উদ্ভিদ-রোগ বিজ্ঞান

অশোক কুমার সিংহ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

উদ্ভিদ-রোগবিজ্ঞান

COMPLIMENTARY

অশোক কুমার সিংহ
পি এইচ ডি (লণ্ডন)
অধ্যাপক, উদ্ভিদ-রোগবিজ্ঞান বিভাগ,
বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মোহনপুর

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

UDVID ROG-BIJNAN

[Plant Disease]

Ashok Kumar Sinha

© : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

© : West Bengal State Book Board

প্রকাশকাল : প্রথম প্রকাশ : জানুআরি ১৯৮৯

প্রকাশক :

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার

আর্য ম্যানসন (নবম তল)

কলিকাতা ৭০০ ০১৩

মুদ্রক :

জাগরণী প্রেস

৪০/১বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন

কলিকাতা-১২

16397

ACC NO. 16397

মূল্য : চল্লিশ টাকা

Published by Sri Sibnath Chattopadhyay Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board under the centrally sponsored scheme of production of books and literature in regional languages at the University level, launched by the Government of India, in the Ministry of Human Resource Development (Department of Education) New Delhi.

বাবা-মার স্মৃতিতে

নিবেদন

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাই স্বাভাবিক এবং অধিকাংশ দেশে প্রচলিত। আমাদের দেশ এর ব্যতিক্রম। এখানে স্কুলের শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা হলেও উচ্চতর শিক্ষা প্রধানতঃ ইংরাজীর মাধ্যমেই পরিচালিত হয়। বহুভাষাভাষী এই দেশে এর হয়ত কারণ আছে, সুবিধার দিকও আছে। তবু প্রশ্ন থেকে যায়। মাধ্যম যেখানে ইংরাজী সেখানে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তির অভাব কি অধিকাংশ ছাত্রের পক্ষে বিষয়টি আয়ত্ব করার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না? বর্তমানে যারা উচ্চশিক্ষার জন্য আসছে তাদের বেশ বড় একটি অংশের পক্ষে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তক থেকে তথ্য আহরণ ও ক্লাসে অধ্যাপকের লেকচারের মর্মোদ্ধার পুরোপুরি সম্ভব হচ্ছে না। ফলে তাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। কিছুকাল থেকেই ক্লাসে আলোচনার সময় ইংরাজীর সঙ্গে কিছুটা বাংলা প্রয়োজনেই ব্যবহার করে আসছি। ইদানীং সেই ব্যবহার আরও বেড়েছে। এর ফলে দেখেছি আলোচ্য বিষয়টি বুঝতে কিছু ছাত্রের অন্ততঃ অনেক সুবিধা হয়েছে। তখনই মনে হয়েছে যে উদ্ভিদ-রোগবিজ্ঞানের জন্য বাঙলায় রচিত কোন পাঠ্যপুস্তক থাকলে ছাত্ররা সেটিকে সহায়ক পাঠ্যপুস্তক হিসাবে গ্রহণ করতে পারত এবং শুধুমাত্র ইংরাজী জ্ঞানের অভাবে যে বিষয়টির মর্মোদ্ধার আগে সম্ভব হয়নি তখন তা সম্ভব হত। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের আনুকূল্যে প্রকাশিত 'উদ্ভিদ-রোগবিজ্ঞান শীর্ষক পুস্তকটির রচনা মূলতঃ এই চিন্তারই ফলশ্রুতি।

ক্লাসে আমার ছাত্রদের কাছে বিষয়টি যে ভাবে উপস্থাপিত করি এই পুস্তকের রচনাকলে আমি মোটামুটি সেই ক্রমপর্যায় অনুসরণ করেছি। বইটির উপজীব্য গাছের রোগের সৃষ্টি, প্রসার ও তজ্জনিত ক্ষতি সংক্রান্ত মূল নীতিগুলি নিয়ে আলোচনা হলেও, উদ্ভিদ-রোগবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের প্রাথমিক ধারণা এখানে দেওয়া হয়েছে এবং রোগ নিয়ন্ত্রণের মূল নীতিগুলি নিয়েও কিছুটা বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কৃষিবিজ্ঞানের যে সব ছাত্র স্নাতক স্তরে উদ্ভিদ-রোগ-বিজ্ঞান নিয়ে বিশেষভাবে অধ্যয়ন করছে এই পুস্তক মুখ্যতঃ তাদের জন্য রচিত হলেও এটি স্নাতকোত্তর স্তরে উদ্ভিদবিজ্ঞানের ছাত্রদেরও প্রয়োজন সিদ্ধ করবে বলে আমার ধারণা। পুস্তকের শেষে সহায়ক গ্রন্থের ও প্রাসঙ্গিক গবেষণা-পত্রাদির তালিকা সংযোজিত হয়েছে যাতে উৎসাহী ছাত্ররা আরও তথ্য সংগ্রহে

সচেষ্ট হতে পারে। যাদের জন্য এই পুস্তকটি রচিত এটি পাঠ করে তাদের উদ্ভিদ-রোগবিজ্ঞান সংক্রান্ত ধারণা যদি কিছুটা স্পষ্টতর হয় তাহলে প্রচেষ্টা সার্থক মনে করব।

এই পুস্তকে মূল বৈজ্ঞানিক শব্দগুলির ইংরাজী থেকে লিপ্যন্তর করা হয়েছে এবং শব্দগুলিকে উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে রাখা হয়েছে। এর সঙ্গে পারিভাষিক শব্দগুলিও ব্যবহৃত হয়েছে। যেখানে প্রচলিত পারিভাষিক শব্দটি উপযোগী নয় সেখানে কোথাও যেমন শব্দের কিছুটা পরিবর্তন করে নেওয়া হয়েছে, অন্যত্র নূতন পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের মতামত জানার আগ্রহ রইল।

এই পুস্তক রচনার প্রয়াসে যাঁরা নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন তাঁরা সকলেই আমার কৃতজ্ঞতার পাত্র। তবুও কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখের প্রয়োজন বোধ করছি। বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সহযোগী অধ্যাপক-বৃন্দ ডঃ শঙ্কর মুখোপাধ্যায়, ডঃ চিত্রেশ্বর সেন, ডঃ শুভেন্দু চৌধুরী ও ডঃ নীলাংশু মুখোপাধ্যায় এবং কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডঃ কনকরঞ্জন সমাদ্দার পাণ্ডুলিপির বিশেষ কয়েকটি অধ্যায় পাঠ করে তাঁদের বিশেষজ্ঞের মতামত দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁদের আমার ধন্যবাদ জানাই। আমার প্রাক্তন ছাত্র—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডঃ রবীন্দ্রপ্রসাদ পুরকায়স্থ পাণ্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত পাঠ করে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত মতামত দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছেন। তিনি আমার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। প্রুফ দেখার সময় আমার স্ত্রী শ্রীমতী তপতী সিংহ আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁর এই অকুণ্ঠ সহযোগিতার সানন্দ স্বীকৃতি এখানে রইল। এতদসত্ত্বেও কিছু ত্রুটি এই পুস্তকে অবশ্যই থেকে গেছে যার দায়িত্ব একান্তভাবে আমার। বিশেষজ্ঞ পাঠকের সুচিন্তিত মতামত পেলে এইসব ত্রুটি ও মুদ্রণজনিত প্রমাদগুলি পরবর্তী সংস্করণে অবশ্যই সংশোধিত হবে।

পরিশেষে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদকে এই পুস্তক প্রকাশনার জন্য ও পর্ষদের মুখ্য প্রশাসন আধিকারিক শ্রীশিবনাথ চট্টোপাধ্যায় ও প্রোডাকসন্-ইনচার্জ শ্রীঅশোক বিশ্বাসকে তাঁদের সাহায্য ও সুপরামর্শের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

অশোক কুমার সিংহ

কল্যাণী

২৬শে জানুআরি ১৯৮৯

সূচীপত্র

উদ্ভিদ-রোগবিজ্ঞান

১ উপক্রমণিকা

সভ্যতার আদিপর্বে মানুষের কোন স্থায়ী বাসস্থান ছিল না। বনের পশুপাখী, গাছের ফলমূল ও দানাশস্য সংগ্রহের আশায় তারা স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াত। পরবর্তী যুগে, সংখ্যাবৃদ্ধির কারণে ও সামাজিক জীবন যাপনের তাগিদে, মানুষ যাযাবর বৃত্তি ছেড়ে জলের কাছাকাছি, সাধারণতঃ নদীর ধারে, নিজেদের সুবিধামত জায়গায় বসতিস্থাপন করল। ফলে জনপদ গড়ে উঠল। তখন বাঁচার তাগিদে, নিজেদের খাবারের প্রয়োজন মেটাতে, তাদের জনপদ সংলগ্ন জমিতে খাদ্যশস্য উৎপাদনের দিকে মন দিতে হল। এইভাবে কৃষির সূত্রপাত হল। শস্য উৎপাদন করতে গিয়ে মানুষ দেখতে পেল যে শস্যের নানারকম রোগ হতে পারে, তাছাড়া প্রতি বছরই ভাল ফলন পাওয়া যায় না। শস্যের রোগের সঙ্গে কম ফলনের একটা সম্পর্কও তারা খুঁজে পেল এবং এও বুঝতে পারল যে শস্যের রোগ তাদের স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। হাজার হাজার বছর আগে শস্যের রোগ নিয়ে মানুষের মনে যে দুশ্চিন্তার সূত্রপাত হয়েছিল আজও তা কমেনি বরঞ্চ বলা যায় যে জীবনধারণের প্রয়োজন মেটায় যে সব শস্য তাদের রোগ সংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যা নিয়ে দুশ্চিন্তা অনেক বেড়েছে। মানুষের এই দুশ্চিন্তা থেকেই উদ্ভিদ রোগ বিজ্ঞানের উৎপত্তি।

গাছের রোগ

একটি গাছকে তখনই সুস্থ ও স্বাভাবিক বলা চলে যখন গাছটির শারীরিক কাজকর্ম ঠিকমত চলে, গাছটি স্বাভাবিকভাবে বাড়তে থাকে এবং সময়মত তার ফুল ও ফল হয়। গাছের স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য কয়েকটি প্রাকৃতিক উপাদান বিশেষ মাত্রায় প্রয়োজন হয়, যেমন—জল, উষ্ণতা এবং নাইট্রোজেন (Nitrogen), ফসফরাস (Phosphorus), পটাশিয়াম (Potassium), বোরন (Boron), দস্তা (Zinc), লোহা (Iron), মলিবডেনাম (Molybdenum) প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের কিছু মৌল কণা। সব গাছের প্রয়োজন অবশ্য একরকম নয়। স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশে সবকটি প্রয়োজনীয় উপাদান যে উপযুক্ত পরিমাণে থাকবেই এমনও বলা যায় না। পরিবেশে এই ধরণের কোন একটি বা একাধিক উপাদান প্রয়োজনের তুলনায় কিছু কম বা

১ উপক্রমণিকা

সভ্যতার আদিপর্বে মানুষের কোন স্থায়ী বাসস্থান ছিল না। বনের পশুপাখী, গাছের ফলমূল ও দানাশস্য সংগ্রহের আশায় তারা স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াত। পরবর্তী যুগে, সংখ্যাবৃদ্ধির কারণে ও সামাজিক জীবন যাপনের তাগিদে, মানুষ যাযাবর বৃত্তি ছেড়ে জলের কাছাকাছি, সাধারণতঃ নদীর ধারে, নিজেদের সুবিধামত জায়গায় বসতিস্থাপন করল। ফলে জনপদ গড়ে উঠল। তখন বাঁচার তাগিদে, নিজেদের খাবারের প্রয়োজন মেটাতে, তাদের জনপদ সংলগ্ন জমিতে খাদ্যশস্য উৎপাদনের দিকে মন দিতে হল। এইভাবে কৃষির সূত্রপাত হল। শস্য উৎপাদন করতে গিয়ে মানুষ দেখতে পেল যে শস্যের নানারকম রোগ হতে পারে, তাছাড়া প্রতি বছরই ভাল ফলন পাওয়া যায় না। শস্যের রোগের সঙ্গে কম ফলনের একটা সম্পর্কও তারা খুঁজে পেল এবং এও বুঝতে পারল যে শস্যের রোগ তাদের স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। হাজার হাজার বছর আগে শস্যের রোগ নিয়ে মানুষের মনে যে দুশ্চিন্তার সূত্রপাত হয়েছিল আজও তা কমেনি বরঞ্চ বলা যায় যে জীবনধারণের প্রয়োজন মেটায় যে সব শস্য তাদের রোগ সংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যা নিয়ে দুশ্চিন্তা অনেক বেড়েছে। মানুষের এই দুশ্চিন্তা থেকেই উদ্ভিদ রোগ বিজ্ঞানের উৎপত্তি।

গাছের রোগ

একটি গাছকে তখনই সুস্থ ও স্বাভাবিক বলা চলে যখন গাছটির শারীরিক কাজকর্ম ঠিকমত চলে, গাছটি স্বাভাবিকভাবে বাড়তে থাকে এবং সময়মত তার ফুল ও ফল হয়। গাছের স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য কয়েকটি প্রাকৃতিক উপাদান বিশেষ মাত্রায় প্রয়োজন হয়, যেমন—জল, উষ্ণতা এবং নাইট্রোজেন (Nitrogen), ফসফরাস (Phosphorus), পটাশিয়াম (Potassium), বোরন (Boron), দস্তা (Zinc), লোহা (Iron), মলিবডেনাম (Molybdenum) প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের কিছু মৌল কণা। সব গাছের প্রয়োজন অবশ্য একরকম নয়। স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশে সবকটি প্রয়োজনীয় উপাদান যে উপযুক্ত পরিমাণে থাকবেই এমনও বলা যায় না। পরিবেশে এই ধরণের কোন একটি বা একাধিক উপাদান প্রয়োজনের তুলনায় কিছু কম বা

বেশী থাকলে গাছের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না কারণ সহজাত অভিযোজন ক্ষমতার দরুণ গাছ নিজেকে এই পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। কিন্তু কোন একটি উপাদান যদি প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম বা অনেক বেশী থাকে বা গাছের অব্যবহিত পরিবেশে কোন ক্ষতিকারক জীবাণুর উপস্থিতি ঘটে তখন গাছের পক্ষে সেই পরিবর্তিত ও প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে আর মানিয়ে চলা সম্ভবপর হয় না। এই অবস্থায় গাছের শারীরবৃত্তীয় বিভিন্ন কাজকর্মে নানা ত্রুটি দেখা দিতে থাকে যার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই গাছের দেহে নানারকম অস্বাভাবিকতার চিহ্ন ফুটে ওঠে এবং গাছটিকে আর সুস্থ বা স্বাভাবিক মনে হয় না। তখন আমরা বলি গাছটির রোগ হয়েছে বা গাছটি রোগগ্রস্ত। অস্বাভাবিকতার চিহ্নগুলিকে বলা হয় রোগের লক্ষণ (disease symptom) যা দেখে আমরা রোগের আক্রমণ সম্বন্ধে অবহিত হই এবং এর থেকে অনেক ক্ষেত্রে রোগের কারণ নির্ণয় করাও সম্ভব হয়। রোগের লক্ষণ নানা ধরণের হতে পারে। রোগের জন্য গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হতে পারে, গঠনে বিকৃতি দেখা দিতে পারে, গায়ে নানাধরণের দাগ হতে পারে, আক্রান্ত অংশটি পচে বা শুকিয়ে যেতে পারে, এমনকি ফসলের বা ফলের মানের অবনতিও ঘটতে পারে। অধিকাংশ রোগলক্ষণই অসুস্থতা জনিত শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় নানাধরণের অস্বাভাবিক পরিবর্তনের ফল। তবে এই সব অস্বাভাবিকতার চিহ্ন যদি অত্যন্ত সাময়িক ধরণের হয় ও সাধারণ চোখে ধরা না পড়ে, তাহলে অনেকেই গাছটিকে রোগগ্রস্ত বলে মানতে চাইবেন না যদিও বৈজ্ঞানিকের চোখ দিয়ে দেখলে রোগের ঘটনা বাস্তব সত্য। গাছের রোগের সংজ্ঞা নিরূপণ অত্যন্ত দুরূহ কাজ। এই প্রসঙ্গে মতভেদও রয়েছে। বিভিন্ন উদ্ভিদ রোগবিজ্ঞানীর মতামত আলোচনা করলে ব্যাপারটা পরিস্কার হবে। ক্যুন (Julius G. Kuhn, 1858) প্রথম গাছের রোগের সংজ্ঞা নিরূপণ করেন। তাঁর মতে গাছের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় অস্বাভাবিক পরিবর্তনের ফলেই রোগের সৃষ্টি হয়। ওয়ার্ড (Harry Marshal Ward, 1901) বলেছিলেন রোগ বলতে এমন একটা অবস্থা বোঝায় যখন গাছের শরীরের বিভিন্ন কাজ ঠিকমত চলে না। হোয়েটজেলের (H. H. Whetzel, 1935) মতে গাছের রোগ এক ধরণের ক্ষতিকর শারীরিক ক্রিয়াকলাপ যা কোন রোগউৎপাদকের দ্বারা সৃষ্ট অবিরাম উত্তেজনার ফলে উদ্ভূত। ব্রিটিশ মাইকোলজিকাল সোসাইটি অনুমোদিত সংজ্ঞা অনুযায়ী রোগ গাছের স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপের এক ক্ষতিকর পরিবর্তন। স্ট্যাকম্যান ও হারারের (E. C. Stakman and

J. G. Harrar, 1967) মতে গাছের রোগ বলতে বোঝায় স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও গঠন থেকে এমন ধরণের বিকৃতি যা রোগের লক্ষণ হিসাবে গণ্য হবার পক্ষে যথেষ্ট প্রকট ও স্থায়ী ধরণের এবং যা উৎপন্ন ফসলের গুণগত মান বা আর্থিক মূল্য কমিয়ে দেয়। এইসব সংজ্ঞাগুলি বিচার করলে দেখা যাবে প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন যে রোগের ফলে গাছের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়, শারীরবৃত্তীয় বিক্রিয়াগুলি ঠিকমত চলে না, বৃদ্ধিতে ও গঠনে অনেক অস্বাভাবিকতা দেখা দেয় এবং ফসলের ক্ষতিকর পরিবর্তন ও তার জন্য আর্থিক মূল্য হ্রাসের সম্ভাবনা থাকে। অনেকের মতে এই সংজ্ঞাগুলি ত্রুটিপূর্ণ কারণ এগুলিতে রোগকে একটি অবস্থা বা কোন কিছুর ফল বা পরিণাম হিসেবে দেখানো হয়েছে। রোগ হলে গাছের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের নানাধরণের ব্যতিক্রম ঘটতে দেখা যায়। আমরা সাধারণতঃ রোগজনিত অস্বাভাবিকতা বা স্বাস্থ্যহীনতাকে রোগের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলি। হর্সফল ও ডাইমণ্ড (J. G. Horsfall & A. E. Dimond, 1959) মনে করেন রোগ বলতে কোন বিশেষ অবস্থা বোঝায় না, কোন কারণ বা লক্ষণও বোঝায় না, রোগ আর রোগউৎপাদক এক নয় এবং রোগ সংক্রামিত হতে পারে না—কেবলমাত্র জীবাণু সংক্রামিত হয়। তাঁদের মতে রোগের লক্ষণকে একটি বিশেষ অবস্থা বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে কিন্তু রোগকে নয়; রোগ বিকৃত ধরনের প্রক্রিয়া বিশেষ। তাঁদের দেওয়া সংজ্ঞানুযায়ী রোগ হল ধারাবাহিকভাবে প্রদত্ত উত্তেজনার ফলে উদ্ভূত গাছের বিকৃত ধরণের শারীরিক প্রক্রিয়া যা দেহে অস্বাচ্ছন্দ্যের ও অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি করে থাকে। এই উত্তেজনা যোগায় রোগজীবাণু বা অন্য ধরনের রোগউৎপাদক। গাছ ও রোগ-উৎপাদকের মধ্যে অবিরাম মিথস্ক্রিয়ার ফলে গাছে যে বিকৃত ধরনের শারীরিক প্রক্রিয়া চলতে থাকে তার ফলে গাছের দেহে ধারাবাহিকভাবে বিকৃতির চিহ্ন বা লক্ষণ দেখা দিতে থাকে। বলা যায় যে যতক্ষণ রোগের আক্রমণে গাছটির মৃত্যু না ঘটে বা গাছের প্রতিক্রিয়ার ফলে রোগউৎপাদক নিষ্ক্রিয় হয়ে না পড়ে ততক্ষণ তাদের মিথস্ক্রিয়া চলতে থাকে এবং রোগের লক্ষণও ক্রমান্বয়ে প্রকাশ পেতে থাকে।

কৃষি ও সমাজের উপর রোগের প্রভাব

সভ্যতার আদিপর্বে যখন যাযাবর বৃত্তি ছেড়ে মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপন শুরু হল এবং জীবনধারণের প্রয়োজনে খাদ্যশস্যের চাষ হতে লাগল তখন থেকেই গাছের রোগ নিয়ে মানুষের দুশ্চিন্তার শুরু। সেদিনের আদিম মানুষের

সেই দুশ্চিন্তা কিন্তু আজও সভ্য জগতের মানুষ কাটিয়ে উঠতে পারেনি। আমরা আছি, পাশাপাশি গাছপালাও আছে। কিন্তু আমরা যে গাছপালার জন্যই এ পৃথিবীতে শুধু খেয়ে পরে বেঁচে আছি তাই নয়, বহুবিধ জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যও ভোগ করছি সে কথা কি আমরা সহজে ভাবতে পারি? প্রথিতযশা উদ্ভিদ রোগবিজ্ঞানী ষ্ট্যাকম্যান ও হারারের মতে মানুষ পৃথিবীতে গাছপালার অতিথি হয়ে বাস করে অর্থাৎ বেঁচে থাকার জন্য মানুষ গাছপালার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। একটু বিশদ আলোচনা করলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে।

পৃথিবীতে প্রায় দু'লক্ষ গাছের জাতি জানা আছে। এদের মধ্যে শতকরা দেড় ভাগ অর্থাৎ প্রায় তিন হাজারের মত গাছের আমাদের খাদ্যের উৎস হিসাবে কমবেশী চাষ করা হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে আবার মাত্র অল্প কয়েকটি থেকে আমাদের অধিকাংশ খাদ্য আমরা পেয়ে থাকি; যেমন-ধান, গম, ভুট্টা, যব, জোয়ার, ডালশস্য, আলু, রাঙা আলু, কাসাভা, কলা ইত্যাদি। এ ছাড়া চিনি খাদ্যের একটি প্রধান উপাদান, বিশেষ করে সভ্যমানুষের। আমাদের চিনির যোগান আসে প্রধানতঃ আখ ও কিছুটা বীট গাছ থেকে। উষ্ণ পানীয় আজ আমাদের জীবনযাত্রার এক অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। চা, কফি বা কোকো আমরা গাছ থেকেই পাই। পরিধেয় কাপড়ের ও নানারকম ব্যবহারের জন্য তন্তুর যোগানও আসে তুলা, পাট প্রভৃতি গাছ থেকে। রোগ হলে যেসব ঔষধ আমরা ব্যবহার করে থাকি তাদেরও অধিকাংশই গাছ থেকে পাওয়া যায়। বড় বড় গাছের কাঠ দিয়ে মানুষ তার বাসস্থান ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র তৈরী করে। এত গেল একেবারে প্রত্যক্ষ দৈনন্দিন প্রয়োজনের কথা। তাছাড়া অন্যান্য দিকও আছে। বর্তমান সভ্যতা একান্তভাবে যন্ত্র নির্ভর। এর জন্য যে শক্তির প্রয়োজন সেই শক্তি পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের জ্বালানি থেকে, যেমন-কয়লা, পেট্রল, ডিজেল ইত্যাদি। বিদ্যুৎ উৎপাদনেও প্রধানতঃ কয়লা লাগে। ঘরের প্রয়োজনে আমরা জ্বালানি হিসেবে কাঠ, কেরোসিন বা কয়লা ব্যবহার করে থাকি। জ্বালানি সবকটিই পাওয়া যায় গাছপালা থেকে। আবার মানুষ যখন একটানা কাজের ফলে বা দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমির দরুণ ক্লান্তিবোধ করে বা দীর্ঘ রোগভোগের পর স্বাস্থ্যোদ্ধারের প্রয়োজন অনুভব করে তখনও সে প্রকৃতির কোলে, যেখানে গাছপালার প্রাচুর্য ও সবুজের সমারোহ, সেখানেই যেতে চায়। গাছপালা আমাদের ক্লান্তি অপনোদন করে, হারানো স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দেয়। এতক্ষণ যা বলা হল তা হল নিত্য প্রয়োজনের বা জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিক এছাড়াও

বলা যায় যে আমাদের অজ্ঞাতসারেই গাছপালা আমাদের ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রদীপটিকে জ্বালিয়ে রেখেছে। মানুষের ও অন্যান্য জীবজন্তুর শ্বসনক্রিয়ার ফলে দেহ থেকে প্রচুর পরিমাণে বিষাক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড (carbon dioxide) গ্যাস অবিরাম নিঃসৃত হচ্ছে যার ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। বায়ুমণ্ডলে এই গ্যাসের স্বাভাবিক পরিমাণ মাত্র শতকরা দশমিক তিন ভাগ। এর পরিমাণ কিছুটা বাড়লেই মানুষ বা অন্য প্রাণীর মৃত্যু ঘটবে। কিন্তু সবুজ গাছপালা তাদের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই বাড়তি কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ব্যবহার করে শুধু যে পৃথিবীর সব প্রাণীর জন্য খাদ্য উৎপাদন করছে তাই নয়, পরিবেশ শোধন করে তাদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকেও রক্ষা করছে। এর পরেও কি আমরা বলব যে গাছপালাকে বাদ দিয়ে আমরা বাঁচতে পারি ? অতএব গাছপালার, বিশেষ করে যে সব গাছ আমরা জীবনধারণের প্রয়োজনে চাষ করে থাকি তাদের স্বাস্থ্যহীনতা আমাদের সমূহ চিন্তার কারণ না হয়ে পারে না।

গাছের রোগের ফলে একটি দেশের, কখনও বা একটি অঞ্চলের কৃষিতে এমনকি জাতীয় অর্থনীতিতে বিরাট বিপর্যয় ঘটতে দেখা গেছে যা সেখানকার সমাজ জীবনে ও ইতিহাসে বড় রকমের দাগ রেখে গেছে।

সবসময় উৎপাদন কতটা কমল তা দিয়ে কৃষি বা সমাজের উপর রোগের প্রভাব সঠিকভাবে নিরূপণ করা যায় না। এর অন্য দিকও রয়েছে যার কয়েকটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হল। একসময় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে 'হাইওয়ে'র দুধারে শ্রেণীবদ্ধভাবে লাগানো দীর্ঘকায় চেষ্টনাট (chestnut) গাছগুলি একধরণের বিশেষ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। প্রথম ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে চেষ্টনাট গাছে ধসা (chestnut blight causal organism *endothia parasitica,* রোগের লক্ষণ দেখা গেল। দশ বছরের মধ্যে এই রোগ অত্যন্ত দ্রুত বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার ফলে এবং রোগ নিবারণের চেষ্টা সফল না হওয়ায় রমণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উৎস চেষ্টনাট গাছগুলি যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ অঞ্চল থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তাছাড়া ট্যানিন (tannin) ও রজন (resin) এর অন্যতম উৎস চেষ্টনাট গাছগুলি এইভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় যে সব শিল্পে এদের প্রচুর ব্যবহার হত সেগুলিও তখনকার মত ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রীলঙ্কায় প্রচুর কফির চাষ হত। উৎপন্ন কফি অধিকাংশই ইংল্যাণ্ডে রপ্তানী হত। তখন কফি ছিল ইংল্যাণ্ডবাসীদের প্রধান

উষ্ণ পানীয়। আঠারশ সত্তর খ্রীষ্টাব্দে শ্রীলঙ্কার কফি ক্ষেতে মরিচা বা 'রাস্ট' (rust : c. o.—*Hemileia vastatrix*) রোগের আক্রমণ প্রথম ঘটতে দেখা গেল। এই রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় মাত্র ৮-১০ বছরের মধ্যেই শ্রীলঙ্কায় কফির চাষ ভীষণভাবে কমে গেল। আঠারশ বিরানব্বই খ্রীষ্টাব্দে কফির রপ্তানী হল আগের তুলনায় শতকরা নব্বই ভাগ কম। যখন বোঝা গেল যে এই রোগ নিবারণে সাফল্যের সম্ভাবনা খুবই কম তখন কফি চাষ তুলে দিয়ে সেখানে চা ও রবারের চাষ শুরু হল। এর ফলে শুধু যে শ্রীলঙ্কার অর্থনীতি বেশ কিছুকালের জন্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল তাই নয় ইংল্যাণ্ডবাসীরাও বাধ্য হয়ে পানীয় হিসাবে কফি ছেড়ে ক্রমশঃ চা ব্যবহার করতে শুরু করেন। বর্তমানে চা তাদের প্রধান উষ্ণ পানীয়।

উত্তর আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনের প্রথম দিকে ইউরোপ থেকে আসা বাস্তুত্যাগীরা প্রধানতঃ দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। ইউরোপে তারা গমের রুটি খেত তাই নতুন উপনিবেশে তারা গমের চাষ শুরু করল, কিন্তু দেখা গেল মরিচা রোগের আক্রমণের ফলে ফলন ভাল হচ্ছে না। তখন উপনিবেশকারীরা মরিচা রোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না এরকম দানাশস্যের দিকে নজর দিল এবং ঐ অঞ্চলে ভূট্টার চাষ শুরু হল। এইভাবে গমের বদলে ভূট্টার রুটি খাওয়া আরম্ভ হয়েছিল যা পরে তাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়।

পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাবের জন্য বিশেষ বিশেষ ফসলের চাষ তুলে দিতে হয়েছে। ঢলে পড়া বা 'পানামা' (Panama wilt : c. o. *Fusarium Oxysporum* f. sp. *cubense*), 'সিগাটোকা' (Sigatoka : c. o. *Mycosphaerella musicola*) ও 'বাঞ্চি টপ' (Bunchy top : c. o. virus) রোগের আক্রমণে কলা চাষের প্রভূত ক্ষতি হয়ে থাকে। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায়, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ও অস্ট্রেলিয়ার কোন কোন অঞ্চলে এই সব রোগ থেকে বছরের পর বছর এত ক্ষতি হত যে বাধ্য হয়ে এই সব জায়গায় কলার চাষ একেবারে বন্ধ করে দিতে হয়েছে। একই কারণে অ্যাফানোমাইসেস *(Aphanomyces Cochlioides)* জনিত শিকড় পচা রোগের আক্রমণের ফলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-মধ্য অংশের অনেক জায়গা থেকে বীটের চাষ প্রায় তুলে দিতে হয়েছিল যার ফলে সেখানকার চিনির কলগুলিও বন্ধ হয়ে যায়।

ফসলের রোগ ও তজ্জনিত ঘটনা অনেক দেশের ইতিহাসে বিশেষ স্বাক্ষর রেখে গেছে। দু একটি উদাহরণ আলোচনা করলেই এই বক্তব্যের যথার্থতা বোঝা যাবে।

রাশিয়ার বিশেষ পরাক্রমশালী সম্রাট (Czar) পিটার দি গ্রেট দেশের জন্য বরফমুক্ত বন্দরের প্রয়োজন মেটাতে ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে আস্ত্রাখান থেকে তুরস্কের ইস্তাম্বুল বন্দর অধিকারের উদ্দেশ্যে অভিযান চালান। প্রায় বিনা বাধায় ভলগা উপত্যকা দিয়ে রুশ সৈন্যবাহিনী ঝড়ের বেগে ইস্তাম্বুলের দিকে এগোতে থাকে। ভলগা উপত্যকায় প্রচুর পরিমাণে 'রাই' (rye) এর চাষ হত। অভিযানের পথে রুশ সৈন্যরা রাই এর রুটি খেত আর ঘোড়াদের খাওয়ান হত রাই এর খড়। অগাষ্টের একদিন ঘূর্ণিরোগে টলমল করতে করতে প্রথম ঘোড়াটি মারা গেল। পরদিন 'হোলি ফায়ার' (holy fire) রোগে একটি সৈন্যের মৃত্যু হল। অতি অল্পদিনের মধ্যেই প্রায় কুড়ি হাজার সৈন্যের মৃত্যু হওয়ায় রুশ সৈন্যবাহিনী মাঝপথেই অভিযান পরিত্যাগ করে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এইভাবে তুরস্ক রুশদের হাত থেকে রক্ষা পায় যদিও আসল কারণটি তখন জানা ছিল না। 'আরগট' (ergot : c. o. *Claviceps purpurea*) রোগে আক্রান্ত রাই গাছে দানার বদলে একরকম গুটি দেখা যায় যা খুবই বিষাক্ত। ফসল তোলার সময় সেগুলি দানার সঙ্গে মিশে যায় বা খড়েও থেকে যায়। সেই দানা বা খড় খেলে এইসব মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হয়। এই ধরণের বিষক্রিয়ায় ফলেই রুশদের আকস্মিকভাবে তুরস্ক অভিযান পরিত্যাগ করতে হয়েছিল।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। পশ্চিম ইউরোপের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য হল আলু। সেই সময় পর পর কয়েক বছর নাবি ধসা বা 'লেট ব্লাইট' (late blight : c. o. *Phytophthora infestans*) রোগের প্রবল আক্রমণে আলু চাষের ভীষণ ক্ষতি হতে থাকে। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে, বিশেষ করে আয়ার্ল্যাণ্ডে, চাষের অবস্থা এমন সঙ্গীন হয়ে পড়ে যে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। পরের বছর আয়ার্ল্যাণ্ডে অবস্থার আরও অবনতি হয় এবং দুর্ভিক্ষের ফলে প্রায় দশ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয় ও প্রায় কুড়ি লক্ষ লোক বেঁচে থাকার আশায় দেশান্তরী হয় যাদের মধ্যে তিন চতুর্থাংশই উত্তর আমেরিকার উদ্দেশে পাড়ি জমিয়েছিল। এইভাবে, ধসা রোগের ফলে, আয়ার্ল্যাণ্ডের অর্থনীতিতে ও সমাজজীবনে এক অভূতপূর্ব দুর্যোগের সৃষ্টি হয়েছিল।

আমাদের দেশেই তৃতীয় ঘটনাটি ঘটে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে, ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে, বাঙলাদেশে ধানের চাষ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সেখানে এক সর্বনাশা দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়েছিল যা 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে খ্যাত। প্রায় কুড়ি লক্ষ মানুষ এই দুর্ভিক্ষে মৃত্যুবরণ করে। দুর্ভিক্ষের কারণ নির্ণয়ের জন্য

তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার এক রাজকীয় কমিশন বসিয়েছিলেন। কমিশনের মতে সেই বছর বাদামী দাগ বা 'ব্রাউন স্পট' (brown spot: c. o. *Helminthosporium oryzae*) রোগের প্রবল আক্রমণের দরুণ ধান চাষের যে মারাত্মক ক্ষতি হয়েছিল তাই ছিল এই দুর্ভিক্ষের মূল কারণ। বিদেশী শাসক নিযুক্ত এই কমিশনের সিদ্ধান্ত অবশ্যই সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নয়। কেননা তখন ভারতের পূর্বসীমান্তে আসন্ন জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনায় ব্রিটিশ অনুসৃত পোড়ামাটি নীতির ফলে পূর্ব বাঙলায় ধানচাষের বিরাট ক্ষতি হয়েছিল আর এর সঙ্গে মিলে ছিল কালোবাজারীদের বলগাহীন মজুতদারি। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে বাদামী দাগ রোগের প্রবল আক্রমণের ফলে ধান চাষের যে ক্ষতি হয়েছিল সেটি পঞ্চাশের মন্বন্তরের একমাত্র বা প্রধান কারণ না হলেও একটি অন্যতম কারণ ছিল।

আধুনিক কৃষিতে রোগবিজ্ঞানের গুরুত্ব

বর্তমানে পৃথিবীর সব থেকে বড় সমস্যা হল জনসংখ্যার বিস্ফোরণ। গত তিন দশকে সারা পৃথিবী জুড়েই চাষবাসের বিরাট অগ্রগতি হয়েছে। তা সত্ত্বেও, যে অকল্পনীয় হারে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে, বিশেষ করে অনগ্রসর দেশগুলিতে, তার জন্য পৃথিবীর মানুষ অদূর ভবিষ্যতে প্রায় অবশ্যম্ভাবী দুর্ভিক্ষের চিন্তায় আজ বিশেষ শঙ্কিত। তাই পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই আরও বেশী পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য এক সক্রিয় প্রচেষ্টা চলেছে। ভারতেও অনুরূপ প্রচেষ্টা চলেছে। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে আমাদের দেশ খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতার দিকে অনেকটাই এগিয়েছে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই আজকাল ভাল জাতের বীজ ব্যবহার করা, মাটি পরীক্ষা করে উপযুক্ত পরিমাণে সার প্রয়োগ করা, প্রয়োজন মত সেচ দেওয়া ও উন্নততর পদ্ধতিতে চাষ হচ্ছে। এর ফলে বিভিন্ন শস্যের ফলন যে অনেক বেড়েছে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। তবে দেখা গেছে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফলন যতটা আশা করা যায় ততটা পাওয়া যায় না। রোগ ও কীটশত্রুর আক্রমণে আর জমিতে আগাছার দরুণ ফলন অনেক সময় কমে যায়, কখনও বা খুব বেশী কমে যায়। আধুনিক কৃষিতে নিবিড় চাষের ফলে এই ক্ষতির সম্ভাবনা বলা যায় আরও বেড়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রোগ, কীটশত্রু ও আগাছার দরুণ গড়ে শতকরা ২৫ থেকে ৪৩ ভাগ ফসল প্রতি বছর নষ্ট হয়। ইউরোপ ও আমেরিকায় এই ক্ষতির পরিমাণ এশিয়া ও আফ্রিকার তুলনায় বেশ কিছুটা কম। শুধুমাত্র রোগের জন্য ক্ষতির পরিমাণ শতকরা

৯ থেকে ১৬ ভাগ। এর থেকে অবস্থার ভয়াবহতার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। পৃথিবীর বিপুল জনসংখ্যার (প্রায় ৫০০ কোটি) শতকরা ৪০ ভাগ অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে দিন কাটায় এই কথা মনে রাখলে বোঝা যাবে ফসলের এই বিপুল ক্ষতির পরিণাম পৃথিবীর মানুষের কাছে কতটা ভয়াবহ। এই ক্ষতি এড়াতে হলে বা কমাতে হলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুসংগঠিতভাবে শস্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা যে আছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। অনগ্রসর দেশগুলির তুলনায় অগ্রসর দেশগুলিতে রোগ ও কীটশত্রু প্রতিরোধ ব্যবস্থা অনেক বেশি উন্নত ও সুসংগঠিত। অগ্রসর দেশগুলিতে রোগের তুলনায় কীটশত্রু থেকে ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কম। কারণ বোধহয় এই যে ঐ সব দেশে অনেক সহজে ও সাফল্যের সঙ্গে কীটশত্রু দমন সম্ভব হয়েছে।

শস্যরক্ষার প্রয়োজনে রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবস্থা নিতে হলে রোগজনিত ক্ষতি সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা থাকা দরকার। এই পরিমাপ শুধু কত টাকার ফসল নষ্ট হল তা দিয়ে হয় না, রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য যে খরচ এবং রোগের কারণে ফসলের উপর নির্ভরশীল শিল্পবাণিজ্যের অপ্রত্যক্ষভাবে যে ক্ষতি হয় তাও এই হিসাবের মধ্যে ধরতে হয়। আমাদের মত দেশের কথা বাদ দিলেও অধিকাংশ অগ্রসর দেশগুলিতে পর্যন্ত এখনও রোগজনিত ক্ষতির সঠিক পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি। বিশেষ বিশেষ শস্যের কিছু মারাত্মক রোগ সম্বন্ধে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু তথ্য পাওয়া যায় মাত্র, খুব নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেই।

বিভিন্ন মরিচা রোগের (rust : c. o. *Puccinia* spp.) আক্রমণে কোন কোন বছরে ক্যানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে গম চাষের বিপুল ক্ষতি হতে দেখা গেছে। ধান চাষে ঝলসা (blast : c. o. *Pyricularia oryze*), ব্যাকটিরিয়া জনিত পাতা ধসা (bacterial leaf blight : c. o. *Xanthomonas campestris* var. *oryzae*) টুংরো (Tungro virus) প্রভৃতি রোগে প্রচুর ক্ষতি হয়। পশ্চিম আফ্রিকায় কোকো ও পূর্ব আফ্রিকায় কফি চাষের একটা বড় অংশ রোগে নষ্ট হয়ে যায়। ইউরোপে 'ব্লু মোল্ড' (blue mold : c. o. *Peronospora tabacina*) রোগে তামাক চাষের ভীষণ ক্ষতি হয়ে থাকে। পানামা ও সিগাটোকা রোগের প্রবল আক্রমণের ফলে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে কলা চাষের শুধু যে প্রচণ্ড ক্ষতি হয় তাই নয়, অনেক অঞ্চলে কলা চাষ একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ অমেরিকার বিভিন্ন দেশে ট্রাইস্টেজা (Tristeza virus) রোগের আক্রমণের ফলে লেবু চাষের খুবই ক্ষতি হয়।

ভারতবর্ষে রোগজনিত ফসলের ক্ষতি সম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান নেই, তবে গমে মরিচা ও ভুষা ; ধানে ঝলসা, পাতা ধসা ও বাদামী দাগ ; আখে লাল পচা (red rot : c. o. *Colletotrichum falcatum)* ; কলার বাঞ্চি টপ ইত্যাদি বিভিন্ন রোগ থেকে ফসলের যে প্রচুর ক্ষতি হয় এ তথ্য আমাদের জানা।

মোটামুটি যে হিসাব পাওয়া যায় তার থেকে জানা যায় যে পৃথিবীতে রোগজনিত ক্ষতির পরিমাণ : দানাশস্য—১৩.৫ কোটি আলু—৯ কোটি, আখ ও বীট ২৩ কোটি, তৈলবীজ—১.৪ কোটি, কফি, কোকো, তামাক ইত্যাদি—২৬ লক্ষ, পাট, তুলা, রবার ইত্যাদি—৩০ লক্ষ, সবজী—৩.১ কোটি ও বিভিন্ন ফল—৮.৩ কোটি টন (G. N. Agrios, 1978)। এই নষ্ট ফসলের মূল্য ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৭০০০ কোটি ডলারের মত ; বর্তমানে ক্ষতির পরিমাণ আরো বেড়েছে বলে মনে হয়। রোগজনিত এই ক্ষতি না হলে কোটি কোটি টন ফসল বেশি পাওয়া যেত, কৃষিভিত্তিক শিল্পগুলির আরো প্রসার হত এবং দেশের অর্থনীতি আরও জোরদার হত। সব থেকে বড় কথা অবশ্য অনগ্রসর দেশগুলির কোটি কোটি মানুষ খেয়ে পরে বাঁচত। রোগজনিত শস্যের ক্ষতি অনেক সময় এই সব দেশের মানুষের কাছে বাঁচা-মরার সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে। জনসংখ্যার বিপুল বিস্ফোরণ ও তজ্জনিত ভয়াবহ খাদ্য সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক কৃষিতে উদ্ভিদ-রোগবিজ্ঞান ও উদ্ভিদ-রোগবিজ্ঞানীর গুরুত্ব অপরিসীম। ফসলের রোগজনিত ক্ষতিকে সহনীয় সীমার মধ্যে রাখতে গেলে উদ্ভিদ-রোগবিজ্ঞান সংক্রান্ত শিক্ষা ও গবেষণার ধারাবাহিক অগ্রগতি ও প্রসার একান্ত প্রয়োজন।

প্রাসঙ্গিক পুস্তক ও গবেষণাপত্রাদি

Cramer, H.H. 1967. "Plant protection and Crop production" (translated by J.H. Edwards). Farbenfabriken Bayer Leverkusen.

Horsfall, J.G., and E.B. Cowling. 1978. Some epidemics man has known. In "Plant Disease : An Advanced Treatise" (J. G. Horsfall and E,B. Cowling, eds.). Vol. 2, 17-33. Academic Press, New York.

Klinkowski, M. 1970. Catastrophic plant diseases. *Ann. Rev. Phytopathol. 8* ; 37-60.

Padmanabhan, S.Y. 1973. The great Bengal famine. *Ann. Rev. Phytopathol. 11* : 11-26.

Stakman, E.C. 1964. Opportunities and obligations in plant pathology. *Ann. Rev. Phytopathol . 2*; 1-12.

Ten Houten, J.G. 1974. Plant Pathology : changing agricultural methods and human society. *Ann. Rev. Phytopathol* : *12*, 1-11.

Horsfall, J.G., and A.E. Dimond. 1960. The pathogen : The concept of casualty. In "Plant Pathology : An Advanced Treatise (J. G. Horsfall and A.E. Dimond, eds.). Vol. 2, 1-18. Academic Press, New York.

Paddock, W.C. 1967. Phytopathology in a hungry world: *Ann. Rev. Phytopathol. 5* : 375-390.

২ উদ্ভিদ রোগবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ ও উল্লেখযোগ্য অবদান

মানুষ যখন যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে যূথবদ্ধ জীবন যাপন করতে শুরু করল তখন থেকেই কৃষির সূত্রপাত। মানুষ নিজের আস্তানার কাছে, মূলতঃ খাদ্যের প্রয়োজন মেটাতে, কিছু খাদ্যশস্যের চাষ আরম্ভ করল। যতই চাষ বাড়তে লাগল ক্রমশঃ রোগ, পোকা ইত্যাদিও দেখা দিতে লাগল। ফসলে রোগের আক্রমণ সেই যুগের মানুষের কাছেও কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা ছিল না। ফসলের ক্ষতি যে শুধু তাদের জীবন ধারণের সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তুলত তাই নয়, তাদের মনেও নিশ্চয় রোগের সম্ভাব্য কারণ ও প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন জাগিয়ে তুলত। অবশ্য সে যুগের মানুষের চিন্তার কোন খবর আমাদের জানা নেই। সভ্যতার ক্রমঃবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী কয়েক হাজার বছরে শস্যের রোগ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা আরও স্পষ্টতর হল। সে যুগের বিভিন্ন রচনা, ধর্মগ্রন্থ বা পুঁথিপত্র থেকে যেটুকু জানা যায় তাতে দেখা যায় যে শস্যের নানা ধরণের রোগ সম্বন্ধে মানুষের অভিজ্ঞতা থাকলেও জ্ঞান ছিল অল্প। এই সব রোগকে অবশ্যম্ভাবী দুর্ঘটনা বলে মনে করা হত এবং রোগ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে নানারকম চেষ্টাও করা হত যদিও সেগুলি বিজ্ঞানভিত্তিক ছিল না। তখন মানুষের মনে এই ধারণাই প্রবল ছিল যে রোগ প্রকৃতির বা দেবতার অভিশাপ ছাড়া আর কিছু নয়, সেজন্য সে ফসলের এই ক্ষতি এড়ানোর উদ্দেশে দেবতাকে নানা উপাচারে, পূজা অর্চনায় তুষ্ট করার প্রয়াস পেত। একটা ধারণা মোটামুটি চালু আছে যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আলোচনার সূত্রপাত ও ক্রমবিকাশ পাশ্চাত্য দেশেই ঘটেছে, যদিও কথাটা সম্পূর্ণরূপে সত্য নয়। বিজ্ঞান সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর সত্য দেশ কাল পাত্র নিরপেক্ষ। মানবসভ্যতার প্রাচীনতম কেন্দ্রগুলি, যথা-মিশর, ব্যাবিলন ভারত ও চীন, সবই প্রাচ্যদেশে অবস্থিত। স্বাভাবিকভাবেই এই সব দেশে প্রাচীনকালে বিজ্ঞানের অনেক শাখায় আলোচনা ও গবেষণার সূত্রপাত হয়েছিল এইতথ্য আজ জানা। উদ্ভিদ রোগবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রেও অবস্থা অনেকটা একই রকম। অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকে আমরা দেখি যে গ্রীক বৈজ্ঞানিক থিওফ্র্যাসটাস (Theophrastus) এর সময় (৩৭০-২৮৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ) থেকে উদ্ভিদ রোগবিজ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনার সূত্রপাত। অ্যারিষ্টটল (Aristotle) এর শিষ্য থিওফ্র্যাসটাসকে উদ্ভিদ তত্ত্বের

জনক বলা হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের প্রাচীন রচনা-ধর্মগ্রন্থ; শাস্ত্রগ্রন্থ ইত্যাদি থেকে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে থিওফ্র্যাসটাসের সময়ের বেশ কিছু আগে থেকেই গাছের রোগ সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা ভারতে গড়ে উঠেছিল। এখানে সংগঠিত কৃষিকাজের ইতিহাস প্রায় ৪ হাজার বছরের পুরানো। প্রায় সেই সময় থেকেই ভারতে কৃষিতে রোগের গুরুত্ব অজানা ছিল না।

প্রাচীন ভারতীয় ধর্মগ্রন্থগুলিতে তৎকালীন সমাজ জীবনের পরিচয় লিপিবদ্ধ রয়েছে। সেগুলি থেকে সেই সময়ের চাষবাসের কথা ও প্রাসঙ্গিক নানা ধরণের সমস্যা সম্বন্ধে জানা যায়। ঋগ্বেদে (খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০—১৫০০ অব্দ) গাছের রোগের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে এবং রোগ যে বাইরের কারণের জন্য হতে পারে এমন সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। অথর্ববেদ (খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০—৫০০ অব্দ), অর্থশাস্ত্র (খ্রীষ্টপূর্ব ৩২১—১৮৬ অব্দ), চরকসংহিতা (১০০—৫০০ খ্রীষ্টাব্দ), শুশ্রুতসংহিতা (২০০—৫০০ খ্রীষ্টাব্দ), বিষ্ণুপুরাণ (৫০০ খ্রীষ্টাব্দ) ও অগ্নিপুরাণ (৫০০—৭০০ খ্রীষ্টাব্দ) ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থে বিভিন্ন শস্যের ছাতাধরা বা "পাউডারি মিলডিউ" (powdery mildew), ঢলে পড়া বা 'উইল্ট' (wilt), ধসা বা 'ব্লাইট' (blight), পচা বা 'রট' (rot) প্রভৃতি নানাধরণের রোগের উল্লেখ দেখা যায়। বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ কুল্লভগ (খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দ) তে ধান এবং আখের রোগের বর্ণনা রয়েছে। প্রাচীন ভারতে যাঁরা আয়ুর্বেদ চর্চা করতেন তাঁরাই সাধারণতঃ গাছের রোগ সম্বন্ধে আগ্রহী ছিলেন। তখন এমন ধারণা চালু ছিল যে মানুষের মত গাছও বায়ু, পিত্ত ও কফ থেকে ভোগে। তখনকার দিনে রোগ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন পদ্ধতিতে দুধ, ঘি, সুমিষ্ট জল, লবণ প্রভৃতির ব্যবহার দেখা যায়। যতদূর জানা যায় সুরপালের লেখা বৃক্ষআয়ুর্বেদ ভারতে গাছের রোগ এবং তার নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে লেখা প্রথম গ্রন্থ। এখানে গাছের রোগকে প্রধানতঃ দুভাগে ভাগ করা হয়েছে, যেমন—বাইরের কারণের জন্য ও ভিতরের কারণের জন্য সঙ্ঘটিত রোগ। রোগ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে নানারকম পদার্থ পাতায় ছিটিয়ে দেওয়া, জমিতে মিশিয়ে দেওয়া, ঘন দ্রবণ করে আক্রান্ত অংশে লাগিয়ে দেওয়া, তাই দিয়ে গাছের গোড়ার মাটি ভিজিয়ে দেওয়া ও ধোঁয়া বা বাষ্পস্নান করান ইত্যাদি নানারকম প্রযোগ পদ্ধতিরও উল্লেখ রয়েছে।

ব্যাবিলনীয় (১৯০০—১৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), সুমেরীয় (১৭০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), গ্রীক (১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ও রোমান (৭১৫—৬২১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) সভ্যতার কালেও বিভিন্ন রচনা, শিলালিপি ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনেতে নানা রকম রোগের উল্লেখ

দেখতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দেশে থিওফ্র্যাসটাসই (Theophrastus) প্রথম যিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গাছের রোগ সম্বন্ধে অনুশীলন করেন ও এ সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর রচনায় সতর্ক পর্যবেক্ষণ শক্তির সঙ্গে সেই সময়ে প্রচলিত কিছু ভুল ধারণার অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখা যায়। তিনি বিভিন্ন রোগে ফসলের প্রতিক্রিয়া এবং কি ধরণের জমিতে কোন আবহাওয়ায় কোন রোগের সম্ভাবনা বেশী সে সম্বন্ধে তাঁর পর্যবেক্ষণ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। থিওফ্র্যাসটাস লক্ষ্য করেছিলেন যে সব গাছে সব রকম রোগ হয় না এবং একই গাছের বিভিন্ন জাতির মধ্যেও রোগের তারতম্য হয়। তিনি তণ্ডুল জাতীয়, ডাল জাতীয় ও অন্যান্য গাছের রোগের সম্বন্ধে লিখেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে গাছ স্বতোবৃত্তভাবে রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে—অন্য কোন জীব বা প্রাণী এর জন্য দায়ী নয়। পরবর্তীকালে বাইবেলে এবং গ্রীক ও রোমানদের বিভিন্ন লেখায় গম ও যবের মরিচা, ভুষা ও ছাতাধরা প্রভৃতি ক্ষতিকর রোগের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। রোমে মরিচা রোগ প্রশমনের আশায় দেবতা রোবিগাসকে (Robigus) তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে প্রতিবছর জাঁক জমকের সঙ্গে রোবিগালিয়া (Robigalia) উৎসব পালন করা হত। ভারতে বিভিন্ন রচনায় নানা ধরণের রোগের উল্লেখের কথা আগেই বলা হয়েছে। এই সময় গাছের রোগ সম্বন্ধে যাঁরা আলোচনা করতেন তাঁরা সকলেই গাছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রোগ সৃষ্টির তত্ত্বে (butogaenic theory of disease) বিশ্বাস করতেন। তাঁদের মতে রোগগ্রস্ত গাছের রুগ্ন অংশে যে সব ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়া ধরণের জীবাণু দেখা যায় রোগের ফলেই তাদের সৃষ্টি হত (spontanecus generation)। এই ধারণা বহুকাল চালু ছিল। উদ্ভিদ রোগবিজ্ঞানকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে দুটি প্রমাণের প্রয়োজন ছিল। প্রথমটি হল যে ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়া রোগগ্রস্ত গাছের দেহে সৃষ্টি হয় না, নিজস্ব বংশবৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় একটি ছত্রাক নিজের অনুরূপ ছত্রাক সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়টি হল ছত্রাক বা অন্য ধরণের জীবাণু গাছে রোগের সৃষ্টি করে, রোগ পরিবেশের প্রভাবে সৃষ্টি হয় না। জীবাণুই যে রোগের উৎস এই তত্ত্বটির (Germ theory of disease) প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠার উপরই বলা যেতে পারে উদ্ভিদ রোগ বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছিল।

সে যুগের সব বৈজ্ঞানিকই যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে রোগের সৃষ্টি হয় এ কথা বিশ্বাস করতেন তা নয়। পোর্টা (Porta) ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে, হুক (Robert Hook) ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে, এবং ম্যালপিঘী (Marshall Malpighi)

পরবর্তীকালে (১৬৭৫-৭৯ খ্রীঃ) বিভিন্ন ছত্রাকের বীজকণা বা 'স্পোর' (Spore) দেখতে পান এবং অভিমত প্রকাশ করেন যে এই সব স্পোর থেকেই নূতন ছত্রাকের জন্ম হয়। কিন্তু তাঁরা কেউই এই বক্তব্যের সমর্থনে কোন পরীক্ষামূলক প্রমাণ উপস্থিত করতে পারেন নি। লিউয়েনহোক (Antony van Leeuwen hoek) এর উন্নত ধরণের অনুবীক্ষণযন্ত্র বা মাইক্রোসকোপ (microscope) আবিষ্কার (১৬৮৬ খ্রীঃ) এই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর ফলে ছত্রাক ও অন্য ধরণের জীবাণু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ সুগম হয়। ইতালীয় বৈজ্ঞানিক মাইকেলি (Pier Antonio Micheli) ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে কিছু নতুন তথ্য উপস্থাপিত করেন। অনুবীক্ষণের সাহায্যে তিনি বিভিন্ন ছত্রাকের উপর অনুসন্ধান চালান এবং কিছু ছত্রাকের স্পোর দেখতে পান। জঙ্গলে রাখা কিছু গাছের শুকিয়ে যাওয়া পাতা ও সদ্য কাটা কিছু ফলের উপরে বিভিন্ন ছত্রাকের স্পোর আলাদা আলাদাভাবে ছড়িয়ে দিয়ে তিনি অনুবীক্ষণের সাহায্যে দেখান যে এদের থেকেই নূতন ছত্রাকের জন্ম হয়েছে এবং সেখানে আবার আগের মত স্পোর উৎপন্ন হচ্ছে। মাইকেলি এ কথাও উল্লেখ করেন যে কাটা ফলের উপরে কোথাও কোথাও যে অন্যধরণের দু-একটি ছত্রাক দেখা গেছে সেগুলি তাদের হাওয়ায় ভেসে আসা স্পোর থেকে জন্মেছে। সমকালীন বৈজ্ঞানিকেরা মাইকেলির বক্তব্যকে বিশেষ গুরুত্ব দেননি, তবু একে জীবাণুবাহিত রোগ তত্ত্বের (germ theory of disease) প্রতিষ্ঠায় প্রথম সুস্পষ্ট পদক্ষেপ বলা যায়।

ইউরোপে সে সময় আলগা ভূষা বা 'লুজ স্মাট' (Loose Smut) ও দুর্গন্ধযুক্ত ভূষা বা 'বান্ট' (bunt) রোগে গম চাষের প্রচুর ক্ষতি হত। ফসল কাটার পরে দেখা যেত গমের গায়ে ভূষার মত কাল গুড়ো লেগে আছে। ফরাসী বৈজ্ঞানিক টিলে (Mathew Tillet) দুর্গন্ধযুক্ত ভূষা রোগগ্রস্ত গাছ থেকে সংগৃহীত বীজ, রোগহীন ফসল থেকে সংগৃহীত নীরোগ বীজ ও সেই বীজে ভূষা মাখিয়ে জমিতে আলাদা আলাদাভাবে লাগিয়ে পর পর ৩ বছর পরীক্ষা চালান ও ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেন। টিলে দেখতে পান যে রোগগ্রস্ত গাছ থেকে নেওয়া ভূষা মাখা বীজ জমিতে লাগালে অনেক গাছে রোগ দেখা দেয়, নীরোগ বীজ থেকে হওয়া গাছে একেবারেই রোগ হয়না। কিন্তু নীরোগ বীজে ভূষা মাখিয়ে লাগালে বেশ কিছু গাছ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তিনি আরও দেখান যে ভূষা মাখানো বীজ লবণ ও চুন গোলা জলে ধুয়ে লাগালে খুব কম গাছেই রোগের আক্রমণ ঘটতে দেখা যায়। তাঁর পরীক্ষা থেকে টিলে

এই সিদ্ধান্তে আসেন যে এই ভূষা রোগ সংক্রামক প্রকৃতির এবং ভূষার মাধ্যমেই ছড়ায়। তবে টিলের ধারণা ছিল যে ভূষার মধ্যে কিছু বিষাক্ত পদার্থ আছে যা এই রোগের কারণ, কোন জীবাণুর কথা তিনি কল্পনাও করেন নি।

ফ্রান্সে প্রেভোষ্ট (Benedict Prevost) গমের দুর্গন্ধযুক্ত ভুষা রোগের উপর পরীক্ষা চালিয়ে টিলের বক্তব্য সমর্থন করেন (১৮০৭ খ্রীঃ)। তিনি ছত্রাকের স্পোরের অঙ্কুরোদগম এবং গমের ছোট চারায়, পরিণত গম গাছের দেহে ও গমের ভ্রূণে ছত্রাকের বিস্তার পরীক্ষামূলকভাবে দেখান কিন্তু ছত্রাক কিভাবে গাছের দেহে প্রবেশ করে তার হদিস পাননি। তিনি আরও দেখান যে তুঁতের (copper sulphate) দ্রবণে ভিজিয়ে বীজ জমিতে লাগালে রোগের আক্রমণের হার আনুপাতিকভাবে কিছুটা কমে। এই সব ফলাফলের উপর ভিত্তি করেই প্রেভোষ্ট সিদ্ধান্তে আসেন যে ছত্রাক থেকেই এই রোগের উৎপত্তি এবং ভূষা ছত্রাকের স্পোরের সমষ্টি ছাড়া অন্য কিছু নয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই রোগ নিবারণের নানাবিধ প্রচেষ্টার খবর পাওয়া যায়। ফ্রান্সের রুঁয়ে (Rouen) অঞ্চলে দেখা গেল যে বারবেরী *Berberis* sp : গাছের ঝোপ কাছাকাছি থাকলে গমের মরিচা রোগ বেশী হচ্ছে। ক্রমশঃ এই ধারণা জোরদার হওয়ায় ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে বারবেরী ঝোপ নষ্ট করে ফেলার জন্য আইন হল যদিও মরিচা রোগ উৎপাদক ছত্রাকের সঙ্গে বারবেরী গাছের কি সম্পর্ক তা তখন জানা ছিল না। আমেরিকার কানেকটিকাটে একই উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করা হল ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে।

আগেই বলা হয়েছে যে প্রেভোস্টের গবেষণার ফলাফল তৎকালীন বৈজ্ঞানিকদের চিন্তার উপর বিশেষ কোন রেখাপাত করেনি। রে (Filippo Re), উঙ্গার (Franz Joseph Unger), মেয়েন (Franz Meyen) প্রভৃতি সে যুগের অগ্রণী বৈজ্ঞানিকেরা তখনও বিশ্বাস করতেন যে বিভিন্ন রোগের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় যে সব ছত্রাককে দেখা যায় তারা পরজীবী নয় এবং তাদের আলাদা কোন অস্তিত্ব নেই ; বিশেষ অবস্থায় বা পরিবেশে একটি গাছ রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং সেই রুগ্ন অবস্থায় গাছে ছত্রাকের জন্ম হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে পশ্চিম ইউরোপে যখন সাধারণ মানুষের প্রধান খাদ্য আলুর চাষ নাবি ধসা রোগের আক্রমণে বছরের পর বছর ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল এবং এই ক্ষতি এড়ানোর উদ্দেশ্যে রোগের কারণ নির্ণয়ের প্রশ্ন খুবই জরুরী হয়ে ওঠে তখনই বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয় পর পর দু বছর, ১৮৪৫ ও ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে আলুর ফসল প্রায় পুরোটাই

নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আয়ার্ল্যাণ্ডে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় যার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। বেলজিয়ান বৈজ্ঞানিক মোরেন (Morren) ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে আলুর এই রোগের ও তার সঙ্গে যুক্ত ছত্রাকের বর্ণনা দেন এবং এই ছত্রাক যে রোগের কারণ হতে পারে এমন সন্দেহ প্রকাশ করেন। ফ্রান্সের মণ্টেন (Montagne) একই বছরে ছত্রাকটির নামকরণ করেন বট্রাইটিস্ ইনফেস্ট্যানস *(Botrytis infestans)*। ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক বার্কলেও (M. Berkeley, 1846) এই ছত্রাকটি আলুর রোগের কারণ বলে মত প্রকাশ করেন। পরে জার্মানীতে প্রথমে স্পিয়ারস্নাইডার (J. Speerschneider, 1857) ও পরে ডি ব্যারী (Heinrich Anton De Bary, 1861, 1863) নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেন যে ছত্রাক থেকেই আলুর নাবি ধসা রোগ হয়। ডি ব্যারী এই ছত্রাকের নাম দেন ফাইটফথোরা ইনফেস্ট্যানস *Phytophthora infestans)*।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত যদিও কোন কোন বৈজ্ঞানিক কিছু রোগের কারণ হিসাবে বিভিন্ন ছত্রাকের নাম উল্লেখ করেছিলেন তবে কেউই গাছের দেহে ছত্রাকের প্রবেশের কোন প্রমাণ দিতে পারেন নি। এর ফলে রোগ যে জীবাণুবাহিত এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হচ্ছিল না। ডি ব্যারী প্রথম ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এই তত্ত্বের স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপিত করেন। তাঁর ভুট্টার ভূষা রোগ (corn smut) সংক্রান্ত গবেষণার ভিত্তিতে ডি ব্যারী পোষক গাছে রোগ-উৎপাদক ছত্রাকের *(Ustilago maydis)* প্রবেশের পর তার হাইফার ক্রম-বিস্তার এবং পরে স্পোর (chlamydospore) উৎপাদন পর্যন্ত আনুপূর্বিক ঘটনার বিবরণ দেন। তখন থেকেই বলা যায় গাছের রোগের ক্ষেত্রে জীবাণু-বাহিত রোগ তত্ত্বের (germ theory of disease) প্রতিষ্ঠা হয়। সে যুগের উদ্ভিদ রোগবিজ্ঞানীদের মধ্যে ডি ব্যারী ছিলেন অগ্রগণ্য। গাছের বিভিন্ন রোগের উপর গবেষণার মাধ্যমে তিনি যে শুধু উদ্ভিদ রোগবিজ্ঞানকে প্রাথমিক ভাবে সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাই নয়, ডি ব্যারী রোগ সম্পর্কে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধারায় গবেষণারও সূত্রপাত করেন। সেজন্য তাঁকে উদ্ভিদ রোগবিজ্ঞানের জনক বলা হয়। উদ্ভিদ রোগবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান হল :

১. তিনি মরিচা ও ভূষা রোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছত্রাকের জীবনের বিভিন্ন পর্যায় ও পোষক গাছের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের বিস্তৃত বিবরণ দেন এবং নিশ্চিন্তভাবে প্রমাণ করেন যে এই সব ছত্রাকই রোগের কারণ।

২. তিনি প্রমাণ করেন যে মরিচা রোগ উৎপাদক ছত্রাক পাকসিনিয়া

গ্র্যামিনিসের *(Puccinia graminis)* জীবন চক্র সম্পূর্ণ করতে গম ছাড়া আরও একটি পোষক গাছের প্রয়োজন হয়। এই দ্বিতীয় পোষক গাছ হল বারবেরী।

৩. পেরোনোস্পোরেসি (Peronosporaceae) পরিবারভুক্ত ছত্রাকের আক্রমণজনিত 'ডাউনি মিলডিউ' (downy mildew) ও আলুর নাবি ধ্বসা রোগ সম্বন্ধে বিশদভাবে গবেষণা করেন ও ছত্রাকের সঙ্গে রোগের সম্পর্ক প্রমাণ করেন।

৪. গাজর ও অন্যান্য কিছু সবজীতে স্ক্লেরোটিনিয়া স্ক্লেরোশিওরাম *(Sclerotinia sclerotiorum)* নামক ছত্রাক যে পচনের সৃষ্টি করে সে সম্বন্ধে গবেষণা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে আক্রমণের সময় ছত্রাকের দেহ নিঃসৃত কিছু এনজাইম (enzyme = উৎসেচক) ধরণের পদার্থ আক্রান্ত অংশে ছড়িয়ে পড়ে ও সেখানকার কোষগুলির দেওয়াল ভেঙ্গে ফেলে ঐ অংশে পচনের সৃষ্টি করে। পরে ছত্রাক মৃত কোষগুলি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে বৃদ্ধি পায় এবং আরও এনজাইম উৎপাদন করে আরও বেশী পচনের সৃষ্টি করে।

ডি ব্যারীর সমসাময়িক জার্মান বৈজ্ঞানিক ক্যুনকে (Julius Gotthelf Kuhn) উদ্ভিদ রোগবিজ্ঞান চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ বলে মনে করা হয়। তিনিই প্রথম দুর্গন্ধযুক্ত ভূষা রোগে আক্রান্ত গম গাছে রোগ উৎপাদক ছত্রাক টিলেশিয়া ক্যারিস *(Tilletia caries)* এর বিস্তার নিয়ে গবেষণা করেন এবং গাছের দেহে প্রবেশ থেকে আরম্ভ করে শিষ আসার পর ফুলের গর্ভাশয়ে স্পোর উৎপাদন পর্যন্ত সম্পূর্ণ জীবনচক্রের আনুপূর্বিক বর্ণনা দেন। ক্যুনের রচিত "শস্যের রোগ, তার কারণ ও প্রতিকার ব্যবস্থা" (১৮৫৮ খ্রীঃ) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখা উদ্ভিদ রোগ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রথম প্রামাণ্য পুস্তক।

ডি ব্যারীর ছাত্র ও সহায়ক গবেষকদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তী কালে গাছের রোগ সংক্রান্ত গবেষণায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন, যেমন—রাশিয়ায় উরোনিন, জার্মানীতে হার্টিগ ও ব্রেফেল্ড এবং ইংল্যাণ্ডে ওয়ার্ড। উরোনিন (Michael Stepanovitch Woronin) তাঁর গবেষণার মাধ্যমে বাঁধাকপির শিকড় ফোলা বা 'ক্লাব রুট' (club root) রোগের রহস্য উদ্ঘাটন করেন এবং প্রমাণ করেন যে এক অস্বাভাবিক ধরণের এককোষী দেওয়ালবিহীন ছত্রাক প্লাজমোডিওফোরা ব্র্যাসিকি *(Plasmodiophora brassicae)* এই রোগের কারণ (১৮৭৪ খ্রীঃ)। হার্টিগ (Adolph Robert Hartig) অরণ্যের বড় বড় গাছের রোগ সংক্রান্ত গবেষণা ও আলোচনার সূত্রপাত করেন। তিনি এই সম্পর্কে দুটি পুস্তকও রচনা করেন (১৮৭৪, ১৮৮২ খ্রীঃ)। ব্রেফেল্ড (Oskar

Brefeld) ছত্রাকের বিশুদ্ধ চাষের বিভিন্ন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন যেগুলি পরে কখ (Robert Koch) ও পেট্রির (Petri) প্রচেষ্টায় আরও উন্নত হয়। ওয়ার্ড (Harry Marshal Ward) বট্রাইটিস জনিত লিলির রোগে পচনের জন্য যে এক ধরণের এনজাইম দায়ী এর প্রমাণ দেন।

ইউরোপে আঙ্গুরের ডাউনি মিলডিউ রোগ প্রথম দেখা যায় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। কয়েক বছরের মধ্যেই এই রোগ ভয়ানক আকার ধারণ করে। ফ্রান্সের বোর্দো (Bordeaux) অঞ্চল আঙ্গুর চাষ ও উৎকৃষ্ট মদ্যের জন্য বিখ্যাত। সেখানে এই রোগ থেকে আঙ্গুর চাষের ভীষণ ক্ষতি হতে থাকায় ফরাসী সরকার বোর্দো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিলার্দেকে (Pierre Marie Alexis Millardet) এই সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব দেন। বোর্দো অঞ্চলে ঘুরতে ঘুরতে মিলার্দে একদিন লক্ষ্য করেন যে একটি ক্ষেতে যেখানে মালিক দুষ্টু ছেলেদের হাত থেকে আঙ্গুরগুলি বাঁচানোর জন্য গাছের উপর কপার সালফেট বা তুঁতে ও চুন গোলা জল ছিটিয়ে দিয়েছেন সেখানে রোগের আক্রমণ বেশ কম, যদিও পাশের অন্যান্য ক্ষেতের আঙ্গুর গাছগুলি রোগে জর্জরিত। মির্লাদে তখন তামা (copper), ক্যালসিয়াম (calcium) ও লোহার (iron) লবণের বিভিন্ন রকম ও বিভিন্ন অনুপাতের মিশ্রণ নিয়ে নানারকম পরীক্ষা চালান এবং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ঘোষণা করেন যে কপার সালফেট ও ভিজে চুনের মিশ্রণ, যার নাম দেওয়া হয় বোর্দো মিক্‌স্‌চার (Bordeaux mixture), আঙ্গুরের ডাউনি মিলডিউ রোগ দমনের পক্ষে খুব উপযোগী। বোর্দো মিক্‌স্‌চার শুধু যে আঙ্গুরের এই রোগ তাই নয় অন্য অনেক রোগ দমনেও যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করে। বলা যায় গাছের রোগ দমনের প্রচেষ্টায় বোর্দো মিক্‌স্‌চার এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছিল।

জার্মান বৈজ্ঞানিক সোর‍্যায়ার (P. C. M. Sorauer, 1874) গাছের রোগ সৃষ্টিতে রোগ উৎপাদকের উপর সমস্ত গুরুত্ব আরোপ করার নীতির প্রতিবাদ জানান এবং রোগ সৃষ্টিতে আবহাওয়ারও যে যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে এই মতবাদের উপর খুব জোর দেন। তাছাড়া প্রতিকূল পরিবেশের জন্যও যে গাছ অনেক সময় রোগগ্রস্ত হতে পারে সেদিকেও সোর‍্যায়ার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ড্যানিশ বৈজ্ঞানিক জেনসেন (J. L. Jensen) ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পরীক্ষামূলক ভাবে প্রমাণ করেন যে গমের বীজ গরম জলে শোধন করে নিয়ে লাগালে আর আলগা ভুষা রোগের আক্রমণের ভয় থাকে না।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মেণ্ডেল তত্ত্বের পুনরাবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্করায়নের মাধ্যমে গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা শুরু হয়।

গমের মরিচা রোগের ক্ষেত্রে বিফেন (R. H. Biffen, 1907) ও তুলা, তরমুজ প্রভৃতির ফিউজেরিয়াম জনিত ঢলে পড়া বা উইল্ট (wilt) রোগের ক্ষেত্রে অর্টন (W. A. Orton, 1905) এর গবেষণা থেকে দেখা যায় যে অন্যান্য গুণাবলীর মত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও মেণ্ডেলীয় তত্ত্ব অনুসারেই এক জন্ম থেকে অন্য জন্মতে যায়। পরবর্তীকালে তিসির মেলাম্পসোরা *(Melampsora lini)* জনিত মরিচা রোগ নিয়ে গবেষণা করে আমেরিকান বৈজ্ঞানিক ফ্লর (H. H. Flor, 1956) দেখান যে রোগ উৎপাদকের বিভিন্ন জাতির আক্রমণ ক্ষমতা থাকবে কি না বা গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকবে কি না তা এক বা কখনও একাধিক জোড়া জীনের উপস্থিতির উপর নির্ভর করে। যখন একটি গাছ কোন রোগ উৎপাদকের আক্রমণের সম্মুখীন হয় তখন সেই গাছের ও রোগ উৎপাদকের নিজ নিজ ক্ষমতার ধারক জীনের মিথষ্ক্রিয়ার উপর গাছে রোগ হবে কিনা তা নির্ভর করে।

ব্যাকটিরিয়া থেকে যে গাছের রোগ হতে পারে এই তথ্য প্রথম জানা যায় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক বারিল (Thomas J. Burril) ফায়ার ব্লাইট (fire blight) রোগে আক্রান্ত আপেল ও ন্যাসপাতি গাছ থেকে পাওয়া এক বিশেষ ধরণের ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যে সুস্থ গাছে রোগের সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। কয়েক বছরের মধ্যেই ব্যাকটিরিয়াজনিত আরও কিছু রোগের খবর জানা যায়, যথা—কচুরীপানার হলদে রোগ (yellow disease, J. H. Wakker, 1883), জলপাই এর 'নট'রোগ (olive knot) ও কুমড়ো জাতের গাছের ঢলে পড়া রোগ (E. F. Smith, 1895)। এর পরেও ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা ব্যাকটিরিয়া থেকে যে গাছের রোগ হতে পারে এ কথা মানতে রাজী হলেন না। শেষ পর্যন্ত স্মিথের (Erwin Frank Smith) ব্যাকটিরিয়া জনিত অনেক রোগের উপর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ গবেষণার (১৮৯৬-১৯১৪) ভিত্তিতে গাছের রোগ উৎপাদক হিসেবে ব্যাকটিরিয়ার গুরুত্বও স্বীকৃত হয়।

হল্যাণ্ডে মেয়ার (Adolf Mayer, 1886) তামাকের একটি রোগ নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তিনি রোগটির নাম দেন 'মোজেইক' (tobacco mosaic)। তিনি দেখান যে রোগগ্রস্ত গাছের রস একটি সুস্থ গাছের পাতায় ঘসে লাগালে সেই গাছটি মোজেইক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। রসটিকে ৮০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় কয়েকঘণ্টা গরম করলে বা অ্যালকোহলের তরল দ্রবণের সঙ্গে মেশালে এর রোগ উৎপাদন ক্ষমতা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। রোগাক্রান্ত

গাছে বা তার রসে কোন ছত্রাক দেখতে না পেয়ে মেয়ার এই সিদ্ধান্তে আসেন যে রোগটির জন্য কোন ব্যাকটিরিয়া দায়ী। রুশ বৈজ্ঞানিক আইভানভস্কি (Dimitri Ivanowski, 1892) দেখতে পান যে ব্যাকটিরিয়া ছাঁকার জন্য ব্যবহৃত চেম্বারল্যাণ্ড ফিল্টার (Chamberland filter) দিয়ে ছেঁকে নিলেও রোগগ্রস্ত তামাক গাছের রস তার রোগ সংক্রমণ ক্ষমতা হারায় না। তাঁর মতে ব্যাকটিরিয়া থেকে উৎপন্ন কোন বিষাক্ত পদার্থ (toxin) অথবা ফিলটারের মধ্যে দিয়ে চলে যেতে পারে এরকম অতি ক্ষুদ্র কোন ব্যাকটিরিয়া এই রোগের কারণ। ডাচ বৈজ্ঞানিক বেইজেরিন্‌ক (Martinius Beijerinck,1898) বললেন যে কোন জীবাণু নয়, একরকম সংক্রামক জীবন্ত তরল পদার্থই (*contagium vivum fluidum*) মোজেইক রোগের কারণ। তিনি এই সংক্রামক পদার্থের নাম দিলেন 'ভাইরাস' (virus)। বেইজেরিন্‌ক আরও দেখালেন যে ভাইরাস গাছের দেহে পরিণত কলার তুলনায় অপরিণত কলাকে বেশি তাড়াতাড়ি আক্রমণ করতে পারে, ফ্লোয়েম বা জাইলেমের মধ্যে দিয়ে তাড়াতাড়ি ছড়াতে পারে, গাছের দেহে নিজেদের সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে এবং শুকনো পাতা বা মাটিতেও কিছুকাল বেঁচে থাকতে পারে। আমেরিকান বৈজ্ঞানিক ষ্ট্যানলি (W. M. Stanley, 1935) মোজেইক রোগে আক্রান্ত তামাক পাতার রসে অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রয়োগ করে এক ধরণের কেলাসিত প্রোটিন পান। এর থেকে ষ্ট্যানলি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে ভাইরাস এক রকম প্রোটিন। পরের বছর ইংল্যাণ্ডে বওডেন ও পিরি (Frederick C. Bowden and N. W. Pirie, 1936) দেখান যে কেলাসিত অবস্থায় ভাইরাসে প্রোটিন ও নিউক্লিয়িক অ্যাসিড থাকে। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে প্রথম ভাইরাস দেখতে পান কউশে (Kausche) ও তাঁর সহকর্মীরা ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে।

রুগ্ন গম গাছে (wheat gall) নিমাটোডের উপস্থিতির কথা প্রথম উল্লেখ করেন ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক নীডহ্যাম (T. Needham, 1743)। শশার শিকড়ের ফোলা অংশে নিমাটোড দেখতে পান বার্কলে (M. J. Berkeley, 1855)। এর কিছুদিনের মধ্যেই শাখট (M. Schacht, 1859), স্মিড (A. Schmidt, 1871) ও কর্নু (M. Cornu, 1879) বিভিন্ন রোগগ্রস্ত গাছের দেহে রোগ উৎপাদক নিমাটোডের সন্ধান পান। তা সত্ত্বেও গাছের রোগ উৎপাদক হিসাবে নিমাটোড পূর্ণ স্বীকৃতি পায়নি অনেকদিন। বৈজ্ঞানিক কবের (N. A. Cobb) দীর্ঘকালব্যাপী (১৯১৩-১৯৩২) বিভিন্ন গাছের নিমাটোডজনিত রোগের উপর গবেষণার ফলেই এই স্বীকৃতি আসে।

16397

অনেক গাছের এমন কিছু ভাইরাস রোগ আছে বলে জানা ছিল যার ফলে আক্রান্ত গাছের পাতাগুলি হলদেটে হয়ে যায় যেমন হলুদ বা পীতরোগ (yellow disease)। জাপানী বৈজ্ঞানিক ডোই (Y. Doi) ও তাঁর সহকর্মীরা ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে অধিকাংশ হলুদ রোগই মাইকোপ্লাজমা ধরণের অতি ক্ষুদ্র জীবাণু থেকে হয়। গিবস (A. Gibbs, 1969) এর মতে অনেক 'উইচেস ব্রুম' (witches broom) জাতীয় গাছের রোগও সম্ভবতঃ মাইকোপ্লাজমা থেকে হয়। কিছু কিছু বাহক পতঙ্গের (vector) শরীরেও মাইকোপ্লাজমার সন্ধান পাওয়া গেছে। চন্দন গাছের 'স্পাইক' (sandal spike) ও বেগুনের তুলসী লাগা বা 'লিটল লীফ' (little leaf) রোগও মাইকোপ্লাজমা থেকে হয় বলে জানা গেছে।

প্রাসঙ্গিক পুস্তক ও গবেষণাপত্রাদি

Anisworth, G. C. 1981. 'Introduction to the History of Plant Pathology'. Cambridge University Press, London.

Fuchs, W. H. 1976. History of physiological plant pathology. In 'Physiological Plant Pathology' (R. Heitefuss and P. H. Williams, eds.). Springer-Verlag, Berlin.

Large, E. C. 1958. 'The advance of fungi'. Jonathan Cape, London.

Keitt, G. W. 1959. History of Plant Pathology. In 'Plant Pathology : An Advanced Treatise'. (J. G. Horsfall and A.E. Dimond, eds.), Vol. 1, 61-97. Academic Press, New York.

Raychaudhuri, S. P. and R. K. Kaw (eds.), 1964. 'Agriculture in Ancient India'. ICAR, New Delhi.

Raychaudhuri, S. P., J. P Verma, T.K. Nariani, and Bineeta Sen. 1972. The history of plant pathology in India. *Ann. Rev. Phytopathol. 10* : 21-36.

---

৩ গাছের রোগ সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা

রোগ থেকে বিভিন্ন ফসলের যে ক্ষতি হয়ে থাকে তার কোন নির্ভরযোগ্য পরিমাপ আমাদের কাছে না থাকলেও ক্ষতির পরিমাণ যে বিরাট এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই ক্ষতি কখনও আঞ্চলিকভাবে কখনও বা বৃহত্তর এলাকা জুড়ে মানুষের জীবনে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে এমন অনেক প্রমাণ রয়েছে। ফসলের রোগজনিত ক্ষতি ও তার দরুণ মানুষের যে দুশ্চিন্তা তার থেকেই **উদ্ভিদ রোগবিজ্ঞান** বা 'ফাইটোপ্যাথলজি' (Phytopathology = Plant Pathology) চর্চার সূত্রপাত। ফাইটোপ্যাথলজি শব্দটি এসেছে তিনটি গ্রীক শব্দ থেকে ; যেমন- 'ফাইটন' (phyton = উদ্ভিদ), 'প্যাথোজ' (pathose = দুঃখ, রোগ বা বিকার) আর 'লোগোজ' (logos = জ্ঞান বা আলোচনা)। ফাইটোপ্যাথলজি হল উদ্ভিদবিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা, উদ্ভিদরোগ বিজ্ঞান, যার উপজীব্য হল গাছের রোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা। গাছের রোগ নিয়ে সবরকম আলোচনা উদ্ভিদ রোগবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হলেও এর মূল লক্ষ্য হল রোগ নিবারণের মাধ্যমে শস্যের স্বাস্থ্যরক্ষা ও উৎপাদন বৃদ্ধি। উদ্ভিদ রোগ-বিজ্ঞানীরা তাই আরও নূতন নূতন রোগ দমন ও পুরাতন রোগগুলির জন্য আরও সহজ ও নির্ভরযোগ্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি উদ্ভাবনের চেষ্টা করে চলেছেন। রোগের সব থেকে নির্ভরযোগ্য নিদর্শন হল সুপরিস্ফুট **রোগলক্ষণ** (symptoms)। বিভিন্ন ধরণের রোগজীবাণু বা প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাবে গাছের শরীরে যে সুস্পষ্ট বিকৃতি বা স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বিচ্যুতি দেখা দেয় তাকেই অসুস্থ অবস্থা বা রোগের লক্ষণ বলা হয়। অনেক সময় রোগের আক্রমণের ফলে গাছের দেহে ক্ষতের সৃষ্টি হয়, আবার বিভিন্ন ধরণের আঘাত থেকেও যেমন পোকা বা জন্তুর কামড়ে গাছের দেহে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এই দুই ধরণের ক্ষতকে অবশ্যই আলাদা করে দেখতে হবে। বিভিন্ন কারণে উদ্ভূত ধারাবাহিক উত্তেজনার প্রভাবে গাছের শারীরিক বিক্রিয়ায় বা চেহারায় যে পরিবর্তন সূচিত হয় তার থেকেই প্রথম ধরণের ক্ষতের সৃষ্টি ; দ্বিতীয় ধরণের ক্ষতের সূচনা হয় আকস্মিকভাবে কোন আঘাত বা উত্তেজনা থেকে। পোকায় গাছ খেয়ে ফেললে ফসলের ক্ষতি অনিবার্য কিন্তু সেই অবস্থা রোগের ইঙ্গিত দেয় না। অথচ নিমাটোড ধরণের সূতাকৃমি যখন গাছের দেহে প্রবেশ করে গাছের স্বাস্থ্যহানি ঘটায় তখন তাকে আমরা রোগ বলি। যে সব পোকা গাছ খেয়ে ফেলে বা পাতার রস শোষণ করে তারা নিজেরা

রোগের সৃষ্টি না করলেও অনেক সময় রোগজীবাণুর বাহক হিসাবে কাজ করে। প্রতিকূল পরিবেশ সব সময়ই যে রোগের সৃষ্টি করে তা নয়, অনেক সময় গাছকেও ভীষণ দুর্বল করে দেয় যার ফলে গাছের কোন কোন রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়।

রোগ সম্বন্ধে জানতে হলে রোগের লক্ষণ চিনতে হবে। এই আলোচনা রোগলক্ষণতত্ত্ব বা 'সিম্পটোম্যাটোলজি'র (symptomatology) অন্তর্ভূক্ত। রোগের লক্ষণ ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে রোগ নির্ণয় করতে হয় তাকে বলে **রোগনিদান** বা 'ডায়াগনোসিস' (diagnosis)। কোন কোন রোগের একটির বেশী লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় যার মধ্যে একটি প্রধান, বাকিগুলি অপ্রধান। আবার বিভিন্ন রোগের লক্ষণ মোটামুটি এক ধরনেরও হতে পারে। সেই অবস্থায় রোগ নির্ণয় করতে হলে **লক্ষণসমষ্টি** (disease syndrome) নিয়ে আলোচনা করতে হয়। তা সত্বেও অনেক সময় শুধু মাত্র লক্ষণের উপর নির্ভর করে রোগ নির্ণয় সম্ভব নাও হতে পারে। তখন অন্যান্য কিছু তথ্যের উপর নির্ভর করতেই হয়।

রোগ সংক্রান্ত যে কোন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হল রোগ উৎপাদক। অধিকাংশ রোগের সূচনা হয় রোগজীবাণু থেকে। সেইসব রোগের ক্ষেত্রে আমাদের মনোযোগ সাধারণতঃ রোগজীবাণুতেই সীমাবদ্ধ থাকে যদিও একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে বিভিন্ন যেসব বিষয়ের উপর রোগ সৃষ্টি নির্ভর করে রোগজীবাণু তার মধ্যে একটি। রোগ সৃষ্টিতে রোগজীবাণুর প্রাথমিক গুরুত্ব অস্বীকার না করেও এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে রোগের সূচনা, বৃদ্ধি ও বিস্তার অন্য নানারকম অবস্থার উপর বহুলাংশে নির্ভর করে যথা-জমির পরিবেশ ও আবহাওয়া, বিশেষ করে আর্দ্রতা ও উষ্ণতা। রোগজীবাণুকে দেশলাই এর কাঠির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। আগুন ধরাতে গেলে দেশলাই এর কাঠির দরকার আছে ঠিকই কিন্তু শুকনো কাগজ, খড় বা কাঠেরও প্রয়োজন হয়। এগুলি ভিজে অবস্থায় থাকলে দেশলাই এর কাঠির ক্ষমতা অনেক কমে যায়। এই কারণে অনেকে রোগজীবাণুকে **উদ্দীপক** বা 'ইনসাইট্যাণ্ট' (incitant) এর সঙ্গে তুলনা করেন।

রোগজীবাণু গাছের গঠনে ও শারীরিক বিক্রিয়ায় নানা ধরণের বিকৃতি ঘটাতে পারে যার ফলে গাছের দেহে বিভিন্ন ধরণের রোগলক্ষণ দেখা যায়। অনেক সময় রোগজীবাণু বা ভাইরাস ধরণের রোগ উৎপাদক গাছের পাতায় তৈরী খাবার নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে ফেললে সেখানে সীমিত ভাবে বা পুরোপুরি

অপুষ্টির লক্ষণ ফুটে উঠতে পারে যার ফলে পাতা হলদে হয়ে যায়, যেমন মোজেইক (mosaic) রোগে দেখা যায়। কোথাও কোথাও রোগজীবাণু প্রধানতঃ পাতার উপরতলেই থাকে—মনে হয় যেন পাউডারের আস্তরণ, যেমন ছাতাধরা রোগ। সেখানে রোগজীবাণু এমন ভাবে বিস্তৃতিলাভ করতে পারে যে তার ফলে পাতার ভিতরের কোষে প্রয়োজনীয় পরিমাণে সূর্যের আলো ঢোকার পথে বাধার সৃষ্টি হয়। ফলে পাতায় যথেষ্ট পরিমাণে খাবার তৈরী হয় না, গাছ অসুস্থ হয়ে পড়ে। কোথাও রোগজীবাণু প্রত্যক্ষ ভাবে বা পরোক্ষভাবে শিকড় থেকে পাতায় জল পরিবহণের পথে বাধার সৃষ্টি করে। ফলে পাতায় যথেষ্ট পরিমাণে জল পৌঁছায় না। এর ফলে পাতা ক্রমশঃ নেতিয়ে পড়ে এবং পরে শুকিয়ে যায়। প্রথমদিকে যথেষ্ট পরিমাণ জলের অভাবে ও পরে পাতা শুকিয়ে নষ্ট হয়ে গেলে গাছে প্রয়োজনীয় খাবার তৈরী হয় না, গাছ অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিছু ভাইরাস ঘটিত রোগে যে ফ্লোয়েম (phloem) কলা দিয়ে তৈরী খাবার পাতা থেকে গাছের দেহের বিভিন্ন অংশে যায় সেটি নষ্ট হয়ে যায়, ফলে সব অংশে খাবার পৌঁছায় না। সর্বাঙ্গীন পুষ্টির অভাবে গাছের শরীরে অপুষ্টির লক্ষণ দেখা যায়, গাছ বাড়ে না ও অসুস্থ হয়ে পড়ে। গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও গঠন নির্ভর করে শরীরে বিভিন্ন উদ্ভিদ হর্মোনের (plant hormone) ক্রিয়ার উপর। রোগজীবাণু অনেক সময় বিভিন্ন হর্মোনের উৎপাদনে তারতম্য ঘটিয়ে বা হর্মোনের ক্রিয়ায় অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটিয়ে গাছের বৃদ্ধিতে ও গঠনে বড় রকমের বিকৃতি ঘটাতে পারে, ফলে রোগাক্রান্ত গাছটি স্বাভাবিকের তুলনায় লম্বা বা ছোট হতে পারে, অথবা স্থানীয়ভাবে পাতা, শিকড় বা কাণ্ডের কোথাও ফুলে অর্বুদের (gall) আকার ধারণ করে বা পাতার অংশবিশেষ উঁচু নীচু বা কোঁচকানো ধরণের হয়ে যায়। এই সব অবস্থা স্বাস্থ্যহীনতার ইঙ্গিত বহন করে। এর ফলে আক্রান্ত গাছটির শারীরিক কাজকর্ম মোটেই স্বাভাবিকভাবে চলে না। এছাড়া রোগজীবাণুর দেহনিঃসৃত বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক পদার্থ আক্রান্ত অংশের কোষগুলির নানারকম ক্ষতি করে যার ফলে অনেক সময় শারীরিক কাজ-কর্ম একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল উৎসেচক বা 'এনজাইম' (enzyme) ও বিষাক্ত ধরণের যৌগ বা 'টক্সিন' (toxin)। এমন কিছু এনজাইম আছে যেগুলি উদ্ভিদ কোষের দেওয়ালের প্রধান উপাদানগুলি যথা সেলুলোজ, পেকটিন ইত্যাদিকে ভেঙ্গে ফেলতে পারে। এর ফলে দেওয়ালের কাঠামোটা নষ্ট হয়ে যায়, কোষটিরও মৃত্যু ঘটে আর আক্রান্ত অংশটি পচে যায়। এনজাইম বেশী পরিমাণে জমা হতে থাকলে আক্রান্ত অংশটি তাড়াতাড়ি পচতে

থাকে। বিভিন্ন রোগের ফলে শিকড়, পাতা, কাণ্ড বা ফলের গায়ে যে পচা দাগ দেখা যায় তার সৃষ্টি হয় এই ভাবে। রোগজীবাণুর দেহনিঃসৃত বিষাক্ত যৌগ বা টক্সিনের (toxin) প্রভাবে আক্রান্ত অংশের কোষগুলির মৃত্যু ঘটে, যদিও দেওয়ালের কাঠামোর কোন পরিবর্তন ঘটে না। ফলে আক্রান্ত অংশ শুকিয়ে যায়। যেখানে বিষাক্ত যৌগ বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হয় বা জমা হয় সেখানে আক্রান্ত অঙ্গটি সম্পূর্ণ ভাবে এমনকি পুরো গাছটিও শুকিয়ে যেতে পারে। পাতায় নানা ধরণের দাগ (spot) বা পাতায় ধসা (blight) রোগের লক্ষণ এই ভাবে সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ গাছের যে অংশ রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় সেখানেই রোগের লক্ষণ ফুটে ওঠে কিন্তু এমন অনেক রোগও আছে যেখানে রোগের লক্ষণ তা না হয়ে গাছের সারা দেহেই দেখা যায়। গাছের শিকড় বা কাণ্ডের নিচের অংশ আক্রান্ত হলেও অনেক সময় পুরো গাছটাই নেতিয়ে পড়তে বা শুকিয়ে যেতে পারে। জলের উর্দ্ধমুখী প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবার ফলে বা বিষক্রিয়ার ফলে এরকম ঘটে থাকে।

কোন রোগজীবাণু উপযুক্ত পোষক গাছের সংস্পর্শে এলে বা তার দেহের মধ্যে প্রবেশ করলেই যে রোগের সৃষ্টি হবে এবং দেহে রোগের লক্ষণ দেখা দেবে তা না হতেও পারে। রোগজীবাণু ও গাছ যখন পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে তখন তাদের মধ্যে যে মিথস্ক্রিয়া শুরু হয় তাকে আমরা এক ধরণের সংঘর্ষই বলতে পারি। সংঘর্ষের প্রথমদিকে ফলাফল বাইরে থেকে বোঝা যায় না। সবরকম সংঘর্ষের মত এখানেও মোটামুটি ভাবে দুরকম ফলাফল আশা করা যায়। অনুকূল পরিবেশে ফলাফল রোগজীবাণুর স্বপক্ষে গেলে গাছ রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। রোগের আক্রমণ অবশ্য কমবেশী হতে পারে। তার উপর নির্ভর করে গাছের কতটা ক্ষতি হবে। কিন্তু অনেক সময় গাছ তার নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতার জোরে রোগের আক্রমণের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে গাছ আক্রান্ত হয় ঠিকই, কিন্তু রোগের দরুণ বিশেষ ক্ষতি হয় না। যে সব গাছের প্রতিরোধ ক্ষমতা অত্যন্ত বেশী তারা প্রায় বিনা ক্ষতিতেই রোগের আক্রমণ কাটিয়ে উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে রোগের লক্ষণ বিশেষ বোঝা যায় না। বিভিন্ন গাছ মূলতঃ চার ভাবে রোগজীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করে থাকে :

(ক) রোগজীবাণুর গাছের দেহে প্রবেশের পথে বাধার সৃষ্টি করে,

(খ) প্রবেশের পর দেহের ভিতরে রোগজীবাণুর প্রসারে বাধা দেয়,

(গ) দেহের ভিতরে যে প্রক্রিয়ায় রোগজীবাণু রোগের অবস্থা সৃষ্টি করে

সেই প্রক্রিয়াগুলিকে বাধা দেয় বা দুর্বল করে দেয়, অথবা

(ঘ) দেহের ভিতরে প্রবেশের অব্যবহিত পরে বা পরবর্তী সময়ে কিছুটা ছড়িয়ে পড়ার পরে রোগজীবাণুর বৃদ্ধি ব্যাহত করে এমনকি মৃত্যুও ঘটায়।

গাছের এমন সুপ্ত ক্ষমতা থাকতে পারে যার ফলে রোগজীবাণুর দেহে প্রবেশের প্রতিক্রিয়া হিসাবে আক্রান্ত অংশের কোষে নানা ধরণের বিক্রিয়া ঘটে যার ফলশ্রুতি হল রোগজীবাণুর নিষ্ক্রিয়তা প্রাপ্তি বা মৃত্যু। কোথাও কোথাও দেহগঠনে বা রাসায়নিক উপাদানের বৈশিষ্ট্যের জন্য গাছ প্রথমোক্ত দুটি পদ্ধতিতে রোগজীবাণুর আক্রমণে বাধার সৃষ্টি করে।

যখন দেখা যায় যে রোগ ফসলে বেশ ছড়িয়ে পড়ছে এবং যথেষ্ট ক্ষতি করছে বা একই রোগ থেকে বছরের পর বছর প্রচুর ক্ষতি হয় তখন স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা নিতে হয়। রোগের বিরুদ্ধে শস্যরক্ষার ব্যবস্থা প্রধানতঃ তিন রকমের হয়ে থাকে, যথা

(ক) রোগ প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ যার উদ্দেশ্য হল রোগের আক্রমণ এড়ানো,

(খ) রোগগ্রস্ত গাছের রোগ নিরাময়ের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ যার উদ্দেশ্য হল গাছটিকে সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা ও

(গ) বিভিন্ন উপায়ে গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো।

এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উদ্ভিদ রোগবিজ্ঞানের চর্চা হয় শুরু, মানব চিকিৎসা বিজ্ঞানের সূত্র ধরে। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভাবনীয় অগ্রগতির সঙ্গে তুলনা করলে উদ্ভিদ রোগবিজ্ঞানের অগ্রগতির ধারা অনেক শ্লথ মনে হবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের সমস্ত প্রচেষ্টা একটি জীব অর্থাৎ মানুষকে কেন্দ্র করে। কিন্তু উদ্ভিদ রোগবিজ্ঞানের উপজীব্য একটি নয় বহু বিচিত্র ধরণের গাছ। প্রতিটি গাছের আবার একটি নয় অনেকগুলি রোগ। ফলে উদ্ভিদ রোগবিজ্ঞানের চর্চা অনেকটা বিক্ষিপ্ত ধরণের হতে বাধ্য। চিকিৎসকের রোগচিকিৎসা যেমন সাধারণতঃ একটি ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, উদ্ভিদ রোগবিজ্ঞানীর ক্ষেত্রে সে রকম কদাচিৎ ঘটে; তাকে একসঙ্গে অনেক গাছের বা গাছের গোষ্ঠিগত চিকিৎসা (group medicine) করার কথাই ভাবতে হয়। একটি গাছের প্রাণের মূল্যই বা কি? ফলে চিকিৎসাশাস্ত্রে যেমন রোগীর শরীরের নানাবিধ পরিবর্তনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জানা আছে উদ্ভিদ রোগবিজ্ঞানে রোগগ্রস্ত গাছের শারীরিক পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা তুলনায় অনেকটা প্রাথমিক পর্যায়ের।

চিকিৎসা বিজ্ঞান ও উদ্ভিদ রোগবিজ্ঞানে যে সব পার্থক্যের কথা বলা হল সেগুলি সত্ত্বেও চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও উদ্ভিদ রোগবিজ্ঞানীর মূল সমস্যাগুলি প্রায় এক ধরণের ; যথা—

(ক) রোগজীবাণুর উৎস কি বা কোথায় ?

(খ) রোগজীবাণু কি ভাবে শরীরে প্রবেশ করে ?

(গ) কি কি অবস্থা বা কোন পরিবেশ রোগের আক্রমণের পক্ষে অনুকূল ?

(ঘ) রোগজীবাণু কি ভাবে আক্রমণের সূচনা করে এবং রুগ্ন অবস্থার সৃষ্টি করে ?

(ঙ) কি ভাবে রোগ দমন করা যায় -

চিকিৎসা বিজ্ঞানী বা উদ্ভিদ রোগবিজ্ঞানী দুজনেরই মূল উদ্দেশ্য শেষ সমস্যাটির সমাধান। কিন্তু এই সমস্যার সার্থক সমাধান বহুলাংশে নির্ভর করে প্রাথমিক সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা ও গবেষণার উপর। ঐ সব সমস্যা সংক্রান্ত আলোচনা ও গবেষণা থেকে যে সব বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগৃহীত হবে একমাত্র তার উপর ভিত্তি করেই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য বাস্তবমুখী, সার্থক পরিকল্পনার রূপায়ণ সম্ভব।

পরজীবিতা ও গাছের রোগ

সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে অধিকাংশ রোগ উৎপাদক জীবাণু স্বভাবে **পরজীবী** বা 'প্যারাসাইট' (parasite)। এই শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'প্যারাসিটোস' থেকে যেটি বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় 'প্যারা' (para) মানে পাশে বা নিকটে ; আর 'সাইটোস' (sitos) মানে যারা অন্যের সংগে আহার করে, প্রতিদানে শুধু তোষামোদ দেয়। জীববিজ্ঞানে পরজীবী বলতে আমরা বুঝি এমন একটি জীব যে অন্য একটি জীবের দেহে বাস করে ও তার থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে। যে জীবটি পরজীবীকে আশ্রয় দেয় ও খাদ্য সরবরাহ করে তাকে **পোষক** বা 'হোস্ট' (host) বলে। পরজীবীর তুলনায় পোষক সাধারণতঃ বড়, জটিল গঠনের ও উচ্চ স্তরের জীব হয়। উদ্ভিদ রোগবিজ্ঞানে পোষক বলতে উচ্চশ্রেণীর সবুজ উদ্ভিদ ও গাছকেই বোঝায়। রোগসৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে পোষক-পরজীবী সম্পর্ক (host-parasite relation) বা উদ্ভিদ-পরজীবী সম্পর্ক (plant-parasite relation) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণভাবে খাবার দেওয়া নেওয়ার ব্যাপার মনে হলেও সম্পর্কটা প্রকৃতপক্ষে বেশ জটিল।

কোন জীবাণু একটি গাছের সঙ্গে **পরজীবিতার** (parasitism) সম্পর্ক স্থাপন করলেই যে তার দেহে রোগের সৃষ্টি করবে এরকম মনে করার কারণ নেই। পরজীবী নিজের প্রয়োজনে গাছের তৈরী খাবার ব্যবহার করে এবং এর ফলে গাছের দেহে স্থানীয়ভাবে বা সামগ্রিকভাবে একটা খাদ্য ঘাটতির অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে গাছের দেহে তখন অসুস্থতার বা রোগের লক্ষণ ফুটে ওঠে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পোষক গাছ-পরজীবী সম্পর্ক অন্যদিকে মোড় নেয়। পরজীবী প্রাথমিক পর্যায়ে গাছ থেকে খাদ্য আহরণ করে ঠিকই তবে পরবর্তী পর্যায়ে নিজেও গাছকে কিছু প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান সরবরাহ করে বা সংগ্রহ করতে সাহায্য করে। তখন গাছ ও জীবাণু দুইই বিশেষ বিশেষ ধরণের খাদ্যের জন্য পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। অবস্থা দেখে মনে হয় যেন তারা এজমালী ভাঁড়ার থেকে নিজের নিজের প্রয়োজনীয় খাবার সংগ্রহ করে নিচ্ছে। এই অবস্থাকে বলা হয় **মিথোজীবীতা** বা 'সিমবায়োসিস' (symbiosis)। রাইজোবিয়াম (*Rhizobium*) প্রজাতির জীবাণু মটর, শিম ও লেগুমিনোসি (Leguminosae) পরিবারের অন্যান্য গাছের শিকড় আক্রমণ করে সেখানে যে গুটি সৃষ্টি করে তাতে এই জীবাণুর পরজীবীতা মিথোজীবীতায় পরিণত হয়। পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল এবং পরস্পরের উপকার সাধনকারী জীবাণু ও গাছকে তখন **মিথোজীবী** বা 'সিমবায়ন্ট (Symbiont) বলা হয়।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু পরজীবিতা দিয়ে রোগের লক্ষণ সমূহের পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ পরজীবী যে পরিমাণ খাবার গাছের থেকে আহরণ করে তার জন্য যেটুকু ক্ষতি হবার কথা তার তুলনায় গাছের ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশী বলে মনে হয়। গাছের দেহে বসবাসের সময় পরজীবীর দেহনিঃসৃত নানাধরণের রাসায়নিক পদার্থ গাছের দেহকোষে বিভিন্ন ধরণের প্রতিক্রিয়া ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। এর ফলে কোষে শ্বসন ক্রিয়ার হার বেড়ে যায়, কোষ থেকে প্রচুর পরিমাণ জল ও অনেক তড়িদবিশ্লেষ্য পদার্থ (electrolyte) বেরিয়ে পড়ে এবং কোষটির দেওয়াল ভেঙ্গে যায় এমনকি প্রোটোপ্লাজম নষ্ট হয়ে কোষটি মরেও যেতে পারে। কখনও বা কোষের ভিতর ক্লোরোফিল কণাগুলি নষ্ট হয়ে যায়। অনেক সময় কোষগুলির বিভাজনের হার ও আয়তন বৃদ্ধি স্বাভাবিক থাকে না। এর থেকে বোঝা যায় যে পরজীবী পোষক গাছ থেকে যে পরিমাণ খাবার আহরণ করে তার সঙ্গে রোগের জন্য যে পরিমাণ ক্ষতি হয় তার কোন আনুপাতিক সম্বন্ধ অধিকাংশ

ক্ষেত্রেই নেই। বরঞ্চ বলা যায় যে পরজীবীর রোগ সঙ্ঘটন ক্ষমতা সে পোষক গাছের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শারীরিক কাজ কর্মে কতটা বাধা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে তার উপর নির্ভর করে, শুধুমাত্র পরজীবিতাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগের কারণ নয়। যে সব পরজীবী রোগের সৃষ্টি করে তাদের সকলের পরজীবিতার ধরণও এক নয়। পরজীবী ছত্রাকদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম শ্রেণীতে সেই ধরনের রোগজীবাণুরা আছে যারা মূলতঃ মৃতজীবী এবং মাটির অন্যান্য মৃতজীবী রোগ জীবাণুদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সেখান থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে ও বংশবৃদ্ধি করে। এরা সুযোগ পেলে অনুকূল পরিবেশে ছোট চারা গাছ বা দুর্বল গাছকে আক্রমণ করে। এদের এই পরজীবীর জীবন দীর্ঘস্থায়ী হয় না। আক্রান্ত গাছটিকে বা তার অঙ্গটিকে খুব তাড়াতাড়ি মেরে ফেলে, পরে মৃত কোষগুলির ভিতরের খাদ্যবস্তু দ্রুত নিঃশেষ করে এই ধরণের পরজীবী তাদের স্বাভাবিক আবাস স্থল মাটিতে ফিরে যায়। এদের বলা হয় **ঐচ্ছিকভাবে পরজীবী** বা 'ফ্যাকালটেটিভ প্যারাসাইট' (facultative parasite)। রোগ-জীবাণু হিসাবে এরা অত্যন্ত উগ্র প্রকৃতির এবং গাছের বা আক্রান্ত অঙ্গের প্রচুর ক্ষতি করে। এরা একাধিক প্রজাতির পোষক গাছের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। এমন কিছু রোগজীবাণু আছে যারা পরজীবীর জীবনেই অভ্যস্ত। তারা জীবনের অধিকাংশ সময় পরজীবী হিসাবে কাটায়। রোগের ফলে পোষক গাছটি মরে গেলেও বা ফসল কেটে নেবার পরও মাটিতে থেকে যাওয়া অংশের মৃত কোষে তারা মৃতজীবী হিসাবে বাস করে। সেখানে খাবারের যোগান নিঃশেষিত হলে মাটিতে ফিরে এসে রোগজীবাণু কোনক্রমে নিজেকে টিঁকিয়ে রাখে এবং পরের বছর নতুন ফসলকে আক্রমণ করে আবার তার অভ্যস্ত পরজীবীর জীবনে ফিরে যেতে পারে। এরা মাটির স্থায়ী অধিবাসী মৃতজীবী জীবাণুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে মাটি থেকে বিশেষ খাবার সংগ্রহ করতে পারে না। ফলে মাটিতে এরা বিশেষ ছড়ায় না বা বংশবৃদ্ধি করতেও পারে না, মাটিতে পড়ে থাকা রোগগ্রস্ত গাছটির দেহের ধ্বংসাবশেষকে কেন্দ্র করে এরা কোন মতে টিঁকে থাকে মাত্র। রোগজীবাণু হিসাবে প্রথম শ্রেণীর পরজীবীর তুলনায় এরা অনেক কম উগ্র বা কম ক্ষতিকারক। এই ধরণের পরজীবীকে বলা হয় **ঐচ্ছিকভাবে মৃতজীবী** বা 'ফ্যাকালটেটিভ স্যাপ্রোফাইট' (facultative saprophyte), অথবা **আধা পরজীবী** বা 'হেমিপ্যারাসাইট' (hemiparasite)। এদের পোষক গাছের সংখ্যা সীমিত। তৃতীয় শ্রেণীতে

এমন কিছু পরজীবী আছে যারা একান্তভাবে পোষক নির্ভরশীল পরজীবী। পোষকের দেহের বাইরে কোন সক্রিয় জীবন না থাকায় এদের বলা হয় **বাধ্যতামূলকভাবে পরজীবী** বা 'ওবলিগেট প্যারাসাইট' (obligate parasite)। এরা মৃত কোষে বাঁচতে পারে না। এরা দুটি সংলগ্ন কোষের দেওয়ালের মাঝখানে জায়গা করে নিয়ে সেখানে থাকে এবং কোষের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ধরণের শোষক অঙ্গ বা 'হস্টোরিয়াম' (haustorium) ঢুকিয়ে দিয়ে প্রয়োজনীয় খাবার সংগ্রহ করে। এর ফলে কোষের শারীরিক কাজকর্মে কোন বড় রকমের বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় না এবং পরজীবী পোষকের সঙ্গে বেশীদিন সহাবস্থান করতে পারে। এই ধরণের পরজীবীর উপযুক্ত পোষক গাছের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত।

উপরের তিন শ্রেণীর পরজীবীর জীবনযাপনের ও রোগ সঙ্ঘটন পদ্ধতির কথা আলোচনা করলে প্রথম থেকে দ্বিতীয় ও দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে নিম্নলিখিত ধারাবাহিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায় :

(ক) বিস্তৃতভাবে ও দ্রুত আক্রমণ থেকে সীমিতভাবে ও অপেক্ষাকৃত শ্লথ ধরণের আক্রমণ,

(খ) সাধারণ ধরণের আক্রমণ থেকে বিশেষ বিশেষ কলায় আক্রমণ, কোষের মধ্যে পরজীবীর অবস্থান অর্থাৎ অন্তঃকোষীয় অবস্থান (intracellular colonization) ও এককোষ থেকে অন্য কোষে বিস্তারের পরিবর্তে দুটি কোষের সংলগ্ন দেওয়ালের মধ্যস্থ অংশে বাস অর্থাৎ আন্তঃকোষীয় অবস্থান (intercellular colonization) ও হস্টোরিয়ামের সাহায্যে কোষ থেকে খাদ্য শোষণ, ও

(গ) পরজীবীর প্রয়োজন অনুসারে পোষকের শারীরিক কাজকর্মের ধারা নিয়ন্ত্রণ।

অভিব্যক্তিবাদের সূত্রানুসারে পরজীবীদের মধ্যেও সরল বা আদিম অবস্থা থেকে উন্নত বা বিশেষ বৈশিষ্ট্য সূচক অবস্থার দিকে পরজীবীতার কোন ক্রমবিকাশ বা বিবর্তন হয়েছে কিনা তা জানা নেই ঠিকই, তবে হয়নি এ কথাও বলা যায় না। পরজীবিতার পক্ষে আদর্শ অবস্থা হবে যেখানে কোন পরজীবী তার পোষকের কোন বড় রকমের ক্ষতি না করে, তাকে বাঁচিয়ে রেখে সহাবস্থানের ও প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহের একটা সাময়িকভাবে স্থায়ী ব্যবস্থা করে নিতে পারবে। যে পরজীবী পোষক গাছের ক্ষতি করে তাকে নষ্ট করে ফেলছে, বলা যায় সে তাৎক্ষণিক লাভের আশায় ভবিষ্যতের নিরাপত্তাকে জলাঞ্জলি দিচ্ছে। প্রথম শ্রেণীর পরজীবী এই ধরণের। যেহেতু তারা মাটিতেও বসবাসে অভ্যস্ত,

তাদের কাছে পোষক গাছ হঠাৎ পাওয়া বাড়তি খাবারের একটি উৎস বই আর কিছু নয়। এদের আদিম বা অনুন্নত ধরণের পরজীবী বলে ভাবা যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর পরজীবী কিছুটা উন্নত (semispecialized parasite)। তারা পোষকের দেহে বসবাসে বিশেষভাবে অভ্যস্ত। তবে বসবাসের কলাকৌশল আয়ত্ব করতে যেয়ে তারা মৃতজীবী হয়ে বাঁচার ক্ষমতা প্রায় হারাতে বসেছে। এ ধরণের পরজীবী কখনই অতি দ্রুত পোষক গাছের কোন বড় রকমের ক্ষতি করে না। তৃতীয় দলে যে সব ছত্রাক জাতীয় পরজীবী পাওয়া যায় তাদের সর্বাপেক্ষা উন্নত শ্রেণীর ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরজীবী (specialized parasite) বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সম্ভাব্য বিবর্তনের ইঙ্গিত সূচক যে সব পরিবর্তনের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে এই শ্রেণীর পরজীবীদের মধ্যে সেগুলির পূর্ণতাপ্রাপ্তির আভাস পাওয়া যায়। এরা পোষকের দেহকে আশ্রয় করে থাকতে এত অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে অন্য কোন রকমে জীবন ধারণ করা এদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। সেজন্য পোষক গাছকে বাঁচিয়ে রাখাটাই এদের স্বার্থের পক্ষে অনুকূল, কেননা পোষকের মৃত্যু তাদের নিজের মৃত্যু ডেকে আনবে। উপরোক্ত তিন শ্রেণীর পরজীবীই রোগ সৃষ্টিতে সক্ষম অতএব রোগ উৎপাদক হিসাবে স্বীকৃত। এছাড়া এমন কিছু ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়া আছে যাদের পোষক গাছের সঙ্গে প্রাথমিক পর্বে পুরোপুরি পরজীবীর সম্পর্ক থাকে কিন্তু পরে মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে পারস্পরিক আদান প্রদান ও স্থায়ীভাবে সহাবস্থানের একটা অনুকূল পরিবেশ গড়ে ওঠে যে অবস্থাকে মিথোজীবিতার নিদর্শন বলা যায়। যদিও এই অবস্থায় রোগ সৃষ্টি হয় না তবুও এটি পরজীবিতার ক্রমবিবর্তনের সর্বোচ্চ স্তর এ কথা বলা যেতে পারে।

বিভিন্ন সংজ্ঞার বিশ্লেষণ

আগের আলোচনা থেকে দেখা গেছে যে নানারকম কারণের জন্য গাছের দেহে রোগের সৃষ্টি হতে পারে। মুখ্য কারণ অবশ্যই বিভিন্ন ধরণের পরজীবী যাদের মধ্যে রয়েছে ছত্রাক, ব্যাকটিরিয়া ও ভাইরাস। এ ছাড়া নিমাটোড ও সপুষ্পক গাছও রয়েছে। পরজীবী হলেই সে রোগের সৃষ্টি করে না। পরজীবিতা যখন একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে বা পরজীবী দেহ নিঃসৃত বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ পোষকের শরীরে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তখনই রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। অতএব **পরজীবী** (parasite) ও **রোগ উৎপাদক** বা 'প্যাথোজেন' (pathogen) সমার্থক নয়। এমন কিছু মৃতজীবী মাটিতে বাস করে যাদের দেহনিঃসৃত বিষাক্ত ধরণের রাসায়নিক পদার্থ কোন গাছ তার

শিকড় দিয়ে আহরণ করলে রোগগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে মৃতজীবীটি রোগ উৎপাদকও বটে। রোগজীবাণু যে ক্ষমতা বা গুণের জন্য গাছে রোগের সৃষ্টি করতে পারে তাকে তার **রোগ সঙ্ঘটন ক্ষমতা** বা 'প্যাথোজেনিসিটি' (pathogenicity) বলে, আর যে প্রক্রিয়া সমূহের মাধ্যমে রোগের সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় **রোগ সঙ্ঘটন প্রক্রিয়া** বা 'প্যাথোজেনেসিস' (pathogenesis)। রোগ সঙ্ঘটন ক্ষমতা থাকলেই যে পরজীবী পোষকের গুরুতর ক্ষতি করে এর কোন মানে নেই। কোন একটি প্রজাতির বিভিন্ন জাতির মধ্যেও এ ব্যাপারে যথেষ্ট গুণগত পার্থক্য দেখা যেতে পারে ; সকলের আক্রমণ বা ক্ষতি করার ক্ষমতা অর্থাৎ **উগ্রতা** বা 'ভিরুলেন্স' (virulence = aggressiveness) সমান হয় না। যে সব জাতি খুব ক্ষতি করে তাদের বলা হয় উগ্র প্রকৃতির (highly virent) রোগ উৎপাদক। যাদের ক্ষতি করার ক্ষমতা মাঝারি ধরণের, তাদের বলা হয় মাঝারি উগ্রতাসম্পন্ন (moderately virulent)। আবার কোন কোন জাতির রোগ সঙ্ঘটন ক্ষমতা বা ক্ষতি করার ক্ষমতা খুবই কম ; তারা দুর্বল প্রকৃতির (weakly or mildly virulent) রোগ উৎপাদক বলে পরিচিত। বিভিন্ন কারণে কোন জাতির রোগ সঙ্ঘটন ক্ষমতা একেবারে লুপ্ত হয়ে যেতে পারে। তারা নিবীর্য প্রকৃতির বা রোগ সঙ্ঘটন ক্ষমতাবিহীন (avirulent = non-virulent) রোগজীবাণু। যে সব রোগজীবাণু কেবলমাত্র জীবিত কোষকেই আক্রমণ করে তাদের বলা হয় 'বায়োট্রফ' (biotroph)। অন্য দিকে এমন রোগ জীবাণুও আছে যারা কেবলমাত্র পোষক গাছের মৃত কোষকে আক্রমণ করে। এরা ক্ষতের মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করে এবং মৃত কোষে বসবাসের সময়ে তাদের দেহনিঃসৃত ক্ষতিকারক পদার্থের ক্রিয়ার ফলে ক্ষত-সংলগ্ন অঞ্চলের জীবিত কোষগুলিরও মৃত্যু ঘটে। রোগজীবাণু তখন সদ্যমৃত কোষগুলি আক্রমণ করে সেখানে ছড়িয়ে পড়ে। এদের বলা হয় 'নেক্রোট্রফ' (necrotroph) বা 'পার্থোফাইট' (perthophyte)। এই ধরণের রোগ-জীবাণুরা পরজীবী বলে পরিচিত হলেও কার্যতঃ এরা মৃতজীবী ছাড়া কিছু নয়।

উগ্র প্রকৃতির রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে পোষক গাছের বিভিন্ন জাতির (variety) প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন ধরণের হতে পারে। কোন কোন জাতি যেমন আক্রান্ত হলে সহজেই রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের দেহে রোগের লক্ষণ সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে, অন্য এমন জাতিও রয়েছে যারা পুরোপুরি রোগের আক্রমণ প্রতিরোধে সক্ষম না হলেও অনেকটা কাটিয়ে উঠতে পারে এবং বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত

হয় না। যে সব জাতির গাছ সহজেই রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাদের **রোগ-সংবেদনশীল** বা 'সাসেপটিবল' (susceptible) এবং যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য এমন হয় তাকে **রোগসংবেদনশীলতা** বা 'সাসেপটিবিলিটি' (susceptibility) বলে। যে সব জাতি সহজেই রোগে আক্রান্ত হয় তাদের ক্ষতির পরিমাণ বিভিন্ন রকমের হতে পারে। রোগের আক্রমণের তীব্রতা ও ক্ষতির পরিমাণ অনুযায়ী কোন প্রজাতির গাছের ভিন্ন ভিন্ন জাতির রোগসংবেদনশীলতা উচ্চ (high) বা মাঝারি (moderate) মানের হতে পারে। যে সব জাতি আক্রান্ত হলেও সহজে রোগগ্রস্ত হয় না তাদের **রোগপ্রতিরোধী** বা 'রেজিস্ট্যাণ্ট' (resistant) এবং যে বৈশিষ্ট্যের জন্য এ'রকম হয় তাকে **রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা** বা 'রেজিস্ট্যান্স' (resistance) বলে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন মাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়, যথা উচ্চ বা মাঝারি ধরণের। কদাচিৎ দেখা যায় কোন জাতির গাছ রোগজীবাণুর আক্রমণ পুরোপুরি প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়। তাদের দেহে রোগের কোন লক্ষণই দেখা যায় না, এই ধরণের জাতিকে বলা হয় **অনাক্রম্য** অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে রোগ প্রতিরোধী বা 'ইমিউন' (immune)। এরা রোগজীবাণুকে দেহে প্রবেশের অব্যবহিত পরে বা যত শীঘ্র সম্ভব মেরে ফেলে দেয় বা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে আসে যার ফলে রোগজীবাণু দেহের মধ্যে ছড়াতে বা কোন ক্ষতি করতে পারে না। এমন জাতিও রয়েছে যারা দেহের ভিতরে রোগজীবাণুর বিস্তৃতি ঠেকাতে পারে না কিন্তু নিজস্ব পদ্ধতিতে তার রোগসজ্ঘটন প্রক্রিয়া সমূহকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে পারে, যার ফলে আক্রান্ত হলেও গাছে রোগের লক্ষণ পরিস্ফুট হয় না। এই ধরণের জাতিকে **রোগসহনশীল** বা 'টলার‍্যাণ্ট' (tolerant) বলা হয়। পোষক গাছের যে সব জাতি রোগজীবাণুর বিভিন্ন জাতির আক্রমণ মোটামুটিভাবে প্রতিরোধ করতে সক্ষম তাদের **আনুভূমিক** বা **সমান্তরাল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা** (horizontal resistance) সম্পন্ন বলা হয়। অন্যদিকে গাছের যে সব জাতি রোগজীবাণুর কিছু জাতির আক্রমণ খুব ভালভাবে প্রতিরোধ করে কিন্তু অন্যান্য জাতির আক্রমণ মোটামুটি প্রতিরোধ করে মাত্র, তাদের **খাড়া** বা **উল্লম্ব ধরণের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা** (vertical resistance) রয়েছে বলা হয়। উচ্চ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন জাতির দেহে রোগজীবাণুর আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে আক্রান্ত বা তার পাশের কোষগুলিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া ঘটতে দেখা যায় যার ফলে কোষগুলির অনতিবিলম্বে মৃত্যু ঘটে আর জীবাণু নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে বা তার মৃত্যু হয়। যে

গুণগত বৈশিষ্ট্যের জন্য উচ্চ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন গাছের কোষে আক্রমণের বিরুদ্ধে এই ধরণের দ্রুত ও তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাকে বলা হয় **অতিসংবেদনশীলতা** বা 'হাইপারসেনসিটিভিটি' (hypersensitivity)।

রোগের আক্রমণের ফলে গাছের দেহে যে নানা ধরণের অস্বাভাবিকতার চিহ্ন ফুটে ওঠে তাকেই রোগের লক্ষণ বলা হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আক্রান্ত কিছু, কখনও বা অনেক কোষের মৃত্যু ঘটে যাকে বলে 'নেক্রোসিস' (necrosis)। বিভিন্ন কারণে এমন ঘটে থাকে। কোথাও কোষগুলির দেওয়াল ভেঙ্গে যাবার ফলে তাদের মৃত্যু ঘটে, যখন মনে হয় আক্রান্ত অংশটি পচে গেছে (rot)। অন্যত্র দেওয়ালের কোন ক্ষতি না হলেও কোষের মৃত্যু ঘটে আর আক্রান্ত অংশটি শুকিয়ে যায় (blight)। আর এক শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য রোগলক্ষণের মূল বৈশিষ্ট্য হল অস্বাভাবিক বা বিকৃত ধরণের বৃদ্ধি। বিভিন্নভাবে এই জাতীয় রোগ লক্ষণের সৃষ্টি হতে পারে। আক্রান্ত অংশে রোগজীবাণুর প্রভাবে **কোষের বর্দ্ধিত হারে বিভাজন** বা 'হাইপারপ্ল্যাসিয়া' (hyperplasia) বা **অস্বাভাবিক আয়তন বৃদ্ধি** বা 'হাইপারট্রফি' (hypertrophy) বিভিন্ন ধরণের অতিবৃদ্ধিজনিত রোগ লক্ষণের সৃষ্টি করে। আবার আক্রান্ত অংশে স্বাভাবিকের তুলনায় **অল্পহারে কোষবিভাজন** বা 'হাইপোপ্ল্যাসিয়া' (hypoplasia) ঘটলে অথবা সীমিতভাবে কোষের আয়তন বৃদ্ধি হলে বা **কোষ নষ্ট** হয়ে গেলে 'অ্যাট্রফির' (atrophy) জন্য অনেক সময় ঐ অংশের বা পুরো গাছটির বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

বিভিন্ন ধরণের পরজীবী থেকে যে সব রোগের সূত্রপাত এবং জীবাণুর মাধ্যমে যে রোগ আক্রান্ত গাছ থেকে সুস্থ গাছে ছড়িয়ে পড়ে তাদের **সংক্রামক** বা 'ইনফেকশাস' (infectious) রোগ বলে। এই ধরণের জীবাণুকে সংক্রামক রোগজীবাণু বলা হয়।

কোন অঞ্চলে বছরের পর বছর একটি বিশেষ রোগের আক্রমণ ও প্রসারের কথা চিন্তা করলে তিন ধরণের সম্ভাবনা দেখা যায়। যখন মাঝারি বা নিদারুণ ক্ষতিকর ভাবে একটি রোগ কোন অঞ্চলে প্রতি বছরই হতে দেখা যায় তখন এটিকে **আঞ্চলিক** বা 'এণ্ডেমিক' (endemic) রোগ বলা হয়। এসব রোগের জীবাণু ঐ অঞ্চলে স্থায়ীভাবে টিকে থাকতে পারে কেন না আবহাওয়া মোটামুটি-ভাবে তাদের প্রতি অনুকূল থাকে। সেজন্যই প্রতি বছর রোগের আক্রমণ ঘটতে পারে। যেসব রোগের আক্রমণ প্রতি বছর দেখা না গেলেও কয়েক বছর পর পর ব্যাপকভাবে ঘটে এবং প্রচুর ক্ষতির কারণ হয় তাদের **মহামারী** বা

'এপিডেমিক' (epidemic) অথবা 'এপিফাইটোটিক, (epiphytotic) ধরণের রোগ বলা হয়। গাছের রোগের ক্ষেত্রে এপিফাইটোটিক শব্দটিই বেশী প্রযোজ্য। এই জাতীয় রোগের ব্যাপক প্রসার অনুকূল আবহাওয়ার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। একটি সম্ভাবনা হল এণ্ডেমিক রোগের মত এক্ষেত্রেও রোগজীবাণু পরিবেশে সাফল্যের সঙ্গে বেঁচে থাকে কিন্তু অনুকূল আবহাওয়ার সঙ্গে যোগাযোগ কয়েক বছর পরপর ঘটে। তখনই রোগ মহামারী হয়ে দেখা দেয়। অন্য আর একটি সম্ভাবনা হল এই যে আবহাওয়া প্রতি বছরই জীবাণুর অনুকূলে থাকে কিন্তু জীবাণু সাধারণতঃ বেঁচে থাকে না। যে বছর যথেষ্ট পরিমাণে জীবাণু পরিবেশে থাকে বা হঠাৎ সংলগ্ন অঞ্চল থেকে এসে পড়ে সে বছর রোগটি মহামারীরূপে দেখা দেয়। এমন কিছু রোগ আছে যেগুলি সাধারণতঃ নিয়মিতভাবে দেখা যায় না এবং এদের আক্রমণ অত্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ঘটে। **এদের বিক্ষিপ্ত** বা 'স্পোর‍্যাডিক' (sporadic) রোগ বলা হয়। এই প্রসঙ্গে অবশ্যই মনে রাখতে হবে কোন রোগই নিয়মিত ভাবে এণ্ডেমিক, এপিফাইটোটিক বা স্পোর‍্যাডিক হয় না। স্থান, কাল ও পরিবেশের প্রভাবে একই রোগ এক অঞ্চলে এণ্ডেমিক আর অন্য অঞ্চলে এপিফাইটোটিক হতে পারে।

রোগের বিভিন্ন পর্যায়

যখন সংক্রামক ধরণের রোগ উৎপাদক নিজে বা তার বিশেষ কোন অংশ গাছের সংস্পর্শে এসে রোগের সৃষ্টি করে তখন তাকে **'ইনোকুলাম'** (inoculum) বলা হয়। আগের মরশুমে লাগানো রোগগ্রস্ত পোষক গাছ, ঐ একই রোগগ্রস্ত জংলা গাছ বা আগাছা, ফসল কেটে নেবার পর মাটিতে থেকে যাওয়া বা পড়ে থাকা রোগগ্রস্ত গাছের অংশবিশেষ ইত্যাদি সাধারণতঃ প্রাথমিক ইনোকুলামের (primary inoculum) উৎস হিসাবে কাজ করে। প্রধানতঃ বাতাস, বাতাসে ভাসমান জলকণা বা জলের ফোঁটা অথবা বিভিন্ন ধরণের কীটপতঙ্গ উৎস থেকে রোগ-জীবাণু বহন করে সুস্থ গাছে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। এইভাবে পোষক ও পরজীবী পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে এবং অনুকূল পরিবেশে রোগের সৃষ্টি হয় যার ফলে আক্রান্ত গাছটি মরে যেতে পারে অথবা প্রাথমিক অসুস্থতার পর পরিবেশের প্রভাবে বা স্বকীয় প্রতিরোধ ক্ষমতার জোরে সুস্থ জীবনে ফিরেও আসতে পারে। একটি সংক্রামক রোগের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিবেচনা করলে তার অগ্রগতিকে কয়েকটি স্বতন্ত্র ধাপে ভাগ করা যেতে পারে।

সংক্রামক রোগের প্রথম ধাপ হল পোষকের দেহের মধ্যে পরজীবীর **অনুপ্রবেশ** বা 'পেনিট্রেশন' (penetration)। যে কোন পোষক গাছের পাতা বা বিভিন্ন অঙ্গের উপর বহু বিচিত্র ধরনের জীবাণু এসে পড়ে যাদের অধিকাংশের সঙ্গেই গাছটির পোষক-পরজীবী সম্পর্ক নেই। যাদের সে সম্ভাবনা আছে তাদের পক্ষে পোষক গাছের দেহের মধ্যে প্রবেশ না করে রোগ সৃষ্টি করা একেবারেই অসম্ভব। দ্বিতীয় ধাপে, পোষকের দেহকোষে প্রবেশের অব্যবহিত পরে, পরজীবী চারিপাশের আরও কিছু কোষের মধ্যে প্রবেশ করে নিজেকে গাছের দেহে প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। এই **প্রাথমিক প্রতিষ্ঠা** বা 'ইনফেকশন' (infection) পরজীবীর রোগসৃষ্টির ইতিহাসে অপরিহার্য এবং প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। একথা মনে রাখতে হবে যে পোষকের যথার্থ পরজীবী ছাড়া অন্য কিছু জীবাণু তার দেহমধ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হলেও কোষের আভ্যন্তরীণ পরিবেশের প্রতিকূলতা বা কোষের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্য তারা পরজীবীর দেহে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

প্রকৃত পক্ষে গাছ ও পরজীবীর মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া শুরু হয় পরজীবীর গাছের দেহমধ্যে প্রবেশের পর থেকেই। পরিবেশের প্রতিকূলতা কাটিয়ে কিছু পরজীবী পোষকের দেহে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। তখন থেকে কোষের স্তরে পোষক ও পরজীবীর মধ্যে যে মিথষ্ক্রিয়া চলতে থাকে তাকে এক ধরনের অসম যুদ্ধ বা সংঘাত বলা যায় কারণ পোষক গাছের দেহ অতি ক্ষুদ্র পরজীবীর তুলনায় শুধু বড়ই নয়, অনেক জটিল ও সুগঠিতও বটে। যুদ্ধের পরিবেশ নানা কারণে পরজীবীর পক্ষে প্রতিকূল হয়ে দাঁড়াতে পারে যার ফলে অনেক সময় পরজীবী নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে বা মরে যায় এবং সেখানে রোগের কোন সম্ভাবনা থাকে না। পোষকের দেহমধ্যে মিথষ্ক্রিয়ার কোন প্রতিফলন বাইরে থেকে বিশেষ চোখে পড়ে না। সুতরাং পোষকের দেহের মধ্যে পরজীবী প্রাথমিক-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলেই যে রোগ সৃষ্টি করতে পারবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। যে কোন কারণেই হোক না কেন ভিতরের পরিবেশ যদি পরজীবীর অনুকূলে যায় তখন ক্রমশঃ রোগের অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং পোষক গাছের দেহে রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। পরজীবীর প্রাথমিক প্রতিষ্ঠার সময় থেকে পোষক গাছের দেহে রোগের লক্ষণ প্রথম ফুটে ওঠা পর্য্যন্ত যে সময় তাকে রোগের **অন্তবর্তীকাল** বা 'ইনকিউবেশন পিরিয়ড' (incubation period) বলা হয়। একে রোগের তৃতীয় ধাপ বা পর্যায় বলা চলে। বিভিন্ন রোগের অন্তবর্তীকাল কমবেশী হয়ে থাকে—সাধারণতঃ কয়েকদিন থেকে কয়েক সপ্তাহ কখনও বা কয়েকমাস এমনকি

কয়েক বছর পর্য্যন্ত। পরিবেশের পরিবর্তন হলে, অন্তবর্তীকাল ছোট বা বড় হয়ে যেতে পারে।

চতুর্থ ধাপে বা পর্যায়ে, অন্তবর্তীকাল শেষ হবার পর থেকে, রোগের লক্ষণ গাছের দেহে ক্রমশঃ প্রকাশ হতে থাকে। গাছের দেহে, বিভিন্ন অংশে, নূতন নূতন লক্ষণ দেখা দেয়। কয়েক দিন থেকে কয়েক সপ্তাহ এরকম চলে যাকে বলে **রোগের পরিস্ফুটন** (disease development)। অনেক পোষক-পরজীবীর ক্ষেত্রে রোগের লক্ষণ প্রকাশ হতে শুরু করার অল্পদিনের মধ্যেই গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে—ফলে রোগের নূতন নূতন লক্ষণ প্রথম কয়েক দিনের পর আর দেখা যায় না। অন্য অনেক ক্ষেত্রে রোগের লক্ষণ বেশ কিছুদিন ধরে দেখা দিতে থাকে ; গাছটি এর ফলে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এমনকি রুগ্ন হয়ে মরেও যেতে পারে। যেখানে রোগের লক্ষণ দেখা যায় সেখানেই অনেক সময় পরজীবীর জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে ছত্রাকের স্পোর, ব্যাকটিরিয়ার কোষ অথবা ভাইরাস কণিকা ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। বাতাস, জল বা কীটপতঙ্গ এই রোগজীবাণুগুলিকে নূতন পোষক গাছের দেহে বহন করে নিয়ে যায় ও সেই গাছে রোগের সূচনা করে। তাছাড়া পরজীবীর নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যও যথেষ্ট পরিমাণে সংখ্যাবৃদ্ধির অর্থৎ বংশবৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। পোষকের দেহে পরজীবীর আক্রমণের সূচনা থেকে রোগের সৃষ্টি ও রোগগ্রস্ত গাছের দেহে পরজীবীর বংশবৃদ্ধি পর্য্যন্ত ঘটনাকে **রোগচক্র** (disease cycle) বলা হয়। রোগচক্রের সঙ্গে পরজীবীর **জীবনচক্র** (life cycle) অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সন্দেহ নেই। তাহলেও মনে রাখতে হবে দুটি কখনই এক নয় কারণ প্রথমটির আবর্তন ও ধারাবাহিকতা পোষক গাছের দেহের বৈশিষ্ট্য ও আভ্যন্তরীণ পরিবেশের উপর অনেকটাই নির্ভর করে।

গাছের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে রোগের আক্রমণের তীব্রতা এবং কতদিন ধরে এবং কতটা বিস্তৃতভাবে গাছের দেহে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে তার উপর। রোগের প্রকোপ খুব বেশী হলে আক্রান্ত গাছের মৃত্যু ঘটতে পারে। কিন্তু অবস্থা গাছের পক্ষে কিছুটা অনুকূল হলে রোগজনিত ক্ষতি মারাত্মক হতে পারে না। তখন রোগের বিস্তার ক্রমশঃ কমতে থাকে আর রোগের লক্ষণও কম কম প্রকাশ পেতে থাকে যার ফলে আক্রান্ত গাছটির রোগের ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দেয়। রোগের পঞ্চম ধাপের বৈশিষ্ট্য হল রোগগ্রস্ত গাছের **আরোগ্যের** (recovery) সূচনা। বর্ষজীবী গাছের ক্ষেত্রে এই পঞ্চম ধাপই রোগের ধারাবাহিক অগ্রগতির শেষ পর্যায়।

রোগগ্রস্ত গাছ ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠলেও তার দেহের বিভিন্ন অংশে কিছু রোগের চিহ্ন তখনও দেখা যায়। কিন্তু দীর্ঘজীবী গাছের ক্ষেত্রে অবস্থা একটু অন্যরকম হয়। রোগের লক্ষণযুক্ত অংশগুলি, বিশেষ করে পাতা, ফুল ইত্যাদি, গাছ থেকে খসে পড়ে যায় এবং নূতন শাখা প্রশাখার সৃষ্টি হতে থাকে যার ফলে গাছের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। এই ষষ্ঠ ধাপকে বলা যেতে পারে রোগগ্রস্ত গাছের **পুনর্বাসন** (rehabilitation)। দীর্ঘজীবী গাছেরও অনেক সময় রোগের আক্রমণের ফলে মৃত্যু ঘটে তবে এক বছরে এমন ঘটনা, সময় লাগে। বিশেষ মরশুমে গাছটি রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আবার আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে রোগের প্রকোপ যখন একেবারে কমে যায় গাছ তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পায়। কিন্তু প্রতি বছরই যদি রোগের আক্রমণ ঘটে তাহলে মরশুমের শেষে গাছটি সুস্থ হয়ে উঠলেও ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে ও তার রোগ প্রতিরোধশক্তি কমে যায় এবং কয়েক বছরের মধ্যেই তার মৃত্যু ঘটে। বর্ষজীবী গাছে রোগ হলে ফসল কেটে নেবার পর যে অংশ মাটিতে পড়ে থাকে তার মধ্যে রোগজীবাণু দুটি চাষের মধ্যবর্তী সময়টা বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু এইগুলি পচে গেলে জীবাণু অনেক সময় মাটিতে চলে যায় এবং সেখানে অনুকূল পরিবেশে ভালভাবে অথবা প্রতিকূল পরিবেশে কোনক্রমে বেঁচে থাকে। কিছু ক্ষেত্রে রোগজীবাণু জংলা কোন গাছ বা আগাছাকে আক্রমণ করেও তার দেহে দুটি ফসলের মধ্যবর্তী সময়টুকু কাটায়। নূতন ফসল লাগালে এই সব উৎস থেকে জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে ও মরশুমের নূতন গাছে রোগের সূচনা করে।

প্রাসঙ্গিক পুস্তক ও গবেষণাপত্রাদি

Bateman, D. 1978. The dynamic nature of disease. In "Plant Disease : An Advanced Treatise" (J. G. Horsfall and E. B. Cowling, eds.), Vol. 3, 53.—83. Academic Press New York.

Deverall, B. J. 1969. 'Fungal Parasitism". Edward Armold, London.

Federation of British Plant Pathologists. 1973. "A guide to the use of terms in plant pathology." Phytopath. Paper No. 17.

Lewis, D.H. 1973. Concepts of fungal nutrition and the origion of biotrophy. *Biol. Rev.* **48** : 261—278.

McNew, G.L. (1960). The nature, origion, and evolution of parasitism. In "Plant Pathology : An Advanced Treatise" (J. G. Horsfall and A. E. Dimond, eds.). Vol. 2, 20-69. Academic Press, New York.

Robinson, R. A. 1969. Disease resistance terminology. *Rev. appl. Mycol.* **48** : 593—606.

———

৪ গাছের রোগের শ্রেণীবিভাগ

যখন বোঝা গেল যে বিভিন্ন ধরণের গাছ নানারকম রোগে আক্রান্ত হতে পারে এবং তাদের দেহে বহু বিচিত্র ধরণের রোগলক্ষণও দেখা দিতে পারে তখন থেকেই রোগসমূহের শ্রেণীবিভাগ করার চেষ্টা আরম্ভ হল। রোগের নানা ধরণের শ্রেণীবিভাগ হয়েছে বটে কিন্তু অধিকাংশেরই কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। এই ধরণের শ্রেণীবিভাগের সময় রোগের কারণের উপর জোর না দিয়ে রোগের লক্ষণ অথবা আক্রান্ত গাছের বা আক্রান্ত অঙ্গের প্রকৃতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

অনেক সময় গাছের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে রোগের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে ; যথা—দানাশস্যের রোগ, ডালশস্যের রোগ, ফলগাছের রোগ, ফুলগাছের রোগ ইত্যাদি। কখনও বা আক্রান্ত অঙ্গের নামানুসারে রোগের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে শিকড়ের রোগ, কাণ্ডের রোগ, পাতার রোগ, ফলের রোগ ইত্যাদি। অনেক সময় রোগের লক্ষণ ধরেও রোগের শ্রেণীবিভাগ হয়েছে, যেমন—শিকড় পচা (root rot), চারাধসা (damping off), ঢলে পড়া (wilt), পাতায় দাগ (leaf spot), ছাতাধরা (powdery mildew), মরিচা (rust) রোগ ইত্যাদি। এই ধরণের শ্রেণীবিভাগ আংশিকভাবে উদ্দেশ্য সাধন করেছে বটে, কিন্তু এগুলি অবৈজ্ঞানিক চিন্তার উপরে প্রতিষ্ঠিত। দানাশস্যের বা ফলগাছের বিভিন্ন কারণের জন্য নানা রকমের রোগ হতে পারে যাদের প্রকৃতিতে, রোগলক্ষণে বা ক্ষতির ব্যাপ্তিতে সামান্যই মিল আছে। একই কথা শিকড়ের রোগ, পাতার রোগ এবং ফলের রোগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

রোগের মূলগত কারণের উপর নির্ভর করে যে শ্রেণীবিভাগ করা হয় সেটি বৈজ্ঞানিক প্রথাসম্মত ও সেই কারণে গ্রহণযোগ্য। অনেকে গাছের রোগকে **সংক্রামক** (infectious) ও **অসংক্রামক** (non-infectious) দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেন। এখানে সংক্রামক রোগ বলতে পরজীবী ও ভাইরাসজনিত রোগকে আর অসংক্রামক বলতে সাধারণতঃ প্রতিকূল পরিবেশজনিত রোগকেই বোঝায়। তবে সব পরজীবীজনিত রোগকে প্রকৃত অর্থে হয়ত সংক্রামক বলা যায় না। এই কারণে দ্বিতীয় মত অনুযায়ী গাছের রোগকে দুটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যথা—(ক) **পরজীবীজনিত** রোগসমূহ (parasitic diseases) ও (খ) **অপরজীবীজনিত** (non-parasitic = abiological = nonbiological)

রোগসমূহ। দ্বিতীয় শ্রেণীর রোগ মূলতঃ প্রতিকূল পরিবেশজনিত হওয়ায় এদের অনেকে শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার ব্যাঘাতজনিত রোগ (physiological disease = physiogenic disease) বলেন। এই ব্যবহার সমর্থনযোগ্য নয় কারণ অধিকাংশ পরজীবীই গাছের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটানোর মাধ্যমেই রোগের সৃষ্টি করে। যারা মূল শ্রেণীবিভাগটি অনুমোদন করেন তাঁদের মধ্যেও একটি ব্যাপারে মতদ্বৈধ দেখা যায়, সেটি হল ভাইরাসজনিত রোগকে পরজীবী-জনিত রোগসমূহের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত কি না। যেহেতু ভাইরাস একটি জীবন্ত সত্তা (living entity) না নিষ্প্রাণ রাসায়নিক যৌগ মাত্র এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে সেজন্য অনেকে মনে করেন যে ভাইরাসজনিত রোগকে পরজীবী-জনিত রোগের শ্রেণীভুক্ত না করে একটি আলাদা শ্রেণীতে স্বতন্ত্রভাবে রাখা উচিত। এই পদ্ধতির শ্রেণীবিভাগের বিস্তারিত বিবরণ নীচে দেওয়া হল (J. C. Walker, 1969)।

(ক) অপরজীবীজনিত রোগসমূহ

রোগের কারণ :

১। প্রতিকূল আবহাওয়া (উষ্ণতা, আর্দ্রতা, আলো ইত্যাদি)
২। জমির প্রতিকূল পরিবেশ (অম্লতা, ক্ষারতা, খাদ্য উপাদানের ঘাটতি, দ্রব লবণের প্রাচুর্য ও আর্দ্রতা)
৩। দূষিত পরিবেশ (পরিবেশে ক্ষতিকারক গ্যাস ও অন্যান্য পদার্থের উপস্থিতি)

(খ) পরজীবীজনিত রোগসমূহ

রোগের কারণ :

১। ছত্রাক
২। ব্যাকটিরিয়া
৩। মাইকোপ্লাজমা
৪। সপুষ্পক পরজীবী
৫। নিমাটোড

(গ) ভাইরাসজনিত রোগসমূহ

প্রথম শ্রেণীভুক্ত যে সব রোগ সেগুলি স্থানীয়ভাবে দেখা যায়, কখনই ছড়ায় না এবং সামগ্রিকভাবে কখনই শস্যের বেশী ক্ষতি করে না। কিন্তু দ্বিতীয় ও

তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত রোগ গাছ থেকে গাছে, একজমি থেকে অন্য জমিতে, এমনকি এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়তে পারে যার ফলে শস্যের মারাত্মক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে। এই সব রোগ উৎপাদকের মধ্যে সংখ্যায় ও গুরুত্বের দিক থেকে ছত্রাকই প্রধান। মোট রোগের শতকরা দশ ভাগ মাত্র ভাইরাস থেকে হয়, কিন্তু সংখ্যার অনুপাতে এদের ফসলের ক্ষতি করার ক্ষমতা অনেক বেশী।

———

৫ প্রতিকূল পরিবেশজনিত গাছের রোগ

মানুষ ও অন্যান্য জীবিত প্রাণীর মত উদ্ভিদেরও সুষম বৃদ্ধি ও স্বাভাবিক জীবনযাপন প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে। আলো, বাতাস, উষ্ণতা, আর্দ্রতা, জমির প্রকৃতি ও প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় বা ক্ষতিকর বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ সব নিয়ে গাছের এই পরিবেশ। কোন শস্যের চাষের সময় অজস্র গাছ অল্প জায়গায় ঘন করে লাগানো হয়। প্রকৃতিতে সাধারণতঃ এরকম দেখা যায় না। প্রয়োজনবশতঃ অনেক সময় এমন জায়গায় চাষ করতে হয় যেখানে স্বাভাবিক পরিবেশ ঐ শস্যের পক্ষে অনুকূল না হতেও পারে। অনেক সময় সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক পরিবেশে, যেমন কাঁচের ঘরে (glass house বা green house), চাষ করা হয়। এ ছাড়া চাষের প্রয়োজনে জমিতে নানারকম সার দেওয়া হয় ও সেচের ব্যবস্থা করা হয়। অনেক সময় জমিতে বা গাছে নানা ধরণের কীটনাশক, রোগ-প্রতিষেধক বা আগাছানাশক রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করা হয়। নিবিড় চাষের দরুণ প্রাথমিক-ভাবে পরিবেশে যে অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হয় চাষের পক্ষে প্রয়োজনীয় এই ধরণের ব্যবস্থাগুলি তা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। তখন চাষের পরিবেশ অনেকসময় শস্যের স্বাভাবিক বৃদ্ধির পক্ষে প্রতিকূল হয়ে পড়ে যার ফলে গাছে নানা ধরণের রোগের সৃষ্টি হতে পারে। এই জাতীয় রোগকে অপরজীবীজনিত রোগ (non-parasitic disease) বলা হয়। এই সব রোগ সংক্রামক নয়, অর্থাৎ এক গাছ থেকে অন্য গাছে ছড়ায় না। নিম্নলিখিত বিভিন্ন কারণে এই ধরণের রোগ হতে পারে :

১। প্রতিকূল আবহাওয়া (unfavourable climate)
২। জমির প্রতিকূল পরিবেশ (unfavourable soil conditions)
৩। অপুষ্টি (nutritional deficiency)
৪। পরিবেশ দূষণ (environment pollution)

প্রতিকূল পরিবেশজনিত রোগের লক্ষণ কোথাও কোথাও পরজীবী বা ভাইরাসজনিত রোগের লক্ষণের মত দেখায়। এর ফলে শুধু রোগগ্রস্ত গাছের চেহারা বা রোগলক্ষণ দেখে কারণ নির্ণয় করা সবসময় সম্ভবপর হয় না। এই ধরণের রোগ পরিবেশের দ্বারা সীমিত। তবে পরিবেশ স্বাভাবিক হলেই গাছে

রোগের প্রকোপ কমে অর্থাৎ যে অস্বাভাবিকতার জন্যে রোগের সৃষ্টি হয় সেটি অপসারিত হলেই রোগের নিরাময় ঘটে। এই ধরণের রোগের ফলে গাছ বা আক্রান্ত অংশটি দুর্বল হয়ে পড়ে ও অনেক সময় রোগজীবাণুর আক্রমণের শিকার হয়।

১। প্রতিকূল আবহাওয়া

আবহাওয়ার মূল উপাদান বলতে উষ্ণতা, আর্দ্রতা ও আলোকে বোঝালেও বাতাস, ঝড়-ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি ও তুষারপাতকেও এর মধ্যে ধরা হয়। প্রথম তিনটি যে কোন গাছের স্বাভাবিক জীবনযাপনের পক্ষে অপরিহার্য হলেও, অস্বাভাবিক কম বা বেশি মাত্রায় থাকলে এই উপাদানগুলিই রোগের সৃষ্টি করতে পারে।

(ক) উষ্ণতা *(Temperature)*

প্রতি গাছের সুষম বৃদ্ধির জন্য একটি সর্বাপেক্ষা অনুকূল তাপমাত্রা আছে যেটি গাছ হয়ত অধিকাংশ সময় পায় না। গাছের পক্ষে সহণীয় উষ্ণতার একটি ন্যূনতম ও একটি সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও আছে যথাক্রমে যার নীচে ও উপরে গাছের বৃদ্ধি সম্ভব নয়। বিভিন্ন গাছের জন্য ন্যূনতম (minimun), সর্বাপেক্ষা অনুকূল (optimun) ও সর্বোচ্চ (maximum) তাপমাত্রার সীমা অবশ্যই এক নয়। তাপমাত্রা যদি ন্যূনতম বা সর্বোচ্চ তাপমাত্রার যথাক্রমে অনেক নীচে নেমে বা অনেক উপরে উঠে যায় তখন গাছের জীবন যাত্রায় রোগের লক্ষণ বা অস্বাভাবিকতার চিহ্ন ফুটে উঠতে পারে। গ্রীষ্মমণ্ডলের কোন গাছের পক্ষে অতি নিম্ন তাপমাত্রা যেমন ক্ষতিকর, নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের গাছের পক্ষে অতি উচ্চ তাপমাত্রাও তেমনি ক্ষতিকর। অতি উচ্চ তাপমাত্রায় যে রোগ সাধারণতঃ দেখা যায় তাকে বলে 'সানস্ক্যাল্ড' (sunscald)। এই রোগে কোষের সাইটোপ্লাজম শুকিয়ে যায় ও প্রোটিন নষ্ট হয়, ফলে কোষগুলির মৃত্যু হয়। সাধারণতঃ রসাল ধরণের ফল বা সবজী ও ছোট চারায় এই ধরণের রোগ হতে দেখা যায়। যে অংশ প্রখর সূর্যকিরণ পায় সেখানে অত্যধিক উত্তাপের ফলে ত্বকের নীচের কোষগুলি নষ্ট হতে থাকে, ফলে ত্বক সেখানে বসে যায়, উপরের রং বিবর্ণ হয়ে যায় এবং অনেকটা ফোস্কার মত দেখায়। টম্যাটো, আপেল, আলু, পেঁয়াজ, লঙ্কা ইত্যাদি সানস্ক্যাল্ড রোগে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রসাল ধরণের পাতাও এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। সানস্ক্যাল্ড রোগের জন্য উচ্চ তাপমাত্রা ও প্রখর সূর্যকিরণ যুগ্মভাবে দায়ী। তাপমাত্র সহ্যাতিরিক্ত হলে অনেক সময় গাছের পাতা ঝরে যায়। তাপমাত্রা খুব উঁচুতে উঠে গেলে গাছপালার যত ক্ষতি হয়

তার থেকে অনেক বেশি ক্ষতি হয় যখন তাপমাত্রা খুব নীচে, বিশেষ করে হিমাঙ্কের নীচে, নেমে যায়। ভীষণ ঠাণ্ডায় কোষের ভিতরে বা সংলগ্ন কোষগুলির মাঝের জায়গায় জলকণা জমে বরফ হয়ে গেলে—কোষের প্লাজমা আবরণীটি (plasma membrane) ক্ষতিগ্রস্ত হয় যার ফলে কোষটি মরে যেতে পারে। তখন জায়গাটা বিবর্ণ হয়ে যায়। তুষারাবৃত অবস্থায় গাছের কচি অংশ শুকিয়ে যায় আর কোমল প্রকৃতির গাছ হলে পুরোটাই শুকিয়ে যেতে পারে। এইভাবে পীচ, চেরী এবং অন্যান্য অনেক গাছের মুকুল, ফুল ও ফল এমনকি রসাল ছোট শাখাগুলিও শুকিয়ে যেতে পারে। হিমাঙ্কের নীচে যখন তাপমাত্রা নেমে যায় তখন অনেক গাছের কচি শিকড়গুলিও মরে যায়। কোথাও বা জলবাহী নালিকাগুলিতে জল জমে বরফ হয়ে যাবার ফলে গাছের উপরের অংশ জল না পেয়ে শুকিয়ে যায়। এই অবস্থায় আলুর ভিতরের অংশ বাদামী রং ধারণ করে এবং তার মিষ্টত্ব বেড়ে যায়।

(খ) আর্দ্রতা (Moisture) : বায়ুমণ্ডলে আর্দ্রতার অভাব হলে গাছের কোন বড় রকমের ক্ষতি হয় না। কারণ এই অবস্থা সাধারণতঃ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তবে বাতাসের গতি যদি দ্রুত হয় ও সেই সঙ্গে উচ্চ তাপমাত্রা থাকে তাহলে কম আর্দ্রতায় বেশি বাষ্পমোচনের ফলে পাতাগুলি শুকিয়ে ঝলসে যেতে পারে এবং গাছে সাময়িকভাবে এমনকি স্থায়ীভাবেও ঢলে পড়া রোগের লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

(গ) আলো (Light) : আলোর যথেষ্ট অভাব হলে গাছে ক্লোরোফিলের অভাব দেখা দেয় ও স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। সাধারণতঃ আলোর অভাব বা আলোর তীব্রতার জন্য বড় একটা রোগ হয় না। রোগ হতে পারে যদি আলোর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে বড় রকমের কোন পরিবর্তন দেখা দেয়। অতি উচ্চতায় হ্রস্ব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রশ্মি বিশেষ করে আলট্রা ভায়োলেট রশ্মির পরিমাণ খুব বেশি হলে গাছের বেশ ক্ষতি হতে পারে। বীনের সানস্ক্যাল্ড রোগ এই ধরণের। বীনের ফলগুলির গায়ে জলভরা দাগ (water soaked lesion) দেখা দেয়। পরে ঐ অংশগুলি শুকিয়ে কুঁচকে যায় ও বাদামী রঙ ধারণ করে। পাতাতেও এই রকমের রোগলক্ষণ দেখা যায়। সয়াবীনেও এই রোগ হয়।

বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা ও জমির আর্দ্রতা খুব বেশি হলে গাছ অনেকসময় অক্সিজেনের অভাবে রুগ্ন হয়ে পড়ে। এই কারণেই শিকড় পচা রোগ হয়। আলুর 'ব্ল্যাকহার্ট' (black heart) রোগের কারণও একই। এই রোগে শ্বসন প্রক্রিয়ায় অসুবিধার ফলে আলুর মাঝখানের কোষগুলি মরে বাদামী রঙের হয়ে

যায় এবং সেখানে ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি হয়। অক্সিজেনের অভাব খুব বেশি হলে পুরো আলুটাই শুকিয়ে কালচে হ'য়ে যেতে পারে। আপেল বা ন্যাসপাতির 'ব্রাউন হার্ট' (brown heart) রোগও অনেকটা একই কারণে হয়। জাহাজে খোল বোঝাই হয়ে যখন আপেল বা ন্যাসপাতি চালান যায়, তখন বায়ুচলাচলের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকলে অক্সিজেনের পরিমাণ ক্রমশঃ কমতে থাকে আর বিষাক্ত কার্বণ ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বাড়ে। যার ফলে এই রোগ হতে পারে।

২। জমির প্রতিকূল পরিবেশ

জমির প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক গঠন, অম্লতা বা ক্ষারতা ও আর্দ্রতা গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও জীবনযাপনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

জমির গঠনের উপর জমির জলধারণ ক্ষমতা ও বাতাসয়ণ (aeration) অর্থাৎ অক্সিজেন প্রাপ্তির সম্ভাব্যতা নির্ভর করে। জমি ঘনসন্নিবদ্ধ ও খুব শক্ত হলে শিকড়ের গঠন ও প্রসার মোটেই ভাল হতে পারে না। এর ফলে শাখাগুলি উপরদিক থেকে শুকোতে আরম্ভ করে, এমনকি গাছটি মরেও যেতে পারে। তাছাড়া এই ধরণের জমিতে অক্সিজেনের স্বল্পতার জন্য গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। কাঁকুরে জমির জল ধরে রাখার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। ফলে অনেক সময় গাছ প্রয়োজন মত জল পায় না।

খরার সময় যে সব জমিতে জল সহজেই নেমে যায় সেখানে গাছগুলি খর্বকায় হয়, পাতাগুলি ছোট ছোট ও হালকা সবুজ রঙের হয় এবং ফুল ও ফল বিশেষ হয় না। বেশিদিন জলের অভাব হলে প্রাথমিক অবস্থায় পাতাগুলি সাময়িক-ভাবে ঢলে পড়ে। পরে ঢলে পড়া অবস্থা স্থায়ী হয় ও গাছ শুকিয়ে যায়। বড় বড় গাছের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা হতে পারে। তখন শাখাগুলি ছোট হয়। পাতাগুলি শুধু ছোটই হয় না, কখনও কখনও তাদের চেহারায় তাপদগ্ধ বা শুক্‌নো ভাব ফুটে ওঠে। পাতা পড়ে যেতেও পারে, এমনকি কিছু শাখা প্রশাখাও শুকিয়ে যায়।

অতিবৃষ্টি বা বন্যার ফলে অথবা জলনিকাশী ব্যবস্থা যথোপযুক্ত না হওয়ায় অনেকসময় জমিতে জল জমে যায়। এই অবস্থায় জমিতে অক্সিজেনের অভাবে শিকড়গুলি খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। সরস ধরণের গাছগুলি অল্পদিনের মধ্যেই শুকিয়ে মরে যায়, আর বড় গাছের ক্ষেত্রে এই অবস্থায় আসতে কিছুটা সময় লাগে। শিকড় নষ্ট হয়ে যাওয়ায় গাছের উপরের অংশ যথেষ্ট জল পায় না এবং ক্রমশঃ শুকোতে থাকে।

গাছ তার খাদ্যের অধিকাংশ উপাদান জমি থেকেই পায়। এগুলি ছাড়াও জমিতে এমন অনেক রাসায়নিক পদার্থ আছে যার কিছু যেমন গাছের নানা প্রয়োজনে লাগে, অন্যরা আবার গাছের ক্ষতিও করে। জমিতে বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ ও অনুপাত গাছের পুষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করে ও নানাভাবে তার স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রসঙ্গে জমির অম্লতা ও ক্ষারতার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। দেখা গেছে যে অম্লতা ও ক্ষারতার মাঝামাঝি বা অল্প অম্লতা (PH 7.0 বা তার অল্প নীচে) অধিকাংশ গাছের স্বাভাবিক জীবন-যাপনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী। জমির অম্লতার বা ক্ষারতার মাত্রা বেশি পরিবর্তিত হলে গাছের বৃদ্ধি বা স্বাভাবিক জীবনে বাধার সৃষ্টি করে। অম্লতার মাত্রা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হলে গাছ স্বাভাবিকভাবে বাড়তে পারে না, পাতার সবুজ রঙ ফিকে হয়ে যায়, শিকড়গুলির ক্ষতি হয় ও বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। অনেকক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে গাছটি অকালমৃত্যু বরণ করে। জমিতে চুন প্রয়োগ করে অম্লতা স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরিয়ে আনা যায়। জমিতে ক্ষারতার মাত্রা বেশি হলে বীজের অঙ্কুরোদ্গম ভাল হয় না বা ছোট চারাগাছ হলদে হয়ে শুকিয়ে যায়। পরিণত বয়সের গাছেও পাতা হলদে হয়ে যেতে ও কিছু পাতা শুকিয়ে যেতে দেখা যায়। জমিতে গন্ধক প্রয়োগ করে ক্ষারতাকে স্বাভাবিক পর্যায়ে নামিয়ে আনা যায়।

৩। অপুষ্টি

স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়াও গাছের অনেকগুলি মৌল উপাদান প্রয়োজন হয়। এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে প্রয়োজন নাইট্রোজেন (Nitrogen), পটাশিয়াম (Potassium), ক্যালসিয়াম (Calcium), ম্যাগনেশিয়াম (Magnesium) ও লোহা (Iron) যাদের প্রাথমিক পুষ্টি উপাদান বলা যেতে পারে। এ ছাড়াও পুষ্টির জন্যে গাছের অতি অল্প পরিমাণে আরও কিছু মৌল উপাদান প্রয়োজন হয় (micronutrients), যেমন ম্যাঙ্গানিজ (Manganese), বোরন (Boron), মলিবডেনাম (Molybdenum), দস্তা (Zinc) ও তামা (Copper)। জমিতে এগুলি বিভিন্ন ধরণের লবণ হিসেবে থাকে এবং ঐ সব লবণের দ্রবণ গাছ তার শিকড়ের সাহায্যে জমি থেকে আহরণ করে। এদের সব কটিই গাছের স্বাভাবিক জীবন ধারণের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। নূতন কোষের গঠনে, বৃদ্ধিতে ও বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় এদের গুরুত্ব অপরিসীম। দেহ-

কোষকে সজীব ও সক্রিয় রাখতে এদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। গাছ যখন জমি থেকে এইসব উপাদান উপযুক্ত পরিমাণে নিতে পারে না তখন গাছের পুষ্টি ব্যাহত হয় এবং বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজকর্মে বাধা পড়ে। কোন একটি উপাদানের অভাব বেশি হলে গাছের দেহে রোগের লক্ষণ দেখা যায়। এমনও হতে পারে যে কোন একটি প্রয়োজনীয় উপাদান হয়ত জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে আছে কিন্তু যে ভাবে আছে তা গাছের পক্ষে সহজলভ্য নয় অর্থাৎ আহরণ করা কঠিন। অনেক সময় এমনও হয় যে একটি উপাদান বেশি থাকার ফলে আর একটি অলভ্য হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রেও গাছ অপুষ্টিতে ভোগে। আবার কোন একটি উপাদান যদি জমিতে প্রয়োজনের তুলনায় বেশ বেশি পরিমাণে থাকে তখনও হয়ত গাছের ক্ষতি করতে পারে। যে উপাদান অল্প পরিমাণে থাকলে গাছের উপকার হয় সেটি অধিক পরিমাণে থাকলে গাছে নানারকম রোগের সৃষ্টি হতে পারে।

নাইট্রোজেন : সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াস, এনজাইম ও ক্লোরোফিল গঠনে নাইট্রোজেনের প্রয়োজন হয়। গাছের স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেনের দরকার হয়। নাইট্রোজেনের অভাব বেশি হলে গাছ স্বাভাবিকের তুলনায় ছোট হয় যেমন জলের অভাব হলে দেখা যায়। নীচের পাতার রঙ ফিকে সবুজ বা একটু হলদেটে ধরনের হয়ে যায়। এই অবস্থায় কিছু গাছে লালচে বা কমলালেবু রঙের ছোপও পড়ে। কাণ্ডের তুলনায় শিকড়ের বৃদ্ধি ও প্রসার বেশি হয়। যেখানে জমিতে নাইট্রোজেনের অভাব খুবই বেশি সেখানে গাছের বৃদ্ধি সর্বাঙ্গীনভাবে হ্রাস পায়, পাতার ধার বরাবর শুকোতে থাকে, পরে পুরো পাতাটাই শুকিয়ে যায় বা খসে পড়ে। স্বাভাবিকের মত ফুল ও ফল ধরে না, দানা পুষ্ট হয় না, আর ফলগুলিও ছোট ছোট হয়। এর ফলে ফলন বেশ কমে যায়।

ফসফরাস : উদ্ভিদ কোষের নিউক্লিয়াস ও ঝিল্লী বা আবরণী (membrane) গঠনে ফসফরাসের বিশেষ প্রয়োজন আছে। এছাড়া ফসফরাস সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসন প্রক্রিয়ায় এবং এনজাইমের অংশ হিসাবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে। ফসফরাসের অভাব হলে রোগের লক্ষণ অনেকটা নাইট্রোজেনের অভাবে যেমন হয় সেরকম। এখানেও গাছ বাড়ে কম। শিকড় ছোট হয়, পাতাগুলিও ছোট ছোট হয় এবং অকালে ঝরে যায়, ভাল ফুল ধরে না এবং ফলন কম হয়। তবে সুস্পষ্ট তফাৎও আছে। পাতার রঙ গাঢ় হয় যদিও তার সঙ্গে একটু নীলচে ভাব থাকে, আর নীচের

তলের রঙ খানিকটা লাল্‌চে-বেগুনী ধরণের হয়। পাতায় একটু উজ্জ্বলতা কম থাকে। যে সব জমিতে অম্লতার মাত্রা বেশী বা জল নিষ্কাশন বেশি হয় সাধারণতঃ সেখানেই গাছ ফসফরাসের অভাবে ভোগে।

পটাশিয়াম ঃ শর্করা জাতীয় খাদ্যের বিপাক প্রক্রিয়া ছাড়াও গাছের অনেক গুরুত্বপূর্ণ শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার সঙ্গে পটাশিয়াম জড়িত। এর অভাবে গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে, কাণ্ড স্বাভাবিকের তুলনায় সরু হয় এবং পাতায় রোগের নানা-রকম লক্ষণ দেখা যায়। সাধারণতঃ পাতায় একটা নীলচে আভা দেখা দেয়, পাতার ডগা শুকিয়ে যায় এবং কিনারা ধরেও শুকোতে থাকে। কিনারার কাছাকাছি সাদা বা বাদামী রঙের দাগও দেখা যায়। এই অবস্থায় তণ্ডুল জাতীয় শস্যের প্রচুর পাশকাঠি বেরোয় আর আলুর গাছ বেশ ছড়ানো ধরণের হয়। পটাশিয়ামের অভাব দীর্ঘস্থায়ী হলে গাছের বৃদ্ধি ভীষণভাবে ব্যাহত হয়—শিকড় বা কাণ্ড কোনটাই স্বাভাবিকভাবে বাড়ে না আর পাতা কিনারা থেকে গুটিয়ে যেতে পারে, এমন কি একেবারে শুকিয়ে যেতেও পারে। বড়গাছের ক্ষেত্রে ছোট ডালগুলি ডগা থেকে শুকোতে থাকে (die back), অনেক সময় গাছটি মরে যায়।

ক্যালসিয়াম ঃ কোষের গঠনে, বিভাজনে ও নানাবিধ শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় ক্যালসিয়ামের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। জমিতে ক্যালসিয়ামের অভাব হলে রোগের লক্ষণ প্রথম দেখা যায় কচি পাতায় ও শাখাপ্রশাখার ডগায়। কচি পাতাগুলি বিকৃত আকার ধারণ করে, কিনারা থেকে গুটিয়ে যায় আর অনেক সময় শুকিয়ে বাদামী রঙ নেয়। মাঝে মাঝে পাতার অংশবিশেষে ত্বকের নীচের কোষগুলি শুকিয়ে যাওয়ায় জায়গাটি বসে যেতে দেখা যায়। পাতার সব অংশ সমানভাবে বাড়ে না। ক্যালসিয়ামের অভাব দীর্ঘস্থায়ী হলে কচি পাতাগুলি নষ্ট হয়ে যায়। পাতার বয়স যত কম, ক্ষতি হয় তত বেশি। শাখা প্রশাখাগুলির ডগাও শুকিয়ে যায়, সেলেরির (celery) 'ব্ল্যাকহার্ট' (black heart), আপেলের 'বিটার পিট' (bitter pit), টম্যাটোর 'ব্লসম এণ্ড রট' (blossom end rot) প্রভৃতি রোগ ক্যালসিয়ামের অভাবে হয়ে থাকে যদিও শেষোক্ত রোগের ক্ষেত্রে জলের অভাবও আংশিকভাবে দায়ী। আপেল আর টম্যাটোর ফলের গায়ে নির্দিষ্ট আকারের গাঢ় বাদামী রঙের বসে যাওয়া ধরণের দাগ হতে দেখা যায় যার ফলে ফলগুলি প্রায় নষ্ট হয়ে যায়।

ম্যাগনেশিয়াম ঃ ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরোফিলে থাকে। এ ছাড়াও শর্করা ও প্রোটিন জাতীয় খাদ্য সংশ্লেষণে ও ফসফরাসের বিপাক ক্রিয়ায় যে সব এনজাইম

অংশ নেয় তাদের অনেকের ক্রিয়ার সঙ্গে ম্যাগনেশিয়াম জড়িত। জমিতে ম্যাগনেশিয়ামের অভাব হলে প্রথমে নীচের এবং পরে উপরদিকে কচি পাতাগুলি ফিকে সবুজ বা হালকা হলুদ রঙের দেখায়। অনেক সময় নীচের পাতাগুলি কমলা বা লালচে রঙে পরিবর্তিত হয়। উপরের কচি পাতাগুলি নানা জায়গায় শুকিয়ে যেতে থাকে ও পরে খসে যেতেও পারে।

লোহা: ক্লোরোফিল উৎপাদনে লোহার প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া গাছের দেহে বিভিন্ন প্রক্রিয়া চালাতে সাহায্য করে এরকম কিছু এনজাইমের জন্যও লোহার প্রয়োজন রয়েছে। জমিতে লোহার অভাব ঘটলে প্রথমে কচি পাতাগুলি হলদে হয়ে যায়, যদিও শিরার অংশ সবুজই থাকে। অভাব খুব বেশি হলে বা দীর্ঘস্থায়ী হলে নীচের পাতাগুলিও হলদে হয়ে যায়। তখন পাতা ঝরে যেতে পারে আর শাখা প্রশাখাগুলি উপর দিক থেকে শুকিয়ে যেতে থাকে। এই অবস্থায় ছোট গাছ মরে যেতে পারে।

উপরোক্ত মৌল উপাদানগুলি ছাড়া যেগুলি অতি অল্প মাত্রায় প্রয়োজন হয় সেগুলি হল ম্যাঙ্গানিজ, বোরণ, দস্তা, মলিবডেনাম ও তামা। তাদের অভাব হলেও গাছের স্বাস্থ্যে নানা ধরণের বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। এই উপাদনগুলি প্রধানতঃ বিভিন্ন এনজাইমের কাজে সহায়তা করে।

ম্যাঙ্গানিজ: প্রায় তিরিশটি গুরুত্বপূর্ণ এনজাইমের ক্রিয়ার সঙ্গে ম্যাঙ্গানিজ জড়িত। ম্যাঙ্গানিজের অভাবে গাছে নানা ধরণের রোগলক্ষণ দেখা দিতে পারে। পাতা হলদে হয়ে যায় কিন্তু ছোট শিরাগুলি সবুজই থাকে। পাতার বিভিন্ন অংশ শুকিয়ে যেতে থাকে। অনেক সময় পুরো পাতাই বাদামী রঙ ধারণ করে শুকিয়ে যায় বা ঝরে পড়ে। গাছ স্বাভাবিকভাবে বাড়ে না, ভাল ফুল ধরে না, ফলও কম হয়। আখের 'পাহালা ব্লাইট' (pahala blight), ওটের 'গ্রে স্পেক' (grey speck) ও মটরের 'মার্শ স্পট' (marsh spot) ম্যাঙ্গানিজের অভাবজনিত রোগের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

বোরণ: গাছের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে বোরণ নানাভাবে প্রভাবিত করে। ভাজক কলায় কোষ বিভাজন এবং ফুল ও ফল উৎপাদনের উপর বোরণের বিশেষ প্রভাব রয়েছে। বোরণের অভাবজনিত একটি খুব সাধারণ রোগলক্ষণ হল ভাজক কলার মৃত্যু। এর ফলে অনেক নূতন শাখা প্রশাখা হয় ও গাছটি ঝাঁকড়া হয়ে ওঠে। এই সঙ্গে পাতাগুলি বিবর্ণ হয়ে যায় ও বিকৃত আকার নেয়, এমনকি পরে শুকিয়েও যেতে পারে। শাঁসাল কাণ্ড, শিকড় ও ফলের ভিতরের অংশ শুকোতে থাকে আর গায়ে ফাটার চিহ্ন ও নানারকম দাগ দেখা

যায়। ফুল বিশেষ ধরে না, আর ধরলেও ফল বিকৃত ধরণের হয়। বীটের 'হার্ট রট' (heart rot), ফুলকপির 'হলো ষ্টেম' (hollow stem) ও আপেলের 'কর্কি স্পট' (corky spot) বোরণের অভাবজনিত রোগের কয়েকটি উদাহরণ।

দস্তা : কিছু এনজাইমের ক্রিয়ায় ও হরমোন উৎপাদনে দস্তার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। পরোক্ষভাবে দস্তা কোষের বৃদ্ধিতে ও কাণ্ডের সম্প্রসারণে অংশ গ্রহণ করে থাকে। জমিতে দস্তার অভাব হলে রোগের লক্ষণ প্রথমে গোড়ার দিকের পাতায় দেখা যায়। শিরার মধ্যবর্তী অংশ হলদে হয়ে যায়। পাতাগুলি ছোট ছোট হয় আর পর্বমধ্য অঞ্চলগুলির স্বাভাবিক প্রসারণ না হওয়ার ফলে মনে হয় একই জায়গা থেকে এক গুচ্ছ পাতা বেরিয়েছে। এই অবস্থায় ফলন ভাল হয় না। আপেলের 'লিটল লীফ' (little leaf), ভুট্টার 'হোয়াইট টিপ' (white tip), কোকোর 'সিকল লীফ' (sickle leaf) প্রভৃতি রোগ দস্তার অভাবে হয়ে থাকে।

মলিবডেনাম : নাইট্রোজেন বিপাকের সঙ্গে যুক্ত প্রক্রিয়াসমূহে মলিবডেনামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। জমিতে এটি প্রয়োজনীয় পরিমাণে না থাকলে, প্রথমে নীচের ও পরে উপরের পাতায় রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। পাতাগুলি বড় হয় না আর কিছু কিছু অংশ হলদে হয়ে যায়। পাতার ধারের অংশ গুটিয়ে যায়, কখনও বা শুকিয়ে যায়। ফুলকপির 'হুইপ টেল' (whip tail), ও লেবুর 'ইয়েলো স্পট' বা 'অরেঞ্জ স্পট' (yellow spot/orange spot) মলিবডেনামের অভাবজনিত দুটি রোগ।

তামা : অনেক এনজাইমের গঠনে তামার বিশেষ প্রয়োজন হয়। উপযুক্ত পরিমাণে তামা না পেলে গাছ কিছুটা নিস্তেজ হয়ে পড়ে, পাতাগুলি ছোট ছোট হয়ে যায় ও নীলচে সবুজ দেখায়। অনেক সময় পাতার ধারের অংশ হলদে হয়ে পরে শুকিয়ে যায়।

এমনও দেখা যায় যে কোন একটি খাদ্য উপাদান, সে প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয় যাই হোক না কেন, খুব বেশি পরিমাণে জমিতে থাকলে গাছের বেশ ক্ষতি করতে পারে। যে সব উপাদান গাছের বেশি পরিমাণে প্রয়োজন হয় তাদের তুলনায় যাদের প্রয়োজন কম তারাই এই অবস্থায় ক্ষতি করে বেশি। সব গাছের বিভিন্ন মৌল উপাদানের প্রয়োজনের উচ্চ সীমা এক নয়। কোন কোন গাছের সহ্য করার ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। জমিতে বিভিন্ন মৌল উপাদানের আপেক্ষিক পরিমাণেরও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। একটি উপাদান জমিতে খুব বেশি পরিমাণে থাকলে শুধু যে উদ্ভিদ কোষের প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতি

করতে পারে তাই নয়, অনেক সময় এর ফলে অন্য একটি উপাদান অলভ্য বা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। যে সব উপাদান গাছের বেশী পরিমাণে লাগে তাদের মধ্যে নাইট্রোজেন বা ক্যালসিয়ামের মাঝে মাঝে মাত্রাধিক্য ঘটতে দেখা যায় কিন্তু পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম বা ফসফরাসের ক্ষেত্রে এরকম কমই হয়। অল্প পরিমাণে যে সব উপাদান প্রয়োজন হয় তাদের মধ্যে বোরন, ম্যাঙ্গানিজ বা তামার মাত্রা বেশী হওয়ার জন্য গাছের রোগগ্রস্ত হয়ে পড়া অস্বাভাবিক নয়। অনেক সময় বিভিন্ন উপাদান অতিরিক্ত মাত্রায় থাকার ফলে জমির অম্লতা বা ক্ষারতা খুব বেড়ে যায়। তার ফলেও অনেক সময় গাছ অসুস্থ হয়ে পড়ে।

৪। পরিবেশ দূষণ

কলকারখানায় কাজ চলার ফলে নানারকম গ্যাসের সৃষ্টি হয় যেগুলি বেরিয়ে এসে চারিপাশের পরিবেশকে দূষিত করে। এইভাবে পরিবেশ দূষিত হওয়ার ফলে ঐ অঞ্চলের গাছপালার নানাধরণের রোগ দেখা দিতে পারে। কলকারখানার চারিপাশে পরিবেশ দূষণজনিত রোগের খবর বহুকাল থেকে জানা আছে। শিল্পায়ণের প্রসার ঘটার সঙ্গে সঙ্গে এই ধরণের রোগের মাত্রাই যে শুধু বেড়েছে তা নয়, রোগের বৈচিত্র্যও বেড়েছে। যে সব গ্যাসীয় উপাদানের জন্য এই জাতীয় রোগ হতে পারে তাদের মধ্যে প্রধান হল হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড (hydrogen fluoride), সালফার ডাইঅক্সাইড (sulphur dioxide), ওজোন (ozone) ও পেরোক্সিঅ্যাসিল নাইট্রেট (peroxyacyl nitrate = PAN)। এ ছাড়া নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড (nitrogen dioxide), ইথিলিন (ethylene), অ্যামোনিয়া (ammonia), ক্লোরিণ (chlorine) প্রভৃতি গ্যাস ও নানারকম ধূলিকণার জন্যও কিছু রোগের সৃষ্টি হয়।

বাতাসে সালফার ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেশী হলে পাতায় শিরামধ্যবর্তী অংশ বিবর্ণ হয়ে যায়। দূষণের পরিমাণ খুব বেশী হলে সেখানকার কোষগুলি নষ্ট হয়ে যায় ও ঐ জায়গাগুলি ভেজা দেখায়। এই গ্যাস থেকে আলফালফা, যব প্রভৃতি শস্যের খুব ক্ষতি হতে পারে।

বাতাসে হাইড্রোজেন ফ্লোরাইডের পরিমাণ বেশী হলে পাতার ধার এবং ডগার অংশ বিবর্ণ হয়ে যায়, কখনও বা একটু ভিজে ভাব থাকে। একবীজপত্রী গাছেই এই ধরণের রোগলক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। পরের দিকে বিবর্ণ অংশগুলি শুকিয়ে যায়, অনেক সময় পাতাও খসে পড়ে। হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড এপ্রিকট, চেরী, পপলার, গ্ল্যাডিওলাস প্রভৃতি গাছের বিশেষ ক্ষতি করে।

ওজোন পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ। ওজোন পরিবেশে জমলে অনেক

গাছের পাতার উপরিতল বিবর্ণ হয়ে যায়। বিবর্ণ অংশগুলি ছোট ছোট বিন্দুর মত অথবা অপেক্ষাকৃত বড় হতে পারে এবং ওগুলির রঙ সাদাটে, বাদামী এমনকি কালোও হতে দেখা যায়। তামাক, আলফালফা, বীন, লেবু প্রভৃতি গাছের ওজোন যথেষ্ট ক্ষতি করে থাকে।

পেরোক্সিঅ্যাসিল নাইট্রেটের জন্য পরিবেশ দূষিত হলে কোন কোন গাছের পাতার নীচের তলা রূপালী বা তামাটে রঙের হয়ে যায় আর সেখানে একটু চকচকে ভাবও থাকে। লেটুস, পালঙ, বীন, পেটুনিয়া প্রভৃতি গাছে এই ধরণের রোগলক্ষণ খুব স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়।

আগাছা, রোগ ও কীটশত্রু দমনের জন্য আজকাল নানারকম রাসায়নিক পদার্থ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। অনেক সময় এগুলি প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি না রেখে, যথেচ্ছভাবে এবং কোন সাবধানতা অবলম্বন না করেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এর ফলে পরিবেশ দূষণের যথেষ্ট সম্ভাবনা থেকে যায়। সেই অবস্থায় অনেক সময় পাতায় নানারকম দাগ হতে দেখা যায়, পাতা বিবর্ণ দেখায় এমনকি শুকিয়েও যায়, মনে হয় পাতা যেন ঝলসে গেছে। অনেক সময় ঠিকমত ফুলও ধরে না। এই সব কারণে ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি হতে পারে।

প্রাসঙ্গিক পুস্তক ও গবেষণাপত্রাদি

Darley, E. F., and J. T. Middleton. 1966. Problems of air pollution. *Ann. Rev. Phytopathol.* **4**: 103–118.

Levitt, J. 1973. "Responses of plants to environmental stress". Academic Press, New York.

Woltz, S. S. 1978. Non parasitic plant pathogens. *Ann. Rev. Phytopathol.* **16**: 403–430.

৬ গাছের রোগ উৎপাদক বিভিন্ন শ্রেণীর পরজীবী

গাছের রোগের প্রধান কারণ হল বিভিন্ন শ্রেণীর পরজীবী। বহুকাল থেকেই মানুষের মনে বিভিন্ন রোগের সঙ্গে কিছু পরজীবীর যোগ বা সম্পর্ক রয়েছে এমন একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল। অস্পষ্ট বলার কারণ এই যে পরজীবী থেকে রোগের সৃষ্টি হয় না রোগের ফলেই পরজীবীর সৃষ্টি সে সম্পর্কে বহুকাল পর্যন্ত কোন পরিষ্কার ধারণা ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৮৫৩, ১৮৫৮ খ্রীঃ) গাছের রোগের কারণ হিসাবে ছত্রাক জাতীয় জীবাণুর গুরুত্ব প্রথম অবিসংবাদিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। এই সময় যে সব গুরুত্বপূর্ণ রোগের কারণ সুনিশ্চিতভাবে জানা যায় সেগুলির সবকটিরই সৃষ্টি ছত্রাক জাতীয় জীবাণু থেকে। কিছুকাল পরে (১৮৭৮—১৮৮৫ খ্রীঃ) জানা গেল যে ব্যাকটিরিয়া থেকেও গাছের রোগ হয়। আরও পরে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৮৯৮ খ্রীঃ), ভাইরাস থেকে যে গাছের রোগের সৃষ্টি হতে পারে এই তথ্য প্রথম প্রতিষ্ঠিত হল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জানা যায় যে নিমাটোডও গাছে রোগের সৃষ্টি করতে পারে। পরবর্তীকালে গাছের রোগ উৎপাদক হিসাবে মাইকোপ্লাজমাও স্বীকৃতি পেয়েছে (১৯৬৭ খ্রীঃ)। এছাড়া সপুষ্পক ধরণের পরজীবী দ্বারাও কিছু গাছের রোগ হতে দেখা গেছে। ভাইরাস ও বিভিন্ন ধরণের পরজীবীদের মধ্যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে যেমন অনেক পার্থক্য রয়েছে তাদের আক্রমণ ও রোগ উৎপাদন পদ্ধতিতেও তেমনি অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রাথমিক পরিচিতির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রকমের পরজীবী ও ভাইরাসের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই অধ্যায় ও পরবর্তী অধ্যায়ে করা হল।

ছত্রাক

ল্যাটিন ভাষায় 'ফাঙ্গাস' (fungus : plural, fungi) বলতে প্রাথমিকভাবে ব্যাঙের ছাতাকে (mushroom) বোঝাত। এখন অবশ্য ফাঙ্গাসের মধ্যে শুধু ব্যাঙের ছাতাই নয় এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বা বিশেষ ঘনিষ্ঠ নয় এরকমও অনেক নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। বাঙলায় এই ধরণের উদ্ভিদকে ছত্রাক বলা হয়। ছত্রাক বলতে সাধারণতঃ সেইসব নিম্নশ্রেণীর অতি ক্ষুদ্র আকৃতির উদ্ভিদকে বোঝায় যাদের কোষ প্রাচীর ও প্রকৃত নিউক্লিয়াস

আছে অথচ ক্লোরোফিল নেই এবং যারা 'স্পোর' (spore) বা বীজকণার মাধ্যমে বংশবিস্তার করে।

গাছের রোগের সংখ্যা ও ক্ষতির পরিমাণ অনুসারে রোগ উৎপাদকদের মধ্যে ছত্রাকের গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশি। প্রায় লক্ষাধিক জানা ছত্রাকের প্রজাতির মধ্যে অধিকাংশই মৃতজীবী। মানুষ এবং বিভিন্ন প্রাণীর দেহে রোগের সৃষ্টি করে এরকম কিছু প্রজাতি ছাড়াও প্রায় ১০ হাজার বিভিন্ন ছত্রাক গাছের দেহে রোগ সৃষ্টি করে বলে জানা গেছে। প্রায় প্রতিটি গাছই কোন না কোন ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয়। কখনও বা একাধিক ছত্রাক একই গাছে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে বা একই ছত্রাক একাধিক গাছের রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাদের জীবন ধারণের পদ্ধতি ও পোষক গাছের সঙ্গে সম্পর্ক খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে বিভিন্ন রোগ উৎপাদক ছত্রাক (ক) বাধ্যতামূলকভাবে পরজীবী, (খ) আধা -পরজীবী বা (গ) ঐচ্ছিকভাবে পরজীবীর জীবন যাপন করে থাকে। বিশেষ ক্ষেত্রে কোন মৃতজীবী ছত্রাকও রোগের কারণ হতে পারে।

ছত্রাকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

ছত্রাকেরা বহু বিচিত্র পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে বেঁচে থাকতে পারে। আমরা জমিতে, জলে, আকাশে, বাতাসে এমনকি মানুষ, পশুপাখী ও গাছপালার দেহেও ছত্রাককে দেখতে পাই। কিছু ছত্রাককে যেমন শূন্যাঙ্কের কাছাকাছি তাপমাত্রায় বাঁচতে দেখা যায়, অন্য কিছু ছত্রাক আবার অতি উষ্ণ পরিবেশে (৪০—৫০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায়) বাঁচতে পারে। ছত্রাক সাধারণতঃ আর্দ্র পরিবেশ পছন্দ করলেও কিছু ছত্রাক রয়েছে যারা অত্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়ার মধ্যেও বেঁচে থাকে। ছত্রাক যে শুধু মানুষ, প্রাণী ও গাছপালার দেহে রোগ সৃষ্টি করে তাই নয়, নানা রকম খাদ্যদ্রব্য, কাঠ, কাপড়, চামড়া ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের জিনিষ নষ্ট করেও প্রচুর আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিছু ছত্রাক আমাদের কাজে লাগে এবং অনেক উপকারও করে। ব্যাঙের ছাতা এক প্রকার অতি উপাদেয় ও অতি আকর্ষণীয় খাদ্য। কিছু ছত্রাক থেকে খাদ্যপ্রাণ বা 'ভিটামিন' (vitamin) ও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ পাওয়া যায়। রুটি ও চীজ তৈরীতে এবং কয়েকটি প্রয়োজনীয় জৈব রাসায়নিক যৌগের শিল্পোৎপাদনে ছত্রাকের বহুল ব্যবহার হয়ে থাকে। এছাড়া মাটিতে পড়ে থাকা মৃত প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহ পচিয়ে জটিল জৈব যৌগগুলিকে ভেঙ্গে দেহের মৌল রাসায়নিক উপাদানগুলিকে প্রকৃতিতে ফিরিয়ে দেবার কাজেও ছত্রাক এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ নেয়। এর ফলে জমির উর্বরতা বজায় থাকে।

অঙ্গসংস্থান : সাধারণতঃ ছত্রাকের দেহ সূতার মত, অল্প বা বহু শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট 'হাইফা'র (hypha : pl., hyphae) সমন্বয়ে গঠিত। একে বলা হয় মাইসীলিয়াম (mycelium)। এটি দেখতে অনেকটা তুলার মত, যদিও সব সময় সাদা না হয়ে অন্য নানা রঙেরও হতে পারে। হাইফাগুলি সাধারণতঃ শিথিলভাবে বিন্যস্ত থাকলেও কোথাও কোথাও অত্যন্ত ঘনসন্নিবিষ্ট ভাবে বিন্যস্ত হওয়ার ফলে বিশেষ আকার ধারণা করে। অনুবীক্ষণের মাধ্যমে দেখলে একটি হাইফাকে অনেকটা শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট বেলনাকার নলের মত দেখায়। দৈর্ঘ্যবরাবর হাইফার ব্যাস সাধারণতঃ একরকমই থাকে, কিন্তু কিছু ছত্রাকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অংশে কমবেশি হতেও দেখা যায়। হাইফার দেওয়ালের মূল উপাদান হল 'কাইটিন' (chitin) নামক এক জাতের জটিল শর্করা, যদিও কোথাও কোথাও 'সেলুলোজ' (cellulose) থাকে। সাধারণতঃ একটি হাইফা দেওয়াল দ্বারা অনেকগুলি কোষে বিভক্ত থাকে। প্রতিটি কোষে এক, দুই কখনও বা ততোধিক নিউক্লিয়াস দেখা যায়। সাধারণতঃ দুটি কোষের মাঝখানের দেওয়ালে ছিদ্র থাকে যার মধ্য দিয়ে প্রোটোপ্লাজমের সঙ্গে নিউক্লিয়াস ও বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য হাইফার এক অংশ থেকে অন্য অংশে যেতে পারে। কিছু ছত্রাকের হাইফাতে অনেক নিউক্লিয়াস থাকলেও আড়াআড়ি কোন দেওয়াল থাকে না। এই ধরণের হাইফাকে বলা হয় 'সিনোসাইটিক' (coenocytic)। অনেকসময় হাইফা ছিঁড়ে গেলে বা কোন রকম আঘাত পেলে সেখানে দেহের সুরক্ষার উদ্দেশ্যে অথবা জননক্রিয়ার সময়ে আড়াআড়িভাবে দেওয়াল তৈরী হতে দেখা যায়। এমন ছত্রাকও আছে যাদের দেহ হাইফার দ্বারা গঠিত নয়, শুধুমাত্র একটি কোষে তৈরী। অনেক ছত্রাক আছে যাদের কোষের প্রাচীর না থাকার ফলে নগ্ন, বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত অ্যামিবার (amoeba) মত দেখায়। এই ধরণের দেহকে 'প্লাজমোডিয়াম' (plasmoduim) বলা হয়।

বংশবিস্তার : হাইফা কোন কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে বিচ্ছিন্ন অংশটি বৃদ্ধি পেয়ে স্বাভাবিক আকার ধারণ করে এবং তার শাখাপ্রশাখা নিয়ে নূতন মাইসীলিয়াম তৈরী হয়। একে বলা হয় অঙ্গজ জনন (vegetative propagation)। কখনও বা মাইসীলিয়ামের অনেকগুলি হাইফা ঘনসন্নিবিষ্ট-ভাবে একত্রিত হয়ে শক্ত গুটির আকার ধারণ করে। এগুলি সাধারণতঃ গোলাকার, তবে অন্য আকৃতিরও হতে পারে। এদের বলা হয় 'স্ক্লেরোশিয়াম' (sclerotium : pl., sclerotia)। পরিবেশ প্রতিকূল হলে সাধারণ হাইফা মরে যায় কিন্তু স্ক্লেরোশিয়ামে হাইফা বেঁচে থাকে এবং এদের থেকেই স্বাভাবিক

পরিবেশ ফিরে এলে নূতন মাইসীলিয়ামের সৃষ্টি হয়। তবে সাধারণতঃ ছত্রাকের বংশ বিস্তার ঘটে স্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে। সপুষ্পক উদ্ভিদের জীবনের সূত্রপাত যেমন বীজ থেকে, ছত্রাকের জীবনও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তেমনি স্পোর থেকে শুরু হয়। স্পোর সাধারণতঃ এককোষী, কখনও দুই বা ততোধিক কোষও থাকে। প্রতি কোষে এক বা একাধিক নিউক্লিয়াস থাকতে পারে। স্পোর যৌন বা অযৌন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জন্মায়। হাইফা থেকে অযৌন প্রক্রিয়ায় যে সব স্পোর জন্মায় তাদের নিউক্লিয়াসে ক্রোমোজোমের কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু যৌন প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ দুটি বিপরীতধর্মী যৌনকোষের মিলনের মাধ্যমে যারা জন্মায় তাদের নিউক্লিয়াসে গুণগত পরিবর্তন ঘটতে পারে।

অনুকূল পরিবেশে ছত্রাক সাধারণতঃ **অযৌন** উপায়ে বংশবিস্তার করে। যৌন স্পোরের তুলনায় অযৌন স্পোর অনেক বেশী সংখ্যায় জন্মায় এবং সংক্রামক রোগ বিস্তারে এদের গুরুত্ব অনেক বেশী। ফাইকোমাইসিটিস (phycomycetes) শ্রেণীর বা নিম্নস্তরের ছত্রাকেরা অযৌন প্রক্রিয়ায় **স্পোর‍্যানজিয়ামের** (**sporangium**) মধ্যে স্পোর উৎপাদন করে (রেখাচিত্র ১ ক)। এই ধরণের স্পোরকে **'স্পোর‍্যানজিওস্পোর'** (sporangiospore) বলে। স্পোর‍্যানজিয়াম হাইফার অগ্রভাগে গড়ে ওঠে, সাধারণতঃ হাইফার থেকে চওড়া হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষ আকার নেয়। আর্দ্র পরিবেশে স্পোর‍্যানজিয়ামের শীর্ষদেশের ছিদ্র দিয়ে চলনশীল ফ্ল্যাজেলা (flagella) যুক্ত স্পোর অর্থাৎ **'জুস্পোর'**গুলি (zoospore) জলে বেরিয়ে আসে। ফ্ল্যাজেলা দুরকমের হয়, যথা 'হুইপল্যাশ' (whiplash) ও 'টিনসেল' (tinsel) প্রকৃতির (রেখাচিত্র-১ খ)। হুইপল্যাশ ফ্লাজেলার দীর্ঘতম গোড়ার অংশ সুদৃঢ় ও মাথার দিকের হ্রস্বতর অংশ নমনীয়। টিনসেল ফ্ল্যাজেলা অনেকটা পাখীর পালকের মত। শুষ্ক পরিবেশে জুস্পোর হয় না। ফ্ল্যাজেলাহীন স্পোর বা **'অ্যাপ্লানো-স্পোর'** (aplanospore) স্পোর‍্যানজিয়ামের দেওয়াল ভেঙ্গে বা ফেটে গেলে বাইরে বেরিয়ে হাওয়ার সাহায্যে ছড়িয়ে পড়ে (রেখাচিত্র-১ গ)। অনেক ছত্রাকে বিশেষ ধরণের হাইফা বা **'কনিডিওফোর'** (conidiophore)এর উপরে স্পোর তৈরী হয় যাদের বলা হয় **'কনিডিয়াম'** (conidium)। (রেখাচিত্র-১চ) একটি জায়গা থেকে একটি কনিডিয়াম বা পরপর অনেকগুলি কনিডিয়াম তৈরী হয়ে থাকে। অনেক সময় কনিডিওফোর এক বা একাধিকবার বিভক্ত হয়ে অনেক শাখাপ্রশাখার সৃষ্টি করে যেগুলির মাথায় কনিডিয়াম তৈরী হয়। কিছু ছত্রাকে হাইফার অগ্রভাগের বা মধ্য ভাগের একটি বা পরপর কয়েকটি কোষ

স্ফীত হয়ে পিপের আকার নেয়, সেখানে খাবার জমে এবং দেওয়াল মোটা হয়ে যায় ; এর ফলে **'ক্ল্যামিডোস্পোর'** (chlamydospore) উৎপন্ন হয়। এই ধরণের স্পোর প্রতিকূল অবস্থায় বেঁচে থাকে এবং অবস্থা অনুকূল হলেই নূতন মাইসীলিয়ামের সৃষ্টি করে।
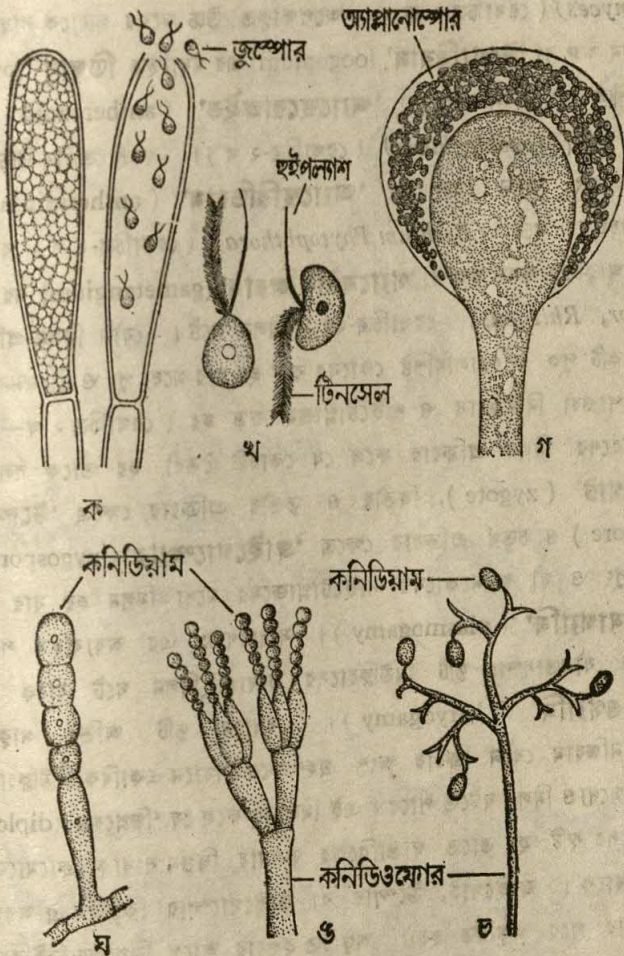
রেখাচিত্র—১ ছত্রাকের অযৌন জনন

(ক) জুস্পোর‍্যানজিয়াম—প্রথমটিতে জুস্পোর তৈরী হচ্ছে, দ্বিতীয়টিতে শীর্ষদেশের ছিদ্র দিয়ে জুস্পোর বেরিয়ে যাচ্ছে (খ) হুইপল্যাশ ও টিনসেল ফ্ল্যাজেলাযুক্ত জুস্পোর (গ) রাইজোপাসের স্পোর‍্যানজিয়ামের ভিতরে অ্যাপ্লানোস্পোর (ঘ) এরিসাইফির কনিডিওফোর ও কনিডিয়াম (ঙ) পেনিসিলিয়াম এর শাখাযুক্ত কনিডিওফোর ও কনিডিয়াম (চ) পেরোনোস্পোরার শাখাযুক্ত কনিডিওফোর ও কনিডিয়াম।

ডিউটেরোমাইসিটিস (Deuteromycetes) ছাড়া অন্য সব শ্রেণীর ছত্রাকই **যৌন** প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে থাকে। ফাইকোমাইসিটিস শ্রেণীর নিম্নস্তরের কিছু ছত্রাকে দুটি সন্তরণশীল যৌন জননকোষের বা **গ্যামেটের** (gamete) মিলনের মাধ্যমে যৌন জননক্রিয়া সম্পন্ন হয় *(Olpidium, Allomyces)* (রেখাচিত্র-২ ক)। অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্তরের ছত্রাকে সাধারণতঃ স্ত্রী জনন অঙ্গ বা **'উগোনিয়াম'** (oogonium) এর মধ্যস্থিত **ডিম্বাণু** (ovum) সন্তরণশীল পুং জননকোষ বা **'অ্যান্থেরোজইড'** (antherozoid) দ্বারা নিষিক্ত হয় *(Monoblepharis)* (রেখাচিত্র-২ খ)। একই শ্রেণীর উচ্চস্তরের ছত্রাকে পুং জনন অঙ্গ বা **'অ্যান্থেরিডিয়াম'** (antheridium) ও উগোনিয়ামের মধ্যে *(Pythium, Phytophthora)* (রেখাচিত্র-২ গ) বা দুটি অভিন্ন আকৃতির জনন অঙ্গ বা **'গ্যামেটানজিয়াম'** (gametangium) এর মধ্যে *(Mucor, Rhizopus)* (রেখাচিত্র-২ঘ) মিলন ঘটে। যৌন মিলন প্রক্রিয়ার ফলে একটি পুরু দেওয়ালবিশিষ্ট কোষের সৃষ্টি হয় যার মধ্যে পুং ও স্ত্রী জননকোষ থেকে পাওয়া নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম জড় হয় (রেখাচিত্র ২ খ—ঘ)। প্রথম ধরণের মিলন প্রক্রিয়ার ফলে যে কোষটি তৈরী হয় তাকে বলা হয় **'জাইগোট'** (zygote), দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে **'উস্পোর'** (oospore) ও চতুর্থ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে **'জাইগোস্পোর'** (zygospore)। প্রথমে পুং ও স্ত্রী জননকোষের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে মিলন হয় যার নাম **'প্লাজমোগ্যামি'** (plasmogamy)। সাধারণতঃ এর অব্যবহিত পরেই বিপরীত যৌনতাসম্পন্ন দুটি নিউক্লিয়াসের মধ্যেও মিলন ঘটে যাকে বলে **'ক্যারিওগ্যামি'** (karyogamy)। যেখানে দুটি অভিন্ন আকৃতির গ্যামেটানজিয়াম যৌন ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে সেখানে একাধিক নিউক্লিয়াসের জোড়ার মধ্যেও মিলন ঘটতে পারে। এই মিলনের ফলে যে 'ডিপ্লয়েড' (diploid) নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি হয় তাতে স্বাভাবিকের তুলনায় দ্বিগুন সংখ্যক ক্রোমোজোম (2N) থাকে। জাইগোট, উস্পোর বা জাইগোস্পোর কিছুদিন ঐ অবস্থায় থাকে, তার পরে অঙ্কুরিত হয়। অঙ্কুরিত হওয়ার আগে ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসে বিয়োজন বিভাজন বা 'মিয়োসিস' (meiosis) হয়, ফলে 'হ্যাপ্লয়েড' (haploid) নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি হয় যাতে স্বাভাবিক সংখ্যক ক্রোমোজোম (N) থাকে। নিম্নস্তরের ছত্রাকে জাইগোট অঙ্কুরিত হলে তার ভিতরে হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস-বিশিষ্ট জুস্পোর বা গ্যামেট উৎপন্ন হয়। উস্পোর অঙ্কুরিত হলে কোথাও জুস্পোর *(Albugo)* কোথাও বা হাইফার *(Saprolegnia, Pythium)* সৃষ্টি

হয়। কিছু ছত্রাকে এই হাইফার অগ্রভাগে স্পোর‍্যানজিয়াম তৈরী হয় যার ভিতরে অনেক জুস্পোরের সৃষ্টি হয় *(Phytophthora, Plasmopara)*। জাইগোস্পোর অঙ্কুরিত হয়ে একটি বিশেষ হাইফার সৃষ্টি করে যার অগ্রভাগে একটি স্পোর‍্যানজিয়াম গড়ে ওঠে। একে বলা হয় **জার্মস্পোর‍্যানজিয়াম** (germ sporangium)। এর ভিতরে অনেক 'অ্যাপ্লানোস্পোর' তৈরী হয়। অঙ্কুরিত

রেখাচিত্র—২ ছত্রাকের যৌন জনন (ফাইকোমাইসিটিস)
(ক) ওলপিডিয়ামের দুটি সন্তরণশীল গ্যামেটের মধ্যে মিলন (খ) মনোব্লেফারিস: অ্যান্থেরোজইড দ্বারা উগোনিয়ামের মধ্যেকার ডিম্বাণু নিষিক্তকরণ ও জাইগোট গঠন (গ) পিথিয়াম: পুরুষ ও স্ত্রী যৌনাঙ্গের অর্থাৎ অ্যান্থেরিডিয়াম ও উগোনিয়ামের মধ্যে মিলন ও উস্পোর গঠন (ঘ) মিউকর: দুটি একধরণের যৌনাঙ্গের—গ্যামেটানজিয়ামের মধ্যে মিলন ও জাইগোস্পোর গঠন

জাইগোট, উস্পোর বা জাইগোস্পোর থেকে যে স্পোর বা হাইফা পাওয়া যায় তাদের নিউক্লিয়াসে স্বাভাবিক সংখ্যক (N) ক্রোমোজোম থাকে।

অ্যাসকোমাইসিটিস (Ascomycetes) শ্রেণীভুক্ত নিম্নস্তরের ছত্রাকে যৌন-ক্রিয়ায় দুটি অভিন্ন আকৃতির যৌনাঙ্গের বা গ্যামেটানজিয়ামের মধ্যে মিলন ঘটে (রেখাচিত্র—৩ ক) ও ডিপ্লয়েড জাইগোট নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি হয় *(Schizo-saccharomyces)*। বিয়োজন বিভাজনের ফলে ঐ নিউক্লিয়াস থেকে চার বা সাধারণতঃ আটটি নিউক্লিয়াস উৎপন্ন হয়। প্রতিটি নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে **অ্যাসকোস্পোর** তৈরী হয় *(Dipodascus, Eremascus)*। উচ্চস্তরের ছত্রাকে সাধারণতঃ অসম আকৃতির পুং জনন অঙ্গ অ্যান্থেরিডিয়াম ও স্ত্রী জনন অঙ্গ বা **'অ্যাসকোগোনিয়াম'** (ascogonium) এর মধ্যে সরাসরি *(Erysiphe)* বা অ্যাসকোগোনিয়ামের বিশেষ অঙ্গ নলাকৃতি 'ট্রাইকোগাইন' এর (trichogyne) মাধ্যমে মিলন ঘটে *(Sphaerotheca, Pyronema)* (রেখাচিত্র—৩ খ)। অ্যান্থেরিডিয়াম থেকে সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস অ্যাসকোগোনিয়ামের মধ্যে চলে যায়। সেখানে প্লাজমোগ্যামি ঘটলেও তখনই ক্যারিওগ্যামি ঘটে না। নিষিক্ত অ্যাসকোগোনিয়াম থেকে অনেকগুলি বিশেষ ধরণের হাইফা বেরোয় যাদের প্রতিটি কোষে দুটি করে, একটি পুং ও একটি স্ত্রী জনন অঙ্গ থেকে আসা নিউক্লিয়াস থাকে। এদের **'অ্যাসকোজিনাস হাইফা'** (ascogenous hypha) ও দুটি বিপরীত যৌন প্রকৃতির নিউক্লিয়াসের যুগ্ম অবস্থাকে **'ডাইকেরিয়ন'** (dikaryon) বলা হয়। পরে প্রতিটি হাইফার শীর্ষদেশের কোষটি বড় হয়ে **'অ্যাসকাস'** (ascus) গঠন করে। অ্যাসকাসের মধ্যে দুটি নিউক্লিয়াসের মিলনে ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস তৈরী হয় ও পরে বিয়োজন বিভাজনের ফলে আটটি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি হয় যেগুলিকে কেন্দ্র করে আটটি অ্যাসকোস্পোর গড়ে ওঠে (রেখাচিত্র—৩ খ)।

ব্যাসিডিওমাইসিটিস (Basidiomycetes) শ্রেণীর ছত্রাকের কোন যৌন অঙ্গ থাকে না। যৌন জননে যাদের মধ্যে মিল (compatibility) রয়েছে এমন দুটি বিপরীত যৌন প্রকৃতির হাইফার দুটি কোষের মধ্যে মিলন হলে সেখানে ডাইকেরিয়নের সৃষ্টি হয়। ঐ কোষ থেকে অনেক নুতন হাইফার সৃষ্টি হয় যাদের প্রতিটি কোষে দুটি বিপরীত যৌন প্রকৃতির এক জোড়া নিউক্লিয়াস থাকে। ছত্রাকের এই অবস্থাকে বলা হয় **'ডাইকেরিওফেজ'** (dikoryophase) যার কিছুটা স্থায়িত্ব আছে। পরে প্রতিটি শাখার শীর্ষকোষটি বড় হয়ে **'ব্যাসিডিয়াম'** (basidium) গঠন করে (রেখাচিত্র—৩ গ)। সেখানে দুটি নিউক্লিয়াসের মিলনে ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি হয় ও পরে সেটি থেকে বিয়োজন বিভাজনের ফলে চারটি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস পাওয়া যায়। এদের প্রতিটিকে কেন্দ্র করে ব্যাসিডিয়ামের উপরে চারটি ব্যাসিডিওস্পোর (basidiospore) হয়।
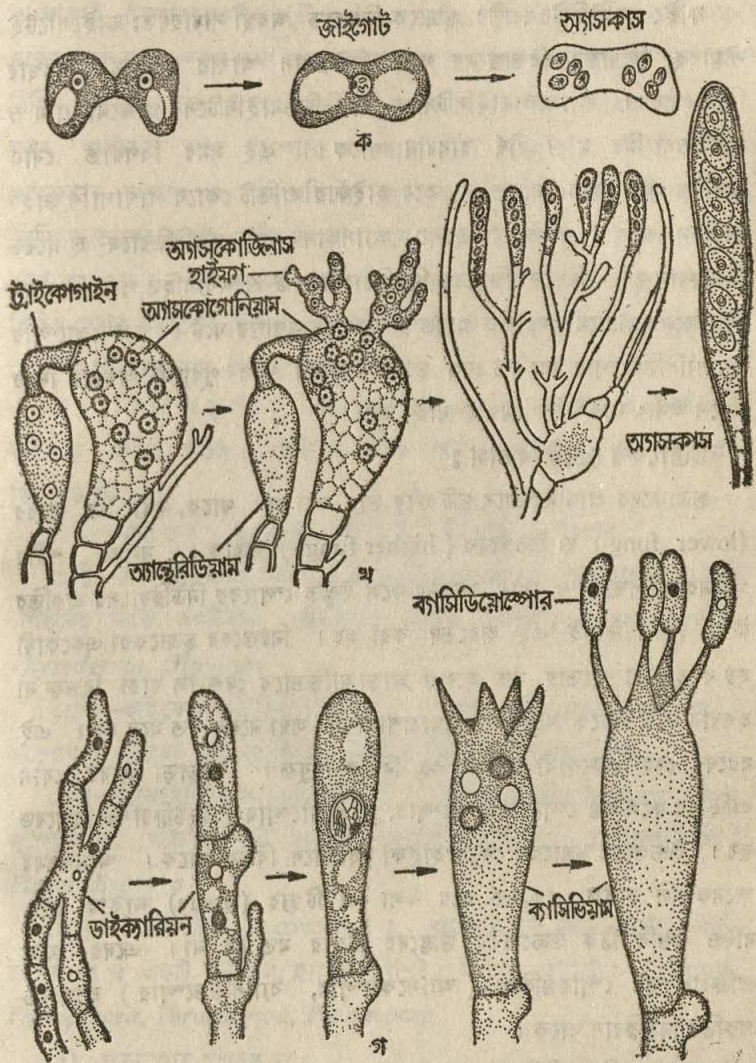
রেখাচিত্র—৩ ছত্রাকের যৌন জনন (অ্যাসকোমাইসিটিস ও ব্যাসিডিওমাইসিটিস)
(ক) সাইক্রোস্যাকারোমাইসেস : দুটি অভিন্ন আকৃতির যৌনাঙ্গের (গ্যামেটানজিয়াম) মিলন, জাইগোট ও অ্যাসকাস গঠন এবং অ্যাসকোস্পোর উৎপাদন (খ) পাইরোনিমা : দুটি অসম আকৃতির যৌনাঙ্গ অ্যান্থেরিডিয়াম ও অ্যাসকোগোনিয়ামের মধ্য মিলন, অ্যাসকোজিনাস হাইফা ও তার অগ্রভাগে অ্যাসকাস গঠন এবং অ্যাসকোস্পোর উৎপাদন (গ) কোষে একটি নিউক্লিয়াস-থাকে এমন দুটি হাইফার মিলনে ডাইক্যারিওটিক হাইফার উৎপত্তি ও শীর্ষকোষ থেকে ব্যাসিডিয়াম গঠন ও ব্যাসিডিওস্পোর উৎপাদন।

ফাইকোমাইসিটিস শ্রেণীর ছত্রাকে ডিপ্লয়েড অবস্থা সাধারণতঃ জাইগোটেই সীমাবদ্ধ, বিয়োজন বিভাজনের ফলে নিউক্লিয়াস আবার হ্যাপ্লয়েড অবস্থায় ফিরে আসে। অ্যাসকোমাইসিটিস ও ব্যাসিডিওমাইসিটিসে প্লাজমোগ্যামি ও ক্যারিওগ্যামির মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান থাকে। এই সময় বিপরীত যৌন প্রকৃতির নিউক্লিয়াস মিলিত না হয়ে হাইফার প্রতিটি কোষে পাশাপাশি ডাই-ক্যারিয়ন অবস্থায় থাকে। এরপর অ্যাসকাস বা ব্যাসিডিয়ামে হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস দুটির মিলনে ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি ও অব্যবহিত পরে বিয়োজন বিভাজনের মাধ্যমে পুনরায় হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াসে রূপান্তর ঘটে। অ্যাসকোস্পোর বা ব্যাসিডিওস্পোর অঙ্কুরিত হলে ছত্রাক আবার তার পুরানো অবস্থায় ফিরে আসে অর্থাৎ মাইসীলিয়ামের রূপধারণ করে।

ছত্রাকের শ্রেণীবিভাগ :

ছত্রাকদের প্রাথমিকভাবে দুটি স্তরে ভাগ করা হয়ে থাকে, যথা নিম্ন স্তরের (lower fungi) ও উচ্চস্তরের (higher fungi) ছত্রাক। মূলতঃ শরীর গঠনের জটিলতার ও যৌন জননের ফলে উদ্ভূত স্পোরের নিউক্লিয়াসের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করেই এই স্তরভেদ করা হয়। নিম্নস্তরের ছত্রাকেরা এককোষী হয় বা হাইফা সূতোর মত হলেও আড়াআড়িভাবে দেওয়াল দ্বারা বিভক্ত না হওয়ার ফলে এটিকে অনেকটা শাখাপ্রশাখাযুক্ত লম্বা নলের মত মনে হয়। এই ধরণের দেহ এককোষী হলেও বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত। তাছাড়া এদের যৌন প্রক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট স্পোরের (উস্পোর, জাইগোস্পোর) নিউক্লিয়াসটি ডিপ্লয়েড হয়। উচ্চস্তরের ছত্রাকের ক্ষেত্রে হাইফা বহুকোষে বিভক্ত থাকে। অনেকসময় অনেকগুলি হাইফা একত্রিত হয়ে কলা বা টিস্যুর (tissue) আকার নেয়, যদিও এগুলি ঠিক উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের টিস্যুর মত হয় না। এদের যৌন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট স্পোরগুলিতে (অ্যাসকোস্পোর, ব্যাসিডিওস্পোর) হ্যাপ্লয়েড-প্রকৃতির নিউক্লিয়াস থাকে।

আগেকার দিনে বিভিন্ন ধরণের ছত্রাককে সাধারণতঃ চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হত যথা (১) ফাইকোমাইসিটিস (Phycomycetes), (২) অ্যাসকোমাই-সিটিস (Ascomycetes), (৩) ব্যাসিডিওমাইসিটিস (Basidiomycetes) ও (৪) ডিউটেরোমাইসিটিস (Deuteromycetes)। এদের মধ্যে প্রথম তিনটি শ্রেণী স্বাভাবিক হলেও চতুর্থটি নয় কারণ এর মধ্যে শুধু সেই সব ছত্রাককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যাদের যৌন জনন হয় না বা সে সম্বন্ধে এখনও পরিষ্কার-ভাবে কিছু জানা নেই। সেজন্য এই শ্রেণীর ছত্রাককে অসম্পূর্ণ ছত্রাকগোষ্ঠী

বা ফাঙ্গাই ইমপারফেকটিও (Fungi imperfecti) বলা হয়। পরবর্তীকালে গবেষণালব্ধ নূতন নূতন তথ্য থেকে দেখা গেল যে ফাইকোমাইসিটিস শ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন ছত্রাকের মধ্যে দেহগঠনের দিক থেকে যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকলেও অযৌন জনন প্রক্রিয়ায় আর জুস্পোর ও গ্যামেটের প্রকৃতিতে, বিশেষ করে ফ্ল্যাজেলার সংখ্যায় ও গঠনবৈশিষ্ট্যে, এমন সুস্পষ্ট কিছু পার্থক্য রয়েছে যার ভিত্তিতে তাদের একই শ্রেণীভুক্ত না রেখে কয়েকটি আলাদা আলাদা শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এই ধারনা অনুযায়ী ছত্রাকের শ্রেণীবিভাগের মূল কাঠামো, বিভিন্ন শ্রেণীর ছত্রাকের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি এবং ঐ সব শ্রেণীভুক্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ রোগ উৎপাদকের নাম এখানে দেওয়া হল।

ক। নিম্নস্তরের ছত্রাক: দেহ এককোষী বা আড়াআড়ি দেওয়ালবিহীন হাইফার সমন্বয়ে গঠিত; যৌন প্রক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত স্পোরের নিউক্লিয়াস ডিপ্লয়েড প্রকৃতির

(১) জননকোষ (জুস্পোর, গ্যামেট, ইত্যাদি) স্বয়ংচল

শ্রেণী—কাইট্রিডিওমাইসিটিস, (Chytridiomycetes) : জুস্পোর ও গ্যামেট পিছনের দিকে একটিমাত্র হুইপল্যাশ ফ্ল্যাজেলাবিশিষ্ট: *Synchytrium, Physoderma, Olpidium*

শ্রেণী—হাইফোকাইট্রিডিওমাইসিটিস (Hyphochytridiomycetes) : জুস্পোর বা গ্যামেট সামনের দিকে একটিমাত্র টিনসেল ফ্ল্যাজেলাবিশিষ্ট

শ্রেণী—প্লাজমোডিওফোরোমাইসিটিস (Plasmodiophoromycetes): জুস্পোর বা গ্যামেট দুটি অসমান দৈর্ঘ্যের হুইপল্যাশ ফ্ল্যাজেলাবিশিষ্ট: *Plasmodisphora*

শ্রেণী—উমাইসিটিস (Oomycetes) : জুস্পোর দুটি সমান দৈর্ঘ্যের, একটি হুইপল্যাশ ও একটি টিনসেল, ফ্ল্যাজেলাবিশিষ্ট; নিশ্চল গ্যামেট : *Pythium, Phytopthora, Peronospora, Plasmopara*

(২) জননকোষ স্বয়ংচল নয়

শ্রেণী—জাইগোমাইসিটিস : দেহ শাখা-প্রশাখাসম্পন্ন হাইফার সমন্বয়ে গঠিত, কখনও বা একটি হ্রস্বাকার হাইফা; অ্যাপ্লানোস্পোর বা কনিডিয়ামের সাহায্যে অযৌন জনন : *Rhizopus*

শ্রেণী—ট্রাইকোমাইসিটিস (Trichomycetes): দেহ সূতার আকৃতির— আর্থ্রোপোড জাতীয় প্রাণীর অন্ত্রাশয়ের বা বহির্দেশের ত্বকে শাখাযুক্ত বা স্ফীত গোড়ার অংশ দিয়ে লেগে থাকে

খ। উচ্চস্তরের ছত্রাক : দেহ বহুকোষবিশিষ্ট, শাখা-প্রশাখা সম্পন্ন হাইফার সমন্বয়ে গঠিত

(১) যৌন জনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিশেষ ধরণের মাতৃকোষে স্পোর উৎপাদন

শ্রেণী—অ্যাসকোমাইসিটিস (Ascomycetes): অ্যাসকাসের ভিতরে নির্দিষ্ট সংখ্যায় অ্যাসকোস্পোর উৎপাদন : *Taphrina, Erysiphe, Sphaerotheca, Sclerotinia*

শ্রেণী—ব্যাসিডিওমাইসিটিস (Basidiomycetes) : ব্যাসিডিয়ামের গায়ে বাইরের দিকে নির্দিষ্ট সংখ্যায় ব্যাসিডিওস্পোর উৎপাদন :

Puccinia, Melampsora, Cronartium, Ustilago, Tilletia, Exobasidium

(২) যৌন জনন প্রক্রিয়া অজ্ঞাত ; অযৌন জনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বংশ বিস্তার

শ্রেণী—ডিউটেরোমাইসিটিস (Deuteromycetes) বা ফাঞ্জাই ইমপারফেকটি (Fungi Imperfecti) :

Alternaria, Helminthosporium, Fusarium Colletotrichum, Phoma, Macrophomina, Sclerotium, Rhizoctonia

ডিউটেরোমাইসিটিসকে একটি কৃত্রিম গোষ্ঠী বলে মনে করা হয় কারণ যৌন জনন ক্ষমতা নেই বা জানা নেই এমন ছত্রাকদেরই এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যদিও তাদের মধ্যে অন্য অনেক বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে। সেজন্য ডিউটেরোমাইসিটিসকে শুধু class (শ্রেণী) না বলে form class বলা হয়।

ব্যাকটিরিয়া

ব্যাকটিরিয়া অতি ক্ষুদ্র, অণুবীক্ষণের সাহায্য ছাড়া দেখা যায় না এরূপ এক ধরণের এককোষী জীবাণু। এদের সুসংগঠিত কোন নিউক্লিয়াস থাকে না বলে **'প্রোক্যারিয়োট'** (prokaryote) বলা হয়। অধিকাংশ ব্যাকটিরিয়াতে ক্লোরোফিল থাকে না। তবে অল্প কিছু ব্যাকটিরিয়া ব্যাকটিরিওক্লোরোফিল (bacteriochlorophyll) ও ব্যাকটিরিওভিরিডিন (bacterioviridin) ইত্যাদি রঞ্জকের সাহায্যে সালোকসংশ্লেষ করে থাকে বলে জানা যায়।

প্রায় ষোলশ'র মত ব্যাকটিরিয়া জানা আছে এবং অধিকাংশই মৃতজীবী। এরা জমিতে পড়ে থাকা মৃত প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহ এবং কলকারখানায় প্রস্তুত ও অন্যান্য নানাধরণের আবর্জনা পচিয়ে তাদের মূল উপাদানগুলি মাটিতে

ফিরিয়ে এনে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। পরজীবী ধরণের প্রায় দু'শ ব্যাকটিরিয়া গাছের রোগ সৃষ্টি করতে পারে বলে জানা গেছে। এরা সবাই কিন্তু মৃতজীবীর জীবনে অভ্যস্ত, ফলে আক্রান্ত গাছটি মরে গেলে বা যখন জমিতে ফসল থাকে না তখন এরা মৃতজীবীর জীবন যাপন করে অনায়াসেই মাটিতে টিকে থাকতে পারে। মানুষ ও পশুর বহুসংখ্যক রোগ ব্যাকটিরিয়া থেকে হয়। এদের মধ্যে কিছু রোগ অতি মারাত্মক।

ব্যাকটিরিয়া বিভিন্ন আকৃতির হতে পারে, যেমন দণ্ডাকার (rod বা bacillus), গোলাকার (sphere বা coccus), পেঁচানো (spirillum), কমার মত (vibrio), সুতার মত ইত্যাদি (রেখাচিত্র ৪ক)। অনেক ব্যাকটিরিয়া অতি সূক্ষ্ম, সুতার মত শুঙ্গ বা ফ্ল্যাজেলার (flagellum : pl. flagella) সাহায্যে তরল পদার্থের মধ্যে নড়াচড়া করতে পারে। ফ্ল্যাজেলার সংখ্যা ও কোষের দেওয়ালে কোথায় যুক্ত থাকে তার উপর ভিত্তি করলে নানারকম ব্যাকটিরিয়া দেখা যায় (রেখাচিত্র ৪খ)। খুব কম ব্যাকটিরিয়াই স্পোর উৎপাদন করতে সক্ষম। ব্যাকটিরিয়ার একটি বৈশিষ্ট্য হল দ্রুত কোষ বিভাজন। এই উপায়ে এরা অতি অল্প সময়ে বিপুল সংখ্যক কোষের সৃষ্টি করে ও অতি দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। রোগ উৎপাদক ব্যাকটিরিয়ার পক্ষে এটি একটি বড় সুবিধা। ব্যাকটিরিয়া সব রকম পরিবেশে পাওয়া গেলেও কিছু আছে যাদের পোষক গাছ সংলগ্ন মাটিতেই বেশী দেখা যায়। প্রায় সব ধরণের গাছকেই ব্যাকটিরিয়া আক্রমণ করতে পারে এবং পরিবেশ অনুকূল হলে যথেষ্ট ক্ষতিও করে। সাধারণতঃ উষ্ণ ও আর্দ্র পরিবেশেই ব্যাকটিরিয়াজনিত রোগের প্রকোপ বেশী হয়।

অঙ্গসংস্থান ঃ

গাছের রোগ উৎপাদক প্রায় সব ব্যাকটিরিয়াই দণ্ডাকৃতি। এদের দৈর্ঘ্য ১.০—৩.০ মাইক্রণ (micron = μ) ও ব্যাস ০.৪—০.৭ মাইক্রণ। স্ট্রেপ্টো-মাইসেস (*Streptomyces*) গণের (genus) ব্যাকটিরিয়ার কোষ দীর্ঘতর ও সূতাকৃতি হয় এবং শাখা-প্রশাখা বিস্তারের ফলে অনেকটা ছত্রাকের বহুকোষী হাইফার মত দেখায়,

ব্যাকটিরিয়ার সুদৃঢ় কোষ প্রাচীরের মধ্যে সজীব পদার্থ বা প্রোটোপ্লাজম থাকে। কোষ প্রাচীরের ঠিক নীচে প্রোটোপ্লাজমকে ঘিরে একটি সূক্ষ্ম পর্দা থাকে যার নাম প্লাজমা আবরণী। অধিকাংশ রোগ উৎপাদক ব্যাকটিরিয়ার কোষ প্রাচীরের বাইরের গায়ে একটি পিচ্ছিল পদার্থের আস্তরণ (slime layer)

থাকে (রেখাচিত্র—৪গ)। কোন কোন ব্যাকটিরিয়াতে এই আস্তরণ বেশ মোটা ও স্থায়ী ধরণের হয়। তখন একে ক্যাপসুল (capsule) বলে। কিছু ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রে এই আস্তরণের সঙ্গে রোগ উৎপাদন ক্ষমতার একটা সম্পর্ক
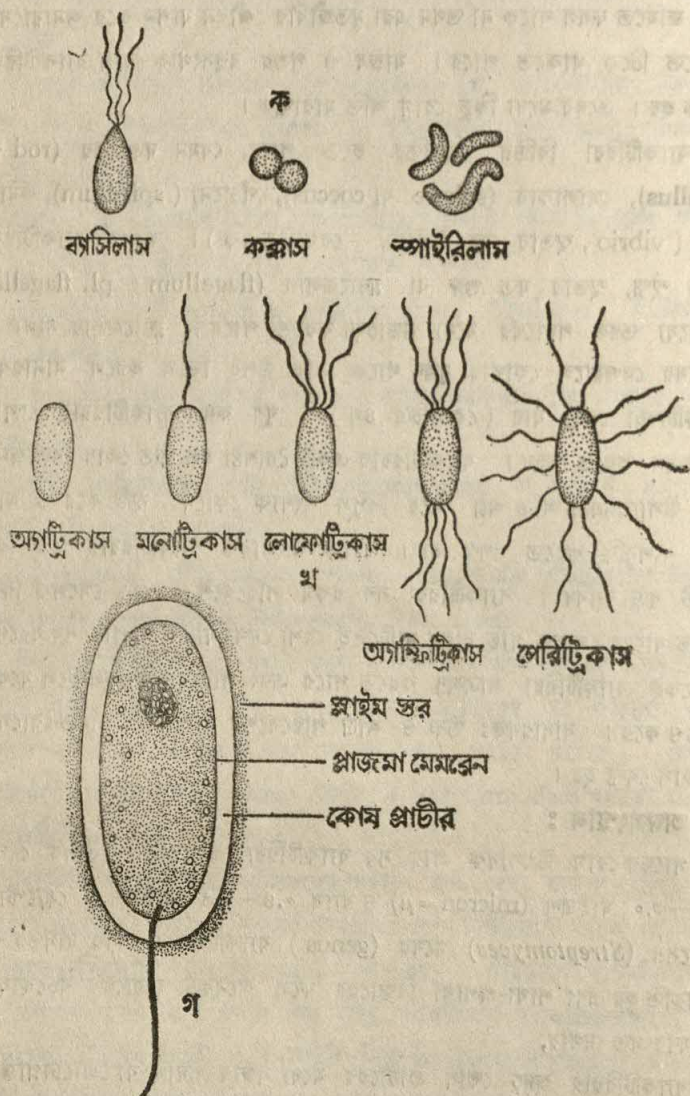
রেখাচিত্র—৪ ব্যাকটিরিয়ার গঠন

(ক) বিভিন্ন আকৃতির ব্যাকটিরিয়া **(খ)** ফ্ল্যাজেলার সংখ্যা ও অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের ব্যাকটিরিয়া **(গ)** একটি দণ্ডাকার ব্যাকটিরিয়া কোষ

আছে বলে মনে করা হয়। পরবর্তীকালে কিছু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ধরণের ব্যাকটিরিয়ার মত জীবাণুর খোঁজ পাওয়া গেছে যাদের আয়তন ৮০ থেকে ৮০০ মিলিমাইক্রণের মধ্যে এবং বাইরে শুধুমাত্র একটি আবরণী থাকে, সুদৃঢ় কোন কোষ প্রাচীর থাকে না। এদের বলা হয় মাইকোপ্লাজমা (mycoplasma)।

অধিকাংশ রোগ উৎপাদক ব্যাকটিরিয়ার দেহে কোষ প্রাচীর সংলগ্ন ফ্ল্যাজেলা দেখা যায় যার সাহায্যে ব্যাকটিরিয়া কিছুটা নড়াচড়া করতে পারে (রেখাচিত্র—৪খ)। ফ্ল্যাজেলার দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ কোষের দৈর্ঘ্যের থেকে বেশি হয়। কোন ব্যাকটিরিয়ার কোষের একপ্রান্তে একটি (monotrichous) বা একগুচ্ছ (lophotrichous), দুইপ্রান্তে এক গুচ্ছ করে (amphitrichous) অথবা সারা গায়ে অনেক ফ্ল্যাজেলা (peritrichous) থাকতে পারে, আবার কোন ফ্ল্যাজেলা না থাকতেও পারে (atrichous)। কোষে ফ্ল্যাজেলার সংখ্যা ও অবস্থান অনুযায়ী ব্যাকটিরিয়ার শ্রেণীবিভাগ করা যায়।

ব্যাকটিরিয়ার কোষে অন্যান্য উদ্ভিদের মত সুসংবদ্ধ কোন নিউক্লিয়াস থাকে না। স্বাভাবিক আবরণী এখানে অনুপস্থিত হওয়ায় নিউক্লিয়াসের উপাদানগুলি প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে কিছুটা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে। এই ধরণের নিউক্লিয়াসকে আদিম প্রকৃতির ধরা হয়।

কোষের ভিতরের অন্যান্য ক্ষুদ্র অঙ্গাণুগুলি (cell organelles) নিউক্লিয়াসের মতই আবরণহীন। তাছাড়া ব্যাকটিরিয়ার কোষের রাইবোজোমগুলি (ribosome) আয়তনে অন্যান্য উদ্ভিদকোষের রাইবোজোমের তুলনায় অনেক ছোট। এইসব কারণেই ব্যাকটিরিয়ার নিউক্লিয়াসকে অসম্পূর্ণ এবং আদিম বা অনুন্নত প্রকৃতির বলে মনে করা হয় ও ব্যাকটিরিয়াকে প্রোক্যোরিয়োট বলা হয়। ছত্রাকসহ অন্যান্য উদ্ভিদ, যাদের নিউক্লিয়াস ও অন্যান্য কোষীয় অঙ্গাণুর নিজস্ব আবরণী আছে ও রাইবোজোমের আয়তন বড়, **'ইউক্যারিয়োট'** (eukaryote) শ্রেণীর অন্তর্গত।

বংশবিস্তার :

স্ট্রেপ্টোমাইসেস গণের ব্যাকটিরিয়া বাদ দিলে সব রোগ উৎপাদক ব্যাকটিরিয়াই কেবলমাত্র কোষ বিভাজনের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে থাকে। একটি থেকে দুটি, দুটি থেকে চারটি এইভাবে সংখ্যাবৃদ্ধি হতে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'ফিশন' (fission বা binary fission)। পরিবেশ অনুকূল হলে প্রতি ২০ মিনিটে একবার কোষ বিভাজন হতে পারে। এই হারে একটি ব্যাকটিরিয়া কোষ থেকে ১০ ঘণ্টায় প্রায় ১০ লক্ষ এবং ২৪ ঘণ্টায় ৩০

হাজার কোটি নূতন কোষের সৃষ্টি হতে পারে। অবশ্য খাদ্য উপাদানের ক্রম-বর্দ্ধমান স্বল্পতা ও পরিবেশ দূষণের জন্য দ্রুতহারে বংশবৃদ্ধি একটানা বেশিক্ষণ চলতে পারে না। হার কমতে কমতে কোষ বিভাজন শেষ পর্যন্ত থেমে যায়। দ্রুত বংশবৃদ্ধির এই ক্ষমতা রোগ উৎপাদক ব্যাকটিরিয়ার উদ্বর্তন ও বিস্তারের পক্ষে বিশেষ সহায়ক।

অল্প কিছু ব্যাকটিরিয়ার বংশবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক রকমের যৌন প্রক্রিয়া ঘটতে দেখা যায় যাকে বলে 'কনজুগেশন' (conjugation)। এই প্রক্রিয়ায় মিলনের উপযোগী দুটি ব্যাকটিরিয়া পরস্পরের সংস্পর্শে আসে এবং শারীরিক যোগাযোগের মাধ্যমে দাতা কোষ থেকে বংশগতির বাহক ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিয়িক অ্যাসিড (deoxyribonucleic acid) বা ডি এন এর (DNA) কিছু অংশ গ্রহীতা কোষে স্থানান্তরিত হয়। এরপরে গ্রহীতা কোষটিতে যখন বিভাজন হয় তখন সৃষ্ট কোষ দুটিতে কিছু নূতন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায় যেগুলি দাতা কোষ (ব্যাকটিরিয়া) থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। এইভাবে ব্যাকটিরিয়ার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে কিছু পরিবর্তনের সূচনা হতে পারে। এছাড়াও অন্যান্য কিছু প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যাকটিরিয়ায় স্থায়ী-পরিবর্তন দেখা দিতে পারে; যেমন—'ট্রান্সফর্মেশন' (tranformation) ও 'ট্রান্সডাকশন' (transduction)। অষ্টম অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

ব্যাকটিরিয়া ও গাছের রোগ :

গাছের রোগ উৎপাদনকারী হিসাবে ছত্রাক ও ভাইরাসের তুলনায় ব্যাকটি-রিয়ার গুরুত্ব কম। কিন্তু অপেক্ষাকৃত উষ্ণ ও আর্দ্র পরিবেশে কিছু ব্যাকটিরিয়া খুব মারাত্মক রোগের সৃষ্টি করে থাকে এবং প্রচুর ক্ষতির কারণ হয়।

ব্যাকটিরিয়া সাধারণতঃ ক্ষত অথবা ত্বকের স্বাভাবিক ছিদ্রসমূহের মধ্য দিয়ে গাছের দেহে প্রবেশ করে, অক্ষত ত্বক ভেদ করে গাছের দেহে প্রবেশ করতে পারে না। প্রবেশের পর ব্যাকটিরিয়া ছত্রাকের মত সক্রিয়ভাবে কোষ থেকে কোষে ছড়ায় না, সাধারণতঃ সংলগ্ন কোষসমূহের মধ্যবর্তী অংশে (intercellular space) আশ্রয় নেয় ও সেখানে কোষ বিভাজনের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাকটিরিয়ার দেহনিঃসৃত এনজাইম বা টক্সিনের প্রভাবে সংলগ্ন অঞ্চলের কোষগুলি নষ্ট হয়ে গেলে ব্যাকটিরিয়া মৃত কোষগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে ব্যাকটিরিয়া গাছের জাইলেম নালিকার মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

বেশ কিছু রোগ উৎপাদনকারী ব্যাকটিরিয়া আক্রান্ত অঙ্গটিকে, কখনও বা

পুরো গাছটিকেই মেরে ফেলে দেয়। ব্যাকটিরিয়ার দেহনিঃসৃত এনজাইম বা টক্সিনের প্রভাবে এইরকম ঘটে থাকে। সাধারণতঃ ছোট চারায়, গাছের অপেক্ষাকৃত কচি অংশে, ফলে বা সবজীতে, অর্থাৎ যেখানে জলের পরিমাণ বেশী সেখানে, ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণে বেশী ক্ষতি হয়। কিছু ব্যাকটিরিয়া জাইলেম (xylem) নালিকার মধ্যে দিয়ে জলের উর্দ্ধমুখী প্রবাহে বড় রকমের বাধার সৃষ্টি করে। তখন পাতাগুলি জলের অভাবে প্রথমে নেতিয়ে পড়ে ও পরে শুকিয়ে যায়।

ব্যাকটিরিয়ার শ্রেণীবিভাগ :

বর্তমানকালে অধিকাংশ ব্যাকটিরিয়া বিশেষজ্ঞরা (bacteriologist) ব্যাকটিরিয়ার শ্রেণীবিন্যাসের যে পদ্ধতি অনুসরণ করেন সেটি বার্জি'র ম্যানুয়াল অফ ডিটারমিনেটিভ ব্যাকটিরিওলজির (Bergey's Manual of Determinative Bacteriology) অষ্টম সংস্করণে (১৯৭৪) দেওয়া হয়েছে। সমস্ত ব্যাকটিরিয়াই প্রোক্যারিয়োটির (Prokaryotae) অন্তর্ভুক্ত। তাদের দুটি প্রধান বিভাগে, যথা—সায়ানোব্যাকটিরিয়া (Cyanobacteria) ও দি ব্যাকটিরিয়া (The Bacteria), এবং দুটি ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠীতে, যথা 'রিকেটসিয়া' (Rickettsias) ও মাইকোপ্লাজমাতে (Mycoplasma) রাখা হয়েছে। সমস্ত ব্যাকটিরিয়াকে মোট উনিশটি গোষ্ঠীতে বা পার্টে (part) ভাগ করা হয়েছে। যে সব ব্যাকটিরিয়া আলো থেকে শক্তি সংগ্রহ করে (phototrophic) তারা সায়ানোব্যাকটিরিয়ার ও যারা রাসায়নিক পদার্থ জারিত করে শক্তি সংগ্রহ করে তারা দি ব্যাকটিরিয়ার অন্তর্গত। সায়ানোব্যাকটিরিয়াকে পার্ট এক (Part 1), দি ব্যাকটিরিয়াকে পার্ট দুই থেকে সতের (Part 2-17), রিকেটসিয়াকে পার্ট আঠার (Part 18) ও মাইকোপ্লাজমাকে পার্ট উনিশে (Part 19) রাখা হয়েছে। এদের মধ্যে অল্প কিছু ব্যাকটিরিয়া মাত্র গাছে রোগ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে। তারা পার্ট ৭, ৮, ১৭, ১৮ ও ১৯ এর অন্তর্গত। রোগ উৎপাদনকারী ব্যাকটিরিয়ার শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা নিচে দেওয়া হল।

প্রোক্যারিয়োটি (Prokaryotae)

বিভাগ : সায়ানোব্যাকটিরিয়া (Cyanobacteria)

বিভাগ : দি ব্যাকটিরিয়া (The Bacteria)

পার্ট ৭ (Part 7)

গোত্র : সিউডোমোনাডেসি (Pseudomonadaceae)

সিউডোমোনাস (*Pseudomonas*)

জ্যান্থোমোনাস (*Xanthomonas*)

গোত্র : রাইজোবিয়েসি (Rhizobiaceae)
অ্যাগ্রোব্যাকটিরিয়াম (*Agrobacterium*)

পার্ট ৮ (Part 8)

গোত্র : এণ্টেরোব্যাকটিরিয়েসি (Enterobacteriaceae)
এরউইনিয়া (*Erwinia*)

পার্ট ১৭ (Part 17)

কোরাইনিব্যাকটিরিয়াম (*Corynebacterium*)

গোত্র : ষ্ট্রেপ্টোমাইসিটেসি (Streptomycetaceae)
ষ্ট্রেপ্টোমাইসেস (*Streptomyces*)

পার্ট ১৮ (Part 18)

গোত্র : রিকেটসিয়েসি (Rickettsiaceae)
রিকেটসিয়া (*Rickettsia*)

গোত্র : ক্ল্যামিডিয়েসি (Chlamydiaceae)
ক্ল্যামিডিয়া (*Chlamydia*)

পার্ট ১৯ (Part 19)

গোত্র : মাইকোপ্লাজমাটেসি (Mycoplasmataceae)
মাইকোপ্লাজমা (*Mycoplasma*)
স্পাইরোপ্লাজমা (*Spiroplasma*)

নিমাটোড

প্রাণী জগতের মধ্যে একমাত্র নিমাটোড ধরণের সুঁতাকৃমিরাই (eelworm) গাছের দেহে পরজীবীর জীবন যাপন করে রোগের সৃষ্টি করতে পারে। চেহারায় সাধারণ কৃমির মত হলেও শ্রেণীগতভাবে তাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। নিমাটোডকে প্রায় সব পরিবেশেই পাওয়া গেছে। কয়েক হাজার নিমাটোড প্রজাতির অধিকাংশই মিষ্টি বা নোনা জলে অথবা মাটিতে নানারকম পচনশীল জৈব পদার্থ থেকে খাবার সংগ্রহ করে বা খুব ছোট প্রাণী অথবা উদ্ভিদ খেয়ে বেঁচে থাকে। এদের একটি ছোট অংশ, প্রায় পাঁচশ'র মত প্রজাতি, বিভিন্ন ধরণের গাছকে আক্রমণ করে ও নানারকম রোগের সৃষ্টি করে। অনেক নিমাটোড প্রাণীদেহেও রোগের সৃষ্টি করে থাকে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গাছের রোগ উৎপাদক প্রাণী হিসেবে নিমাটোড বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি পায়। নিমাটোডের আক্রমণে ফসলের যে প্রচুর ক্ষতি হতে পারে এ তথ্য প্রথম জানা যায় চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি। রোগ উৎপাদনকারী নিমাটোড গাছের

দেহ থেকে রস শোষণ করে তার খাদ্যের প্রয়োজন মেটায় ও বেঁচে থাকে। এদের বাধ্যতামূলকভাবে পরজীবী বলা যায়। কোন কোন নিমাটোড অবশ্য মৃত গাছের দেহ থেকেও খাদ্য সংগ্রহ করে বেঁচে থাকতে পারে।

অঙ্গসংস্থান :

গাছের রোগ উৎপাদক নিমাটোড নিমাটা (Nemata) পর্বের অন্তর্গত এক ধরণের লম্বা, বেলনাকার, স্বচ্ছ বা আংশিকভাবে স্বচ্ছ, মসৃণ দেহবিশিষ্ট, অমেরুদণ্ডী অতি ক্ষুদ্র প্রাণী। এদের দৈর্ঘ্য ৩০০—৩০০০ মাইক্রণ ও ব্যাস বা প্রস্থ ১৫—৫০ মাইক্রণ। রোগ উৎপাদক নিমাটোডের দৈর্ঘ্য ৩০০—১০০০ ও প্রস্থ ১৫—৩০ মাইক্রণের মধ্যে হয়। অধিকাংশই খুব ছোট যাদের অণুবীক্ষণের সাহায্য ছাড়া ভালভাবে দেখা যায় না। এদের মাথা ও লেজের অংশ অপেক্ষাকৃত সরু (রেখাচিত্র ৫ক)। সাধারণতঃ পুরুষ ও স্ত্রী নিমাটোডের আকৃতিতে কোন পার্থক্য থাকে না। কিন্তু কিছু প্রজাতির ক্ষেত্রে পরিণত বয়সে স্ত্রী নিমাটোডের দেহের মধ্যভাগ স্ফীত হয়ে ওঠে। উদ্ভিদের উপর পরজীবী যে সব নিমাটোড তাদের মাথার দিকে, মুখের ভিতরে, ফাঁপা, হাইপোডার্মিক সূচের (hypodermic needle) আকৃতির একটি বিশেষ অঙ্গ থাকে যাকে বলা হয় **স্টাইলেট** (stylet) (রেখাচিত্র ৫খ)। প্রয়োজনের সময় স্টাইলেট মুখের বাইরে বেরিয়ে আসে। এই স্টাইলেটের সাহায্যেই নিমাটোড গাছের ত্বক ভেদ করে ও দেহকোষ থেকে রস শোষণ করে। অন্যান্য নিমাটোডের অনুরূপ স্টাইলেট থাকে না। আকারে অতি ক্ষুদ্র হলেও নিমাটোডের দেহ সংগঠন বেশ জটিল এবং পরিপাকতন্ত্র, রেচনতন্ত্র, সংবেদনতন্ত্র ও প্রজননতন্ত্র ইত্যাদি আছে। কিন্তু নিমাটোডের কোন সংবহনতন্ত্র বা শ্বসনতন্ত্র নেই; দেহ গহ্বরস্থিত তরল পদার্থের মাধ্যমে সংবহন ও শ্বসনের কাজ চলে।

বংশবিস্তার :

নিমাটোডের প্রজননতন্ত্র উন্নত ধরণের। সাধারণতঃ যৌন মিলনের ফলে স্ত্রী নিমাটোডের ডিম্বাশয়ে ডিম পুরুষ নিমাটোডের শুক্রকীট দ্বারা নিষিক্ত হয়। অনেক প্রজাতির কোন পুরুষ থাকে না, সেখানে ডিম অপুংজাতভাবে (parthenogenetically) বাড়তে থাকে। কিছু নিমাটোড উভলিঙ্গ প্রকৃতিরও হতে পারে অর্থাৎ সেখানে একই দেহে পুরুষ ও স্ত্রী যৌনাঙ্গ বর্তমান। নিমাটোডের জীবনধারার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে জীবনচক্র ছয়টি পর্যায়ে বিভক্ত; যথা—ডিম—শূককীট দশা ১ (larval stage)—দশা ২—দশা ৩—দশা ৪— পরিণত নিমাটোড। দেখা গেছে যে ডিম ফুটবার

জন্ম উপযুক্ত পোষক গাছের শিকড় নিঃসৃত রসের প্রয়োজন হয়। একে বলা হয় ডিম ফোটানর জন্যে প্রয়োজনীয় উপাদান (hatching factor)। পরিবেশে প্রয়োজনীয় পোষক গাছ না থাকলে ডিম ফোটার অসুবিধা হয়। বাচ্চা নিমাটোড কিন্তু ডিমের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় অনেকদিন বেঁচে থাকতে পারে। ডিমের মধ্যে প্রথম এবং পরে প্রতিটি শূককীট দশার শেষে বাচ্চা নিমাটোড খোলস ছাড়ে যাকে বলা হয় 'মোল্ট' (molt)। রোগ উৎপাদক নিমাটোডের জীবনচক্রের ছয়টি পর্যায় শেষ হতে সময় লাগে ২০—৪০ দিন।
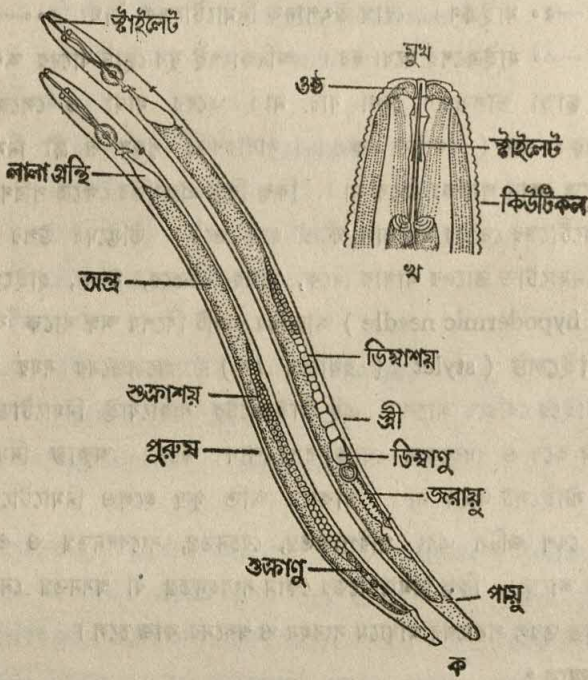
রেখাচিত্র—৫ গাছের রোগ উৎপাদনকারী নিমাটোডের দেহগঠন

(ক) স্ত্রী ও পুরুষ নিমাটোডের দেহের গঠন (খ) নিমাটোডের মাথার অংশ (পাশ থেকে)

উদ্বর্তন ও বিস্তার :

অধিকাংশ রোগ উৎপাদক নিমাটোড তাদের জীবনের কিছুটা অংশ মাটিতে কাটায়। তারা গাছের শিকড় বা কাণ্ডের যে অংশ মাটির নীচে থাকে তার থেকে রস শোষণ করে। গাছের কিছু ক্ষতি করলেও এদের ঠিক পরজীবী বলা যায় না। জমির উপরের স্তরে, ১৫ সেন্টিমিটার গভীরতা পর্যন্ত, নিমাটোড বেশি সংখ্যায় দেখা যায়। অবশ্য এ ব্যাপারে বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে এবং এই পার্থক্য নির্ভর করে তাদের পোষক গাছের অবস্থানের

উপর। চাষের জমির সর্বত্র নিমাটোড সমান সংখ্যায় থাকে না ; উপযুক্ত পোষক গাছের শিকড়ের চারিধারেই তাদের বেশি সংখ্যায় পাওয়া যায়। শিকড় নিঃসৃত রসে নানারকম উপাদান থাকে যা শুধু নিমাটোডের খাদ্য জোগায় না ডিম ফুটতেও সাহায্য করে। অনেক প্রজাতির ক্ষেত্রে প্রথম বা দ্বিতীয় শূককীট দশায় নিমাটোডের গাছকে আক্রমণ করার ক্ষমতা থাকে না। শূককীট বা পরিণত অবস্থায় নিমাটোড যখন গাছকে আক্রমণ করার ক্ষমতা লাভ করে তখন সংবেদনশীল গাছের সংস্পর্শে না এলে খাদ্যের অভাবে তাদের মৃত্যু ঘটে।

স্ত্রী নিমাটোডের দেহের মধ্যভাগ স্ফীত হয়ে ওঠে, বহিঃত্বক পুরু ও শক্ত হয় এবং ডিমগুলি ঐ শক্ত আবরণযুক্ত দেহের ভিতরে থাকে। এই রকম শক্ত আবরণযুক্ত ডিম ভর্তি দেহকে বলে সিস্ট (cyst)। ডিমগুলি সিস্টের মধ্যে থাকার ফলে প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাব থেকে রক্ষা পায় এবং এই কারণে জমিতে বহুদিন জীবন্ত অবস্থায় থেকে যেতে পারে। ডিমের মধ্যেও শূককীট অনেক সময় সুপ্ত (dormant) অবস্থায় বহুদিন বেঁচে থাকে।

নিমাটোডের চলন ক্ষমতা থাকলেও জমিতে তাদের চলার গতি খুবই শ্লথ। হয়ত এক মরশুমে একটি নিমাটোড মাত্র কয়েক ফুট যেতে পারে। এই গতি মাটির কণার আয়তন, জমির আর্দ্রতা ও নিমাটোডের দেহের ব্যাস ও কর্মতৎপরতার উপর নির্ভর করে। নিমাটোড সেচের বা বৃষ্টির জলের সঙ্গেও ছড়াতে পারে, এমনকি গাছের ভিজে কাণ্ডের গা বেয়ে উপরে ওঠে এরকমও দেখা গেছে। আক্রান্ত গাছ থেকে স্পর্শের মাধ্যমেও পার্শ্ববর্তী গাছগুলিতে নিমাটোড ছড়িয়ে পড়তে পারে।

নিমাটোড ও গাছের রোগ :

পরিণত অবস্থায়, এমনকি শূককীট দশাতেও নিমাটোড গাছকে আক্রমণ করে। গাছের সংস্পর্শে এলে নিমাটোড মুখের ভিতরের স্টাইলেটটি বের করে সূচের মত দেহত্বক ভেদ করে ত্বকের নীচের প্যারেনকাইমা কোষের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় এবং ঐ স্টাইলেটেরই মাধ্যমে কোষ থেকে রস শোষণ করে খেতে থাকে। কিছু নিমাটোড গাছের দেহের বাইরে থেকেই রস শোষণ করে থাকে, যেমন—জিফিনেমা *(Xiphinema)*, ট্রাইকোডোরাস *(Trichodorus)*, ও ডাইটিলেঙ্কাস *(Ditylenchus)*। এদের বহিঃপরজীবী (ectoparsite) বলা হয়। অন্যরা দেহের ভিতরে ঢুকে রস শোষণ করে। তারা অন্তঃপরজীবী (endopoarasite)। উদাহরণ মেলয়ডোগাইন *(Meloidogyne)* ও হেটেরোডেরা *(Heterodera)*। এ ছাড়া এমনও দেখা যায় যে পূর্ণতাপ্রাপ্ত

স্ত্রী নিমাটোডের কেবলমাত্র মাথা ও গলার অংশ গাছের দেহে প্রবেশ করে আর শরীরের বাকী অংশ বাইরে থাকে, যেমন—রোটিলেঙ্কিউলাস *(Rotylenchulus* sp*)* ও টিলেঙ্কিউলাস *(Tylenchulus* sp*)*। যে সব নিমাটোড খুব তাড়াতাড়ি খায় তারা আক্রমণের কিছুক্ষণের মধ্যেই স্টাইলেট বের করে নিয়ে আবার নূতন জায়গায় আক্রমণ করে। যারা ধীরগতিতে খাদ্য সংগ্রহ করে, তারা কোথাও আক্রমণ করলে সেখানে কয়েকঘণ্টা থেকে কয়েকদিন পর্যন্ত, এমনকি সারা জীবনও থাকতে পারে। যে সব নিমাটোড দেহের ভিতরে ঢুকে খাদ্য সংগ্রহ করে তাদের মধ্যে কিছু প্রথম আক্রমণের জায়গা থেকে নড়ে না, কিন্তু অন্যরা দেহের প্যারেনকাইমা কোষগুলির মধ্যে ঘুরে বেড়ায় ও নূতন নূতন কোষ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। এদের প্রধানতঃ শিকড়েই দেখা যায়।

খাদ্য শোষণ করার সময় স্টাইলেটের মধ্য দিয়ে নিমাটোডের মুখনিঃসৃত লালা আক্রান্ত কোষের মধ্যে প্রবেশ করে। প্রথমে নিমাটোড কোষের মধ্যে লালা ঢুকিয়ে দেয়, পরে কোষ থেকে লালাযুক্ত রস শোষণ করে নেয়। এই লালা শুধু যে নিমাটোডকে কোষ প্রাচীর ভেদ করতে সাহায্য করে তাই নয়, কোষমধ্যস্থ বিভিন্ন পদার্থকে জারিত ও তরল করে রস শোষণের কাজও সহজ করে দেয়। লালাতে যে এনজাইম রয়েছে তার প্রভাবে আক্রান্ত অংশের কোষগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। এইভাবে বা লালাস্থিত বিষাক্ত পদার্থের প্রভাবে কখনও বা কোষগুলি নষ্ট হয়ে যায়। এ'ছাড়া নিমাটোডের প্রভাবে আক্রান্ত অংশে কোষ বিভাজনের গতি স্বাভাবিকের তুলনায় কম বা বেশি হলে সেখানে বৃদ্ধিজনিত বিকৃতি ঘটতে পারে।

নিমাটোডের আক্রমণ হলে গাছে বিভিন্ন ধরণের রোগ লক্ষণ দেখা যায়। নিমাটোড গাছের কোষ থেকে রস শোষণ করে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে। সেজন্য সাধারণতঃ গাছের আক্রান্ত অংশে খাদ্যের ঘাটতিজনিত পুষ্টিহীনতার লক্ষণ ফুটে ওঠে। নিমাটোড সাধারণতঃ গাছের শিকড়কে আক্রমণ করে। আক্রান্ত অংশের কোষগুলি নষ্ট হয়ে গেলে শিকড় আংশিকভাবে পচে যায়। কখনও কোষের দ্রুত বিভাজন ও অতিবৃদ্ধির ফলে শিকড়ের আক্রান্ত অংশটি স্ফীত হয়ে ফুলে উঠলে গিঁটের মত দেখায়। শিকড়ে পর পর এরকম অনেকগুলি গিঁটের মত বা অর্বুদ (gall) হতে পারে। পচন বা স্ফীতি যাই হোক না কেন তার ফলে শিকড়ের মাটি থেকে জল ও খাদ্যদ্রব্য আহরণের ও জল সরবরাহের ক্ষমতা কমে যায়, ফলে গাছের উপরের অংশ পর্যাপ্ত পরিমাণে জল ও খাদ্য উপাদান পায় না এবং সেখানে তখন রুগ্নতার ছাপ ফুটে ওঠে। গাছ

স্বাভাবিকভাবে বাড়ে না, পাতায় হলদে ছোপ দেখা যায়। দেখলে মনে হয় গাছ পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। কখনও বা পাতা নেতিয়ে পড়ে। এই সব গাছে ফলনও খুব কম হয়। অনেক সময় আক্রান্ত শিকড়টি থেকে প্রচুর শাখা বেরোতে দেখা যায়। যখন নিমাটোড কাণ্ড, পাতা বা ফুলের শিষ আক্রমণ করে তখন সেই সব অংশেও পচন বা ফুলে ওঠার লক্ষণ দেখা যায়। যেখানে নিমাটোড ফুলের শিষ আক্রমণ করে, সেখানে আক্রান্ত শিষটি স্বাভাবিকভাবে বাড়তে পারে না, কখনও ফুলে ওঠে এবং এর ভিতরে অনেকসময় বীজের বদলে নিমাটোড পাওয়া যায়।

নিমাটোড যে শুধু বিভিন্ন ধরণের গাছে রোগের সৃষ্টি করে তাই নয়, গাছের ত্বকে ক্ষতের সৃষ্টি করে জমিতে থাকা অনেক ছত্রাক, ব্যাকটিরিয়া ও ভাইরাস জাতীয় রোগ উৎপাদকের গাছের দেহে প্রবেশের পথও সুগম করে দেয়। অনেক সময় এমনও দেখা গেছে যে নিমাটোডের আক্রমণের ফলে ঐ সব রোগ উৎপাদনের বিরুদ্ধে গাছের নিজস্ব প্রতিরোধক্ষমতাও কমে যায়। মাটিতে পাওয়া যায় এ'রকম কিছু ভাইরাস নিমাটোড বাহকের মাধ্যমে জমির এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয়। নিমাটোড ২-৪ মাস পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে ভাইরাস বহন করতে পারে।

উইল্ট রোগ উৎপাদক ছত্রাক ফিউজেরিয়াম অক্সিস্পোরামের (***Fusaruim oxysporum***) ক্ষেত্রে জমিতে থাকা নিমাটোডের সংখ্যার সঙ্গে রোগের তীব্রতার একটা সম্পর্ক আছে বলে অনেকে অনুমান করেছেন। সাধারণতঃ দেখা যায় যে জমিতে নিমাটোডের সংখ্যা বেশী হলে উইল্ট রোগের আক্রমণ তীব্রতর হয়, ক্ষতিও অনেক বেশী হয়। ভার্টিসিলিয়াম জনিত (***Verticillium spp.***) উইল্ট, পিথিয়াম (***Pythium spp***) জনিত চারা ধসা বা ড্যাম্পিং অফ (***Damping off***)- এবং রাইজোকটোনিয়া (***Rhizoctonia spp***) ও ফাইটফথোরা (***Phytophthora spp.***) জনিত শিকড় পচা রোগের ক্ষেত্রেও এই ধরণের তথ্য রয়েছে।

নিমাটোডের শ্রেণাবিভাগ :

গাছে রোগসৃষ্টিতে সক্ষম সব নিমাটোডই পর্ব (Phylum) নিমাটা'র (Nemata) অন্তর্গত (B.G. Chitwood and M. B. Chitwood. 1933)। এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ রোগ উৎপাদক যারা তাদের অধিকাংশই সেসেরনেন্টি (Secerentea) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। অপর শ্রেণী অ্যাডেনোফোরি (Adenophorea) তে অল্প কয়েকটি রোগ উৎপাদক নিমাটোড রয়েছে। রোগ উৎপাদক নিমাটোডের শ্রেণীবন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ নিমাটোডের নাম নীচে দেওয়া হল।

শ্রেণী : সেসেরনেন্টি (Secernentea = Phasmidia)

বর্গ : টাইলেঙ্কিডা (Tylenchida)

গোত্র : টাইলেঙ্কিডী (Tylenchidae)

অ্যাঙ্গুইনা (*Anguina*), ডাইটিলেঙ্কাস (***Ditylenchus***)

গোত্র : হেটেরোডেরিডী (Heteroderidae)

হেটেরোডেরা (***Heterodera***), মেলয়ডোগাইন (***Meloidogyne***)

গোত্র : হ্যাপ্লোএইমিডী (Haploaimidae)

প্র্যাটিলেঙ্কাস (***Pratylenchus***), ডলিকোডোরাস (***Dolichodorus***)

শ্রেণী : অ্যাডেনোফোরি (Adenophorea = Aphasmidia)

বর্গ : ডোরিল্যামিডিয়া (Dorylamidia)

গোত্র : টাইলেঙ্কোলেইমিডী (Tylencholaimidae)

লঙ্গিডোরাস (***Longidorus***), জিফিনেমা (***Xiphinema***)

গোত্র : ট্রাইকোডোরিডী (Trichodoridae)

ট্রাইকোডোরাস (***Trichodorus***)

(ঘ) অপ্রধান পরজীবী

ছত্রাক, ব্যাকটিরিয়া ও নিমাটোড ছাড়া আরও কিছু পরজীবী আছে যারা গাছে রোগের সৃষ্টি করতে পারে। এমন অনেক সপুষ্পক গাছ আছে যারা অন্য গাছের উপর পরজীবী হয়ে বেঁচে থাকে। এদেরও পোষক গাছের মত ফুল ও বীজ হয়। এদের মধ্যে কিছু হল আধা পরজীবী, যাদের সবুজ কণা, ক্লোরোফিল, আছে এবং যারা শুধুমাত্র জল ও কিছু বিশেষ খাদ্য উপাদানের (খনিজ লবণ) জন্য গাছের উপর নির্ভরশীল। বিশেষ ধরণের শিকড়ের সাহায্যে এরা পোষক গাছ থেকে এগুলি সংগ্রহ করে এবং এর ফলে অনেক সময়ে পোষক গাছের উপর দিকের অংশ জল ও খাদ্যদ্রব্যের অভাবে রুগ্ন হয়ে পড়ে—কখনও বা মরেও যায়। ফোরাডেনড্রন (***Phoradendron***), স্ট্রাইগা (***Striga***) প্রভৃতি প্রজাতির গাছ এই ধরণের পরজীবী। অন্য কিছু গাছ আছে যাদের শিকড় হয়না এবং ক্লোরোফিল থাকে না। এরা সর্বাংশে পোষক গাছের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় এদের বাধ্যতামূলকভাবে পরজীবী বলা হয়। এরা পোষক গাছের

দেহে তাদের বিশেষ ধরণের শিকড় বা 'হস্টোরিয়াম' (haustorium: pl. haustoria) ঢুকিয়ে দিয়ে তারই সাহায্যে জল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে। অনুকূল পরিবেশে যখন পরজীবী পোষক গাছের উপর বেশ ছড়িয়ে পড়ে ও চারিদিক থেকে জল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য শোষণ করতে থাকে তখন পোষক গাছটি ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে, অনেক সময় মরেও যায়। কাসকিউটা (*Cuscuta*) অরোব্যাঙ্কি (*Orobanche*) প্রভৃতি এই শ্রেণীর পরজীবী গাছে নানা রকম রোগের সৃষ্টি করে থাকে।

এই রকম রোগ থেকে কখনও কখনও পেঁয়াজ, তিসি, বীট, সরিষা প্রভৃতি ফসলের বেশ ক্ষতি হতে দেখা গেছে। গ্রীষ্মমণ্ডলের কোন কোন অঞ্চলের গভীর জঙ্গলে অনেক বড় গাছও এই ধরণের পরজীবীর আক্রমণে রোগগ্রস্ত হয়, এমনকি মরেও যায়। তার ফলে বনসম্পদের প্রচুর ক্ষতি হয়।

এরকম বিরল নজীরও আছে যে ক্লোরোফিলযুক্ত নিম্নস্তরের উদ্ভিদ সেফালিউরস (*Cephaleuros spp.*) নামক কিছু অ্যালগা (algae) চা, কফি, কোকো, লেবু, আম, সিঙ্কোনা, রাবার ইত্যাদি গাছের দেহে পরজীবী হিসেবে বাস করতে পারে এবং কখনও বা রোগের সৃষ্টি করে। এদের মধ্যে চা গাছের রেড রাস্ট (red rust) রোগ উৎপাদক অ্যালগা সেফালিউরস প্যারাসিটিকাস (*Cephpaleuros parasiticus*) ও সেফালিউরস ভাইরেসেন্স (*C. virescens*) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সময় বিশেষে এই সব অ্যালগা চা ও অন্যান্য গাছের বেশ ক্ষতি করে থাকে।

প্রাসঙ্গিক পুস্তক সমূহ

Alexopoulos, C.J., and C. W. Mims. 1979. Introductory Mycology, 3rd edition. J. Wiley & Sons, New York.

Buchanan, R.E., and N. E. Gibbons (eds.). 1974. Bergey's Manual of Determinative Bacteriology, 8th edition. Williams & Wilkins Co., Baltimore.

Burnett, J. H. 1976. Fundamentals of Mycology, 2nd edition. Edward Arnold, London.

Deacon, J. W. 1980. Introduction to Modern Mycology. Blackwell Scientific Publications, Oxford.

Jenkins, W. R., and D. P. Taylor, 1967. Plant Nematology. Van Nostrand—Reinhold, New York.

Stapp, C. 1961. Bacterial Plant Pathogens. Oxford University Press, London.

Wallace, 1973. Nematode ecology and plant disease. Arnold, London.

Webster, J. 1979. Introduction to Fungi. University Press, Cambridge.

———

COMPLIMENTARY

৭ | গাছের রোগ উৎপাদক ভাইরাস

ভাইরাস থেকে যে গাছের রোগ হতে পারে এই তথ্য প্রথম সুনিশ্চিতভাবে জানা গেল উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। ভাইরাস এক ধরণের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবন্ত সত্ত্বা (Living entity) যা কেবলমাত্র জীবিত কোষের মধ্যে নিজের সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে এবং যার গাছ বা অন্য কোন জীবিত প্রাণীর দেহে সংক্রামক রোগ সৃষ্টির ক্ষমতা আছে। সব ভাইরাসই পরজীবী, একান্তভাবে জীব কোষের উপর নির্ভরশীল এবং ছোট-বড় গাছ, প্রাণী ও মানুষের নানারকমের এবং কিছু অতি মারাত্মক রোগের কারণ। এক হাজারের উপর ভাইরাস এ পর্য্যন্ত জানা গেছে। একটি ভাইরাস একাধিক গাছকে আক্রমণ করতে পারে। কোন কোন ভাইরাস বিশেষ দুএক জাতের গাছকে মাত্র আক্রমণ করে। আবার কোন গাছ একাধিক ভাইরাস দ্বারাও আক্রান্ত হতে পারে। ভাইরাসকে কৃত্রিম কোন মাধ্যমে (medium) চাষ বা 'কালচার' (culture) করা যায় না। যদিও ভাইরাসের মধ্যে জীবজগতেয় কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়, যথা—ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধির ও রোগ সৃষ্টির ক্ষমতা এবং কিছু বংশগতি সংক্রান্ত গুণাবলী, তবু ভাইরাসকে রাসায়নিক পদার্থের বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতেই বর্ণনা করা সম্ভব। সাধারণভাবে বলা যায় যে ভাইরাস নিউক্লিয়িক অ্যাসিড (nucleic acid) ও প্রোটিনের (protein) সমন্বয়ে গঠিত; প্রোটিন নিউক্লিয়িক অ্যাসিডের চারিধারে আবরণীর মত ঘিরে থাকে। একটি ভাইরাস কণিকাকে 'ভিরিয়ন' (virion) বলে। কিছু ভাইরাসের ক্ষেত্র একাধিক সম্পূর্ণ প্রোটিনের প্রমাণ পাওয়া গেছে। অনেকে মনে করেন দুই প্রকার অতিকায় অণু (macro molecule) নিউক্লিয়িক অ্যাসিড ও প্রোটিনের সমবায়ে গঠিত ভাইরাস একটি অতি—অতিকায় অণু (megamolecule)। ভাইরাসের রোগসৃষ্টির ক্ষমতা বা অন্যান্য বংশগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে তার নিউক্লিয়িক অ্যাসিডের উপর। অতি ক্ষুদ্র আয়তন ও স্বচ্ছতার জন্য ভাইরাসকে সাধারণ মাইক্রোস্কোপে (light microscope) দেখা যায় না। একমাত্র ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে (electron microscope) বহুগুণ বর্দ্ধিত আকারে ভাইরাসকে দেখা সম্ভব হয়।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য: গাছের রোগ উৎপাদক ভাইরাসে **রাইবো-নিউক্লিয়িক অ্যাসিড** (*r*ibonucleic acid = RNA) থাকে। কদাচিৎ

এর ব্যতিক্রম দেখা যায় যেমন ফুলকপির মোজেইক (Cauliflower mosaic) ভাইরাসে RNA থাকে না, পরিবর্তে **ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিয়িক অ্যাসিড** (deoxyribonucleic acid = DNA) থাকে। ভাইরাসে সাধারণতঃ এক রকমের প্রোটিন থাকলেও কিছু বড় আকারের ভাইরাসের ক্ষেত্রে একাধিক প্রোটিন ও বাড়তি রাসায়নিক পদার্থ, যথা পলি অ্যামাইন (polyamines), লিপিড (Lipids) ইত্যাদি, থাকতে পারে। নিউক্লিয়িক অ্যাসিড ও প্রোটিনের আনুপাতিক পরিমাণ সব ভাইরাসে এক নয়; শতকরা ৫—৩৭ ভাগ নিউক্লিয়িক অ্যাসিড ও ৬০—৯৫ ভাগ প্রোটিন থাকতে পারে। দণ্ডাকৃতি (rods haped) ভাইরাসে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি হয়, গোলাকার (spherical) ভাইরাসে নিউক্লিয়িক অ্যাসিডের পরিমাণ আনুপাতিকভাবে বেশী। ঠিক কিভাবে নিউক্লিয়িক অ্যাসিডের সাথে প্রোটিন যুক্ত থাকে তার সম্বন্ধে ধারণা এখনও স্পষ্ট নয়—তবে এটুকু জানা গেছে যে নিউক্লিয়িক অ্যাসিড প্রোটিনের আবরণের মধ্যে সুরক্ষিত অবস্থায় থাকে। পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে আরও জানা গেছে যে ভাইরাসের মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বাহক হল RNA। এর উপরেই ভাইরাসের রোগ-সৃষ্টির ক্ষমতা, বংশধারার অবিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি নির্ভর করে। ভাইরাসের RNA শুধু যে নিজের মত RNA উৎপাদন করে তাই নয়, প্রোটীন উৎপাদনের ক্ষমতাও রাখে। তবে মনে করা হয় যে পোষকের সঙ্গে ভাইরাসের বিশেষ সম্পর্ক বা পোষককে চিনে নেবার ক্ষমতা (recognition) তার প্রোটিন আবরণের উপর নির্ভর করে। RNA বলতে এক বিশেষ ধরণের নিউক্লিয়িক অ্যাসিডকে বোঝায়। যে কোন RNA কয়েক শত থেকে কয়েক হাজার নিউক্লিওটাইডের সমষ্টি। প্রতিটি নিউক্লিওটাইডে একটি রাইবোজ (ribose) জাতীয় ৫-কার্বনযুক্ত শর্করা একপাশে ফসফরিক অ্যাসিড (phosphoric acid) ও অন্যপাশে অ্যাডেনিন (adenin), গুয়ানিন (guanin), সাইটোসিন (cytosine) বা ইউরাসিল (uracil) যে কোন একটি নাইট্রোজেন ঘটিত ক্ষারক পদার্থের (base) সঙ্গে যুক্ত থাকে। অ্যাডেনিন ও গুয়ানিন পিউরিন (Purine) জাতীয় এবং সাইটো-সিন ও ইউরাসিল পিরিমিডিন (pyrimidine) জাতীয়। একটি নিউক্লিও-টাইডের রাইবোজের সঙ্গে অন্য নিউক্লিওটাইডের ফসফরিক অ্যাসিডের সংযুক্তর ফলে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের যে RNA তৈরী হয় তার আকৃতি সুতার (strand) মত। চারটি ক্ষারক পদার্থের ক্রমপর্য্যায় ও উপস্থিতির হারের উপর-বিভিন্ন RNA ভাইরাসের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। যে কোন ভাইরাসের RNA তে অ্যাডেনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন ও ইউরাসিলের সংখ্যা ও

ক্রমপর্যায় নির্দিষ্ট থাকে। এর কোন পরিবর্তন হলে ভাইরাসের গুণাবলীতে পরিবর্তন দেখা দেবে—এমনকি নুতন ভাইরাসেরও সৃষ্টি হতে পারে।
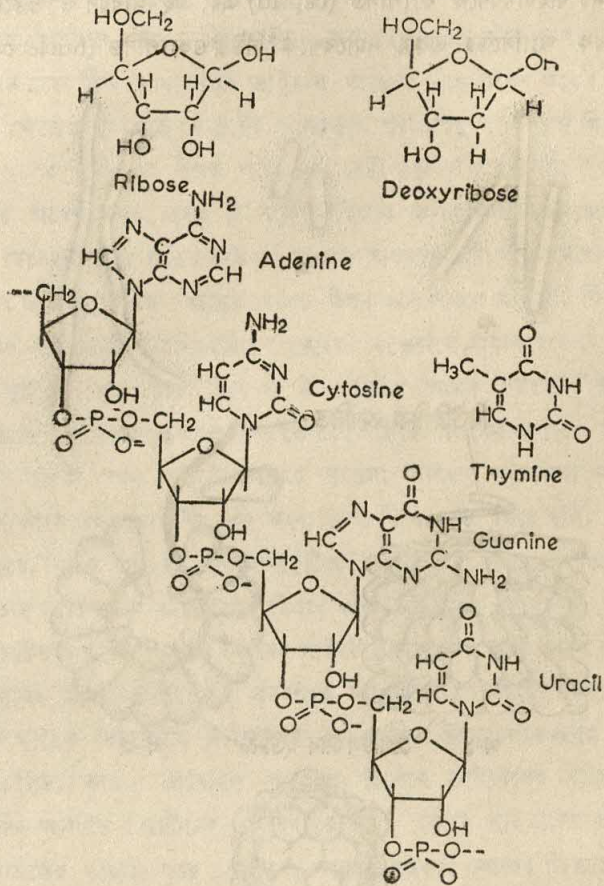
ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিয়িক অ্যাসিডে রাইবোজের পরিবর্তে ডিঅক্সিরাইবোজ ধরণের শর্করা ও ইউরাসিলের পরিবর্তে থাইমিন থাকে। প্রায় কুড়িটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের বিভিন্ন ক্রমপর্যায়ে ও বিভিন্ন সংখ্যায় সংযুক্তির ফলে বিভিন্ন ভাইরাসের প্রোটিন তৈরী হয়।

গাছের রোগ উৎপাদক ভাইরাস আকৃতিতে প্রধানতঃ দু রকম : অসমমাত্র (anisometric) ও সমমাত্র (isometric)। প্রথম শ্রেণীতে রয়েছে দণ্ডাকার (rod shaped) ও সূতার মত (filamenotus) ভাইরাস (রেখাচিত্র—৬ ক, খ ও গ)। গোলাকার (spherical), প্রকৃতপক্ষে বহুতলবিশিষ্ট (polyhedral)

ভাইরাস দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত (রেখাচিত্র ৬ঘ)। দণ্ডাকার ভাইরাসের মধ্যে সেগুলি হ্রস্ব দৈর্ঘ্যের তাদের 'র‍্যাবডোভাইরাস' (rhabdovirus) বলে। ভাইরাসে প্রোটিনের বহিরাবরণকে 'ক্যাপসিড' (capsid) এবং এই আবরণ ও ভিতরে থাকা নিউক্লিয়িক অ্যাসিডের একত্র সমাবেশকে 'নিউক্লিওক্যাপসিড' (nucleocapsid)
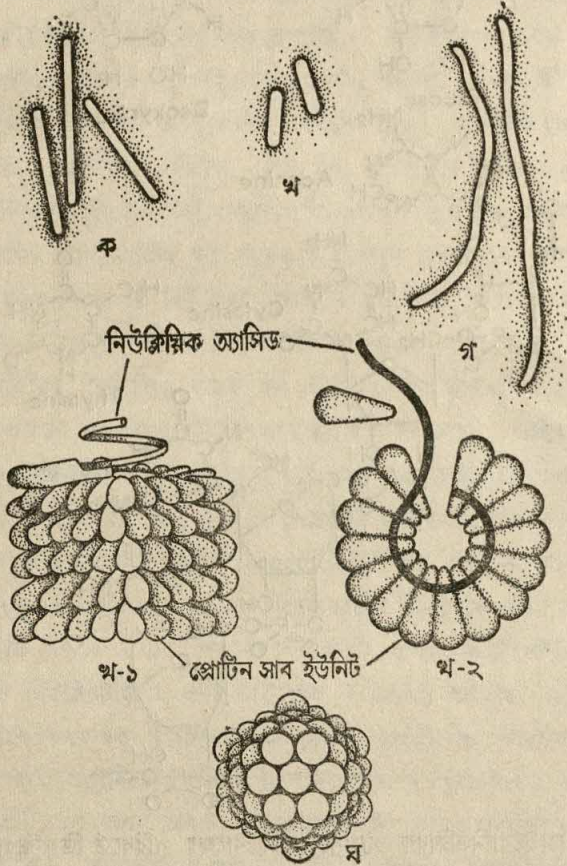
রেখাচিত্র—৬ ভাইরাসের দেহগঠন—(ক) ও (খ) দণ্ডাকার ভাইরাস (খ-১ ও ২) ভাইরাসের গঠনে প্রোটিনের বহিরাবরণের ভিতরে নিউক্লিয়িক অ্যাসিড (গ) সূতাকৃতি ভাইরাস (ঘ) বহুতলবিশিষ্ট ভাইরাস

বলে (রেখাচিত্র-৬খ-১ ও ২)। কোন ভাইরাসের দেহই মসৃণ নয়—বরঞ্চ ডুমো ডুমো বলা যায়। প্রতিটি উঁচু জায়গা প্রোটিনের ছোট একটি অণু বা 'সাব ইউনিট' (sub unit) ছাড়া কিছু নয় যার নাম 'ক্যাপসোমিয়ার' (capsomere)। এগুলি পেঁচানোভাবে নির্দিষ্ট প্রণালীতে বিন্যস্ত হয়ে বিভিন্ন ভাইরাসের প্রোটিন

আবরণী তৈরী করে। প্রোটিন আবরণীর ভিতর নিউক্লিয়িক অ্যাসিড ঠিক কি ভাবে বিন্যস্ত থাকে সে সম্বন্ধে ধারণা এখনও স্পষ্ট নয়।

ভাইরাস ও গাছের রোগ : গাছের দেহে নানারকম ক্ষত বা গাছ থেকে রস শোষণের সময় বিভিন্ন ভাইরাস বাহক (vector) কীট যে ক্ষতের সৃষ্টি করে তার মধ্যে দিয়ে সাধারণতঃ ভাইরাস গাছের দেহে প্রবেশ করে। কিছু রোগের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ভাইরাস আক্রান্ত পরাগরেণু যখন উড়ে গিয়ে অন্য গাছের ফুলের গর্ভমুণ্ডের উপর পড়ে এবং সেটি অঙ্কুরিত হয়ে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে তখন ঐ সঙ্গে ভাইরাস কণিকাও (virus particle) গাছের দেহের ভিতরে প্রবেশ করে। সাধারণ অবস্থায় এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ভাইরাস কণিকা গাছের দেহের উপর এসে পড়লে বাইরের কিউটিকল (cuticle) ও তার নীচে এপিডার্মিসের কোষের দেওয়ালে নানাকারণে যে সামান্য ক্ষতের সৃষ্টি হয় তার মধ্যে দিয়ে বা ঐ দেওয়ালে অনেক সময় যে সূক্ষ্ম নালী (ectodesma) থাকে তার মধ্যে দিয়ে কোষের সাইটোপ্লাজমের সংস্পর্শে আসে। ভাইরাস কণিকা যখন সাইটোপ্লাজমের পাতলা আবরণ বা প্লাজমা আবরণীর সংস্পর্শে আসে তখন আবরণীর কিছু অংশ ভিতর দিকে ঢুকে গিয়ে থলির আকার ধারণ করে, যাকে বলা হয় 'পিনোসাইটিক ভেসিকল' (pinocytic vesicle)। পরে কোষ মধ্যস্থ কোন এনজাইমের ক্রিয়ার ফলে এই থলির আবরণটি নষ্ট হয়ে গেলে ভাইরাস কণিকাটি তখন কোষের সাইটোপ্লাজমের সংস্পর্শে আসে।

কোষের মধ্যে ভাইরাসের প্রবেশকে আক্রমণের সূচনামাত্র বলা যায়। পোষক গাছের দেহকোষে ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধির উপর আক্রমণের সম্ভাব্য সফলতা নির্ভর করে। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ভাইরাসের সক্রিয় অংশ নিউক্লিয়িক অ্যাসিড প্রোটিনের আবরণ মুক্ত হয়! কোষে ভাইরাসের প্রবেশের ঘন্টাখানেকের মধ্যেই তার প্রোটিনের আবরণী সম্ভবতঃ কোষের ভিতরের কোন এনজাইমের ক্রিয়ায় নষ্ট হয়ে যায়। অনেকসময় আক্রান্ত কোষের ভিতরে নষ্ট হয়ে যাওয়া প্রোটিনের আবরণটির টুকরো টুকরো অংশ দেখতে পাওয়া গেছে। তখন নিউক্লিয়িক অ্যাসিড কোষের নিউক্লিয়াসের ভিতর, সম্ভবতঃ নিউক্লিওলাসে, প্রবেশ করে এরকম কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে। এর পরে কোষের ভিতরে ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধির কাজ শুরু হয়। ভাইরাস নিউক্লিয়িক অ্যাসিডের প্রভাবে কোষে নিউক্লিয়িক অ্যাসিড সংশ্লেষণে সাহায্য করে এমন কিছু এনজাইম; যেমন রাইবোনিউক্লিয়িক অ্যাসিড পলিমারেজ, সিন্থেটেজ, রেপ্লিকেজ RNA-(polymerase-synthetase replicase) প্রভৃতি তৈরী হতে থাকে। ভাইরাস

নিউক্লিয়িক অ্যাসিডের উপস্থিতিতে তখন আক্রান্ত কোষের বিভিন্ন উপাদান থেকে ঐ সব এনজাইমের সাহায্যে অবিকল একই ধরণের RNA তৈরী হয়। নিউক্লিয়িক অ্যাসিড তৈরী হলে কোষের মধ্যেই ভাইরাসের বৈশিষ্ট্যমূলক প্রোটিন আবরণীও তৈরী হয়। রাইবোজোম, সংবাদবাহক (messnger) RNA ও স্থানান্তর-কারী (transfer) RNA এইকাজে ভাইরাস নিউক্লিয়িক অ্যাসিডকে সাহায্য করে। প্রথমে কোষের অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি থেকে প্রোটিনের অণু তৈরী হয়। তারপর সেগুলি যথাযথভাবে বিন্যস্ত হলে প্রোটিন আবরণীটি তৈরী হয়। যেটুকু প্রমাণ পাওয়া গেছে তার থেকে মনে হয় যে ভাইরাসের নিউক্লিয়িক অ্যাসিড ও সম্ভবতঃ প্রোটিন তৈরীর কাজও কোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যেই ঘটে। নিউক্লিয়িক অ্যাসিড ও প্রোটিনের সংযোগে ভাইরাস কণিকা তৈরীর কাজ নিউক্লিয়াসের মধ্যে শুরু হলেও পরে সাইটোপ্লাজমে এসে সম্পূর্ণ হয়। যেখানে প্রোটিন তৈরীর কাজ সাইটোপ্লাজমে হয় সেখানে নিউক্লিয়িক অ্যাসিড তৈরী হবার পরে নিউক্লিয়াস থেকে সাইটোপ্লাজমে বেরিয়ে আসে।

ভাইরাস কণিকা বা ভাইরাস নিউক্লিয়িক অ্যাসিড একটি কোষ থেকে পার্শ্ববর্তী কোষে সম্ভবতঃ দুটি কোষের মধ্যে প্রোটোপ্লাজমের যোগসূত্র বা প্লাজমোডেসমার (plasmodesma, pl. plasodesmata) মধ্য দিয়ে যায়। তবে যে সব জায়গায় প্লাজমোডেসমা থাকে না সেখানেও যে ভাইরাস এক কোষ থেকে অন্য কোষে যায় তারও প্রমাণ আছে। ভাজক কলা (meristematic tissue) আক্রান্ত হলে কোষ বিভাজনের মাধ্যমে ভাইরাস নূতন কোষে ছড়িয়ে পড়ে। কোষ থেকে কোষে ভাইরাস খুবই ধীরে ধীরে ছড়ায়। মনে হয় একদিনে ভাইরাস এভাবে ৮-১০টি কোষে বা অনধিক এক মিলিমিটার ছড়াতে পারে। কিছু ভাইরাস প্রাথমিক আক্রমণের জায়গার চারিদিকে বেশি ছড়াতে পারে না, ফলে তারা স্থানীয়ভাবে রোগের (local lesion) সৃষ্টি করে। অন্য কিছু ভাইরাস দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং গাছের দেহে বিস্তৃতভাবে রোগের (systemic disease) সৃষ্টি করে থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাইরাস প্রধানতঃ ফ্লোয়েম কলার কখনও বা জাইলেম কলার নলাকৃতি কোষের মধ্য দিয়ে খাদ্য মিশ্রিত জলপ্রবাহের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে ভাইরাস প্রতি মিনিটে ১-২ সে.মি. ছড়াতে পারে। পরে ফ্লোয়েম বা জাইলেম কোষ থেকে ভাইরাস আবার সংলগ্ন প্যারেনকাইমা কোষে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে।

ছত্রাক, ব্যাকটিরিয়া ও অন্যান্য পরজীবীর মত ভাইরাস নিজে এনজাইম, টক্সিন বা হরমোন উৎপাদন করতে পারে না বটে কিন্তু ভাইরাস গাছের দেহে

বিভিন্ন শারীরিক প্রক্রিয়ায় নানারকম বিকৃতি ও রোগলক্ষণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। ভাইরাসের নিউক্লিয়িক অ্যাসিডই (RNA) রোগ উৎপাদনের মূল কারণ। কোষের নাইট্রোজেনঘটিত মূল উপাদানগুলি ব্যবহার করে ভাইরাস নিজের প্রয়োজনমত RNA ও প্রোটিন তৈরী করিয়ে সংখ্যাবৃদ্ধি করে। এর ফলে গাছে খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে। তবে মনে হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটাই রোগের একমাত্র বা প্রধান কারণ নয়। গাছের উপর ভাইরাসের প্রত্যক্ষ প্রভাবের থেকে তার পরোক্ষ প্রভাবই অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগ সৃষ্টির মূল কারণ। সম্ভবতঃ ভাইরাসের প্রভাবে কোষের মধ্যে এনজাইম, টক্সিন ও অন্য নানাধরণের সক্রিয় পদার্থ উৎপন্ন হয় যেগুলি গাছের বিভিন্ন বিপাকীয় প্রক্রিয়া, শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া ও হরমোন্ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে নানাভাবে প্রভাবিত ও বিপর্যস্ত করে। এর ফলে গাছের কোষের কিছু স্বাভাবিক উপাদান নষ্ট হয়ে যেতে পারে বা এমন কিছু নূতন পদার্থের সৃষ্টি হতে পারে যা কোষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পক্ষে ক্ষতিকারক। ভাইরাসের পরোক্ষ প্রভাবের ফলে গাছের জীবনযাত্রায় যে নানা ধরণের বিপর্যয় ঘটে রোগলক্ষণগুলি তারই ফলশ্রুতি। কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য দেখা গেছে যে ভাইরাস গাছের দেহে প্রবেশ করে দেহকোষে নিজের সংখ্যাবৃদ্ধি ও প্রসার লাভ করলেও গাছে কোনরকম অসুস্থতার লক্ষণ দেখা যায় না। ভাইরাসটি এখানে সুপ্ত অবস্থায় (latent virus) থাকে। এই অবস্থায় গাছটিকে বলা হয়ে থাকে রোগলক্ষণহীন বাহক (symptomless carrier)।

রোগের বিস্তার ঃ ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়ার মত ভাইরাস জল বা হাওয়ার সাহায্যে ছড়ায় না অথবা ছত্রাক বা নিমাটোডের মত ভাইরাস নিজেও সক্রিয়ভাবে ছড়াতে পারে না। কিন্তু ভাইরাসজনিত রোগ যে সাফল্যের সঙ্গে গাছ থেকে গাছে ছড়িয়ে পড়তে পারে এ তথ্য আমাদের জানা। এই কাজে সব থেকে সক্রিয় অংশ নেয় বিভিন্ন ধরণের কীটপতঙ্গ। এদের মধ্যে অ্যাফিডিডি (Aphididae) ও সাইকাডেলিডি (S.C. Cicadellidae) পরিবারভুক্ত পতঙ্গরাই প্রধান যারা স্টাইলেটের সাহায্যে ত্বক ভেদ করে গাছ থেকে রস শোষণ করে খায়। অল্প কিছু 'বীটল' (beetle) বা শোষক পোকা (leafhopper) জাতীয় কীটপতঙ্গ আছে যারা কামড়ে গাছ থেকে রস শোষণ করে। অধিকাংশ বাহক পতঙ্গই যান্ত্রিক উপায়ে ভাইরাসকে স্থানান্তরিত করে থাকে (mechanical (transmission)। অন্য কিছু ক্ষেত্রে বাহক পতঙ্গের সঙ্গে ভাইরাসের ঘনিষ্ঠ ও দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কেরও প্রমাণ পাওয়া গেছে। একটি ভাইরাস কোন একটি বিশেষ পতঙ্গ বা কখনও একাধিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত পতঙ্গের মাধ্যমে ছড়াতে

পারে। সব থেকে বেশি সংখ্যক ভাইরাস স্থানান্তরিত হয় জাব পোকা বা 'এফিড' (aphids) মাধ্যমে। এছাড়া শোষক পোকা বা 'লীফ হপার' (leaf hoppers), 'হোয়াইট ফ্লাই' (white flies), চোষী পোকা বা 'থ্রিপ' (thrips), দয়ে পোকা বা 'মীলি বাগ' (mealy bugs), মাকড় বা 'মাইট' (mite) প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের কীটপতঙ্গও এই কাজে অংশ গ্রহণ করে। এছাড়া অন্যান্য জীবও ভাইরাস ছড়ানোর কাজে অংশ গ্রহণ করে থাকে, যেমন কিছু নিমাটোড, ছত্রাক বা সপুষ্পক ধরণের পরজীবী, তবে সংখ্যার দিক থেকে এদের গুরুত্ব অনেক কম।

কিছু ভাইরাস বীজের মাধ্যমে ছড়ায়। রোগগ্রস্ত গাছের বীজে ভাইরাস থাকে যেমন বীন, টম্যাটো, লেটুস ইত্যাদির ক্ষেত্রে দেখা যায়। ঐ ধরণের বীজ জমিতে লাগালে যে গাছ হয় সেটি প্রথম থেকেই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ে। যে সব ক্ষেত্রে বীজের বদলে গাছের অন্য কোন অংশ বংশ বিস্তারের জন্য ব্যবহার করা হয় সেখানেও কিছু ভাইরাস রোগ একইভাবে ছড়ায়। জোড় কলমের মাধ্যমে ভাইরাস ছড়ায় এরকম নজীরও রয়েছে। কিছু ভাইরাস রোগ যান্ত্রিক উপায়ে ছড়ায়। রোগগ্রস্ত গাছের রস কোন ক্ষতের মাধ্যমে সুস্থ গাছের দেহে প্রবেশ করলেই সেটি ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ে, যেমন টোব্যাকো মোজেইক ভাইরাস।

রোগ উৎপাদক ভাইরাসের সনাক্তকরণ : ভাইরাসের আক্রমণের ফলে গাছে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্যমূলক রোগলক্ষণ ফুটে ওঠে ঠিকই তবে লক্ষণ দেখে সব সময় ভাইরাস রোগ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না। অপুষ্টি বা পরিবেশে বিষাক্ত পদার্থের উপস্থিতির জন্য যে সব রোগলক্ষণ সাধারণতঃ গাছের দেহে ফুটে ওঠে তার সঙ্গে ভাইরাসজনিত রোগলক্ষণের অনেক সময় খুব সাদৃশ্য দেখা যায়। প্রাথমিক পরীক্ষায় কোন রোগ ভাইরাস থেকে হয়েছে এমন মনে হলে তখন চূড়ান্তভাবে ভাইরাস সনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে আরও কিছু পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। যখন একটি ভাইরাসকে একটি বিশেষ রোগের কারণ বলে সন্দেহ করা হয় তখন সেই ভাইরাসটি কোন কোন প্রজাতির গাছ আক্রমণ করে এবং সেখানে কি কি ধরণের রোগলক্ষণ দেখা যায় এই সব তথ্য সনাক্তকরণের কাজে প্রাথমিক ভাবে কিছুটা সাহায্য করতে পারে। রোগটির সংক্রমণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ রোগটি কীটপতঙ্গবাহিত না যান্ত্রিক উপায়ে অথবা অন্য কোন উপায়ে সংক্রামিত হয় সেই তথ্য জানা গেলে তাতে সনাক্তকরণের কাজ আরও কিছুটা এগোয়। যেখানে যান্ত্রিক উপায়ে রোগ সংক্রমণ হয় সেখানে রোগগ্রস্ত গাছ থেকে সংগৃহীত

রস ব্যবহার করে অশোধিত অবস্থায় ভাইরাসের কিছু শারীরিক ধর্ম বা গুণাবলী (physical properties), যথা উত্তাপজনিত নিষ্ক্রিয়তার নিম্নসীমা (thermal inactivation point), পোষকের দেহের বাইরে সক্রিয় থাকার সময় সীমা (longevity *in vitro*) ও সক্রিয়তায় লঘুকরণের শেষ সীমা (dilution end point) ইত্যাদি পরীক্ষা করলে যে তথ্য পাওয়া যাবে তাতে কাজ আরও এগোবে। সংগৃহীত রস সর্বনিম্ন যে তাপমাত্রায় ১০ মিনিট রাখলে ভাইরাস পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে তাকেই উত্তাপজনিত নিষ্ক্রিয়তার নিম্নসীমা বলে। সক্রিয়তার লঘুকরণের শেষ সীমা বলতে সেই মাত্রা বা সীমা বোঝায় যার পরে আর লঘুকরণ করলে ভাইরাসের সংক্রমণ ক্ষমতা থাকে না। এই ভাবে রোগ-উৎপাদক ভাইরাস সম্বন্ধে ধারণা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠলে তখন ঐ ধরণের অন্যান্য ভাইরাসের সঙ্গে 'সেরোলজি' সংক্রান্ত পরীক্ষা (serological tests) করে বা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে ভাইরাসের গঠন সংক্রান্ত বিশদ তথ্য সংগ্রহ করে চূড়ান্তভাবে সনাক্তকরণ করা হয়।

Bawden, F.C. 1964. "Plant virus and virus diseases", 4th edition. Ronald Press Co., New Vork.

Bos, L. 1983. "Plant Virology" Centre for Agricultural Publishing and Documentation, Wageningen (Indian edition : Oxford and IBH Publishing Co. New Delhi).

Gibbs, A., and B. Harrison. 1976. "Plant Virology" : The Principles". Edward Arnold, London.

Hamilton, R.I. 1064. Replication of plant viruses. *Ann. Rev. Phytopathol.* **12**: 223-245.

Mathews, R. E. F. 1981. "Plant Virology", 2nd edition. Academic Press, New York.

Smith, K. M. 1977. "Plant Viruses", 6th edition. Chapman and Hall, London.

৮ | রোগউৎপাদক জীবাণুর বংশধারায় পরিবর্তন

জীবজগতের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল যে উদ্ভিদ বা প্রাণীর কোন প্রজাতির মধ্যে সকলে এক হয় না। আকৃতি, প্রকৃতি ও স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যে কিছু না কিছু পার্থক্য তাদের মধ্যে থেকেই যায়। মানুষ বা অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর জীব, যারা যৌন উপায়ে বংশবৃদ্ধি করে থাকে, তাদের মধ্যে এই পার্থক্য অত্যন্ত পরিস্ফুট। মানুষের ক্ষেত্রে কয়েক লক্ষ লোকের মধ্যেও একেবারে এক চেহারার দুজনকে খুঁজে পাবার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ, যথা ছত্রাক, ব্যাকটিরিয়া ইত্যাদি, যাদের জীবনে অযৌন প্রক্রিয়ার মাধমেই সাধারণতঃ বংশবৃদ্ধি ঘটে থাকে, ও উচ্চশ্রেণীর যে সব উদ্ভিদ অঙ্গজ জননের মাধ্যমেও বংশবৃদ্ধি করে তাদের ক্ষেত্রেও প্রজাতির মধ্যে এই ধরণের পার্থক্যের সম্ভাবনা তুলনামূলক-ভাবে মোটেই কম নয়। যখন পূর্বপুরুষের সঙ্গে উত্তরপুরুষের কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় তখন উত্তরপুরুষকে পূর্বপুরুষ থেকে ভিন্ন (variant) বলে ধরা হয়। যৌন মিলনের ফলে বা অযৌন প্রক্রিয়ায় ভিন্নতার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই ভিন্নতা এক বা একাধিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করে ঘটতে পারে এবং ভিন্নতার মাত্রারও কম বেশি হতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন শ্রেণীর রোগউৎপাদক জীবাণুর মধ্যেও ভিন্নতার পরিচয় পাওয়া যায়। এর ফলে যেমন আকৃতিগত বা শারীরবৃত্তীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটতে পারে তেমনি রোগ উৎপাদন ক্ষমতায়ও পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। প্রকৃতিতে যে এই ধরনের পরিবর্তন ঘটে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে দুটি তথ্য থেকে। প্রথমতঃ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একই জাতের বীজ লাগালেও ফসলে যদি কোন রোগ দেখা দেয় তাহলে সব জায়গায় রোগের আক্রমণের তীব্রতা সমান হয় না—কোথাও বেশি, কোথাও মাঝারি বা কোথাও কম হয়। এর একটি কারণ অবশ্য আঞ্চলিক ভিন্নতার দরুণ আবহাওয়ার পার্থক্য, অপর কারণ হল প্রকৃতিতে রোগ উৎপাদকের একই প্রজাতির (species) মধ্যে একাধিক জাতির (race) অস্তিত্ব। দ্বিতীয়তঃ অনেক জায়গায় রোগ-প্রতিরোধী প্রজাতির ফসল লাগানোর ফলে অন্ততঃ কয়েক বছর রোগ হয় না বা রোগ হলেও ফসলের খুব অল্প ক্ষতি করে। তারপরে হয়ত হঠাৎ দেখা যায় যে এক বছর রোগের আক্রমণ খুবই বেশি হয় এবং এই অবস্থাই পরে চলতে থাকে। এরকম ক্ষেত্রে মনে করা হয় যে আগে পরিবেশে কোন উগ্র প্রকৃতির রোগ-

উৎপাদক জীবণু ছিল না যার ফলে রোগের আক্রমণের তীব্রতা কম ছিল। কিন্তু বংশধারায় পরিবর্তনের ফলে একই প্রজাতির মধ্যে উগ্র প্রকৃতির নূতন জাতির সৃষ্টি হওয়ায় ফসলের ক্ষতি বেশি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

প্রকৃতিতে বিভিন্ন রোগ জীবাণুর বংশ ধারায় যে পরিবর্তন নিয়ত ঘটে চলেছে তার সম্বন্ধে জ্ঞান ও আলোচনা উদ্ভিদ-রোগবিজ্ঞানের পক্ষে নানা কারণে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এর থেকে শুধু যে জীব অভিব্যক্তির গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুটা জানা যায় তাই নয়, বিভিন্ন অঞ্চলে কোথায় রোগজীবাণুর কোন কোন বা ক'টি জাতির অস্তিত্ব রয়েছে সে সম্বন্ধেও একটা ধারণা হয়। সঙ্করায়ণের মাধ্যমে নতুন রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছ সৃষ্টি করতে হলে শেষোক্ত তথ্যের বিশেষ প্রয়োজন হয়।

পরিবর্তনের কারণ

ছত্রাক, নিমাটোড, সপুষ্পক উদ্ভিদ প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের রোগউৎপাদক যারা যৌন প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি করে থাকে তাদের ক্ষেত্রে যৌন মিলনের পর জাইগোট নিউক্লিয়াসে বিয়োজন বিভাজন বা মিয়োসিসের (meiosis) সময় জীনের পৃথকীকরণ (segregation) ও স্বাধীন সঞ্চরণ সূত্র (Law of independent assortment) অনুসারে পুনঃ সংযুক্তীকরণের (recombination) মাধ্যমে বংশধারায় এক স্থায়ী পরিবর্তন সূচিত হয়। একে বলা হয় সঙ্করায়নের মাধ্যমে পরিবর্তন। ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রেও যৌন প্রক্রিয়ার অনুরূপ উপায়ে বংশধারায় পরিবর্তন ঘটতে পারে। এছাড়াও, ছত্রাক ব্যাকটিরিয়া ও ভাইরাসে যৌন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এরকম বিভিন্ন উপায়ে নূতন নূতন ধারার সৃষ্টি হতে পারে তারও যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। এখানে এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হচ্ছে।

১। মিউটেশন (Mutation)

প্রকৃতিতে সবরকম প্রাণী বা উদ্ভিদের কোষে যৌন প্রক্রিয়া ছাড়াই জীনের স্তরে নানা প্রকার পরিবর্তন হঠাৎ দেখা দিতে পারে। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই ধরণের আকস্মিক ও স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন ঘটে তাকে বলা হয় **পরিব্যক্তি** বা **'মিউটেশন'** (mutation)। সাধারণতঃ কোষ বিভাজনের সময় ক্রোমোজোমে বা বংশগতির গুণাবলী সম্পন্ন অন্যান্য পদার্থে জীনের স্তরে অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটে। বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ বা বিভিন্ন ধরণের রশ্মি-আলট্রাভায়োলেট রে, গামা রে, এক্স রে ইত্যাদি প্রয়োগ করে কৃত্রিম উপায়ে মিউটেশন ঘটানো যেতে পারে। মিউটেশনের ফলে জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে এমন পরিবর্তন আসে যা স্থায়ী এবং উত্তরাধিকার সূত্রে এক জন্তু থেকে পরবর্তী জন্তুতে যায়। নূতন সৃষ্ট

জীবকে প্রথমটির **'মিউট্যান্ট'** (mutant) বলে। ব্যাকটিরিয়া বা ছত্রাকের হ্যাপ্লয়েড অবস্থায় মিউটেশন হলে পরিবর্তন খুব শীঘ্রই প্রকাশ পায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিউটেশনজনিত পরিবর্তন প্রচ্ছন্ন ধরণের হয়। ছত্রাকের ডিপ্লয়েড বা ডাইক্যারিওটিক অবস্থায় সঙ্করায়ণের মাধ্যমে যতক্ষণ এই ধরণের দুটি প্রচ্ছন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জীন একত্রিত না হয় ততক্ষণ এই নূতন পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হয়না।

প্রকৃতিতে মিউটেশন স্বাভাবিক ঘটনা। যখন গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে চাষ করা হয় তখন ছত্রাকে মিউটেশন ঘটে এরও অনেক প্রমাণ রয়েছে। বিভিন্ন প্রজাতির মিউটেশনের হার এক নয়; অনেক সময় পরিবেশের উপরও এই হার নির্ভর করে। মিউটেশনের ফলে জীবের সবরকম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেই পরিবর্তন আসতে পারে। রোগ উৎপাদন ক্ষমতা পরজীবীদের বহু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটিমাত্র। সুতরাং এই ক্ষমতায় পরিবর্তন খুব ঘনঘন ঘটে না এটা ঠিক। তবে ছত্রাক, ব্যাকটিরিয়া বা ভাইরাসে সংখ্যাবৃদ্ধির হার এত বেশী যে প্রকৃতিতে প্রতি বছরই বিভিন্ন প্রজাতির বেশ কিছু রোগ উৎপাদন ক্ষমতায় ভিন্নতাসম্পন্ন নূতন ধারার সৃষ্টি হয়। কিছু ক্ষেত্রে মিউটেশনের ফলে যেমন রোগ উৎপাদন বা পোষক গাছের নূতন নূতন জাতিকে আক্রমণ করার ক্ষমতা বাড়ে, অনেক ক্ষেত্রে অনুরূপভাবে ক্ষমতা কমেও যায়। পাকসিনিয়া গ্র্যামিনিস, ফাইফথারা ইনফেসট্যানস, ভেঞ্চুরিয়া ইনইক্যুয়ালিস. সিউডোমোনাস স্টুয়ার্টআই *(Pseudomonas stewartii)* প্রভৃতি ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়ায় মিউটেশনের মাধ্যমে উচ্চতর রোগ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন নূতন ধারার সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেছে।

২। সঙ্করায়ণ (Hybridization)

প্রায় সব ধরণের পরজীবীর ক্ষেত্রেই, বিশেষ করে ছত্রাকে, সঙ্করায়ণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনেক নূতন ধারার সৃষ্টি হয়েছে। যৌন প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াসে হ্যাপ্লয়েড অর্থাৎ N সংখ্যক ক্রোমোজোম বিশিষ্ট দুটি জননকোষের মিলনের ফলে যে জাইগোট উৎপন্ন হয় তার নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোম সংখ্যা ডিপ্লয়েড অর্থাৎ 2N। যৌন জননের পরবর্তী পর্যায়ে বিয়োজন বিভাজনের ফলে ডিপ্লয়েড প্রকৃতির নিউক্লিয়াস থেকে হ্যাপ্লয়েড সংখ্যার ক্রোমোজোমবিশিষ্ট নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি হয়। এই ধরণের নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে হ্যাপ্লয়েড স্পোরের সৃষ্টি হয়। বিয়োজন বিভাজনের সময় একটি জননকোষের ক্রোমোজোমগুলি অন্য জননকোষ থেকে আসা অনুরূপ ক্রোমোজোমের সঙ্গে জোড়া বাঁধে এবং পাশাপাশি এসে

দাঁড়ায়। তারপর জোড়ার দুটি ক্রোমোজোমই লম্বালম্বিভাবে একেবারে এক ধরণের দুটি ক্রোমাটিডে বিভক্ত হয়। তখন দুটি ক্রোমোজোমের সংলগ্ন দুটি
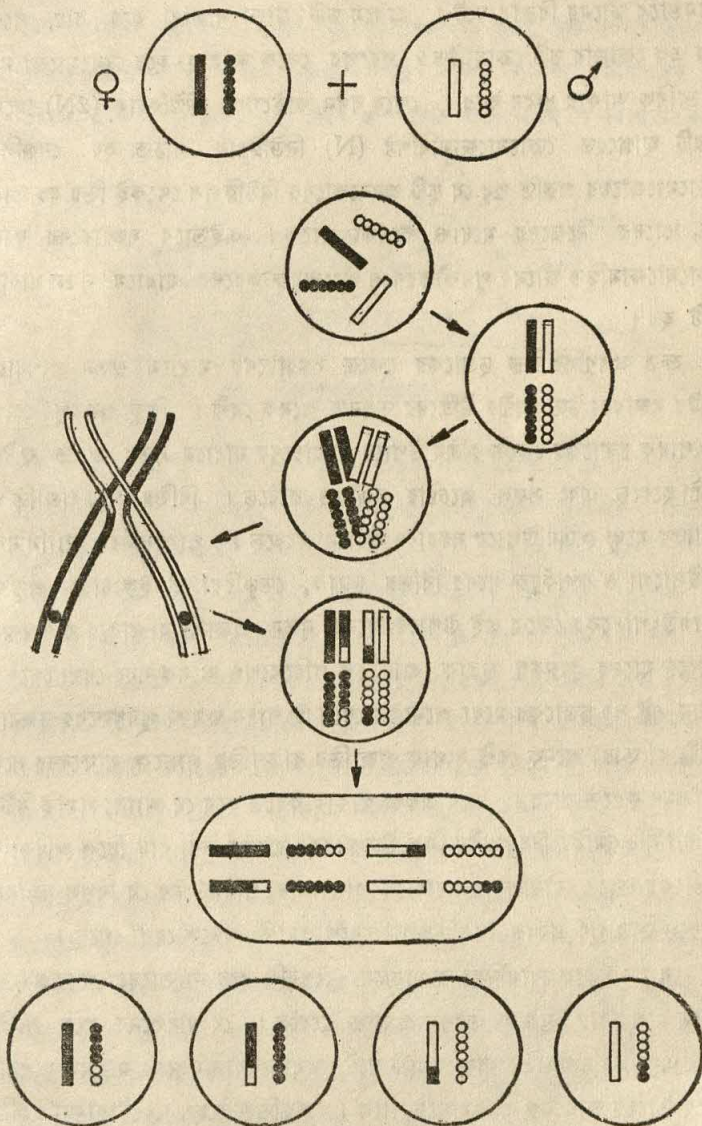
রেখাচিত্র—৭ ছত্রাকের বংশধারায় পরিবর্তন

যৌনমিলনের ফলে ক্রোমোজোমের ক্রসিং ওভার ও পরবর্তী পর্যায়ে জীনের পৃথকীকরণ ও স্বাধীন সঞ্চরণ সূত্র অনুসারে পুনঃসংযুক্তীকরণের মাধ্যমে নুতন বংশধারার সৃষ্টি।

ক্রোমোটিডের ক্রসিং ওভারের (crossing over) মাধ্যমে তাদের মধ্যে জীনের আদান প্রদান হয় (রেখাচিত্র ৭)। এইভাবে চারটির মধ্যে দুটি ক্রোমাটিডে নূতনভাবে জীনের বিন্যাস ঘটে। প্রথমে দুটি জোড়া আলাদা হয়ে যায়, পরে এক এক জোড়ার দুটি ক্রোমাটিডও পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে ক্রোমোজোমের স্বাভাবিক আকার ধারণ করে। শেষে যখন জাইগোট নিউক্লিয়াস (2N) থেকে চারটি হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজোমবিশিষ্ট (N) নিউক্লিয়াস গঠিত হয় সেগুলির ক্রোমোজোমের প্রকৃতি শুধু যে দুটি জননকোষের নিউক্লিয়াস থেকেই ভিন্ন হয় তাই নয়, তাদের নিজেদের মধ্যেও পার্থক্য থাকে। এইভাবে সঙ্করায়ণের ফলে ক্রোমোজোমস্থিত জীনের পৃথকীকরণ ও পুনঃসংযুক্তীকরণের মাধ্যমে নূতন ধারার সৃষ্টি হয়।

দ্রুত বংশবৃদ্ধির জন্য ছত্রাকের ক্ষেত্রে সঙ্করায়ণের মাধ্যমে নূতন বংশধারা সৃষ্টির সম্ভাবনা উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদের তুলনায় অনেক বেশী। কিছু গুরুত্বপূর্ণ রোগ উৎপাদক ছত্রাকের ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে সঙ্করায়ণের মাধ্যমে নূতন জাতি সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে এবং সফল প্রচেষ্টার নজীরও রয়েছে। বিভিন্ন গণ, প্রজাতি ও জাতির মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে সঙ্করায়ণ করানো হয়েছে। পাকসিনিয়া গ্র্যামিনিস, উষ্টিলাগো ও সম্পর্কযুক্ত গণের বিভিন্ন ছত্রাক, ভেঞ্চুরিয়া ইনইক্যুয়ালিস প্রভৃতি রোগউৎপাদকের ক্ষেত্রে এই উপায়ে অনেক নূতন প্রজাতি বা ধারার সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে যাদের অনুরূপ ছত্রাক প্রাকৃতিক পরিবেশেও অনেক সময় দেখা গেছে। নূতন এই সব ছত্রাকের মধ্যে অনেকের রোগ উৎপাদন ক্ষমতা পূর্বপুরুষের তুলনায় বেশী বা তারা অনেক বেশী সংখ্যক প্রজাতির বা জাতির গাছকে সাফল্যের সঙ্গে আক্রমণ করতে পারে। তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে অ্যাসকোমাইসিটিস ও ব্যাসিডিওমাইসিটিস শ্রেণীর কিছু উচ্চস্তরের ছত্রাকের কথা বাদ দিলে অধিকাংশ ছত্রাকের ক্ষেত্রে যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে বংশধারায় পরিবর্তনের যে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে তার পূর্ণ প্রকাশ প্রাকৃতিক পরিবেশে কদাচিৎ ঘটতে দেখা গেছে।

যে সব ছত্রাক যৌনমিলনের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে না তাদের ক্ষেত্রেও নূতন নূতন বংশধারার উদ্ভব হয় এরকম প্রমাণও রয়েছে। যৌনমিলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন কিছু পদ্ধতির মাধ্যমে এটি ঘটে। যারা যৌনমিলনের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে তাদের জীবনেও এরকম ঘটে থাকে। পদ্ধতিগুলি হল হেটেরোক্যারিওসিস (heterokaryosis) ও প্যারাসেক্সুয়াল রিকম্বিনেশন (parasexual recombination)। এ ছাড়া যৌন মিলনের মত প্রক্রিয়ায় ব্যাকটিরিয়ারও নূতন ধারার উদ্ভব হয় বলে জানা আছে।

৩। হেটেরোক্যারিওসিস (Heterokaryosis)

কোন হাইফা বা তার কোষের মধ্যে একাধিক বিভিন্ন বংশগত গুণাবলীসম্পন্ন নিউক্লিয়াস থাকলে সেই অবস্থাকে বলে হেটেরোক্যারিওসিস। ব্যাসিডিওমাইসিটিস শ্রেণীর ছত্রাকে যখন দুটি হাইফার মিলনের ফলে দুটি বিপরীত যৌনগুণসম্পন্ন নিউক্লিয়াস একত্রিত হয় কিন্তু পরস্পর মিলিত না হয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে আলাদা আলাদা ভাবে ভাগ হতে থাকে তখন যে সব নুতন হাইফার
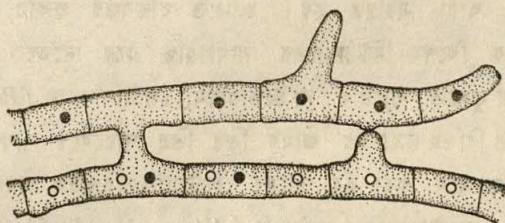
হেটেরোক্যারিয়ন

সৃষ্টি হয় তাদের প্রতিকোষেই ঠিক এই দুটি নিউক্লিয়াস থাকে। এদের ডাইক্যারিওটিক (dikoryotic) হাইফা বলা হয়। বংশগত গুণাবলীর দিক থেকে এই হাইফা প্রাথমিক হাইফার (যার প্রতি কোষে মাত্র এক ধরণের নিউক্লিয়াস আছে) থেকে কিছুটা ভিন্ন এবং অনেকসময় এর রোগ উৎপাদন ক্ষমতাও আগের তুলনায় কিছুটা অন্যরকম হতে পারে। যৌন উপায়ে বংশবৃদ্ধি করে এবং করেনা এরকম দু'ধরণের ছত্রাকের ক্ষেত্রেই হেটেরোক্যারিওসিসের প্রমাণ রয়েছে। একই প্রজাতির বিভিন্ন জাতির ছত্রাকের দুটি হাইফা পাশাপাশি থাকলে অনেক সময় একটির একটি কোষের সঙ্গে অন্যটির একটি কোষের মিলন বা অ্যানাস্টোমোসিস (anastomosis) ঘটে। এর ফলে একটি কোষের এক বা একাধিক নিউক্লিয়াস অন্য কোষটির মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং সেখানে হেটেরোক্যারিওটিক অবস্থার (heterokaryotic condition) সৃষ্টি। ফাঞ্জাই ইমপারফেকটি শ্রেণীর ছত্রাকে এই ধরণের দুটি হাইফার মধ্যে মিলন প্রায়ই ঘটে থাকে এবং এর ফলে বংশধারায় কিছু পরিবর্তন সুচিত হয়। কখনও বা একাধিক এক ধরণের নিউক্লিয়াস আছে এমন কোষে বা স্পোরে একটি নিউক্লিয়াসের এক বা একাধিক জীনে মিউটেশনের ফলে নিউক্লিয়াসটির গুণাবলীতে পরিবর্তন ঘটে। তখনও হেটেরোক্যারিওটিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। যে কোষে অন্য কোষ থেকে নিউক্লিয়াস আসে সেখানে নিউক্লিয়াস বিভাজনের ফলে নূতন হাইফা তৈরী হয় যার প্রতি কোষে বিভিন্ন ধরণের নিউক্লিয়াস থাকে এবং যার বংশগত চরিত্র প্রথম দুটি

হাইফার থেকে নিঃসন্দেহে পৃথক। এর ফলে নূতন সৃষ্ট হেটেরোক্যারিওটিক হাইফার বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতা বা পরিবেশ থেকে বিভিন্ন ধরণের খাদ্যদ্রব্য আহরণের ক্ষমতা প্রাথমিক পর্যায়ের হাইফার থেকে বেশি হতে পারে। এছাড়াও হেটেরোক্যারিওটিক অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার ফলে যে সব ছত্রাক মাটিতে বাস করে (soil-borne) তাদের কিছুটা সুবিধা হতে পারে। জমি থেকে বিভিন্ন ধরণের খাদ্য দ্রব্য আহরণের ক্ষমতা বিভিন্ন নিউক্লিয়াসের মধ্যের ভিন্ন ভিন্ন জীন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। জমিতে খাদ্যবস্তুর প্রকারভেদে ছত্রাক প্রয়োজনমাফিক বিশেষ নিউক্লিয়াসের সংখ্যাবৃদ্ধি করে নিজেকে পরিবেশের উপযোগী করে তুলতে পারে। ফিউজেরিয়াম, পেনিসিলিয়াম (*Penicillium* spp.), প্রভৃতি বিভিন্ন ছত্রাকের জমির ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে সাফল্যের সঙ্গে বসবাসের ক্ষমতা মনে করা হয় তাদের হেটেরোক্যারিওটিক অবস্থার ফলেই সম্ভব হয়েছে। অলটারনেরিয়া সোল্যানি (*Alternaria solani*), হেলমিনথো-স্পোরিয়াম স্যাটাইভাম (*Helminthosporium sativum*), ফিউজোরিয়াম সোল্যানি (*Fusarium solani*), ফাইটোফথোরা ইন্‌ফেস্‌ট্যানস ও আরও অনেক ছত্রাকের ক্ষেত্রে হেটেরোক্যারিওসিসের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

কৃত্রিম উপায়েও হেটেরোক্যারিওটিক হাইফা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। পাকসিনিয়া গ্র্যামিনিস ও ফিউজেরিয়াম অক্সিস্পোরাম এর উপর গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে যে রোগ উৎপাদন ক্ষমতা একেবারে নেই বা অল্প আছে এরকম দুটি জাতির থেকে হেটেরোক্যারিওসিসের মাধ্যমে উৎপন্ন ছত্রাক অনেক বেশি রোগ উৎপাদন ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে যে এই নতুন অবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হয় না এবং কিছুদিন পরে একত্রিত বিভিন্ন ধরণের নিউ-ক্লিয়াসগুলি আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে হাইফা পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে।

৪। প্যারাসেক্সুয়াল রিকম্বিনেশন (Parasexual recombination)

হেটেরোক্যারিওসিসের ফলে ছত্রাকে অনেক সময় যে উন্নত গুণাবলীর পরিচয় পাওয়া যায় সেই অবস্থা সাধারণতঃ স্থায়ী হয় না ঠিকই কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে হেটেরোক্যারিওটিক অবস্থা থেকে স্থায়ী পরিবর্তনের সূচনা হতে দেখা গেছে। পন্টিকোর্ভো (Pontecorvo) প্রথম এই ধরণের স্থায়ী পরিবর্তনের উল্লেখ করেন। এই প্রক্রিয়ায় কোন হেটেরোক্যারিয়নে উপস্থিত দুটি বিভিন্ন গুণাবলীসম্পন্ন নিউক্লিয়াস, যদি তারা যৌনতার দিক থেকে বেমানান না হয় (compatible), মিলিত হয়ে একটি ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস (2N) তৈরী করে। এই ধরণের মিলনের সম্ভাবনা অবশ্য খুবই কম (১ : ১০০০০০০)। এই নিউক্লিয়াস

থেকে সাধারণ বিভাজন বা 'মাইটোসিস' (mitosis) এর ফলে অনেক একই ধরণের গুণাবলীসম্পন্ন ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস তৈরী হয় যাদের নূতন হাইফার কোষে কোষে বা স্পোরে দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরণের বিভাজনের সময় কখনও কখনও (১ : ১০০০) ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস থেকে হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াসের (N) সৃষ্টি হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় হ্যাপ্লয়ডাইজেশন (haploidization)। এই প্রক্রিয়ার ফলে শুধুই যে পুরণো দুই ধরণের নিউক্লিয়াস পাওয়া যায় তাই নয় কখনও কখনও (১ : ৫০০) এমন কিছু হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াসও পাওয়া যায় যেখানে বিভাজনের সময় ক্রসিংওভারের ফলে দুটি নিউক্লিয়াসের গুণাবলীর সংমিশ্রণ ঘটেছে। এইভাবে রোগউৎপাদক ছত্রাকের ক্ষেত্রে কিছু নূতন জাতির সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকে। পাকসিনিয়া গ্র্যামিনিস (*P, graminis*), পাকসিনিয়া রিকনডাইটা *(P. recondita)*, উষ্টিলাগো মেইডিস (*Ustilago maydis*), ফিউজেরিয়াম অক্সিস্পোরাম প্রভৃতির ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে ভিন্ন রাগ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন নূতন প্রজাতির সৃষ্টি এইভাবে সম্ভব হয়েছে বলে জানা গেছে।

৫। কনজুগেশন (Conjugation), ট্রান্সফর্মেশন (Transformation) ও ট্রান্সডাকশন (Transduction)

অনেক সময় পরস্পরের সঙ্গে মিল রয়েছে (compatible) এমন দুটি ব্যাকটিরিয়া একে অন্যের সংস্পর্শে এলে এবং তাদের মধ্যে সংযোগ সাধিত হলে একটি থেকে এক বা একাধিক জীন অন্যটিতে স্থানান্তরিত হতে পারে (রেখাচিত্র ৮)। এর ফলে গ্রহীতা কোষে জীনের স্তরে কিছু পরিবর্তন সূচিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলে **কনজুগেশন।** গ্রহীতা কোষটিতে বিভাজনের ফলে যে দুটি নূতন কোষের সৃষ্টি হয় তারা জীনগত বৈশিষ্ট্যে প্রথম দুটি ব্যাকটিরিয়া থেকে কিছুটা ভিন্ন। এইভাবে জীনের স্তরে পরিবর্তন ঘটার ফলে ব্যাকটিরিয়ার নূতন ধারা বা 'স্ট্রেন' (Strain) এর সৃষ্টি হতে পারে।

অনেক সময় এক জায়গায় বিভিন্ন ধরণের ব্যাকটিরিয়া থাকলে কোন ব্যাকটিরিয়ার কোষ যদি ভেঙ্গে যায় এবং তার কোষমধ্যস্থ পদার্থ বেরিয়ে আসে তখন অন্য একটি তার সঙ্গে মিল রয়েছে (compatible) এমন ব্যাকটিরিয়া প্রথম ব্যাকটিরিয়ার কিছু জীনকে শোষণের মাধ্যমে নিজের দেহভুক্ত করে নিতে পারে যার ফলে গ্রহীতা ব্যাকটিরিয়ার বংশগত গুণাবলীতে স্থায়ী পরিবর্তন হয় ও নূতন ধারার সৃষ্টি হয় (রেখাচিত্র ৮)। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় **ট্রান্সফর্মেশন** (transformation)।

ব্যাকটিরিয়া আক্রমণকারী ভাইরাসকে বলে ব্যাকটিরিওফাজ (bacteriophage), যা সংখ্যাবৃদ্ধি ব্যাকটিরিয়া কোষের ভিতরেই হয়ে থাকে। যখন ভাইরাস এক জাতির কোন ব্যাকটিরিয়াকে আক্রমণের পরে আবার অন্য জাতির একটি ব্যাকটিরিয়াকে আক্রমণ করে তখন ফাজের মাধ্যমে কিছু জীন প্রথম
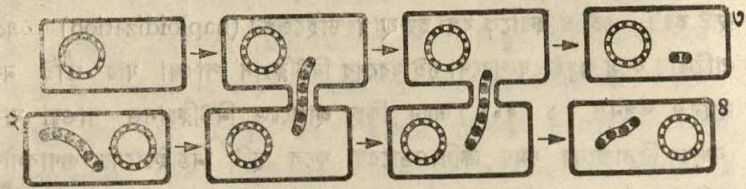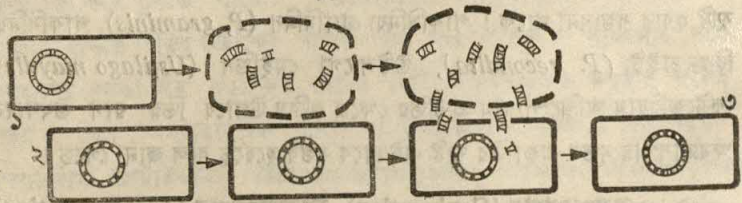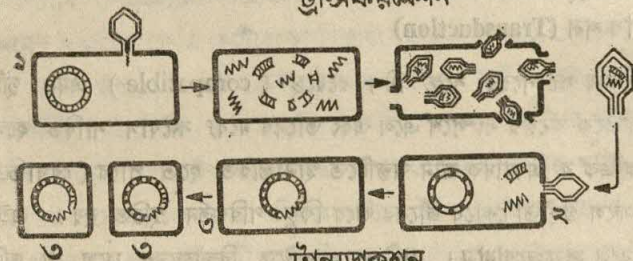
রেখাচিত্র—৮ ব্যাকটিরিয়ার বংশধারায় পরিবর্তনের বিভিন্ন পদ্ধতি

ব্যাকটিরিয়া থেকে দ্বিতীয়টিতে স্থানান্তরিত হতে পারে। (রেখাচিত্র—৮) ব্যাকটিরিওফাজের আক্রমণে যদি দ্বিতীয় ব্যাকটিরিয়াটি মরে না যায় তাহলে বাড়তি জীন কোষভুক্ত হওয়ার ফলে এর স্থায়ী চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় **ট্রানসডাকশন** (transduction)।

কোন পোষক গাছে একই পরজীবীর দুটি বিভিন্ন ধারার ভাইরাস কৃত্রিম উপায়ে প্রবেশ করিয়ে দিলে অনেক সময় সেই গাছে তৃতীয় একটি নতুন ধারার ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া যায় যার মধ্যে প্রথম দুটি ভাইরাসের গুণাবলীর মিশ্রণ হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে সঙ্করায়ণের মাধ্যমে তৃতীয় ধারাটির উৎপত্তি হয়েছে তবে এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কোন ধারণা এখনও গড়ে ওঠেনি।

৬। **অভিযোজন—(Adaptation) :** অনেক সময় ছত্রাক, ব্যাকটিরিয়া প্রভৃতিকে প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে ধীরে ধীরে বেশ খাপ খাইয়ে নিতে দেখা যায়। একে বলা হয় **অভিযোজন** বা 'অ্যাডাপটেশন' (adaptation)। অভিযোজনের ফলে রোগ উৎপাদকের কোন বিষাক্ত পদার্থের প্রতি সহনশীলতা বা পরিবেশ থেকে কোন বিশেষ খাদ্য দ্রব্য আহরণের ক্ষমতা জন্মায় বা বাড়ে এমনকি আক্রমণ ক্ষমতাও বাড়তে পারে। এই ধরণের পরিবর্তন গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে চাষের সময় এবং প্রকৃতিতে দেখা যায়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে এখনও ধারণা স্পষ্ট নয়। ছত্রাকের হেটেরোক্যারিওটিক অবস্থায় এক ধরণের নিউক্লিয়াসের আনুপাতিকভাবে সংখ্যাবৃদ্ধি এর একটি কারণ হতে পারে। অভিযোজন থেকে যে পরিবর্তন আসে তা স্থায়ী হয় না। যে সব ক্ষেত্রে স্থায়ী পরিবর্তন ঘটে সেখানে অনেকেই মিউটেশনকে কারণ বলে মনে করেন। বংশগতিতে নিউক্লিয়াসের অনস্বীকার্য গুরুত্ব মেনে নেওয়া সত্ত্বেও অনেকের ধারণা যে এ ব্যাপারে সাইটোপ্লাজমেরও কিছু ভূমিকা আছে। সাইটোপ্লাজমেও বংশগতির বাহক কিছু আছে এরকম প্রমাণ পাওয়া গেছে। পরিবেশের প্রভাবে এর ক্রমিক পরিবর্তনের ফলেও অভিযোজন ঘটতে পারে।

জাতিগত স্বাতন্ত্র্য (Physiologic specialization) :

আগেকার দিনে যে কোন প্রজাতিকে অঙ্গসংস্থান বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে একটি অভিন্ন সত্বা (entity) বলে মনে করা হত। কিন্তু সে ধারণা এখন বদলে গেছে। প্রকৃতিতে বংশধারায় নিয়ত পরিবর্তনের ফলে একই প্রজাতির মধ্যে এমন ভিন্ন ভিন্ন ধারার উপস্থিতি সম্ভব যাদের বিভিন্ন ধরণের বৈশিষ্ট্য দ্বারা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়। এদের বলা হয় **'ফিজিওলজিকাল রেস'** (Physiological race)। এইনসওয়ার্থের (G.C. Ainsworth, 1963) মতে ফিজিওলজিকাল রেস বলতে একই প্রজাতির অন্তর্গত এমন সব ধারা বা জাতিকে বোঝায় যাদের মধ্যে অঙ্গসংস্থানগত সাদৃশ্য থাকলেও পুষ্টিগত, জীবরসায়ণগত বা শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যে বা রোগসৃষ্টির ক্ষমতায় সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। যে সব শস্যের অনেক প্রকার ভ্যারাইটির (variety) বা জাতির চাষ হয় তাদের রোগ উৎপাদকদের মধ্যেই সাধারণতঃ অনেক স্বতন্ত্র জাতির বা ধারার সন্ধান পাওয়া যায়। পাকসিনিয়া গ্র্যামিনিস এই রকম ছত্রাকের একটি ভাল উদাহরণ। প্রাথমিক পর্যায়ে, কি ধরণের গাছকে আক্রমণ করে তার ভিত্তিতে, এর ছটি ভাগ রয়েছে যাদের 'ভ্যারাইটি' বা উপপ্রজাতি (Variety = Subspecies) বলা হয়। এদের মধ্যে *P. graminis tritici, P. graminis*

avenae ও *P. graminis secalis* যথাক্রমে গম, ওট ও রাইতে মরিচা রোগের সৃষ্টি করে। অপর তিনটি উপপ্রজাতি বিভিন্ন রকমের ঘাসে একই রোগের সৃষ্টি করে। এই ছত্রাকের প্রথমোক্ত উপপ্রজাতির *(P. graminis tritici)* প্রায় তিনশর মত স্বতন্ত্র জাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। স্ট্যাকমান (E.C. Stakman) নির্দেশিত গমের বারটি নির্দিষ্ট পার্থক্যমূলক ভ্যারাইটির (standard differential hosts) গাছে কৃত্রিম উপায়ে রোগের সৃষ্টি করে এবং রোগলক্ষণের মান তুলনামূলকভাবে পরীক্ষা করে ছত্রাকের জাতিগুলিকে পরস্পর থেকে আলাদা করা হয় ও এদের ক্রমিক সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীকালে আরও কয়েকটি গমের পার্থক্যমূলক ভ্যারাইটির সন্ধান পাওয়া গেছে। কোন জাতির অন্তর্গত বিভিন্ন ধারার মধ্যে পার্থক্যের আভাস পাওয়া গেলে এই সব গমের ভ্যারাইটির উপর কৃত্রিম উপায়ে আক্রমণ চালিয়ে তাদের রোগসৃষ্টির ক্ষমতায় কোন সুস্পষ্ট পার্থক্য ধরা পড়ে কিনা দেখা হয়। পার্থক্য দেখা গেলে তখন তাদের উপজাতি বা 'সাবরেস' (subrace) এর স্তরে উন্নীত করা হয়, যেমন 15 নম্বর জাতির মধ্যে রয়েছে 15, 15A ও 15B উপজাতি বা 77 এর মধ্যে 77, 77A, 77B ইত্যাদি উপজাতি। কোথাও আবার একটি উপজাতির মধ্যে রোগসৃষ্টির ক্ষমতায় সুস্পষ্ট পার্থক্যের ভিত্তিতে আরও পৃথকীকরণ সম্ভব হয়েছে, যেমন 15B—1, 15B—2, 15B—3 ও 15B—4। যদি গমের আরও কিছু পার্থক্যমূলক ভ্যারাইটির সন্ধান পাওয়া যায়, তখন তাদের উপর পরীক্ষা চালালে পরবর্তী পর্যায়ে এদের কোনটি হয়ত নূতন উপজাতি বা জাতি হিসাবে স্বীকৃতি পেতে পারে।

পাকসিনিয়া গ্র্যামিনিস ছাড়া, পাকসিনিয়া রিকনডাইটা, পাকসিনিয়া স্ট্রাইফর্মিস, মেলাম্পসোরা লিনি, উষ্টিলাগো মেইডিস, এরিসাইফি গ্রামিনিস, ফাইটফথোরা ইনফেসট্যানস প্রভৃতি অনেক ছত্রাকের ক্ষেত্রেই ফিজিওলজিকাল রেসের অস্তিত্ব আছে বলে জানা গেছে। ফাইটফথোরা ইনফেসট্যানস এর ক্ষেত্রে ফিজিওলজিকাল রেসকে চিহ্নিত করা হয় আলুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী যে জীনের (R gene) বিরুদ্ধে সেটি সক্রিয় তার সংখ্যা দ্বারা। যে জাতি R gene বিহীন আলু গাছে রোগ সৃষ্টি করে তাকে O race বলা হয়। যারা R_1 বা R_2 জীনবিশিষ্ট গাছে রোগ সৃষ্টি করে তাদের যথাক্রমে race 1 এবং race 2 বলা হয়। একই নিয়মে যারা R_1R_2 বা R_2R_4 জীনবিশিষ্ট গাছে রোগ সৃষ্টি করে তাদের race 1.2 ও race 2.4 বলে। ফিউজেরিয়াম অক্সিপোরাম এমন একটি ছত্রাক যা স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন গাছে উইল্ট রোগের সৃষ্টি

করে। এক একটি বিশিষ্ট ধারা বা উপপ্রজাতি (Special form = forma specialis = f. sp.) মাত্র একটি প্রজাতির গাছে রোগসৃষ্টি করতে সক্ষম, অন্য কোন প্রজাতির গাছে নয়। উদাহরণ *F. oxysporum* f. sp. *lycopersici*, *F. oxysporum* f. sp. *cubense* ও *F. oxysporum* f. sp. *udum* যথাক্রমে টম্যাটো, কলা ও অড়হড় গাছে রোগ সৃষ্টি করে মাত্র, অন্য কোন প্রজাতির গাছে পারে না। এদের প্রত্যেকের মধ্যে আবার একাধিক জাতির সন্ধান পাওয়া যায় যাদের রোগ উৎপাদন ক্ষমতায় সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক পুস্তক ও গবেষণাপত্রাদি

Day, P.R. 1960. Variations in phytopathogenic fungi. *Ann. Rev. Microbiol.* **14** : 1—16.

Fincham, J.R.S., and P.R. Day. 1979. "Fungal Genetics", 4th edition. Blackwell Scientific Publications, Oxford.

Lederberg, R. 1959. Bacterial variation. *Ann. Rev. Microbiol.* **3** : 1—12.

Nelson, R. R. 1963. Interspecific hybridization in the fungi. *Ann. Rev. Microbiol.* **17** : 31—48.

Tinline, R.D., and B.H. McNeill. 1969. Parasexuality in plant pathogenic fungi. *Ann. Rev. Phytopath.* **7** : 147—170.

Tousson, T. A., and P.E. Nelson. 1975. Variation and speciation with Fusaria. *Ann. Rev. Phytopathol.* **13** : 71—81

Watson, I.A. 1970. Changes in virulence and population shifts in plant pathogens. *Ann. Rev. Phytopathol.* **8** : 209-230.

Webster, R. K. 1974. Recent advances in the genetics of plant pathogenic fungi. *Ann. Rev. Phytopathol.* **12** : 331-353.

১ | গাছের রোগের লক্ষণ

রোগের আক্রমণ হলে গাছের দেহে নানারকম অস্বাভাবিকতার চিহ্ন ফুটে ওঠে যাকে বলা হয় রোগের লক্ষণ। এগুলি দেখেই বোঝা যায় যে গাছটি আর সুস্থ নেই, রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। গাছের রোগের বিভিন্ন লক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে এ সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ তথ্য জানা প্রয়োজন। বিভিন্ন ধরণের পরজীবী বা পরিবেশজনিত কারণের জন্যে একই গাছের দেহে নানা রকম রোগলক্ষণ বা বিকৃতির সৃষ্টি হতে পারে আবার বিভিন্ন কারণে সৃষ্ট রোগের ফলে একই গাছে বা আলাদা আলাদা গাছে প্রায় একই ধরণের রোগলক্ষণ দেখা দিতে পারে। খুব খুঁটিয়ে দেখলে হয়ত এসব ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য ধরা পড়ে, অন্যথায় নয়। অল্প কিছু রোগের ক্ষেত্রে একাধিক লক্ষণ গাছের দেহে দেখা দিতে পারে। অবশ্যই সব রোগলক্ষণগুলির উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। যেটিকে রোগের প্রধান লক্ষণ মনে করা হয় তার নামে অনেক সময় রোগের নামকরণও হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় করতে গেলে প্রধান লক্ষণটির উপর সমস্ত গুরুত্ব আরোপ না করে লক্ষণসমষ্টির বা রোগের সামগ্রিক চেহারার *(disease syndrome)* বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন হতে পারে। আর একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হল যে পরজীবীজনিত রোগে গাছের দেহে প্রথম যেখানে জীবাণু বা ভাইরাসের আক্রমণ হয় রোগলক্ষণ যে সেখানেই দেখা যাবে এমন কোন স্থিরতা নেই ; অনেক সময় দূরে কোথাও, কখনও বা কোন বিশেষ অঙ্গে, এমনকি গাছের সারা দেহেও রোগের লক্ষণ ফুটে উঠতে পারে।

রোগের লক্ষণ ছাড়াও রোগগ্রস্ত গাছের দেহে, সাধারণতঃ ত্বকের উপরে, অনেক সময় রোগ উৎপাদকের, যথা ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়ার, উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে এই উপস্থিতি বিশেষ বৈশিষ্ট্যমূলক ও সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একে রোগের চিহ্ন বা 'সাইন' (sign) বলা হয়। মরিচা, ভুষা বা ছাতাধরা রোগের ক্ষেত্রে এই চিহ্ন দেখেই রোগ নির্ণয় করা হয়ে থাকে (রেখাচিত্র ১০—ঘ, ঙ ও চ)। এই অধ্যায়ে আলোচনা রোগ লক্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

বিভিন্ন রোগলক্ষণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে তাদের কয়েকটি প্রাথমিক ভাগে ভাগ করা যেতে পারে : (ক) আক্রান্ত অংশের বা গাছের মৃত্যু বা

'নেক্রোসিস' (necrosis), (খ) অসমঞ্জস বৃদ্ধিজনিত বিকৃতি (growth abberration), (গ) রঙের পরিবর্তন (discolouration), এবং (ঘ) ঢলে পড়া বা 'উইলটিং' (wilting)। নীচে এইসব লক্ষণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

ক। নেক্রোসিস (necrosis)

রোগের আক্রমণের ফলে গাছের দেহকোষের মৃত্যু হতে পারে যাকে বলে **নেক্রোসিস** (necrosis)। রোগজনিত মৃত্যু শুধু আক্রান্ত অঞ্চলের কোষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে অথবা ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়ে পুরো অঙ্গ এমনকি গাছেরও মৃত্যু ঘটতে পারে। নেক্রোসিস মূলতঃ তুরকম : পচন বা **'রট'** (rot) ও শুকিয়ে যাওয়া বা **'ব্লাইট'** (blight)।

পচন (Rot) :

সাধারণতঃ ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণের ফলে গাছের দেহে এই ধরণের রোগলক্ষণ দেখা দেয়। পরজীবীর দেহনিঃসৃত এনজাইমের ক্রিয়ার ফলে আক্রান্ত অংশে পরস্পর সংলগ্ন কোষগুলির মাঝখানের অর্থাৎ এজমালি দেওয়াল, মধ্যচ্ছদা বা 'মিডল ল্যামেলা' (middle lamella), নষ্ট হয়ে যায় ও কোষগুলি প্রথমে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং পরে মরে যায়। তখন এই অংশটি পচে গেছে বলা হয়। পচন তু রকমের হতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে আক্রান্ত অংশ খুব তাড়াতাড়ি পচে যায় আর মৃত কোষগুলি থেকে জল বেরিয়ে আসার ফলে পচা অংশটি নরম ও ভিজে হয়। পচা অংশের রঙ অপরিবর্তিত থাকতে পারে বা হালকা বাদামী রঙের হয়ে যেতে পারে। একে ভিজে বা নরম পচা (soft rot) বলে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পচা অংশ শুকনো ধরণের হয়, খুব ধীরে ধীরে পচে—ফলে বেশি ছড়ায় না। পচা অংশ সাধারণতঃ গাঢ় বাদামী বা বা কালচে বাদামী রঙের হয়। একে শুকনো পচা (dry rot) বলে। এই ধরণের রোগলক্ষণ সব রকমের গাছে এবং গাছের বিভিন্ন অঙ্গে দেখা দিতে পারে। নীচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হল।

১। **বীজ পচা (Seed rot or seed decay) :** অনেক রোগে জমিতে লাগানোর পরে অঙ্কুরোদ্গমের আগেই ছত্রাকের আক্রমণে বীজ পচে নষ্ট হয়ে যায় যার ফলে চারা বেরোনর কোন সুযোগই থাকে না ; যেমন ফিউজেরিয়ামের আক্রমণে ছোলা ও মটরের বীজ পচা রোগ।

২। **চারা ধসা (Damping off of seedlings) :** কিছু রোগে চারা বেরোনোর কয়েকদিনের মধ্যেই জমিতে থাকা জীবাণুর আক্রমণে মাটির ঠিক

উপরে চারার গোড়ার অংশ পচে নরম হয়ে যায়। ফলে ভার বইতে না পেরে চারাটি তখন ভেঙ্গে বা ধসে পড়ে ও মরে যায়। একটু বড় চারায় এই ধরণের রোগলক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় না। পিথিয়াম, ফাইটফথোরা, রাইজোক-টোনিয়া ইত্যাদির আক্রমণ হলে, চারাতলায় টম্যাটো, তামাক, লঙ্কা, কপি প্রভৃতি সবজীতে এই রোগলক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন রকমের বীন গাছে রাইজোকটোনিয়ার আক্রমণ হলে একই রোগলক্ষণ দেখা যায়।

৩। **গোড়া পচা (Foot rot) :** ঠিক একই ধরণের রোগ লক্ষণ গাছে চারার পরবর্তী অবস্থাতে দেখা গেলে গাছটি ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়, কখনও বা ভেঙ্গে পড়ে। তখন একে শুধু গোড়া পচা বলে। উদাহরণ : ফিউজেরিয়াম-জনিত ধান ও মটরের স্ক্লেরোশিয়ামজনিত ছোলা ও চীনা বাদামের এবং পিথিয়াম-জনিত পেঁপের গোড়া পচা রোগ।

৪। **শিকড় পচা (Root rot) :** রোগের ফলে শিকড় পচে যেতে পারে। সাধারণতঃ ছোট শিকড়গুলি এইভাবে নষ্ট হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে মাটি থেকে খাবার সংগ্রহে বিঘ্ন ঘটায় গাছটি দুর্বল হয়ে পড়ে, অবস্থাবিশেষে মরে যেতেও পারে। রাইজোকটোনিয়ার আক্রমণে ছোলা ও তুলা, অ্যাফানোমাইসেস (*Aphanomyces*) এর আক্রমণে মটর ও ফোমিস (*Fomes*) এর আক্রমণে রবার গাছে শিকড় পচা রোগ হতে দেখা যায়।

কাণ্ড বা ডাঁটা পচা (Stem rot) : এর ফলে গাছের কাণ্ডে ত্বক সংলগ্ন অংশ পচে সেখানে নানা আকৃতির দাগের সৃষ্টি হতে পারে (রেখাচিত্র—৯ক)। কখনও বা পচন চলতে থাকায় পচা দাগ প্রসারিত হয়ে বা একাধিক দাগ জুড়ে গিয়ে কাণ্ডের চারিধার ঘিরে ফেলতে পারে। কিছু রোগে কাণ্ডের ভিতরের অংশও পচে যায়। এর ফলে গাছ খুব দুর্বল হয়ে কখনও বা ভেঙ্গে পড়ে বা শুকিয়ে যায়। উদাহরণ : ম্যাক্রোফোমিনাজনিত পাটের, স্ক্লেরোশিয়ামজনিত ধানের ও সিউডোমোনাসজনিত ভুট্টার ডাঁটা পচা রোগ ও কোলেটোট্রাইকাম-জনিত আখের ডাঁটা পচা রোগ।

সবজী পচা (Vegetable rot) ও ফল পচা (Fruit rot) : ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণের ফলে সবজী ও ফলের গায়ে পচা দাগ দেখা দেয়। খুব দ্রুত পচনের ফলে দাগটি যেমন বাড়তে থাকে সবজী বা ফলের ভিতরের অংশও দ্রুত পচতে থাকে (রেখাচিত্র—৯খ)। এই অবস্থায় নড়াচড়ার ফলে বা ধাক্কা লেগে উপরের খোসা ছিঁড়ে বা ফেটে গেলে দেখা যায় যে ভিতরের অংশ পচে নরম হয়ে গেছে (soft rot) ; হাত দিলে ভেজা মনে হয়। বাতাসে

আর্দ্রতা কম থাকলে সবজী বা ফল থেকে দ্রুত বাষ্প মোচনের ফলে সেটি শুকিয়ে ছোট ও কালো হয়ে যায় আর খোসা কুঁচকে যায়। লাউ, ঝিঙে ও পটলে পিথিয়াম, বেগুনে ফোমপসিস (*Phomopsis*), পেয়ারায় ফাইটফথোরা ও বট্রিওডিপ্লোডিয়া (*Botryodiplodia*), আপেল ও কমলালেবুতে পেনিসিলিয়াম এবং আলুতে এরউইনিয়ার আক্রমণ হলে এই ধরণের পচন ঘটতে দেখা যায়।
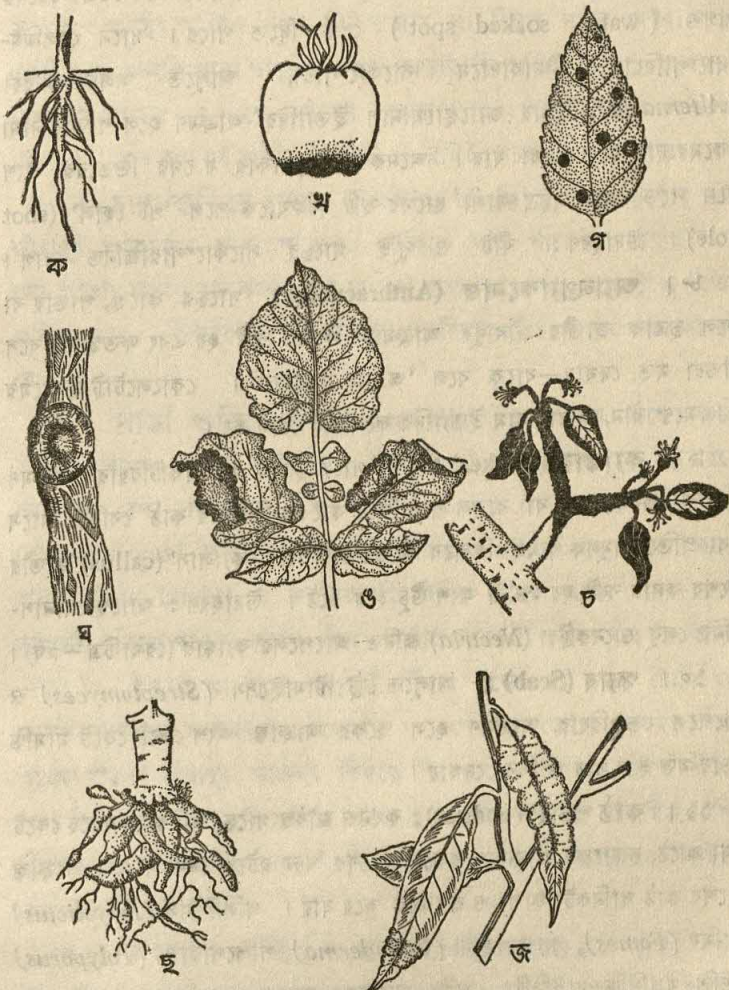
রেখাচিত্র—৯ গাছে রোগের নানাবিধ লক্ষণ—
(ক) কাণ্ড পচা, (খ) ফল পচা, (গ) পাতায় দাগ. (ঘ) ক্যাঙ্কার, (ঙ) পাতা শুকিয়ে যাওয়া, (চ) উপশাখা শুকিয়ে যাওয়া, (ছ) শিকড়ে অর্বুদ, (জ) পাতা গুটিয়ে যাওয়া (লীফ কার্ল)।

৭। **পাতায় দাগ (Leaf spot) :** ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণে ও অন্যান্য নানা কারণে পাতায় বিভিন্ন রকম দাগের সৃষ্টি হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাগগুলি সীমিত প্রকৃতির এবং বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার হয়। কখনও বা দাগগুলি জুড়ে যেতে পারে। দাগগুলি সাধারণতঃ হালকা থেকে গাঢ় বাদামী রঙের ও শুকনো ধরণের হয়। ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণের ফলে ভেজা ধরণের দাগও (water soaked spot) দেখা দিতে পারে। ধানে হেলমিন-থোস্পোরিয়াম, চীনাবাদামে সার্কোস্পোরা, আলুতে অলটারনেরিয়া *(Alternaria)*, তুলায় জ্যান্থোমোনাস ইত্যাদির আক্রমণ হলে পাতায় নানা রকমের দাগ হতে দেখা যায়। অনেক সময় বৃত্তাকার দ গের ভিতরের অংশ খসে পড়ে গেলে ছিদ্রওয়ালা দাগের সৃষ্টি হয় যাকে বলে 'শট হোল' (shot hole)। উদাহরণ : বীট ও পুঁই গাছের সার্কোস্পোরাজনিত রোগ।

৮। **অ্যানথ্র্যাকনোজ (Anthracnose) :** গাছের কাণ্ডে, পাতায় বা ফলে ছত্রাক জাতীয় জীবাণুর আক্রমণে ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং ক্ষতস্থানটি বসে যাওয়া মত দেখায়—যাকে বলে 'অ্যানথ্র্যাকনোজ'। কোলেটোট্রাইকামের আক্রমণে বীন, লঙ্কা, আম ইত্যাদির ফলে এই রোগ হয়।

৯। **ক্যাঙ্কার (Canker) :** বড় গাছে ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণ হলে অনেকসময় ছাল বা বাকল পচে গিয়ে কাণ্ডের ভিতরের কাঠ বেরিয়ে আসে এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে ক্ষতের চারিপাশে 'ক্যালাস' (callus) জাতীয় বিশেষ কলার সৃষ্টি হয় ও ঐ অংশ উঁচু হয়ে ওঠে। উদাহরণ : জ্যান্থোমোনাস-জনিত লেবু ও নেকট্রিয়া *(Nectria)* জনিত আপেলের ক্যাঙ্কার (রেখাচিত্র—৯ঘ)।

১০। **স্ক্যাব (Scab) :** আলুতে স্ট্রেপ্টোমাইসেস *(Streptomyces)* ও আপেলে ভেঞ্চুরিয়ার আক্রমণ হলে ত্বকের আক্রান্ত অংশ ফেটে ফেটে মামড়ি পড়ায় মত হয়ে যায় ও বিবর্ণ দেখায়।

১১। **কাঠ পচা (Wood rot) :** কখনও জীবন্ত গাছে, অধিকাংশ সময়ে কেটে রাখা কাঠে, ছত্রাকের আক্রমণে শুকনো ধরণের পচন ঘটতে দেখা যায়। আক্রান্ত অংশের কাঠ খানিকটা ফাঁপা ও ঝরঝরে হয়ে যায়। পলিষ্টিক্টাস *(Polystictus)* ফোমিস *(Fomes)*, গ্যানোডার্মা *(Ganoderma)*, পলিপোরাস *(Polyporus)* প্রভৃতি ব্যাসিডিওমাইসিটিস শ্রেণীর ছত্রাকের আক্রমণে কাঠের প্রচুর ক্ষতি হয়। পচনের সময় সেলুলোজ বেশি নষ্ট হলে পচা অংশের রঙ হালকা বাদামী ধরণের দেখায় তখন বলে 'ব্রাউন রট' ; আর 'হোয়াইট রট' (white rot) এর ক্ষেত্রে লিগনিন বেশি নষ্ট হওয়ায় ঐ অংশের রঙ সাদাটে দেখায়।

১২। **ভিতর পচা (heart rot) :** প্রতিকূল পরিবেশজনিত রোগে কখনও গাছের মাঝখানের অংশ পচে বাদামী বা কালো রঙের হয়ে যায়। উদাহরণ আলুর 'ব্ল্যাকহার্ট' (black heart) রোগ।

শুকিয়ে যাওয়া (Blight) : কিছু ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণে জীবাণুনিঃসৃত বিষাক্ত যৌগ বা 'টক্সিন' (toxin) এর প্রভাবে কোষের মৃত্যু হলে গাছের আক্রান্ত অংশ সীমিতভাবে বা বিস্তৃত ভাবে অথবা গাছের একটি অংশ এমনকি পুরো গাছটিই বেশ তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। অনেকসময় দেখা যায় গাছের যে অংশে আক্রমণ হয়েছে তার থেকে দূরবর্ত্তী অংশ শুকিয়ে যাচ্ছে। একে বলা হয় ব্লাইট (blight)। ব্লাইট নানা ধরণের হতে পারে।

১। **চারা শুকিয়ে যাওয়া (Seedling blight) :** চারার গোড়ার অংশে জীবাণুর আক্রমণের ফলে পাতাগুলি শুকিয়ে যেতে পারে। আবার অনেক সময় পাতায় প্রথমে অনেকগুলি দাগ (spot) হতে দেখা যায়, পরে পুরো পাতাই শুকিয়ে যায়। উদাহরণ : হেলমিনথোস্পোরিয়ামজনিত ধানের বাদামী দাগ রোগ।

২। **পাতা শুকিয়ে যাওয়া (Leaf blight) :** অনেক রোগে পাতায় সীমিত ধরণের দাগের সৃষ্টি হয়। কখনও এই দাগের চারিধারে হলুদ রঙের সরু দাগ দেখা যায় যাকে বলে 'হ্যালো' (halo), যেমন—ব্যাকটিরিয়াজনিত *(Pseudomonas)* তামাকের 'ওয়াইল্ড ফায়ার' (wild fire), বীনের 'হ্যালো ব্লাইট' (halo blight) ও অলটারনেরিয়াজনিত গমের পাতা ধসা রোগ। দাগগুলি বাড়তে থাকলে অনেক সময় পাতার অনেকটা শুকিয়ে যায় (রেখা চিত্র —৯৬)। কখনও বা পুরো পাতাই শুকিয়ে খড়ের রঙ নেয়, যেমন ধানে জ্যান্থোমোনাসের আক্রমণ হলে দেখা যায়। বেশ কিছু রোগে এরকমও দেখতে পাওয়া যায় যে জীবাণুর আক্রমণ শিকড়ে বা গাছের গোড়ার দিকে সীমাবদ্ধ অথচ উপরদিকে পাতাগুলি শুকিয়ে যাচ্ছে। উদাহরণ ওটের হেলমিনথোস্পো-রিয়ামজনিত 'ভিক্টোরিয়া ব্লাইট' (Victoria blight) ও জোয়ারের 'মাইলো' রোগ (milo disease)।

৩। **উপশাখা শুকিয়ে যাওয়া (Twig blight) :** গাছের শাখা প্রশাখায় রোগের আক্রমণ হলে অনেকসময় উপরের অংশ শুকিয়ে মরে যায় (রেখাচিত্র—৯৮)। জমিতে কোন প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাব হলেও শাখাগুলি এইভাবে শুকিয়ে যেতে পারে। স্ক্লেরোটিনিয়ার আক্রমণে অনেক গাছে এরকম হয়। অনেকসময় উপশাখা মাথার দিক থেকে শুকোতে থাকে ; যাকে

বলে 'ডাই ব্যাক' (die back)। উদাহরণ: কোলেটোট্রাইকামজনিত লঙ্কার ডাইব্যাক রোগ।

খ। অসমঞ্জস বৃদ্ধিজনিত বিকৃতি (Growth aberrations) বিভিন্ন হরমোন গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। পরজীবীর বা ভাইরাসের আক্রমণে, তাদের প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে, দেহে প্রয়োজনীয় হরমোনের পরিমাণে তারতম্য ঘটতে পারে। এর ফলে কোষ বিভাজনের স্তরে নানারকম অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হতে পারে, যেমন কোষ বিভাজন দ্রুততর বা আরও শ্লথ হওয়ায় স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি বা কম কোষের সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্রথম অবস্থাকে বলা হয় **'হাইপারপ্লাসিয়া'** (hyperplasia) আর দ্বিতীয় অবস্থাকে **'হাইপোপ্লাসিয়া'** (hypoplasia)। এ ছাড়াও কোষের অস্বাভাবিক আয়তনবৃদ্ধি বা **'হাইপারট্রফি'** (hypertrophy) ঘটতে পারে। বিভাজনের ফলে সৃষ্ট নূতন কোষ স্বাভাবিকের তুলনায় কম বাড়তে পারে বা নষ্টও হয়ে যেতে পারে, যে অবস্থাকে বলে **'এট্রফি'** (atrophy)। এই সব নানা কারণে রোগাক্রান্ত গাছে সামগ্রিকভাবে বা স্থানীয়ভাবে আক্রমণের জায়গায় নানা রকম বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিকৃতি দেখা দিতে পারে।

১। খর্বতা (Stunting = Dwarfing): ভাইরাসের আক্রমণ হলে সাধারণতঃ গাছের বৃদ্ধি বিশেষ ব্যাহত হয়, ফলে গাছটি স্বাভাবিকের তুলনায় বেশ ছোট হয়। ভাইরাসের আক্রমণজনিত এই খর্বতা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

২। অর্বুদ বা 'গল' (Gall): ছত্রাক, ব্যাকটিরিয়া ও নিমাটোডের আক্রমণে অনেক সময় আক্রান্ত অংশ ফুলে ওঠায় অর্বুদ বা গলের সৃষ্টি হয় রেখাচিত্র—৯ছ)। সাধারণতঃ অর্বুদগুলি খুব বড় হয় না। বাঁধাকপির প্লাজমোডিওফোরাজনিত ক্লাব রুট (club root), ভুট্টার উস্টিলাগোজনিত স্মাট, আলুর সিনকাইট্রিয়ামজনিত ওয়ার্ট (wart) ও বিভিন্ন সবজীর নিমাটোড *(Meloidogyne sp)* জনিত শিকড় ফোলা (root gall) রোগে এই ধরণের লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু অ্যাগ্রোব্যাকটিরিয়ামের আক্রমণে অনেক প্রজাতির গাছে ক্রাউন গল *(Crown gall)* রোগে যে সব অর্বুদের সৃষ্টি হয় সেগুলি 'টিউমার' (tumour) জাতীয় অর্থাৎ সততবর্দ্ধনশীল। অনেক সময় এগুলি বেশ বড় আকারের হয়।

৩। অসমঞ্জস বৃদ্ধিজনিত পাতার নানাবিধ রোগলক্ষণ (Rolling, puckering, crinkling and frenching of leaf): পাতার বিভিন্ন অংশ

রোগের আক্রমণের ফলে সমভাবে বৃদ্ধি না পাওয়ায় পাতার আকৃতিতে নানারকম বিকৃতির চিহ্ন দেখা দিতে পারে। পাতার উপরিতলের তুলনায় নীচের তলের বৃদ্ধি বেশি হলে পাতা কিনারা বরাবর উপরদিকে গুটিয়ে যায় যাকে বলে 'লীফ কার্ল' (Leaf curl)। শিরা উপশিরা যদি শিরা-মধ্যবর্তী অঞ্চলের তুলনায় কম বাড়ে তাহলে পাতার উপরিতল কুঞ্চিত হওয়ার ফলে অনেকটা ডুমো ডুমো দেখায়। এই অবস্থাকে বলে 'পাকারিং' (puckering)। ভাইরাসজনিত টম্যাটোর লীফ কার্ল ও ছত্রাক ট্যাফ্রাইনা (*Taphrina deformans*) জনিত পীচ গাছের লীফ কার্ল রোগে উপরোক্ত দু ধরণের রোগলক্ষণই দেখা যায় (রেখাচিত্র—৯জ)। অনেক রোগের আক্রমণে বিপরীতও ঘটে। শিরা মধ্যবর্তী অংশ যদি শিরা উপশিরার তুলনায় কম বাড়ে, তখন পাতার উপরিতল উঁচুনীচু বা কিছুটা কুঞ্চিত (crinkling) দেখায়। উদাহরণ: আলুর 'ক্রিঙ্কল' (Crinkle) রোগ। অনেক ভাইরাস রোগের আক্রমণে পাতার শিরা উপশিরা স্বাভাবিক আকৃতির হলেও ফলকটি বিশেষ বাড়ে না, যার ফলে এটিকে অনেকটা ফার্ণের পাতার মত দেখায়। এই অবস্থাকে বলে 'ফ্রেঞ্চিং' (frenching)।

৪। **উইচেস ব্রুম (Witches broom):** কিছু রোগে কাণ্ডের ডগায় ঘনঘন শাখাবিস্তারের ফলে ঝাঁটার মত একগুচ্ছ উর্দ্ধমুখী শাখা দেখা যায় যার গায়ে ছোট ছোট কিছুটা স্ফীত ধরণের পাতাও থাকতে পারে। আম গাছে এই ধরনের বিকৃতি প্রায়ই চোখে পড়ে (mango malformation)।

গ। রঙের পরিবর্ত্তন (Discolouration)

প্রধানতঃ ভাইরাসের আক্রমণে, কখনও বা অন্য রোগে, পাতার স্বাভাবিক সবুজ রঙ আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণভাবে বিবর্ণ হয়ে যেতে পারে। বিবর্ণ হবার মূল কারণ হল রোগজনিত অস্বাভাবিক পরিস্থিতির ফলে পাতার কোষে ক্লোরোফিল (chlorophyll) কণা নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং / বা যথেষ্ট পরিমাণে নূতন ক্লোরোফিল তৈরী না হওয়া। যে হলুদ রঙ স্বাভাবিক অবস্থায় সবুজ রঙের আড়ালে চাপা পড়ে থাকে, ক্লোরোফিলের অভাব হলে সেই রঙই তখন ফুটে ওঠে।

১। **পুরোপুরি হলদে হয়ে যাওয়া (yellows):** ভাইরাস বা মাইকোপ্লাজমার আক্রমণে অথবা প্রয়োজনীয় কোন বিশেষ খাদ্য উপাদানের অভাব ঘটলে পাতা পুরোপুরি হলদে হয়ে যেতে পারে। ধানের 'ইয়োলো ডোয়ার্ফ' (yellow dwarf) এবং পীচের 'ইয়েলো' (peach yellows) রোগে এই রকম হতে দেখা যায়।

২। **মোজেইক (Mosaic):** সাধারণতঃ ভাইরাসের আক্রমণে ইতস্ততঃ

বিক্ষিপ্তভাবে পাতার সবুজ রঙ বিবর্ণ হয়ে যাওয়ায় যখন গাঢ় সবুজের সঙ্গে হালকা সবুজ (হলদেটে সবুজ) বা হলুদ অংশ ছিটিয়ে থাকতে দেখা যায় তখন তাকে 'মোজেইক' (mosaic) বলা হয়, যেমন তামাক, শশা ও বীনের মোজেইক রোগ (রেখাচিত্র ১০ক)।

৩। **ছিটেদাগ বা 'মটল' (Mottle) :** ভাইরাস আক্রান্ত গাছে অনেক সময় দেখা যায় যে পাতার সবুজ রঙের সঙ্গে হালকা সবুজ বা হলুদ রঙের বিন্দু বিন্দু দাগ থাকে যা অনেকটা রঙের ছিটের মত দেখায়। উদাহরণ : আমের মোজেইক রোগ।
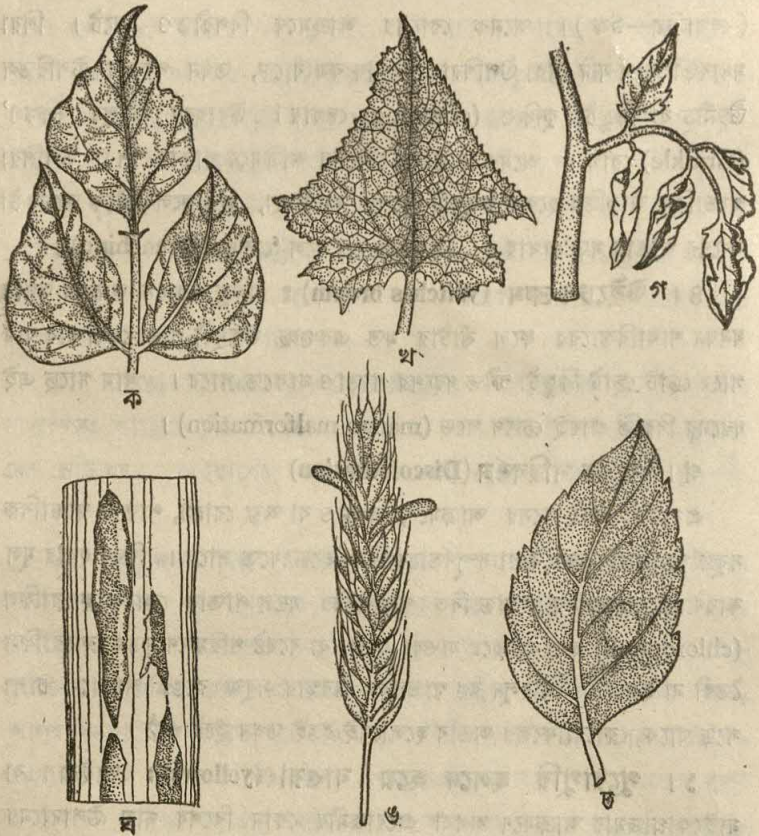
রেখাচিত্র-১০ গাছে রোগের লক্ষণ (ক—গ) ও রোগের চিহ্ন (ঘ—চ)
(ক) পাতায় মোজেইক, (খ) পাতায় শিরাবন্ধনী, (গ) পাতা ঢলে পড়া (উইল্ট), (ঘ) পাতায় মরিচা রোগ, (ঙ) পুষ্পমঞ্জরীতে আর্গট ও (চ) পাতায় (ছাতাধরা) পাউডারি মিলডিউ)।

৪। **শিরাস্বচ্ছতা (Vein Clearing) :** ভাইরাস রোগে পাতায় শিরা সংলগ্ন প্যারেনকাইমা কোষের ক্লোরোফিল নষ্ট হয়ে গেলে শিরা সংলগ্ন অঞ্চলের রঙ হালকা হয়ে স্বচ্ছ হয়ে যেতে পারে, যেমন দেখা যায় লেটুসের 'বিগ ভেইন' (big vein) ও ঢেড়সের 'ইয়েলো ভেইন মোজেইক' (yellow vein mosaic) রোগে।

৫। **শিরাবন্ধনী (Vein banding) :** ভাইরাসের আক্রমণে পাতার সবুজ রঙ যদি নষ্ট হয়ে যায় অথচ শিরা সংলগ্ন বেশ চওড়া অংশের রঙ গাঢ় সবুজ থাকে তখন তাকে শিরাবন্ধনী বলা হয় (রেখাচিত্র—১০খ)। উদাহরণ : গোলাপের মোজেইক।

৬। **বেগুনী বা লালচে রঙ ধারণ (Purpling) :** কিছু ভাইরাস বা প্রতিকূল পরিবেশজনিত রোগে পাতায় 'অ্যান্থোসায়ানিন' (anthocyanin) নামক রঞ্জক পদার্থের পরিমাণ স্বাভাবিকের তুলনায় খুব বেশী বেড়ে গেলে পাতার রঙ বেগুনী বা লালচে হয়ে যায়। বিশেষ করে কচি পাতায় এই ধরণের রঙের পরিবর্তন চোখে পড়ে। ভাইরাস আক্রান্ত ওট গাছে এবং জমিতে ফসফরাসের অভাবে অনেক গাছে এই লক্ষণ দেখা যায়। ভাইরাসের আক্রমণ হলে টিউলিপের ফুলে নানা রকম রঙের আশ্চর্য সংমিশ্রণ ঘটতে দেখা যায়। একে বলে 'বাড ব্রেক' (bud break)। পীচের ছত্রাকজনিত লীফ কার্ল (*C.O. Taphrina deformans*) রোগেও কচি পাতাগুলি লালচে রঙ ধারণ করে।

(ঘ) ঢলে পড়া (Wilting)

ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়াজনিত উইল্ট রোগ হলে প্রথম দিকে দিনের বেলা নীচের দিকের একটি-দুটি পাতা নেতিয়ে পড়ে, আবার সন্ধ্যায় তাদের স্বাভাবিক সতেজ অবস্থায় ফিরে আসে। ক্রমশ নেতিয়ে পড়াটা স্থায়ী হয় ও আরও উপরদিকের পাতায় এই লক্ষণ দেখা দিতে থাকে (রেখাচিত্র—১০গ)। নেতিয়ে পড়া পাতাগুলি হলদে হয়ে যেতে পারে এবং পরে শুকিয়ে যায় বা তার আগেই ঝরে পড়ে যায়। ছোট গাছ এই রোগে আক্রান্ত হলে অনেক সময় নীচের দিকের সব পাতা ঝরে পড়ে কিন্তু মাথার দিকে একগুচ্ছ ছোট পাতা থেকে যায়। এই রোগলক্ষণ শুধু ছোট নয় বড় বড় গাছেও দেখতে পাওয়া যায় এবং এর ফলে গাছের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়। তুলা, ও টম্যাটোর ফিউজেরিয়াম ও ভার্টিসিলিয়াম উইল্ট, অড়হর ও কলার ফিউজেরিয়াম ও আলুর ভার্টিসিলিয়াম উইল্ট, ওক উইল্ট ও ডাচ এলম রোগে এই ধরণের রোগলক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়।

১০ | রোগ উৎপাদক ও গাছের রোগ

রোগ উৎপাদকের যে অংশ গাছের দেহের সংস্পর্শে এলে সেখানে রোগ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে তাকে বলা হয় **'ইনোকুলাম'** (inoculum)। রোগ সৃষ্টি করার সম্ভাবনা থাকলেই যে ইনোকুলাম সব সময়ে গাছে রোগ সৃষ্টি করতে পারে তা নয়, অবস্থা বিশেষে ইনোকুলাম নিষ্ক্রিয় বা অকার্যকারী (ineffective) হতেও পারে। যে ইনোকুলাম অনুকূল পরিবেশে গাছে রোগের সৃষ্টি করতে সক্ষম তাকে সক্রিয় বা কার্যকরী (effective) ইনোকুলাম বলে। চাষের মরশুমে যে ইনোকুলাম থেকে গাছে বা ফসলে রোগের সূত্রপাত হয় তাকে বলা হয় **প্রাথমিক পর্যায়ের ইনোকুলাম** (primary inoculum)। রোগের প্রাথমিক সূত্রপাতকারী জীবাণু বা প্রাথমিক ইনোকুলাম আক্রান্ত বীজে বা গাছে সুপ্ত অবস্থায় থাকে, জমিতে বা জমিতে পড়ে থাকা গাছের অংশ বিশেষে সক্রিয় অথবা সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে, এমনকি বাহক পতঙ্গের দেহের ভিতরেও থাকতে পারে। প্রাথমিক ইনোকুলাম থেকে গাছের রোগ হলে আক্রান্ত অংশে রোগজীবাণুর সংখ্যাবৃদ্ধি হয়। যখন এই রোগজীবাণু বাতাস, জল বা পতঙ্গের মাধ্যমে বা অন্য কোন পদ্ধতিতে স্থানান্তরিত হয়ে অন্য সুস্থ গাছের সংস্পর্শে আসে ও গাছের দেহে রোগের সৃষ্টি করে তখন তাকে বলা হয় **দ্বিতীয় পর্যায়ের ইনোকুলাম** (secondary inoculum)।

প্রাথমিক ইনোকুলাম থেকে মরশুমে রোগের সূত্রপাত হলেও রোগের প্রসার অর্থাৎ নূতন নূতন গাছে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে দ্বিতীয় পর্যায়ের ইনোকুলামের উপরে। ছত্রাক জাতীয় রোগ উৎপাদকের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের ইনোকুলাম ভিন্ন ধরণের হতে পারে।

ছত্রাক ছাড়া অধিকাংশ পরজীবীর ক্ষেত্রে ইনোকুলামের দিক থেকে বিশেষ কোন বৈচিত্র্য দেখা যায় না। ভাইরাস কণিকা, বিশেষ করে এর নিউক্লিয়িক অ্যাসিড, এবং ব্যাকটিরিয়ার দেহকোষই ইনোকুলাম হিসাবে কাজ করে থাকে। নিমাটোড নিজে অথবা তার ডিম ও সিস্ট দ্বারা রোগের সূচনা করতে পারে। সপুষ্পক পরজীবীর বীজই তার ইনোকুলাম হিসাবে কাজ করে। কিন্তু ছত্রাকের বেলায় ইনোকুলাম নানা ধরণের হতে দেখা যায়। এই বৈচিত্র্যের কিছু আভাস নীচে দেওয়া হল।

(ক) পাতলা দেওয়ালযুক্ত সাধারণ হাইফা : ফিউজেরিয়াম অক্সিস্পোরাম, রাইজোক্টনিয়া সোল্যানি, পিথিয়াম ডিব্যারীয়ানাম।

(খ) কয়েকটি হাইফার সহযোগে গঠিত সরু ফিতা বা 'ষ্ট্র্যাণ্ড' (strand) : ফোমিস অ্যানোসাস, স্ক্লেরোশিয়াম রল্‌ফসিআই।

(গ) অনেকগুলি হাইফার সহযোগে গঠিত শিকড়ের মত 'রাইজোমর্ফ' (rhizomorph) : আর্মিলারিয়া মিলীয়া।

(ঘ) অনেকগুলি হাইফার সহযোগে গঠিত সাধারণত গোলাকার স্ক্লেরোশিয়াম (sclerotium) : স্ক্লেরোশিয়াম রল্‌ফসিআই, রাইজোক্টোনিয়া ব্যাটাটিকোলা।

(ঙ) খুব ছোট ছোট ধরণের স্ক্লেরোশিয়াম (microsclerotium) : ভার্টিসিলিয়াম অ্যালবো-এট্রাম্।

চ। সুপ্ত অবস্থায় থাকা মাইসীলিয়াম (dormant mycelium) যার হাইফার দেয়াল মোটা ও বাদামী রঙের : ভার্টিসিলিয়াম অ্যালবো-এট্রাম

ছ। জুস্পোর (zoospore): পিথিয়াম, ফাইটোফথোরা, অ্যাফানোমাইসেস প্লাজমোডিওফোরা।

জ। পাতলা দেওয়ালবিশিষ্ট কনিডিয়াম (conidium) : ফাইটফথোরা, এরিসাইফি, পেরোনোস্পোরা, কোলেটোট্রাইকাম।

ঝ। মোটা দেওয়ালবিশিষ্ট কনিডিয়াম : হেলমিনথোস্পোরিয়াম, অল্টারনোরিয়া।

ঞ। মোটা দেওয়ালবিশিষ্ট ক্ল্যামিডোস্পোর (chlamydospore): পিথিয়াম, ফিউজেরিয়াম, উস্টিলাগো।

ট। যৌন মিলনের ফলে উৎপন্ন স্পোর (sexual spore) :

১। উস্পোর (oospore) : পেরোনোস্পোরা, স্ক্লেরোস্পোরা *(Sclerospora)*, প্লাজমোপারা *(Plasmopara)*।

২। এসিওস্পোর (aeciospore) : পাকসিনিয়া।

৩। অ্যাস্কোস্পোর (ascospore) : ভেঞ্চুরিয়া, ক্ল্যাভিসেপ্স, ট্যাফ্রাইনা।

৪। ব্যাসিডিওস্পোর (basidiospore) : পাকসিনিয়া, এক্সোব্যাসিডিয়াম *(Exobasidium)*, ম্যারাসমিয়াস *(Marasmius)*।

ঠ। কিছু এককোষী ছত্রাক ব্যাকটিরিয়ার মত রোগজীবাণু হিসাবে কাজ করে অর্থাৎ তাদের পুরো দেহটাই ইনোকুলাম। উদাহরণ: ওলপিডিয়াম ব্র্যাসিকি *(Olpidium brassicae)*।

রোগ উৎপাদকের সাফল্য তার প্রকৃতিগত রোগসৃষ্টির ক্ষমতা ছাড়াও আংশিকভাবে নির্ভর করে (ক) তার উদ্বর্তন ক্ষমতা, (খ) উর্বরতা বা ইনোকুলাম উৎপাদন ক্ষমতা, (গ) উপযুক্ত সময়ে যথেষ্ট পরিমাণে ও বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ইনোকুলামের বিস্তার ইত্যাদির উপর। এগুলি অনেকটাই রোগ উৎপাদকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এছাড়া পোষক গাছের রোগ সংবেদনশীলতা বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং আক্রমণের সময়কার ও তার কিছুটা আগের ও পরের আবহাওয়ার উপরও রোগ উৎপাদকের সাফল্য নির্ভর করে। রোগ উৎপাদকের প্রাসঙ্গিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে।

রোগ উৎপাদকের উদ্বর্তন ক্ষমতা (Survival of plant pathogen)

রোগ উৎপাদকের প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার ও বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা রোগসৃষ্টিতে তার সাফল্য নিয়ন্ত্রিত করে। তাছাড়া ইনোকুলাম গাছ থেকে গাছে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার উপরও এই সাফল্য অনেকটা নির্ভর করে। গাছে রোগের সফল আক্রমণের জন্য জীবাণুর ছড়িয়ে পড়ার এই অবিচ্ছিন্নতা ভাইরাস রোগের ক্ষেত্রে যেভাবে প্রযোজ্য অন্যত্র সেরকম নয়। বহুবর্ষজীবী (perennial) গাছে অনেক সময় রোগজীবাণু স্থায়ীভাবে থাকলেও সারা বছরই সক্রিয় অবস্থায় থাকে না। মরশুমী (annual) গাছের ক্ষেত্রে চাষের ৩ থেকে ৬ মাস ছাড়া বছরের বাকী সময়টা রোগ উৎপাদক গাছের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হয়। পৃথিবীর নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে সাধারণতঃ শীতকালে ও গ্রীষ্মমণ্ডলে গ্রীষ্মের সময় পরিবেশ অনেক সময় রোগ উৎপাদকের সক্রিয় জীবন যাপনের উপযোগী থাকে না। সুতরাং দুটি চাষের অন্তর্বর্তী সময়ে, যখন জমিতে গাছ থাকে না, বা প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকা রোগ উৎপাদকের অবিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের ও সাফল্যের জন্য একান্ত প্রয়োজন। আবার অনুকূল পরিবেশ ফিরে এলে বা মরশুমে নূতন গাছ লাগানো হলে, টিঁকে থাকা বা সুপ্ত অবস্থায় থাকা রোগ উৎপাদক সক্রিয় অবস্থায় ফিরে আসে ও সেই উৎস থেকে ইনোকুলাম ছড়িয়ে পড়ে গাছে মরশুমের প্রথম রোগের আক্রমণের সূচনা করে। যখন প্রাথমিক উৎস থেকে ছড়িয়ে পড়া রোগজীবাণু মরশুমে রোগের সূচনা করে, তখন তাকে বলা হয় রোগের প্রাথমিক আক্রমণ (primary infection)। দেখা গেছে যে প্রায় সব রোগ উৎপাদকই প্রতিকূল পরিবেশে কোন না কোন একটি উপায়ে কোথাও সক্রিয়ভাবে কোথাও বা নিষ্ক্রিয়ভাবে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারে ; যথা—(ক) কোন আক্রান্ত গাছের দেহের আশ্রয়ে, (খ) আক্রান্ত বীজের বা বীজের মতন ব্যবহৃত গাছের অনুরূপ

অংশের ভিতরে, (গ) বাহক পতঙ্গের দেহের ভিতরে, (ঘ) মাটিতে পড়ে থাকা গাছের রোগগ্রস্ত অংশে, (ঙ) জমিতে সক্রিয়ভাবে অথবা নিষ্ক্রিয়ভাবে বা (চ) আবহাওয়ার পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না এরকম অবস্থা ধারণ করে (রেখাচিত্র—১১)। উদ্বর্তনের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি এখানে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হচ্ছে।

(ক) আক্রান্ত গাছকে প্রাথমিক ইনোকুলামের সব থেকে বড় উৎস বলা যেতে পারে। বহুবর্ষজীবী গাছের ক্ষেত্রে এ কথা বিশেষভাবে সত্য। রোগের উৎস
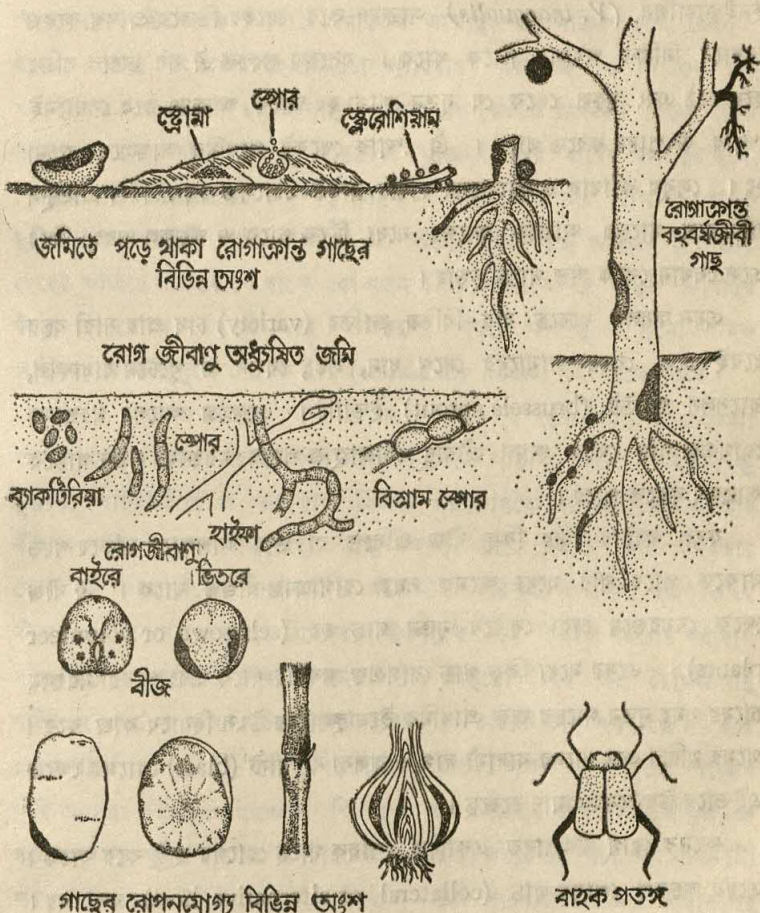
রেখাচিত্র ১১. রোগ উৎপাদকের উদ্বর্তনের বিভিন্ন পদ্ধতি

গাছটি (distributor plant) অধিকাংশ সময়ই রোগগ্রস্ত অর্থাৎ রোগলক্ষণযুক্ত; কিন্তু আক্রান্ত অথচ রোগলক্ষণহীন গাছও উৎস হিসাবে কাজ করতে পারে।

নিশিন্দে গাছে এই ভাবে কিছু আলুর ভাইরাস আশ্রয় পায়। অনেক সময় ছত্রাকের হাইফা গাছের আক্রান্ত অংশের ভিতরে সুপ্ত অবস্থায় প্রচণ্ড শীতের সময়টা কাটিয়ে বসন্তের শুরুতে আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে ও নূতন করে স্পোর তৈরী করতে আরম্ভ করে যা দিয়ে প্রাথমিক আক্রমণের সূচনা হয়। দেখা গেছে যে শীতের আগেই আপেলের শাখা মুকুলের বৃতি (bud scales)কে পাউডারি মিলডিউ ছত্রাক, পোডোস্ফিরা লিউকোট্রিকা (*Podosphaera leucotricha)* ও কচি মুকুলকে (bud primordium) স্ক্যাব রোগ উৎপাদক ছত্রাক ভেঞ্চুরিয়া ইনইক্যুয়ালিস *(V. inaequalis)* আক্রমণ করে দেহের ভিতরে প্রবেশ করেও সেখানে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় টিঁকে থাকে। বসন্তের শুরুতে ঐ সব ছত্রাক সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং মুকুল থেকে যে নূতন শাখা হয় তাকে আক্রমণ করে সেখানেই স্পোর উৎপাদন করতে থাকে। ঐ স্পোর থেকেই প্রাথমিক আক্রমণের সূচনা হয়। লেবুর ক্যাঙ্কার ও আপেলের ফায়ার ব্লাইট রোগেও ব্যাকটিরিয়া প্রতিকূল পরিবেশে গাছের আক্রান্ত অংশের মধ্যে টিঁকে থাকে ও অনুকূল অবস্থা ফিরে এলে সেখান থেকে অন্য গাছে ছড়ায়।

এমন ফসলও রয়েছে যার বিভিন্ন জাতির (variety) চাষ প্রায় সারা বছর ধরেই চলে, যেমন আমাদের দেশে ধান, লঙ্কা, বেগুন ও বৃটেনে বাঁধাকপি, ব্রাসেলস স্প্রাউট (brussels sprout) ইত্যাদি। এক্ষেত্রে আগের মরশুমের রোগগ্রস্ত গাছ থেকে আসা জীবাণু সোজাসুজি পরের মরশুমের নূতন গাছকে আক্রমণ করতে পারে।

ফসল কাটার সময় কিছু বীজ জমিতে বা তার আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে থাকতে পারে যার মধ্যে অনেক সময় রোগাক্রান্ত বীজও থাকে। ঐ বীজ থেকে বেমরশুমে চারা বেরিয়ে নূতন গাছ হয় (self sown or volunteer plants)। এদের মধ্যে কিছু গাছ রোগগ্রস্ত অবস্থায় থাকে এবং পরের মরশুমে চাষের সময় নূতন গাছের জন্য প্রাথমিক ইনোকুলামের উৎস হিসাবে কাজ করে। গমের মরিচা এবং ধানের বাদামী দাগ ও ঝলসা বা 'ব্লাস্ট' (blast) রোগের ক্ষেত্রে এইভাবে উদ্বর্তনের প্রমাণ রয়েছে।

অনেক রোগ উৎপাদক একাধিক পোষক গাছে রোগের সৃষ্টি করে থাকে। এদের অনুরূপ পোষক গাছ (collateral or alternative host) বলা হয়। এরা প্রায় সারা বছরই কোন না কোন প্রজাতির রোগগ্রস্ত গাছে সক্রিয় অবস্থায় থাকে এবং ইনোকুলাম উৎপাদন করে যা অন্য প্রজাতির সুস্থ গাছে রোগের সৃষ্টি করতে পারে। স্ক্লেরোশিয়াম রলফ্‌সিআই, রাইজোকটোনিয়া সোল্যানি,

ফিউজেরিয়াম সোল্যানি *(F. solani)* ভার্টিসিলিয়াম অ্যালবো-এট্রাম, সিউডো-মোনাস সোল্যানেসিয়ারাম *(P. solanacearum)* প্রভৃতি ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়া এবং মেলয়ডোগাইন নামক নিমাটোডের বিভিন্ন প্রজাতির পোষক গাছে রোগ উৎপাদনের ক্ষমতা থাকায় এদের উদ্বর্তনের সমস্যা খুব বড় নয়। পাকসিনিয়া গ্র্যামিনিস ও পাকসিনিয়া রিকন্ডাইটা *(P. rencodita)* প্রভৃতি ছত্রাকের প্রধান পোষক গাছ গম ছাড়াও একটি করে বিকল্প পোষক গাছ (alternate host) আছে তাকে আক্রমণ না করলে এদের জীবন চক্র কখনই সম্পূর্ণ হয় না। যে সব দেশে ঐ ধরণের বিকল্প গাছ পাওয়া যায় সেখানে এরা উদ্বর্তনে নিঃসন্দেহে সাহায্য করে। অনেক রোগ উৎপাদক আবার নানারকম আগাছাকেও আক্রমণ করে, যেমন: ধানের রোগ উৎপাদক হেলমিনথোস্পোরিয়াম ওরাইজি ও পিরিকুলারিয়া ওরাইজি। এদের বলা হয় আগাছা পোষক গাছ (weed host)। কিছু রোগ উৎপাদক নানা ধরণের বুনো গাছকেও আক্রমণ করে যাদের বলা হয় বুনো পোষক গাছ (wild host)। কিছু ছত্রাক বা ভাইরাস জাতীয় রোগ উৎপাদক দুটি ফসলের অন্তর্বর্তী সময় আগাছা বা অন্যান্য বুনো গাছ আক্রমণ করে তার দেহের আশ্রয়ে সক্রিয়ভাবে থাকে এবং নূতন ফসল লাগালে ঐ গাছই জীবাণুর উৎস হিসাবে কাজ কাজ করে। অনুরূপ, বিকল্প, আগাছা বা বুনো পোষক গাছকে একত্রে সম্পূরক পোষক গাছ (subsidiary hosts) বলা যেতে পারে।

(খ) বীজ ও গাছের অন্য রোপণযোগ্য অংশ (planting material) অনেক রোগের ক্ষেত্রে রোগ উৎপাদকের উদ্বর্তনে সাহায্য করে। বেশ কিছু ছত্রাক, ব্যাকটিরিয়া ও ভাইরাস নিষিক্ত গর্ভকোষকে বা অপরিণত অবস্থায় বীজকে আক্রমণ করে বীজদেহের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে সেখানে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থেকে যায় কিন্তু বীজের কোন ক্ষতি করে না। পরবর্তী ফসলের সূত্রপাত যে বীজ থেকে সেখানে আশ্রয় নিয়ে রোগ উৎপাদক তার উদ্বর্তন সমস্যার সমাধান করে ফেলে। জমিতে বীজ বপনের পরে, অঙ্কুরোদ্গমের সময়, রোগজীবাণু সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং চারাটিকে আক্রমণ করে। চারাটি সেই অবস্থাতে নষ্ট হয়ে যেতে পারে বা পরবর্তী পর্যায়ে বড় গাছে রোগের লক্ষণ দেখা দিতে পারে। সিম্বি গোত্রের (Leguminosae) বিভিন্ন পোষক গাছের ভাইরাস, ছত্রাকজনিত গমের আলগা ভুষা, সরিষার অলটারনেরিয়া ব্লাইট, লঙ্কার ফল পচা, পাটের ডাঁটা পচা, ছোলার ব্লাইট, ধানের বাদামী দাগ এবং ব্যাকটিরিয়াজনিত বাঁধাকপির কালোশিরা (black vein) ও তুলার পাতায় কোনাচে দাগ (angular leaf spot) প্রভৃতি রোগের জীবাণু বীজের মধ্যেই সুপ্ত অবস্থায় থাকে। ভালভাবে

শুকানো বীজের মধ্যে কোন রোগজীবাণু সুপ্ত অবস্থায় দীর্ঘকাল জীবিত থাকতে পারে।

বীজ ছাড়াও গাছের রোপণযোগ্য অন্যান্য অংশ যেমন কন্দ, স্ফীতকন্দ, কাটিং ইত্যাদি রোগ উৎপাদকের উদ্বর্তনে একইভাবে সাহায্য করতে পারে। আলুর রোগ উৎপাদনকারী কিছু ছত্রাক (ফাইটফথোরা ইনফেসট্যানস ও সিনকাইট্রিয়াম এণ্ডোবয়োটিকাম), ব্যাকটিরিয়া (সিউডোমোনাস সোল্যানে-সীয়ারাম) ও ভাইরাস (ক্রিঙ্কল ও রুগোজ মোজেইক ভাইরাস) স্ফীতকন্দ বা টিউবারের মধ্যে বেঁচে থাকে। একই ভাবে আদা ও হলুদের মধ্যে পিথিয়াম অ্যাফানিডার্মেটাম *(P. aphanidermatuum)* ও আখে কোলেটাট্রাইকাম ফ্যালকেটাম *(C. falcatum)* থেকে যায়।

(গ) কীট পতঙ্গের মাধ্যমে ছড়ায় এমন দু একটি রোগের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে রোগ উৎপাদক ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়া বাহকের দেহের আশ্রয়ে শীতের সময় টিঁকে থাকে, যথা—ওকের ছত্রাকজনিত উইল্ট (c.o. *Endoconidiophora fagacearum)*, ভুট্টার ব্যাকটিরিয়াজনিত উইল্ট (c.o. *Xanthomonas Stewartii)* ও ধানের স্টাণ্ট (stunt) নামক ভাইরাস রোগ। বাহক কীট এই সময় নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। শীতের শেষে সক্রিয় অবস্থা ফিরে পেলে তারা যখন নূতন করে গাছকে আক্রমণ করে তখন তাদের দেহ থেকে ছত্রাক, ব্যাকটিরিয়া বা ভাইরাস গাছের দেহে স্থানান্তরিত হয়ে রোগের প্রাথমিক আক্রমণের সূচনা করে।

(ঘ) ফসল জমিতে থাকার সময় গাছের আক্রান্ত পাতা, শাখা, ফল ইত্যাদি খসে বা ভেঙ্গে মাটিতে পড়তে পারে। ফসল তোলার সময়, বিশেষ করে যেখানে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ফসল কাটা হয়, গাছের বিভিন্ন অংশ মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে যার মধ্যে রোগগ্রস্ত পাতা, শাখা, ফল ইত্যাদিও থাকে। তাছাড়া ফসল কাটার পর গাছের শিকড় বা গোড়া জমিতে থেকে যায় যার মধ্যে কিছু রোগে আক্রান্ত অবস্থায় থাকতে পারে। এগুলির নিরাপদ আশ্রয়ে রোগ জীবাণু বেশ কিছুদিন কাটিয়ে দিতে পারে। এর ফলে তাকে জমিতে থাকা বিভিন্ন জীবাণুর সঙ্গে খাদ্য বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুবিধার জন্য সরাসরি কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে হয় না। অবশ্য এই সুবিধার স্থায়িত্ব নির্ভর করে অন্তবর্তীকালীন অবস্থার উপর। অপেক্ষাকৃত আর্দ্র ও উষ্ণ আবহাওয়ায় গাছের পড়ে থাকা অংশগুলি বেশ তাড়াতাড়ি পচে যায়, ফলে রোগজীবাণু মাটিতে নেমে আসতে বাধ্য হয় এবং সেখানে ভীষণভাবে সক্রিয় কিছু মৃতজীবী প্রকৃতির জীবাণুর সঙ্গে সফল

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যর্থ হয়ে অনেক সময় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তাছাড়া জমিতে উই বা অন্যান্য কীটের আক্রমণেও গাছের পড়ে থাকা অংশগুলির যথেষ্ট ক্ষতি হতে পারে। শুকনো ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় এগুলি সহজে পচে না, ফলে রোগ উৎপাদকের নিরাপদ আশ্রয় দীর্ঘতর হয়। তাছাড়া গাছের নরম অংশের তুলনায় কঠিন বা কাষ্ঠময় অংশে ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়া বেশিদিনের জন্য আশ্রয় পায়। রোগ উৎপাদক ছত্রাক কোলেটোট্রাইকাম ফ্যালকেটাম (আখের লাল পচা), ভেঞ্চুরিয়া ইনইক্যুয়ালিস (আপেলের স্ক্যাব), পেস্টালোশিওপসিস থিয়ি (চা গাছের গ্রে ব্লাইট), ম্যাক্রোফোমিনা ফ্যাসওলিনা (পাটের ডাঁটা পচা), অলটারনেরিয়া সোল্যানি (আলুর জলদি ধসা) ও ব্যাকটিরিয়া জ্যান্থোমোনাস ম্যালভেসীয়ারাম (তুলার পাতায় কোনাচে দাগ), জ্যান্থোমোনাস সাইট্রি (লেবুর ক্যাঙ্কার) প্রভৃতি এইভাবে উদ্বর্তনের ভাল উদাহরণ। এদের মধ্যে অনেকে গাছের এই সাময়িক আশ্রয় নষ্ট হয়ে গেলে মাটিতে ফিরে এসে সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা অন্য মৃতজীবীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে টিঁকে থাকতে পারে। কিন্তু গয়ম্যানোমাইসেস গ্র্যামিনিস *(Gaumannomyces graminis)*, ফোমিস অ্যানোসাস প্রভৃতি ছত্রাক মৃতজীবীর জীবনে বিশেষ অভ্যস্ত না হওয়ায় কোন কারণে গাছের আশ্রয়স্থলটি নষ্ট হয়ে গেলে জমিতে অল্পদিন মাত্র টিঁকে থাকতে পারে।

সাধারণতঃ শীতের পরে বসন্তের শুরুতে অনুকূল পরিবেশ ফিরে এলে পোষক গাছের জমিতে পড়ে থাকা অংশে টিঁকে থাকে কিছু এরকম ছত্রাককে ওখানেই অযৌন বা যৌন প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি করতে দেখা যায়। উৎপন্ন স্পোর ইনোকুলামের কাজ করে। গমের সেপ্টোরিয়া *(Septoria tritici)* জনিত রোগে, আপেলের স্ক্যাব ও বিভিন্ন শস্যের ছাতাধরা রোগে যথাক্রমে পিকনিডিয়াম, পেরিথীসিয়াম ও ক্লিস্টোথীসিয়াম গঠনের মাধ্যমে প্রথম ক্ষেত্রে কনিডিয়াম ও শেষ দুটি ক্ষেত্রে অ্যাসকোস্পোর উৎপন্ন হয়। এই সব স্পোর থেকে মরশুমের প্রাথমিক আক্রমণের সূচনা হয়।

(ঙ) জমি প্রাথমিক ইনোকুলামের একটি প্রধান উৎস। অধিকাংশ ছত্রাক, ব্যাকটিরিয়া বা নিমাটোড তাদের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে জমিতে ফিরে আসে। কিন্তু এদের সকলেই যে জমির পরিবেশে সক্রিয়ভাবে বাঁচতে পারে তা নয় ; অধিকাংশই সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে বা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, অনেকে আংশিক সক্রিয়ভাবে টিঁকে থাকে। আর কিছু সেখানে স্বাভাবিক সক্রিয় জীবন যাপন করতে পারে। জমিতে তারাই সাফল্যের সঙ্গে বেঁচে থাকতে পারবে (১) যাদের

বিশেষ ধরণের খাদ্যের প্রয়োজন সীমিত, (২) যারা ভিটামিন, হরমোন প্রভৃতি ধরণের প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু নিজেরাই সংশ্লেষ করে নিতে পারে এবং (৩) যাদের **প্রতিযোগিতামূলক মৃতজীবিতার ক্ষমতা** (competitive saprophytic ability) অর্থাৎ জমির অন্যান্য মৃতজীবী বাসিন্দাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে খাদ্য আহরণের ক্ষমতা আছে। জমিতে যে সব রোগ উৎপাদক ছত্রাক থাকে তাদের গ্যারেটের (S.D. Garrett, 1956) মতে প্রধানতঃ দুভাগে ভাগ করা যায়, যথা (১) **জমিতে বসবাসকারী ছত্রাক** (soil inhabiting fungi) ও (২) **জমিতে সাময়িকভাবে আশ্রয় গ্রহণকারী ছত্রাক** (soil invading fungi)। জমিতে অন্যান্য জীবাণুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যারা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে সেইসব পরজীবী ছত্রাক প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। পিথিয়াম ডিব্যারিয়ানাম, ফিউজেরিয়াম সোল্যানি, রাইজোকটেনিয়া সোল্যানি, রাইজোকটোনিয়া ব্যাটাটিকোলা প্রভৃতি এই শ্রেণীর ছত্রাক যাদের জমিতে প্রায়শঃই দেখা যায়। গ্যারেটের মতে এই শ্রেণীর ছত্রাক মূলতঃ মৃতজীবী এবং অত্যন্ত আদিম প্রকৃতির বা নিম্নশ্রেণীর পরজীবী। এরা সুযোগ ও সুবিধামত ছোট চারা বা দুর্বল গাছকে তার জমি সংলগ্ন অংশের মধ্য দিয়ে আক্রমণ করে সেটিকে মেরে ফেলে ও মৃতজীবী হিসাবে সেটিকে নষ্ট করে আবার জমিতে তার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। দুটি ফসলের অন্তবর্তী সময় এরা স্বাভাবিক ভাবেই জমিতে কাটায়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে সেইসব রোগ উৎপাদক ছত্রাক আছে যারা উচ্চস্তরের পরজীবী এবং যাদের মৃতজীবিতার ক্ষমতা খুব সীমিত। এরা ফসল বা গাছ কেটে নেবার পর জমিতে থেকে যাওয়া শিকড় ও সংলগ্ন অংশের মধ্যেই মৃতজীবী হিসেবে বেঁচে থাকে যতদিন না ঐ অংশটি তার আক্রমণে বা অন্য কোন কারণে নষ্ট হয়ে যায়। গয়ম্যানোমাইসেস গ্রামিনিস, আর্মিলারিয়া মিলীয়া, ফোমিস অ্যানোসাস প্রভৃতি এই ধরণের ছত্রাক। গ্যারেটের মতে এরা মূলতঃ পরজীবী কিন্তু প্রয়োজনে আক্রান্ত শিকড়কে আশ্রয় করে কিছুদিন, সাধারণতঃ দুটি ফসলের অন্তবর্তী সময়, মৃতজীবীর জীবন যাপন করে কাটিয়ে দিতে পারে। এদের অনেক সময় শিকড়ে বসবাসকারী (root inhabiting) ছত্রাকও বলা হয়ে থাকে। এরা মৃত শিকড়টি থেকে খাবার সংগ্রহ করে যদিও জমিতে শিকড়ের বাইরে অল্প কিছুটা ছড়াতে পারে কিন্তু সেই অবস্থায় সাধারণতঃ বংশবৃদ্ধি করতে পারে না। শিকড়টি যদি কোন কারণে তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে উদ্বর্তনে বাধা পড়ে। এদের মধ্যে যারা আবহাওয়ার পরিবর্তন সহনশীল কোন অবয়ব ধারণ করতে

পারে একমাত্র তারাই শিকড়টি নষ্ট হয়ে গেলেও টিঁকে থাকতে পারে, যেমন আর্মিলারিয়া মিলীয়া।

ফিউজেরিয়াম অক্সিস্পোরাম, ভার্টিসিলিয়াম অ্যালবো-এট্রাম প্রভৃতি উইল্ট রোগ উৎপাদক ছত্রাককে উপরোক্ত দুই শ্রেণীর মাঝামাঝি বলা যায়। এরা শোষক গাছের অবর্তমানে কয়েক বছর অন্ততঃ জমিতে মোটামুটি সক্রিয়ভাবে বেঁচে থাকতে পারে। কিছু রোগ উৎপাদক ব্যাকটিরিয়া, যেমন সিউডোমোনাস সোল্যানেসিয়ারাম ও অ্যাগ্রোব্যাকটিরিয়াম টিউমিফেসিয়েন্স জমিতে মৃতজীবী হিসাবে থাকতে পারে কিন্তু এদের ক্ষেত্রে এইভাবে দীর্ঘদিন উদ্বর্তনের কোন নজির নেই।

(চ) দুটি ফসলের মধ্যবর্তী সময়ে বা প্রতিকূল পরিবেশে যখন সক্রিয় জীবন যাপন খুবই কঠিন, তখন আবহাওয়ার পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না এরকম বিশেষ অবয়ব (resting structure) ধারণ করে অনেক রোগ উৎপাদক ছত্রাক টিঁকে থাকে। কিছু রোগ উৎপাদক নিমাটোড তাদের সিস্টের মধ্যে বেশ অনেকদিন বেঁচে থাকে বলে জানা আছে। ছত্রাকের ক্ষেত্রে এই ভাবে উদ্বর্তনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এই ধরণের অবয়ব প্রধানতঃ দুরকমের হতে পারে, যথা বিশেষ ধরণের বিশ্রাম স্পোর (resting spore) বা অনেক হাইফা ঘনসন্নিবিষ্ট হওয়ার ফলে উৎপন্ন কোন বিশেষ অবয়ব (resting structure)। এই ধরণের বিশ্রাম স্পোরের (resting spore) কতগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে: (১) এদের দেওয়াল একাধিক স্তরবিশিষ্ট, বেশ পুরু, কিউটিন (cutin) যুক্ত ও অনেক সময়ে উপরিতল অসমান বা উঁচু নীচু হয় আর (২) কোষের মধ্যে বাড়তি খাদ্য প্রধানতঃ স্নেহ পদার্থ হিসাবে জমা থাকে। এই ধরণের স্পোর শুধু যে তাপমাত্রার তারতম্য ও অতিমাত্রায় শুকনো অবস্থা সহ্য করতে পারে তাই নয়, এরা অন্য জীবাণুর আক্রমণে বা রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শেও সহজে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। পিথিয়াম, ফিউজেরিয়াম সোল্যানি ও ফিউজেরিয়াম অক্সিস্পোরাম প্রভৃতির হ্যাপ্লয়েড় হাইফা থেকে উৎপন্ন ক্ল্যামিডোস্পোর, মরিচা ও ভূষা রোগ উৎপাদক ছত্রাকের ডিপ্লয়েড হাইফা থেকে উৎপন্ন ক্ল্যামিডোস্পোর (=টেলিউটোস্পোর) ও ডাউনি মিলডিউ রোগ উৎপাদক পেরোনোস্পোরা, প্লাজমোপারা ইত্যাদির উস্পোর এই ধরণের উদ্বর্তনে অংশ গ্রহণ করে। এদের সাধাণতঃ ২/৩ বছর এবং অনেক সময় ৮।১০ বছরও বাঁচতে দেখা গেছে। পরিবেশের অর্থাৎ আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে এরা কতকদিন বাঁচবে। শুকনো অবস্থায় থাকলে এরা দীর্ঘদিন বাঁচে। অপেক্ষাকৃত কম পুরু দেওয়ালযুক্ত স্পোর যেমন ডিপ্লোকার্পন রোজি (*Diplocarpon*

rosae) ও ফোমিস অ্যানোসাসের কনিডিয়াম উদ্বর্তনে অংশ গ্রহণ করে বলে জানা আছে, তবে এরা পুরু দেওয়াল যুক্ত স্পোরের মত অতদিন বাঁচেনা। এছাড়া অনেকগুলি হাইফার সমন্বয়ে তৈরী স্ক্লেরোশিয়াম কিছু ছত্রাকের উদ্বর্তনে গুরুত্বপূর্ণ অংশ নেয়। অধিকাংশ সময় বাইরের দিকের হাইফার কোষগুলির দেওয়াল অপেক্ষাকৃত পুরু ও বাদামী রঙের হয়। ফলে আবহাওয়ায় বড় রকমের পরিবর্তন হলেও তার ক্ষতিকর প্রভাব ভিতরের দিকের কোষগুলিতে পৌঁছায় না। স্ক্লেরোশিয়াম, রাইজোকটোনিয়া, ফাইমাটোট্রিকাম ওমনিভোরাম (*Phymatotrichum omuivorum*) প্রভৃতি এই ধরণের ছত্রাক। ভার্টিসিলিয়াম অ্যালবো-এট্রামের স্ক্লেরোশিয়ামকে জমিতে ১৩ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে দেখা গেছে।

উদ্বর্তনের প্রয়োজন মেটায় বিশেষ ধরণের পুরু দেওয়ালযুক্ত যে সব স্পোর বা স্ক্লেরোশিয়াম সেগুলি কতদিন সুপ্ত অবস্থায় বেঁচে থাকবে তা নির্ভর করে গঠন বৈশিষ্ট্য ও পরিবেশের উপর। তবে অনুকুল আবহাওয়া ফিরে এলেই সব সময় এদের অঙ্কুরোদ্গম হয় না। দেখা গেছে জমিতে থাকা জীবাণুদের দেহনিস্হঃত বিভিন্ন রকম বিষাক্ত পদার্থের সামগ্রিক প্রভাবের ফলে স্পোর বা স্ক্লেরোশিয়াম সাধারণতঃ অঙ্কুরিত হতে পারে না। জমির ছত্রাকের অঙ্কুরোদ্গমে বাধা দেবার এই ক্ষমতা ফাঙ্গিষ্ট্যাসিস (soil fungistasis) সর্বত্রই দেখা যায় এবং প্রায় সব ছত্রাকের বিরুদ্ধেই সক্রিয়। স্পোর বা স্ক্লেরোশিয়াম শুধু জলের মাধ্যমে সহজেই অঙ্কুরিত হয় কিন্তু মাটি ধোওয়া জলে হয় না। প্রাকৃতিক পরিবেশে দেখা গেছে যে জমিতে গাছ লাগালে তার শিকড় নিঃসৃত রসে যে সব খাদ্যবস্তু বিশেষ করে শর্করা জাতীয় যৌগ থাকে সেগুলি শিকড় সংলগ্ন অঞ্চলে জমির উপরোক্ত দমনমূলক ক্ষমতাকে ব্যর্থ করে স্পোর ইত্যাদিকে অঙ্কুরিত হতে সাহ্যযা করে। অধিকাংশ ছত্রাকের ক্ষেত্রে জমিতে যে ফসলই লাগানো হোক না কেন স্পোরের অঙ্কুরোদ্গম হয়; যেমন—প্লাজমোডিওফোরা ব্রাসিকি ও ফিউজেরিয়াম সোল্যানি (*F. solani f. sp. phaseoli*)। কিন্তু ভার্টিসিলিয়াম অ্যালবো-এট্রামের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে পোষক গাছ লাগালে অন্য যে কোন গাছের তুলনায় অধিকতর সংখ্যায় মাইক্রোস্ক্লেরোশিয়ামের অঙ্কুরোদ্গম ঘটে। আবার এমনও দেখা যায় যে কেবল-মাত্র পোষক গাছ লাগালে তবেই জমিতে অঙ্কুরোদ্গম হয়, যেমন—পেঁয়াজ ও স্ক্লেরোশিয়াম সেপিভোরামে (*S. cepivorum*) এর স্ক্লেরোশিয়াম আর শালগম ও পিথিয়াম ম্যামিলেটাম (*P. mammilatum*) এর স্পোর।

দু একটি ছত্রাক আক্রমণের শেষ পর্যায়ে আক্রান্ত গাছের দেহে অনেক হাইফার সমন্বয়ে গঠিত সহনশীল, কঠিন, গাঢ় বাদামী রঙের এক দেহ ধারণ করে

যাকে বলা হয় স্ট্রোমা (*stroma*)। এই অবস্থাতে ছত্রাক পরবর্তী প্রতিকূল সময়টা অর্থাৎ শীতের দিনগুলি কাটায়। বসন্তের শুরুতে এই স্ট্রোমাতে নূতন যৌনাঙ্গের সৃষ্টি হয়। পরে যৌন মিলনের ফলে যে স্পোর উৎপন্ন হয় সেগুলি প্রাথমিক ইনোকুলাম হিসাবে কাজ করে। ক্ল্যাভিসেপস পারপিউরিয়া, ভেঞ্চুরিয়া ইনইক্যুয়ালিস, রিটিস্মা এসেরাইনাম (*Phytisma acerinum*) প্রভৃতি অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেণীর ছত্রাকে এই ধরণের উদ্বর্তন দেখা যায়।

ইনোকুলামের সংখ্যাবৃদ্ধি (Multiplication of inoculum)

যে সব রোগ উৎপাদক জীবাণু দ্রুত ও প্রচুর পরিমাণে সংখ্যাবৃদ্ধি করতে সক্ষম তাদের রোগ সৃষ্টির ও গাছের ক্ষতি করার ক্ষমতা সাধারণতঃ অন্যদের তুলনায় বেশি হয়। কোন গাছেই সব সময় যে রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে তা নয়। গাছের বৃদ্ধির পর্যায় ও আবহাওয়ার স্বাভাবিক তারতম্য অনুযায়ী জীবনের একটি বিশেষ পর্যায়ে বা কখনও একাধিক বিশেষ বিশেষ পর্যায়ে গাছের আক্রান্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং সফল হতে হলে রোগ উৎপাদকের পক্ষে গাছের যখন আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা সব থেকে বেশী তখনই পর্যাপ্ত ইনোকুলামের সাহায্যে জোরালো আক্রমণ চালানো দরকার। এর জন্য অল্প সময়ে দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দেয়। উৎস থেকে বাতাস, জল, পতঙ্গ প্রভৃতির মাধ্যমে স্থানান্তরিত হবার সময় ইনোকুলামের খুব বড় একটা অংশ নষ্ট হয় অর্থাৎ ঠিক জায়গায় পৌঁছায় না। সুতরাং সফল আক্রমণ রচনা করতে হলে রোগ উৎপাদককে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক অনেক বেশি ইনোকুলাম উৎপাদন করতে হয়। বংশবৃদ্ধি বা ইনোকুলামের পরিমাণ বাড়ানোর সব থেকে সহজ উপায় হল দ্রুত কোষ বিভাজন। ব্যাকটিরিয়ার পক্ষে এটাই স্বাভাবিক পদ্ধতি, তবে কিছু ছত্রাকও এই ভাবে সংখ্যাবৃদ্ধি করে থাকে। ছত্রাকের পক্ষে অপর্যাপ্ত ইনোকুলাম উৎপাদন নানা ভাবে ঘটতে দেখা যায় যার প্রায় সবগুলিরই মূল উদ্দেশ্য হল অল্প জায়গার মধ্যে যথাসাধ্য বেশি সংখ্যায় স্পোর উৎপাদন। সাধারণতঃ দুভাবে ছত্রাকেরা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে থাকে। প্রথমটি হল উপরদিকে বাড়া বা vertical extension এর নীতি। জনসংখ্যার চাপে মহানগরীগুলি যেমন উপরদিকে বাড়তে থাকে অর্থাৎ বহুতলবিশিষ্ট বাড়ী তৈরী হতে থাকে, ছত্রাকের হাইফার স্পোর উৎপাদনকারী বিশেষ অংশ অর্থাৎ স্পোর‍্যানজিওফোর বা কনিডিওফোরও সেইভাবে বেশ অনেকটা উপরদিকে বেড়ে যায় এবং শীর্ষদেশে স্পোর ধারণ করে। স্পোর‍্যানজিওফোর বা কনিডিওফোরগুলি পরপর উপরদিকে বেড়ে ওঠে ; পুরানোগুলি স্পোর উৎপাদনের পর নষ্ট হয়ে গেলে পরেরগুলি তাদের জায়গা

নেয়। এইভাবে অল্প জায়গায় অজস্র স্পোর উৎপাদন সম্ভব হয়। স্পোর্যান-জিয়ামের মধ্যে যেমন অজস্র স্পোর তৈরী হয়, কনিডিওফোরের শীর্ষদেশে থেকেও ক্রমান্বয়ে নূতন স্পোর তৈরী হতে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কনিডিও-ফোর মাথার দিকে নানারকমভাবে শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে যায় ও প্রতিটি শাখায় তখন স্পোর তৈরী হতে থাকে। এইভাবে স্পোর উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে যে সব অঙ্গে স্পোর উৎপন্ন হয় সেরকম অনেকগুলি ঘন-সন্নিবিষ্টভাবে একত্রিত হয়ে বিশেষ আকার ধারণ করে। যেখানে কনিডিওফোর সাধারণতঃ শাখাপ্রশাখা ধারণ করে না সেখানে অনেকসময় অনেকগুলি কনিডিও-ফোর ঐভাবে একত্রিত হওয়ায় করিমিয়াম (coremium), সিন্‌নেমা (Synnema), স্পোরোডকিয়াম (sporodochium), অ্যাসারভিউলাস (acervulus), পিকনিডিয়াম প্রভৃতি তৈরী হয়। এর ফলে খুবই অল্প জায়গার মধ্যে বহু কনিডিওফোরের জায়গা হয় ও প্রচুর পরিমাণে স্পোর উৎপন্ন হতে পারে। অ্যাসকোমাইসিটিস ও ব্যাসিডিওমাইসিটিস শ্রেণীর ছত্রাকে যৌন মিলনের ফলে যথাক্রমে অ্যাসকাস ও ব্যাসিডিয়াম তৈরী হয়। কিছু ছত্রাকে অ্যাসকাস বা ব্যাসিডিয়াম আলাদা আলাদাভাবে থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই বহু অ্যাসকাস বা ব্যাসিডিয়াম একত্রিত হয়ে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অঙ্গের সৃষ্টি করে। অ্যাসকোমাইাইসিটিস শ্রেণীর ছত্রাকে এইভাবে ক্লিস্টোথীসিয়াম (cleistothecium), অ্যাপোথীসিয়াম (apothecium), ও পেরিথীসিয়ামের (perithecium) সৃষ্টি হয়েছে। ডিশের আকৃতির অ্যাপোথীসিয়ামের সমগ্র উপরিতলে ও কলসাকৃতির পেরিথীসিয়ামের ভিতরে অ্যাসকাস ঠাসাঠাসিভাবে সাজানো থাকে। ফলে অল্প জায়গার মধ্যে অনেক বেশী সংখ্যায় অ্যাসকোস্পোর উৎপাদন সম্ভব হয়। অধিকসংখ্যায় স্পোর উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যাসিডিওমাইসিটিস্ শ্রেণীর ছত্রাকে আরও বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে অ্যাগারিকেসি (Agaricaceae) ও পলি-পোরেসি (Polyporaceae) গোত্রের ছত্রাকদের মধ্যে যথাক্রমে ব্যাঙের ছাতা ও ব্রাকেট আকৃতির যে সব বিশেষ দেহগঠন দেখতে পাওয়া যায় সেগুলিকে আদর্শ স্পোর উৎপাদন কারখানা বলা যেতে পারে। ব্যাঙের ছাতায় নীচের তলের গায়ে ব্যাসিডিয়াম হবার কথা। কিন্তু ঐ অংশ অনবরত ভাঁজ হয়ে যাওয়ায় সেখানে অনেকগুলি পরদা বা ঝিল্লীর সৃষ্টি হয় যাদের সারা গায়ে ব্যাসি-ডিয়াম থাকে। এর ফলে স্পোর উৎপাদনের জায়গা ২০ গুণ পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। এইভাবে স্যালিওটা ক্যাম্পেস্ট্রিস (*Psaliota campestris*) নামক

ছত্রাকের ৬ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত ব্যাঙের ছাতায় প্রায় ১০০ কোটি স্পোর উৎপাদন সম্ভব বলে মনে করা হয়। পলিপোরেসি গোত্রের ছত্রাকে এই দিকে আরও উন্নতির প্রমাণ পাওয়া যায়। এদের ব্রাকেট আকৃতির দেহের নীচের তলটি (hymenial surface) মসৃণ না হয়ে ভিতরে ঢুকে যেয়ে খাড়াই ধরণের অজস্র নালীর সৃষ্টি করে। এই সব নালীর সারা গায়ে ব্যাসিডিয়াম উৎপন্ন হয়। ফলে স্পোর উৎপাদনের জায়গা কোন কোন ছত্রাকে প্রায় হাজার গুণ পর্যন্ত বেড়ে যায়।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে ছত্রাকেরা প্রচুর পরিমাণে স্পোর উৎপাদন করতে পারে। গাছের আক্রান্ত অংশেও এইভাবে বিপুল সংখ্যায় রোগ উৎপাদক ছত্রাকের স্পোর উৎপন্ন হতে দেখা যায়। ডাউনি মিলডিউ রোগগ্রস্ত পাতার প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে লক্ষাধিক স্পোর উৎপন্ন হতে পারে। সে তুলনায় ছাতাধরা রোগে আক্রান্ত পাতায় মাত্র কয়েক হাজাব স্পোর হয়। একটি রোগাক্রান্ত গাছে স্মাট এর 'সোরাসে' (sorus = যেখানে ক্ল্যামিডোস্পোর উৎপন্ন হয়) ১০ লক্ষ স্পোর উৎপন্ন হতে দেখা গেছে। পাকসিনিয়া গ্র্যামিনিস দ্বারা ভীষণভাবে আক্রান্ত একটি বারবেরী গাছে একই সময়ে প্রায় ৭ হাজার কোটি এসিওস্পোর তৈরী হয় বলে অনুমান করা হয়। ভার্টিসিলিয়াম ডালিয়ি (*V. dahliae*) দ্বারা আক্রান্ত আলু গাছের কাণ্ডে প্রায় এক ইঞ্চি জায়গার মধ্যে ২০০০০ থেকে ৫০০০ হাজার মাইক্রোস্ক্লেরোশিয়াম পাওয়া গেছে। এই সব উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে রোগ উৎপাদক ছত্রাকেরা আক্রান্ত গাছের দেহে বিপুল সংখ্যায় স্পোর উৎপাদন করে থাকে। এই রকম স্পোর উৎপাদন যদি বেশিদিন বা অন্ততঃ কিছুদিন ধরে চলে এবং পোষক গাছ সংবেদনশীল অবস্থায় থাকে তাহলে সফল আক্রমণের সম্ভাবনা নিঃসন্দেহে অনেক বেড়ে যায়।

ইনোকুলামের প্রসার (Transmission of Inoculum)

ইনোকুলামের উৎস অর্থাৎ যেখানে ইনোকুলাম উৎপন্ন হয় সেখান থেকে আক্রমণযোগ্য গাছের দূরত্ব খুব অল্প থেকে খুব বেশিও হতে পারে। সুতরাং রোগ উৎপাদককে সফল হতে গেলে উপযুক্ত সময়ে, যথেষ্ট পরিমাণে ও বিস্তৃত এলাকা জুড়ে তার ইনোকুলামের বিস্তার অবশ্যই প্রয়োজন।

স্পোর ছড়িয়ে পড়ার আগে স্পোর‍্যানজিয়াম, কনিডিওফোর, অ্যাসকাস বা ব্যাসিডিয়াম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। সাধারণতঃ প্রবহমান বাতাস, জলের ধারা, বৃষ্টির ছাট, কোনরকম ধাক্কা বা বাতাসে আর্দ্রতার হঠাৎ পরিবর্তন ইত্যাদির জন্য স্পোর নিষ্ক্রিয়ভাবে ছত্রাকের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কিছু ছত্রাকের

ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে তাপমাত্রায় বা রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে অ্যাসকাসের ভিতরে এবং কনিডিওফোরের বা ব্যাসিডিয়ামের অগ্রভাগে রস স্ফীতিজনিত চাপের যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটে তার ফলে স্পোর ধারক অঙ্গ থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়ে। ফাইকোমাইসিটিস শ্রেণীর পেরোনোস্পোরা ট্যাবাসিনা (*P.tabacina*) ও স্ক্লেরো-স্পোরা ফিলিপিনেনসিস (*S. Philippinensis* ইত্যাদি এবং অ্যাসকোমাইসিটিস ও ব্যাসিডিওমাইসিটিস শ্রেণীর কিছু ছত্রাকে এমন হতে দেখা যায়।

অধিকাংশ সময় ইনোকুলাম ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে রোগ উৎপাদকের সক্রিয় কোন অংশ থাকে না। কিছু ছত্রাকের জুস্পোর, চলনশীল (ফ্ল্যাজেলা-যুক্ত) ব্যাকটিরিয়া বা নিমাটোডেরা তাদের সক্রিয় চলন ক্ষমতার মাধ্যমেই পোষক গাছের সংস্পর্শে আসে। কিছু ছত্রাকের হাইফাও তাদের সক্রিয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জমিতে অল্প কিছুটা ছড়াতে পারে। এইভাবে অবশ্য ইনোকুলামের বেশিদূর ছড়িয়ে পড়ার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। সাধারণতঃ নানাবিধ জড় বা সজীব মাধ্যমের সহায়তায় অপ্রত্যক্ষভাবে ইনোকুলামের বিস্তার ঘটে থাকে যার মধ্যে বাতাস, কীটপতঙ্গ, মানুষ প্রভৃতি অন্যতম। অন্য কিছু রোগের ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে যে রোগগ্রস্ত গাছ নিজেই প্রত্যক্ষভাবে রোগের বিস্তারে অংশ গ্রহণ করে। এখানে সংক্ষেপে বিভিন্ন পদ্ধতির আলোচনা করা হল।

ক। **বাতাস ঃ** গাছের রোগ ছড়ানোর ব্যাপারে বাতাসের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। প্রধানতঃ ছত্রাকের ইনোকুলাম বাতাসের সাহায্যে ছড়িয়ে পড়ে। ব্যাকটিরিয়া বা ভাইরাসের বিস্তারে বাতাসের সাধারণতঃ কোন গুরুত্ব নেই। বাতাসের গতি অত্যন্ত দ্রুত হলে অর্থাৎ ঝড়ের সময় ব্যাকটিরিয়াবাহী বৃষ্টির ফোঁটাগুলি বা ভাইরাস বাহক পতঙ্গেরা বাতাসের সঙ্গে বেশ কিছুটা দূরে চলে যেতে পারে।

যে সব ছত্রাক অজস্র পরিমাণে খুব ছোট এবং হাল্কা ধরণের স্পোর উৎপাদন করে তারাই বাতাসের মাধ্যমে সাফল্যের সঙ্গে অনেকদূর ছড়াতে পারে। বাতাসের সাহায্যে স্পোর কয়েক সেন্টিমিটার থেকে কয়েক শত কিলোমিটার পর্যন্ত ছড়াতে দেখা গেছে। অবশ্য বাতাসের মাধ্যমে শত শত কিলোমিটার ভেসে যাবার সময় উত্তাপ ও আর্দ্রতার ঘন ঘন পরিবর্তন হবার ফলে স্পোর যখন শেষ পর্যন্ত কোন গাছ, জমি বা অন্য কিছুর উপর এসে পড়ে তখন হয়ত তার অঙ্কুরোদ্গমের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং যে সব রোগ উৎপাদকের স্পোর বাতাসে ভেসে যাবার সময় আবহাওয়ার এই তারতম্যে অঙ্কুরোদ্গমের ক্ষমতা হারায় না কেবলমাত্র তাদেরই এইভাবে বহুদূরে সাফল্যের সঙ্গে ছড়িয়ে

পড়ার সম্ভাবনা থাকে। বেশির ভাগ স্পোর এত ছোট ও হালকা যে মৃদু বাতাসেও তারা বেশ অনেকদূর ভেসে যেতে পারে। শ্রোডটার (H. Schrodter, 1960) এর মতে বাতাসে স্পোরের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়া প্রায় পুরোপুরি বহিঃস্থ প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বাতাসে ছত্রাকের স্পোরকে বিভিন্ন ধরণের জড় বস্তুকণার সঙ্গে তুলনা করা যায়, যেমন ধোঁয়াতে কার্বণ কণার মত, যা মাধ্যাকর্ষণের দরুণ প্রতি সেকেণ্ডে ০·০৫ থেকে ২·৫ সে. মি গতিবেগে নীচের দিকে নেমে আসতে থাকে। বাতাসের সমান্তরাল গতি স্পোর ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ নেয় ঠিকই তবে স্পোরকে উঁচুতে বেশীদূর তুলতে পারে না যদি না তার গতিপথে কোন বাধার সৃষ্টি হয়। বিভিন্নমুখী প্রবাহের সংঘর্ষের ফলে বাতাস যখন উত্তাল বা এলোমেলো হয়ে ওঠে, যখন বাতাসের গতিপথে কোন বাধার সৃষ্টি হয় বা উত্তপ্ত আবহাওয়ায় যখন নীচের বাতাস হালকা হয়ে উপরে উঠতে থাকে কেবল তখনই স্পোরগুলি বাতাসের সঙ্গে উপরের স্তরে উঠে যায়। এর পরে ঝড় ঝাপটার সময় এইভাবে ক্রমান্বয়ে বিভিন্নমুখী প্রবাহের ধাক্কা খেতে খেতে স্পোর অনেক উঁচুতে উঠে যেতে পারে। গতিবেগ দ্রুত হলেও বাতাস যদি এলোমেলো না হয় তাহলে স্পোরের অনেক উঁচুতে উঠে পড়ার সম্ভাবনা কম। সাধারণতঃ বেশির ভাগ স্পোরই জমির উপরে প্রথম ১০০ মিটারের মধ্যে থাকে। স্পোর যদি একবার কয়েকশ মিটার উপরে উঠে যেতে পারে তাহলে তাদের সমান্তরাল ভাবে অনেক দূর এমনকি কয়েকশ কিলোমিটার পর্যন্ত স্থানান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বেলুনের সাহায্যে পরীক্ষা চালিয়ে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২৭,০০০ মিটার পর্যন্ত উপরে ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে। উঁচুতে অলটারনেরিয়া, ক্ল্যাডোস্পোরিয়াম (*Cladosporium*), অ্যাসপারজিলাস (*Aspergillus*) প্রভৃতি ছত্রাকের স্পোরই বেশী দেখা গেছে। মরিচা রোগে আক্রান্ত গমের ক্ষেতের প্রায় ৪ হাজার মিটার উপরে পর্যন্ত ইউরেডোস্পোর পাওয়া গেছে। বাতাসে স্পোর জড় বস্তুকণার মতই মাধ্যাকর্ষণের অধীন এবং বাধা না পেলে খাড়াভাবে ভূপৃষ্ঠের দিকে নেমে আসে। স্থির বাতাসে বিভিন্ন আয়তন ও আকৃতির স্পোর বিভিন্ন গতিতে নীচের দিকে নেমে আসে। শুকনো আবহাওয়ায় অলটারনেরিয়ার স্পোর সেকেণ্ডে ৩ মিমি, পাকসিনিয়ার ইউরেডোস্পোর ১২ মিমি ও হেলমিনথোস্পোরিয়ামের বড় স্পোর ২০ মিমি গতিতে নীচের দিকে নামে। আবহাওয়া আর্দ্র হলে জল শোষণ করে স্পোর ভারী হয়ে পড়ে ফলে তখন দ্রুততর গতিতে নামতে থাকে। হিসাব করে দেখা

গেছে যে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৩০ কিমি হলে ১৫০০ মিটার উচ্চতা থেকে নামতে নামতে ভূপৃষ্ঠে পৌঁছানর আগে অলটারনেরিয়া ও পাকসিনিয়ার স্পোর ৪৮০০ ও ১২০০ কিমি দূরে চলে যাবে। মধ্যপথে অশান্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি হলে স্পোরের আরও দূরে চলে যাবার সম্ভাবনা থাকে। আবার নিম্নমুখী প্রবাহ থাকলে বা বৃষ্টি হলে স্পোর অনেক আগেই নীচে নেমে আসে।

স্পোরকে সফল হতে গেলে গাছের উপর এসে পড়তে হবে তা না হলে আক্রমণের সূচনা হবে না। বিভিন্ন উপায়ে এটি ঘটে। স্থির বাতাসে মাধ্যাকর্ষণের ফলে স্পোর গাছের গায়ের উপরে এসে পড়ে। একে বলা হয় **'সেডিমেন্টেশন'** (sedimentation)। এইভাবে স্পোর সাধারণতঃ পাতার উপরের ত্বকে এসে পড়ে। বাতাসের গতিবেগ বেশি থাকলে স্পোর সজোরে এসে গাছের ত্বকে ধাক্কা মারে। একে বলা হয় **'ইম্প্যাক্শন'** (impaction)। হেলমিনথোস্পোরিয়ামের মত বড় বড় স্পোর সাধারণতঃ এইভাবে গাছের সংস্পর্শে আসে। যে সব ছত্রাকের স্পোর আকারে ছোট তাদের পক্ষে এই প্রক্রিয়া বিশেষ কার্যকরী হয় না যদিনা গাছের ত্বক ভেজা, চটচটে, খসখসে বা রোমশ প্রকৃতির হয়। যখন ঝোড়ো বাতাস এলোমেলো ভাবে বইতে থাকে তখন স্পোর চারিদিক থেকে এসে গাছের উপরে পড়ে। একে বলা হয় **'টার্বুলেন্ট ডিপোজিট'** (turbulent deposit)। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাতার নীচের ত্বকেও স্পোর জমা হয়। উপরোক্ত তিনটি উপায় ছাড়া বাতাসে ভাসমান স্পোর বৃষ্টিতে ধুয়ে জলের ফোঁটার সঙ্গে গাছের পাতা ও অন্যান্য অঙ্গের সংস্পর্শে আসতে পারে। বাতাসের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে ছড়িয়ে পড়ে এই ধরণের কটি গুরুত্বপূর্ণ রোগ হল আলুর নাবি ধসা (Late blight), গমের আলগা ভুষা, আপেলের স্ক্যাব, চেষ্টনাটের ব্লাইট (*c.o. Endothia parasitica*), ধানের বাদামী দাগ ও ঝলসা।

কিছু রাস্ট, পাউডারি মিলডিউ ও ডাউনি মিলডিউ জাতীয় রোগ উৎপাদকের ক্ষেত্রে বাতাসের মাধ্যমে আঞ্চলিক ভাবে অর্থাৎ বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ইনোকুলাম ছড়িয়ে পড়ার প্রমাণও পয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চল ও মেক্সিকো থেকে দক্ষিণের বাতাসের মাধ্যমে মধ্যাঞ্চলের তিন-চার হাজার কি. মি. অতিক্রম করে উত্তরাঞ্চল ও ক্যানাডায় গমের স্টেম রাস্ট (মরিচা রোগ) ছড়িয়ে পড়তে দেখা গেছে। বসন্তের শুরুতে এই ঘটনা ঘটে। উল্টোটা ঘটে শরতের সময় যখন উত্তরের বাতাসের সঙ্গে উত্তরাঞ্চল থেকে দক্ষিণাঞ্চলে স্পোর ছড়াতে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে ওটের মরিচা ও গমের অরেঞ্জ বা লিফ স্ট্রাইপ রাস্ট (মরিচা) প্রায় একই

ভাবে বাতাসের সাহায্যে অনেক দূরের রাজ্যগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতের সমতল অঞ্চলে প্রখর গ্রীষ্মের তাপে ইউরেডোস্পোর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। কে. সি. মেটার মতে ভারতে উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের গমের ক্ষেত থেকে ইউরেডোস্পোর উত্তরের বাতাস বাহিত হয়ে কয়েকশ মাইল অতিক্রম করে সমতল অঞ্চলে প্রতিবছর নূতন রোগের সূচনা করে। বর্তমান ধারণা হল দক্ষিণাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চল থেকে ইউরেডোস্পোর বাতাস বাহিত হয়ে বেশ কয়েকশ মাইল অতিক্রম করে উত্তরের বিস্তীর্ণ গম চাষের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। বাতাস বাহিত হয়ে হাজার কি.মি. অতিক্রম করলেও ছত্রাকের স্পোর বাতাসের মাধ্যমে এক মহাদেশ থেকে মহাসাগর অতিক্রম করে অন্য মহাদেশে বা সুউচ্চ পর্বতশ্রেণীর বাধা ডিঙ্গিয়ে একদেশ থেকে অন্যদেশে স্থানান্তরিত হয়ে সেখানে সফলভাবে রোগের সৃষ্টি করে এমন বিশেষ কোন প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি।

খ। কীটপতঙ্গ ও নিমাটোড

ওয়েইট (M.B. Waite, 1891) প্রথম দেখতে পান যে মৌমাছি ও বোলতা আপেল ও ন্যাসপাতির ফায়ার ব্লাইট রোগ ছড়ানোর কাজে অংশ নেয়। পরে দেখা গেছে আরও অনেক গাছের রোগই নানা ধরণের কীটপতঙ্গের মাধ্যমে ছড়ায়।

বাতাসের পর সামগ্রিকভাবে কীটপতঙ্গই রোগ ছড়ানোর কাজে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ নেয় বলা যেতে পারে। এরাই ভাইরাসের প্রধানতম বাহক। কিছু ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়াজনিত রোগও এদের মাধ্যমেই ছড়ায়। যে সব কীট পতঙ্গ গাছের ত্বক ছিদ্র করে বা কামড়ে রস শোষণ করতে পারে তারাই সাধারণতঃ ইনোকুলাম ছড়ানোর কাজে অংশ নেয়। তাছাড়া শোষণ বা কামড়ানোর সময় এরা গাছের দেহের ভিতরে ছত্রাক, ব্যাকটিরিয়া বা ভাইরাসকে ঢুকিয়ে দিয়ে রোগের প্রাথমিক আক্রমণ সম্ভব করে তোলে। সাধারণতঃ কীট-পতঙ্গের ঘুরে বা উড়ে বেড়ানোর ক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বৃত্তাকার পরিধির মধ্যে ইনোকুলাম ছড়ায় যদি না জোরালো বাতাসের ফলে বাহক পতঙ্গ বাতাসের গতির দিকে আরও খানিকটা ছড়িয়ে পড়ে। কীটপতঙ্গের মাধ্যমে ইনোকুলাম ছড়িয়ে পড়াটা একেবারেই স্থানীয় ব্যাপার। এক্ষেত্রে একটা সুবিধা হল এই যে এরা সাধারণতঃ পোষক গাছকেই আক্রমণ করে, ফলে ইনোকুলাম নষ্ট হবার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে।

ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়ার বিস্তারে যে সব কীটপতঙ্গ সাহায্য করে তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক গাছে কোন ক্ষতের সৃষ্টি না করেই শুধুমাত্র যান্ত্রিক উপায়ে

ইনোকুলাম স্থানান্তরিত করে থাকে। আরগট (ergot) রোগগ্রস্ত রাই (rye) গাছে ক্ল্যাভিসেপস পারপিউরিয়ার কনিডিয়াম মধুর মত নিঃসরণের সঙ্গে মিশে থাকে। মধুর লোভে আকৃষ্ট পতঙ্গ ঐ গাছ থেকে অন্য গাছে গেলে সেখানে তার দেহের সঙ্গে কনিডিয়াম স্থানান্তরিত হয়। আপেলের ফায়ার ব্লাইট রোগ উৎপাদক ব্যাকটিরিয়া, এরউইনিয়া অ্যামিলোভোরা, অনেকটা একইভাবে পতঙ্গের মাধ্যমে ছড়ায় যদিও অন্যান্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমেও এটি ছড়াতে পারে। এই ব্যাকটিরিয়া বাহক পতঙ্গের অন্ত্রের মধ্যে আশ্রয় নেয় এবং এইভাবে প্রতিকূল অবস্থায় নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। শশা ও ভুট্টার ব্যাকটিরিয়াজনিত উইল্ট রোগের কারণ যথাক্রমে এরউইনিয়া ট্র্যাকাইফাইলা *(E. tracheiphila)* ও জ্যান্থোমোনাস স্টুয়ার্টিআই *(X. stewartii)* শুধু যে তাদের ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে একান্তভাবে বিশেষ জাতের বীটল শ্রেণীর পতঙ্গের উপর নির্ভরশীল তাই নয়, তারা পতঙ্গের দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতের মধ্যে দিয়েই পোষক গাছকে আক্রমণ করে এবং বছরের প্রতিকূল সময়টা বাহকের দেহের ভিতরেই কাটায়। কিছু ছত্রাকজনিত রোগের ক্ষেত্রেও পতঙ্গ ফুল থেকে ফুলে যাবার সময় যান্ত্রিক উপায়ে ইনোকুলাম ছড়ায়, যথা ক্যারিওফাইলেসি (Caryophyllaceae) পরিবারভুক্ত গাছের অ্যান্থার স্মাট (anther smut) ও ক্লোভারের (clover) এর অ্যান্থার মোল্ড (anther mould) রোগ। তাছাড়া ডাচ এল্‌ম্ (Dutch elm) ও ওক উইল্ট (oak wilt) রোগ উৎপাদক ছত্রাক যথাক্রমে সেরাটোস্টোমেলা আলমি *(Ceratostomella ulmi)* ও সেরাটোসিস্টিস ফ্যাগেসীয়ারাম *(Ceratocystis fagacearum)* ভিন্ন ভিন্ন জাতের বীটলের মাধ্যমে ছড়ায় ও তাদের সৃষ্ট ক্ষতের মধ্য দিয়েই গাছের দেহে প্রবেশ করে।

ভাইরাস ছড়ায় প্রধানতঃ কীটপতঙ্গের সাহায্যে। কুঙ্কেল (L.O. Kunkel, 1933) প্রথম দেখান যে পীচের yellows ধরণের রোগের বাহক এক ধরণের শোষক পোকা। পরবর্তীকালে দেখা গেছে যে প্রধানতঃ এফিড (জাব পোকা) লীফ হপার (শোষক পোকা), জ্যাসিড, থ্রিপ (চোষী পোকা), মিলী বাগ (দয়ে পোকা), বীটল (গুবরে জাতীয় পোকা) প্রভৃতি কীটপতঙ্গের সাহায্যেই ভাইরাস রোগ ছড়ায়। পঞ্চাশটির বেশি জাব পোকা ভাইরাস রোগ ছড়াতে সাহায্য করে। ভাইরাসের বাহক হিসাবে জাব পোকার পরই শোষক পোকার স্থান। অবশ্য সব কীটপতঙ্গই ভাইরাস বহন করে না। কোন ভাইরাস এক বা একাধিক পতঙ্গ দ্বারা বাহিত হতে পারে, তবে এটা ঠিক যে ভাইরাস ও তার বাহক পতঙ্গের মধ্যে একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে। কোন নির্দিষ্ট ভাইরাস

রোগের বিস্তার নির্ভর করে (১) বিশেষ ধরণের বাহক পতঙ্গের যথেষ্ট সংখ্যায় উপস্থিতি, (২) ঐ পতঙ্গ কত সহজে এবং কত তাড়াতাড়ি রোগগ্রস্ত গাছ থেকে শোষণের মাধ্যমে যথেষ্ট পরিমাণে ভাইরাস আহরণ করে, (৩) পতঙ্গের সংক্রামক অবস্থা কতক্ষণ স্থায়ী হয় ও (৪) বাহকের দেহের মধ্যে ভাইরাস সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে কিনা তার উপর।

পতঙ্গবাহিত ভাইরাসদের সংক্রমণ ক্ষমতার স্থায়িত্বের দিক থেকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: (১) ক্ষণস্থায়ী বা অস্থায়ী (non-persistent): যাদের বাহকেরা খুবই অল্পক্ষণ সংক্রামক অবস্থায় থাকে; (২) কিছুকাল স্থায়ী (semi-persistent): যাদের বাহকেরা বেশ কিছুক্ষণ সংক্রামক অবস্থায় থাকে ও (৩) দীর্ঘস্থায়ী (persistent): যাদের বাহকদের সংক্রমণ ক্ষমতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

অস্থায়ী ভাইরাসের বাহক পতঙ্গেরা রোগগ্রস্ত গাছ থেকে অল্পক্ষণ রস শোষণ করেই সংক্রামক হয়ে ওঠে। পনের সেকেণ্ড থেকে ৫ মিনিট এর জন্য প্রয়োজন হতে পারে। এরা ভাইরাস আহরণের পর মাত্র দু তিনটি গাছকে সেই ভাইরাস দ্বারা সংক্রামিত করতে পারে। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই জাব পোকা জাতের। অস্থায়ী ধরণের ভাইরাস প্রধানতঃ স্টাইলেটবাহিত (stylet borne)। মনে হয় এদের শোষণ করা ভাইরাস মেশানো রস স্টাইলেট বা মুখের অগ্রভাগেই লেগে থাকে। দু তিনটি গাছে যাবার পর ওখান থেকে ভাইরাস প্রায় মুছে যায় ফলে পতঙ্গের আর সংক্রমণ ক্ষমতা থাকে না। দেখা গেছে যে রোগগ্রস্ত গাছ থেকে ভাইরাস আহরণের পর কিছুক্ষণ উপবাস করে থাকলে পতঙ্গের সংক্রমণ ক্ষমতা বেড়ে যায়। অনেকে মনে করেন উপবাসী অবস্থায় লালাক্ষরণ বেশী হয় এবং এটাই সম্ভবতঃ পতঙ্গের সংক্রমণ ক্ষমতা বেড়ে যাবার কারণ। মনে করা হয় যে এই ধরণের ভাইরাস বাহক পতঙ্গের দ্বারা যান্ত্রিকভাবে স্থানান্তরিত হয় মাত্র, এদের মধ্যে নিবিড় কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু অনেক পতঙ্গই কেবল বিশেষ বিশেষ ভাইরাসকে বহন করে, সব ভাইরাসকে নয়। তাদের মুখের বা স্টাইলেটের গড়ন এবং স্টাইলেটের দৈর্ঘ্য হয়ত এই বিশেষ সম্বন্ধের জন্যে দায়ী। যব, কলা, লঙ্কা ও বীনের মোজেইক; ধানের টুংরো (Tungro) ও এলাচের 'চিরকে' (Chirke) রোগ উৎপাদক ভাইরাসেরা এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাইরাসেরা কিছুকাল সংক্রামক অবস্থায় থাকে। দেখা গেছে যে বাহক পতঙ্গের মুখের অংশ বা স্টাইলেটের উপর রঞ্জন রশ্মি ফেললে

এদের সংক্রমণ ক্ষমতা কমে না। এর থেকে মনে হতে পারে যে ভাইরাস পতঙ্গের মুখের অগ্রভাগে লেগে থাকে না, হয়ত দেহের ভিতরেও কিছুটা প্রবেশ করে। দেখা যায় যে জাব পোকা যখন খোলস ত্যাগ করে তখন বাইরের ত্বকের সঙ্গে স্টাইলেট এমনকি অন্ত্রের খানিকটা অংশও খসে যায়। এর থেকে মনে হয় যে উপরোক্ত শ্রেণীর ভাইরাস পতঙ্গের দেহের এইসব অংশে আশ্রয় নেয়। বড় এলাচের 'কাটে' (Katte) রোগ এই ধরণের ভাইরাস থেকে হয়।

দীর্ঘস্থায়ী ভাইরাসের বাহক পতঙ্গেরা রোগগ্রস্ত গাছ থেকে রস শোষণের কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিন পরে সংক্রমণ ক্ষমতা লাভ করে এবং তারপরে দীর্ঘ সময় সংক্রামক অবস্থায় থাকে। বাহক পতঙ্গ তার জীবনের একটা বড় অংশই সংক্রামক অবস্থায় কাটায় এবং এই সময়ে পরপর অনেক গাছকে আক্রমণ করে সেখানে ভাইরাস স্থানান্তরিত করে। যবের ইয়েলো ডোয়ার্ফ (yellow dwarf) ও এলাচের ফুরকে (Foorkey) রোগ এই রকম ভাইরাস থেকেই হয়। এরা পতঙ্গের দেহের মধ্যে প্রবেশ করে। এই সব তথ্য থেকে মনে হয় যে রোগগ্রস্ত গাছ থেকে শোষণ করা রসে ভাইরাস (কণা) খুব অল্প পরিমাণে ও সংক্রমণ ক্ষমতাহীন অবস্থায় থাকে, পরে বাহক পতঙ্গের দেহের মধ্যে ধীরে ধীরে সংখ্যাবৃদ্ধির মাধ্যমে বা অন্য কোন উপায়ে সংক্রমণ ক্ষমতা লাভ করে। তখন পতঙ্গ সংক্রামক হয়ে ওঠে। রস শোষণের পর থেকে পতঙ্গ সংক্রামক অবস্থায় আসা পর্যন্ত দীর্ঘ সময়কে প্রচ্ছন্ন কাল (latent period) বলে। ভাইরাস ও পতঙ্গের প্রকৃতির উপর প্রচ্ছন্ন কালের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে। আগেই বলা হয়েছে দীর্ঘস্থায়ী ভাইরাস দু' রকমের হয়ঃ সার্কুলেটিভ (circulative) ভাইরাস ও প্রোপাগেটিভ (propagative) ভাইরাস। সার্কুলেটিভ ভাইরাসের প্রচ্ছন্ন অবস্থা কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েকদিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। ওই সময়ে রোগগ্রস্ত গাছের রসের সঙ্গে শোষণ করা ভাইরাস পতঙ্গের পুষ্টিনালী ও অন্ত্রের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত রক্তরসের সঙ্গে মিশে লালা গ্রন্থিতে আসে এবং তখন পতঙ্গ নতুন কোন গাছকে আক্রমণ করলে লালার সঙ্গে মিশে ভাইরাস সেই গাছের দেহে সংক্রামিত হয় ও রোগের সৃষ্টি করে। এইভাবে পতঙ্গের দেহের ভিতর দিয়ে ঘুরে আসার সময় ভাইরাস উজ্জীবিত হয়ে সংক্রমণশীল অবস্থা ফিরে পায়। এটা ঠিক কি ভাবে ঘটে অবশ্য জানা নেই। সার্কুলেটিভ ভাইরাস প্রধানতঃ জাব পোকা ও শোষক পোকার মাধ্যমে ছড়ায়। খোলস ছাড়ার ফলে এদের সংক্রমণ ক্ষমতার কোন তারতম্য হয় না। প্রোপাগেটিভ ভাইরাস সার্কুলেটিভ ভাইরাসেরই মত, তফাৎ হল এই যে পতঙ্গের শরীরের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় এরা সংখ্যাবৃদ্ধি

করে। অনেক সময় সংক্রামিত ডিমের মাধ্যমে এই ধরণের পতঙ্গকে চল্লিশ জন্ম পর্য্যন্ত ভাইরাস বহন করতে দেখা গেছে (transovarial transmission)। এই ধরণের ভাইরাসের প্রচ্ছন্ন কাল পতঙ্গের শরীরের মধ্যে দিয়ে ঘুরে আসা ও যথেষ্ট পরিমাণে সংখ্যাবৃদ্ধি হওয়ার উপর নির্ভর করে। সার্কুলেটিভ ও প্রোপাগেটিভ ভাইরাসের সঙ্গে তাদের বাহক পতঙ্গের সম্পর্ক খুব সুনির্দিষ্ট। পতঙ্গ উপবাস করলে এইসব ভাইরাসের সংক্রমণ ক্ষমতা মোটেই বাড়ে না।

কিছু মাইট (মাকড়) জাতীয় কীট ভাইরাস ও ছত্রাকজনিত রোগের প্রসারে সাহায্য করে বলে জানা আছে—উদাহরণ : আঙ্গুরের ভাইরাস ও গমের নাইগ্রোস্পোরা *(Nigrospora sp)* জনিত রোগ। এদের পাখা না থাকায় দূরে যেতে পারে না কিন্তু অনেক সময় অন্য পতঙ্গ বা বাতাসবাহিত হয়ে কিছুদুর পর্য্যন্ত ছড়ায়।

জিফিনেমা *(Xiphinema)*, ট্রাইকোডোরাস *(Trichodorus)*, লঙ্গিডোরাস *(Longidorus)* প্রভৃতি কিছু নিমাটোডও ভাইরাস রোগের প্রসারে সাহায্য করে। এদের মধ্যে আঙ্গুরের ফ্যান লীফ (fan leaf) ভাইরাসের বাহক জিফিনেমা ইনডেক্স *(X. index)* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নিমাটোডের মাধ্যমে কিছু ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়াজনিত রোগ ছড়ায় এমন প্রমাণও রয়েছে। একাধিক বীরুৎ শ্রেণীর (herb) কোমল ডাঁটাবিশিষ্ট গাছের লীফি গল (leafy gall) রোগ উৎপাদক কোরাইনিব্যাকটিরিয়াম ফ্যাসিয়ান্স *(C. fascians)* ও গমের রোগ উৎপাদক ছত্রাক ডাইলোফোস্পোরা অ্যালোপিকিউরি *(Dilophospora alopecuri)* নিমাটোডের মাধ্যমে ছড়ায়। এ ছাড়াও দেখা গেছে যে কিছু ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়াজনিত রোগের সঙ্গে জমিতে বিশেষ বিশেষ নিমাটোডের উপস্থিতির সম্পর্ক রয়েছে ; যথা তুলার ফিউজেরিয়াম উইল্ট ও কার্শের্নানের সিউডোমোনাস উইল্ট। এইসব রোগের ক্ষেত্রে নিমাটোড ইনোকুলাম বহন করে কি না জানা নেই তবে গাছের শিকড়ে নিমাটোড সৃষ্ট ক্ষতের মধ্যে দিয়ে ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়ার পক্ষে গাছের দেহে প্রবেশ যে সহজতর হয় এর প্রমাণ পাওয়া গেছে।

গ। পশু ও পাখী

বিভিন্ন ধরণের পশু ও পাখী কিছু রোগ ছড়াতে সাহায্য করে। কাঠ বিড়ালীর মাধ্যমে ওক উইল্ট রোগ উৎপাদক ছত্রাক সেরাটোসিস্টিস ফ্যাগেসীয়ারামের স্পোর ছড়ায়। ক্ষেতের ইঁদুর মাটির ভিতরে তৈরী সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে যাতায়াতের সময় ট্র্যামেটিস র‍্যাডিসিপারডার *(Trametes radiciperda)*

স্পোর বহন করে নিয়ে যায় ও নূতন গাছের শিকড়ে তাদের স্থানান্তরিত করে রোগের প্রসার ঘটাতে সাহায্য করে। তাছাড়া চলাফেরার সময় কোন পশুর গায়ে রোগগ্রস্ত গাছের দেহে উৎপন্ন ছত্রাকের স্পোর, ব্যাকটিরিয়া ইত্যাদি বা ভাইরাস আক্রান্ত গাছের রস লেগে গেলে এবং সেটি সুস্থ গাছের দেহে স্থানান্তরিত হলে অনেক সময় রোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে।

পাখীরা নিঃসন্দেহে অনেক রোগগ্রস্ত গাছ থেকে সুস্থ গাছে ইনোকুলাম ছড়ায়। কাঠঠোকরা গাছ থেকে গাছে উড়ে বেড়ানোর সময় তার ঠোকরে সৃষ্ট গাছের ক্ষততে ছত্রাকের স্পোর স্থানান্তরিত করে রোগের প্রসারে সাহায্য করে, যেমন দেখা যায় চেষ্টনাটের ব্লাইট রোগের ক্ষেত্রে। একটি কাঠঠোকরা তার দেহে ৭,৫০,০০০ স্পোর বহন করেছে এরকম রিপোর্ট আছে। মারাত্মক ধরণের সপুষ্পক পরজীবী মিসলেটোর (mistletoe—*Phoradendron sp*) বীজও পাখীর মাধ্যমে ছড়ায়। ভ্রমণশীল পাখীরা ইনোকুলাম বেশ দূরে দূরে ছড়িয়ে দিতে পারে।

ঘ। মানুষ

রোগ ছড়ানোর ব্যাপারে মানুষের গুরুত্ব কিছু কম নয়। মানুষ ক্ষেতের মধ্যে গাছ থেকে গাছে, দেশের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে, এমনকি এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে রোগ ছড়ানোতে সাহায্য করে। বলা যায় দূর দূরান্তরে, বিশেষ করে সমুদ্র ও পাহাড়ের মত প্রাকৃতিক বাধা অতিক্রম করে, রোগের বিস্তার প্রধানতঃ মানুষের জন্যই সম্ভব হয়েছে।

ক্ষেতে কাজের সময় নিড়াতে, রোয়া করতে বা ফলমূল তুলতে যেয়ে, চাষীরা খেয়াল না করেই রোগগ্রস্ত গাছ থেকে সুস্থ গাছে রোগ ছড়াতে সাহায্য করে। ভাইরাসজনিত তামাকের মোজেইক রোগ ও ব্যাকটিরিয়াজনিত টম্যাটোর ক্যাঙ্কার ও শশার পাতায় কোণাচে দাগ (angular leaf spot) রোগ ক্ষেতের কাজের সময় সহজেই ছড়াতে পারে।

মানুষের মাধ্যমে এক দেশ থেকে অন্য দেশে রোগ ছড়ানোর কাজ সাধারণতঃ দু'ভাবে ঘটে থাকে। এক দেশ ছেড়ে বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে অন্য দেশে যাবার সময় মানুষ তার গৃহস্থালীর জিনিষের সঙ্গে অনেক সময় নূতন জায়গায় চাষের জন্য বীজ, গাছের চারা ইত্যাদি নিয়ে যেত। এগুলির মধ্যে কিছু রোগাক্রান্ত থাকলে নূতন দেশে ঐ বীজ বা চারা লাগানোর পর গাছগুলিও রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ত। এইভাবে দূর দূর দেশে রোগ ছড়ানোর নজীর আছে। তাছাড়া ব্যবসার প্রয়োজনে মানুষ একদেশ থেকে অন্য দেশে বীজ পাঠায়। বীজবাহিত

হয়ে অনেক রোগ বহু দূরের দেশে ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের মাধ্যমে এইভাবে অনেক গুরুতর ধরণের রোগ এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে, যেমন পাইনের ব্লিস্টার রাস্ট (blister rust—*Cronartium ribicola*), ডাচ এল্‌ম্ ও বিভিন্ন শস্যের গোল্ডেন নিমাটোড রোগ ইউরোপ থেকে আমেরিকায়; চেস্টনাট ব্লাইট রোগ এশিয়া থেকে আমেরিকায়; আঙুরের পাউডারি ও ডাউনি মিলডিউ, আলুর নাবি ধসা ও ভুট্টার মরিচা রোগ আমেরিকা থেকে ইউরোপে; আলুর ওয়ার্ট ও আপেলের ফায়ার ব্লাইট আমেরিকা থেকে জাপানে এবং কফির মরিচা রোগ আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলে।

ঙ। জল

কিছু রোগ জলের মাধ্যমে ছড়ায়। জমি থেকে রোগের সূচনা হয় এরকম কিছু রোগের ক্ষেত্রে সেচের জলের মাধ্যমে ইনোকুলাম ক্ষেতের মধ্যে ছড়ায়, যেমন বাঁধাকপির ক্লাব রুট ও কালোশিরা (black vein) রোগ। প্রবল বৃষ্টির পর জল যখন এক ক্ষেত থেকে অন্যান্য ক্ষেতের উপর দিয়ে বহে যায় তখন আলুর নাবি ধসা, ধানের গোড়া পচা ও ব্যাকটিরিয়াজনিত ধসা, মটরের শিকড় পচা (c. o. *Apharomyces euteiches*) প্রভৃতি রোগের ইনোকুলাম সেই জলের সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। বৃষ্টির সময় জলের ফোঁটাগুলি যখন বেগে রোগগ্রস্ত গাছের উপর এসে পড়ে তখন সেখান থেকে আবার ছোট ছোট ফোঁটা চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ার সময় ছত্রাকের স্পোর ও ব্যাকটিরিয়াও বহন করে। এই-ভাবে জলের ফোঁটার মাধ্যমে কিছু রোগজীবাণু গাছের এক অংশ থেকে অন্য অংশে বা এক গাছ থেকে পাশের গাছে ছড়িয়ে পড়ে। একে বলে splash dispersal। কিছু রোগ উৎপাদক ছত্রাক; যথা—কোলেটোট্রাইকাম, সেপ্টোরিয়া, ফাইটফথোরা পামিভোরা (*P. palmivora*), এবং ব্যাকটিরিয়া জ্যান্থোমোনাস ম্যালভেসিয়ারাম এইভাবে ছড়াতে পারে।

চ। ছত্রাক

কিছু ভাইরাস ছত্রাকের সাহায্যেও ছড়াতে পারে। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল লেটুসের বিগ ভেন (big vein) ও টোব্যাকো নেক্রোসিস ভাইরাস। ফাইকোমাইসিটিস শ্রেণীর নিম্নস্তরের ছত্রাকেরা, যেমন—ওলপিডিয়াম ব্র্যাসিকি (*O. brassicae*), সিনকাইট্রিয়াম (*Synchytrium sp*), স্পঙ্গোস্পোরা সাবটেরানীয়া (*Spongospora subterranea*) ও পলিমিক্সা গ্র্যামিনিস (*Polymixa graminis*) ভাইরাসের বাহক হিসাবে কাজ করে। এরা সব এককোষী ছত্রাক। বিভিন্ন তথ্য থেকে মনে হয় যে ভাইরাস ছত্রাকের দেহের

মধ্যে আশ্রয় নেয় এবং ছত্রাক যখন গাছের দেহকোষে প্রবেশ করে, তার সঙ্গে ভাইরাসও সেখানে প্রবেশ করে।

ছ। রোগাক্রান্ত গাছের মাধ্যমে প্রসার

কিছু রোগে ইনোকুলাম রোগগ্রস্ত গাছের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে পরবর্তী জন্মর গাছে স্থানান্তরিত হয় (direct transmission)। তিনভাবে এটি ঘটতে পারে।

(১) কোথাও রোগজীবাণু সুস্থ গাছের ফুলকে আক্রমণ করে বীজের ভ্রুণের মধ্যে জায়গা করে নেয় এবং সেইখানেই সুপ্ত অবস্থায় থাকে, বীজের অথবা গাছের কোন ক্ষতি করে না। জমিতে বোনার পর এই ধরণের বীজ অঙ্কুরিত হলে সুপ্ত অবস্থায় থাকা জীবাণু পুনরুজ্জীবিত হয়ে কচি চারাকে আক্রমণ করে রোগের সূত্রপাত করে। গমের ও যবের আলগা ভূষা এই ধরণের রোগ। যখন অঙ্কুরের মাধ্যমে ইনোকুলাম ছড়ায়, তখন তাকে বলা হয় 'জারমিনেটিভ ট্র্যান্সমিশন' (germinative transmission).

অনেক সময় গাছ রোগগ্রস্ত হয়ে পড়লে পূর্ণতাপ্রাপ্তির আগেই বীজ আক্রান্ত হয়ে পড়তে পারে যদিও সেটি নষ্ট হয়ে যায় না। পরের বছর ঐ বীজ থেকে যে গাছ হয় সেটি প্রথম থেকেই রোগাক্রান্ত এবং চারা অবস্থায় বা পরে পরিণত অবস্থায় সেই গাছে রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। সরিষার অলটারনেরিয়া ব্লাইট (*A. brassicicola*), লঙ্কার ফল পচা (*c. o. Colletotrichun capsici*); বাঁধাকপির কালো শিরা; সীম, বীন, বরবটি ইত্যাদির মোজেইক রোগ এইভাবে সরাসরি বীজের মাধ্যমে এক জন্ম থেকে পরবর্তী জন্মর গাছে ছড়িয়ে পড়ে।

(২) চাষের জন্য কোন কোন সময় বীজের বদলে গাছের অন্যান্য বিশেষ অঙ্গ; যেমন—স্ফীতকন্দ, রাইজোম, কন্দ, কাটিং ইত্যাদিও লাগানো হয়। গাছ রোগগ্রস্ত হলে গাছের ঐ সব অঙ্গগুলিও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে, যদিও বাইরে থেকে অধিকাংশ সময় বোঝা যায় না। পরের বছর নূতন চাষের জন্য ঐগুলি জমিতে লাগালে যে নূতন গাছ হয় সেগুলি সাধারণতঃ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এইভাবে জন্ম থেকে জন্মতে রোগের প্রসারের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল আলুর নাবি ধসা ও ব্যাকটিরিয়াজনিত উইল্ট, আখের লাল পচা ও আদার রাইজোম রট (*c. o. Pythium aphanidermatun*)। একে বলা হয় ইনোকুলামের অঙ্গজ বিস্তার (vegetative transmission)।

(৩) কিছু ছত্রাক জাতীয় রোগে দেখা যায় ফুলের শিষে রোগের আক্রমণ হয়। এর ফলে ফুল বা বীজ নষ্ট হয়ে যায় এবং সেখানে প্রচুর সাধারণ

স্পোর বা বিশ্রাম স্পোর তৈরী হয়। ফসল তোলার সময় ঝাড়াই-মাড়াই এর ফলে ঐ সব স্পোর নীরোগ বীজের সঙ্গে মিশে যায় ও অনেক সময় তার গায়ে লেগে থাকে। এই সব বীজ জমিতে পরের বছর বুনলে চারা বেরোনর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অঙ্কুরিত স্পোর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ে। গমের দুর্গন্ধযুক্ত ভূষা (c. o. *Tilletia tritici*), যবের বদ্ধ ভূষা (c.o. *Ustilago hordei*) ও ওটের আলগা ভূষা (c. o. *Ustilago avenae*) এইভাবে ছড়ায়। একে বলা হয় সংস্পর্শজাত বিস্তার (adherent transmission)।

ইনোকুলামের রোগ উৎপাদন ক্ষমতা (Inoculum potential)

রোগ সৃষ্টির সুপ্ত ক্ষমতা থাকলেও ইনোকুলাম সব অবস্থায় রোগ সৃষ্টি করতে পারে না। অতি উগ্র প্রকৃতির রোগ উৎপাদকের ক্ষেত্রে ছত্রাকের একটি স্পোর বা হাইফা বা ব্যাকটিরিয়ার একটি কোষ থেকে গাছে সফল আক্রমণের সূচনা হতে পারে, অবশ্য পরিবেশ যদি অনুকূল থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় যে একাধিক, এমনকি বেশ বেশী সংখ্যায় স্পোর হাইফা বা ব্যাকটিরিয়া কোষ একত্রে না থাকলে আক্রমণ সাধারণতঃ ব্যর্থ হয়। এর থেকে মনে হয় যে ইনোকুলামের শুধু গাছে রোগ সৃষ্টির সুপ্ত ক্ষমতা থাকলেই চলবে না, পরিবেশ অনুযায়ী ও গাছের প্রতিরোধ ক্ষমতা অতিক্রম করে আক্রমণ করার যথেষ্ট ক্ষমতাও থাকতে হবে। যথেষ্ট ক্ষমতার প্রয়োজন দুটি কারণে : (ক) অধিকাংশ ক্ষেত্রে গাছের সুদৃঢ় বহিঃত্বক ভেদ করার জন্য ও (খ) দেহে প্রবেশের পর ভিতরের অপরিচিত পরিবেশে সেখানকার অন্তর্নিহিত প্রতিরোধ ক্ষমতাকে কাটিয়ে প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য। এই প্রসঙ্গেই ইনোকুলামের আক্রমণ ক্ষমতা বা **'ইনোকুলাম পোটেনশিয়াল'** (inoculum potential) এর প্রশ্ন এসে পড়ে। হর্সফল (J. G. Horsfall, 1932) প্রথম ইনোকুলাম পোটেনশিয়ালের সংজ্ঞা নিরূপণ করেন—"গাছের পরিবেশে উপস্থিত রোগ উৎপাদকের জীবাণুর বা সংক্রামক কণিকার সংখ্যা।" এখানে সংখ্যার গুরুত্ব স্বীকৃত এবং যৌথ ক্রিয়ার ধারণা রয়েছে। জেণ্টমেয়ার (G. A. Zentmeyer) ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ নূতন সংজ্ঞা দিলেন—"গাছের পরিবেশের রোগ উৎপাদন ক্ষমতা"। এই সংজ্ঞায় পরিবেশকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গ্যারেট (S. D. Garrett, 1952) এর মতে ইনোকুলাম পোটেনশিয়াল হল পোষক গাছের ত্বকে যেখানে আক্রমণ হয় সেখানে রোগ উৎপাদকের আয়ত্তাধীন বৃদ্ধির শক্তি (energy of growth available at the host surface to be infected)। এখানে গ্যারেট ঠিক যেখানে রোগের আক্রমণ শুরু হয় সেখানে

রোগ উৎপাদকের কতটা বৃদ্ধির শক্তি আছে তার উপর জোর দিয়েছেন। অধিকাংশ ছত্রাকের ক্ষেত্রে ত্বক ভেদ করে গাছের দেহে প্রবেশ একটি বৃদ্ধিসঞ্জাত ক্রিয়া ছাড়া কিছু নয়। সেই অর্থে বৃদ্ধির শক্তি বা ক্ষমতার কিছু গুরুত্ব অবশ্যই থাকতে পারে। আক্রমণের জন্য বৃদ্ধির শক্তি বা জৈবিক শক্তি কতটা পাওয়া যাবে তা অনেকগুলি আলাদা আলাদা ঘটনা বা অবস্থার উপর নির্ভর করে। দেখা গেছে যে জীবাণুর সংখ্যা বা শক্তির যোগানদার খাদ্যের সরবরাহ বাড়িয়ে রোগ উৎপাদকের আক্রমণ ক্ষমতা বা ইনোকুলাম পোটেনশিয়াল কিছুটা বাড়ানো সম্ভব।

উপরে আলোচিত বিভিন্ন সংজ্ঞা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা থেকে এরকম ধারণা করা যায় যে কোন রোগ উৎপাদকের ইনোকুলাম পোটেনশিয়াল নিম্ন-লিখিত বিভিন্ন অবস্থা, ঘটনা ও ক্ষমতার সামগ্রিক ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে: (১) ইনোকুলামের পরিমাণ (সংখ্যা বা ঘনত্ব—inoculum density), (২) ইনোকুলামকে সক্রিয় করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদানের উপস্থিতি (adequate nutrition), (৩) পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা পরিবেশ (environment), (৪) রোগ উৎপাদকের উগ্রতা (virulence) ও (৫) পোষক গাছের রোগ সংবেদনশীলতা (susceptibility)। এই রকম ধারণার ভিত্তিতে অনেকে মনে করেন যে ইনোকুলাম পোটেনশিয়াল বলতে অনুকূল পরিবেশে রোগ সংবেদনশীল জাতির গাছে সফল আক্রমণ রচনার ক্ষমতাকে বোঝায়।

ক। ইনোকুলামের ঘনত্ব

ইনোকুলামের ঘনত্ব বলতে সাধারণতঃ গাছের গায়ে বা জমিতে একক আয়তনের জায়গায় জীবাণু বা সংক্রামক কণিকার সংখ্যা বোঝায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে একটি স্পোর, হাইফা বা ব্যাকটিরিয়ার কোষ দিয়ে গাছে সফল আক্রমণের সূচনা হয় না। অনুকূল পরিবেশে জীবাণু যে নিম্নতম মাত্রায় বা সংখ্যায় থাকলে গাছ আক্রান্ত হয়, গয়ম্যান (E. Gaumann, 1950) তাকে **ইনোকুলামের আক্রমণ সূচনার মান বা 'নিউমেরিকাল থ্রেশহোল্ড অফ ইনফেকশন'** (numericat threshhold of infection) অ্যাখ্যা দেন। পরবর্তী কাল অনেকে একে **থ্রেশহোল্ড ভ্যালু অফ ইনো-কুলাম** (threshhold value of inoculum) বলেন। কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশে বা অধিকাংশ গাছে উচ্চ হারে সফল আক্রমণ পেতে হলে অনেক বেশী পরিমাণে ইনোকুলামের প্রয়োজন হয়। রোগ উৎপাদকের উগ্রতা গাছের রোগ সংবেদনশীলতার উপর নির্ভর করে অবশ্য সূচনার মানের তারতম্য ঘটতে

পারে। সাধারণতঃ দেখা গেছে যে ইনোকুলামের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়াতে থাকলে একটা সীমা পর্য্যন্ত রোগের আনুপাতিক হার (disease incidence) ও ক্ষতির পরিমাণ বাড়তে থাকে, তার পরে আর বাড়ে না। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রোগের ইনোকুলামের আক্রমণ সূচনার মান এখানে দেওয়া হল, যেমন গমের দুর্গন্ধযুক্ত ভূষা—প্রতি বীজের জন্য ১০০ ক্ল্যামিডোস্পোর, আলুর স্ক্যাব—প্রতি গ্রাম মাটিতে ৫০০ স্পোর ও ওয়ার্ট—প্রতি গ্রাম মাটিতে ২০০ জুস্পোর, টম্যাটোর ফিউজেরিয়াম উইল্ট—প্রতি মিলি. জলে ৭×১০^৫ স্পোর। যে সব রোগের লক্ষণ পাতায় বা কাণ্ডে আলাদা আলাদা ক্ষত বা দাগ হয়ে দেখা দেয় সেখানে ইনোকুলামের পরিমাণ (ছত্রাকের স্পোর বা ব্যাকটিরিয়া কোষ) ক্রমশঃ বাড়িয়ে বা কমিয়ে আক্রমণ সূচনার মান নির্দ্ধারণ করা যেতে পারে। গমের মরিচা রোগে পাতার একটি জায়গায় সফলভাবে আক্রমণ করে মরিচা দাগের সৃষ্টি করতে অন্ততঃ ৪০০ ইউরেডোস্পোর লাগে, কিন্তু আলুর নাবি ধসা রোগে মাত্র ১৫টি কনিডিয়াম থাকলে ঐ একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। বীনের চকোলেট স্পট রোগে পাতায় প্রতি মিলি. জলে ১০০০ কনিডিয়াম সহ জল ছেটালে গড়পড়তা ৫টি দাগের সৃষ্টি হয় কিন্তু কনিডিয়ামের সংখ্যা বাড়িয়ে ১০^৫ করলে ১০০টি দাগের সৃষ্টি হয়। এর থেকে বোঝা যাবে যে ইনোকুলামের ঘনত্বের উপর রোগের আক্রমণের তীব্রতা অনেকটাই নির্ভর করে। কিন্তু বেকার (K F.Baker) দেখিয়েছেন যে জমিবাহিত রোগের ক্ষেত্রে জমিতে ইনোকুলামের পরিমাণ ৮ গুণ বাড়ালে রোগের পরিমাণ দ্বিগুণ হয় মাত্র, যার অর্থ এই যে ইনোকুলামের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে রোগের প্রকোপ আনুপাতিক হারে বাড়ে না। গ্যারেট (১৯৬০) দেখিয়েছেন যে জমিতে থাকা ছত্রাকের হাইফা থেকে যে সব রোগে আক্রমণের সূচনা হয় সেখানেও এই ধরণের নজীর রয়েছে। অনেক রোগে একটি হাইফা থেকেই সার্থক আক্রমণের সূচনা হতে পারে, যেমন দেখা যায় ফিউজেরিয়াম, গয়ম্যানোমাইসেস ইত্যাদির ক্ষেত্রে। অন্য অনেক রোগে কিন্তু তা হয় না। সেখানে কয়েকটি হাইফা একত্রিত হয়ে সরু ফিতার মত (hyphal strand) বা অনেকগুলি হাইফা একত্র হয়ে দড়ির মত আকার (রাইজোমর্ফ = rhizomorph) ধারণ করলে তবেই তার মাধ্যমে সফল আক্রমণ সম্ভব হয়। প্রথমটির উদাহরণ ফোমিস অ্যানোসাস, দ্বিতীয়টির আর্মিলারিয়া মিলীয়া। দেখা গেছে যেসব গাছকে এই ধরণের ছত্রাকেরা আক্রমণ করে তাদের বহিঃত্বক কতটা পুরু তার উপর নির্ভর করে একটি হাইফা দিয়ে আক্রমণ সম্ভব না কয়েকটি বা অনেকগুলি হাইফা একত্রিত হয়ে আক্রমণের প্রয়োজন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইনোকুলামের পরিমাণ বেশী না থাকলে আক্রমণ কেন সফল হয় না তার সম্ভাব্য কারণগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। প্রথমতঃ দেখা যায় যে গাছের পাতা, কাণ্ড বা অন্য যে সব অঙ্গের উপর ইনোকুলাম এসে পড়ে তার সব জায়গাটাই রোগ উৎপাদকের ভিতরে প্রবেশের পক্ষে প্রশস্ত নয়। ইনোকুলামের পরিমাণ বেশী হলে তবেই কিছু না কিছু স্পোর বা জীবাণু আক্রমণযোগ্য জায়গাগুলিতে গিয়ে পড়ে ও আক্রমণের সূচনা করে। ইনোকুলামের পরিমাণ বাড়াতে বাড়াতে যখন সব প্রবেশযোগ্য স্থান দিয়েই স্পোরের প্রবেশ ঘটে তখনই রোগের আক্রমণ সর্বাধিক হয়। দ্বিতীয়তঃ ইনোকুলামের সব স্পোর বা জীবাণু সমান সক্রিয় অবস্থায় থাকে না। যেগুলি নিষ্ক্রিয় বা মাঝারি ধরণের সক্রিয় অবস্থায় রয়েছে তাদের আক্রমণে বিশেষ কোন ভূমিকা থাকে না। কিন্তু সংখ্যায় বেশী হলে তার মধ্যে অন্ততঃ কিছু সক্রিয় ধরণের স্পোর বা জীবাণু থাকবেই যাদের মাধ্যমে সফল আক্রমণের সূচনা হতে পারে। তৃতীয়তঃ পরিবেশ অধিকাংশ সময়ে রোগ উৎপাদকের অনুকূলে থাকে না। প্রতিকূল অবস্থায় ইনোকুলামের পরিমাণ বেশী না হলে আক্রমণ সম্ভব হয় না। চতুর্থ পরিস্থিতি হল প্রকৃতিতে কোন অবস্থাতেই রোগজীবাণু এককভাবে গাছের সংস্পর্শে আসে না। জমিতে ত নিশ্চয়ই—এমনকি জমির উপরের অংশেও আরো অনেক জীবাণু পরিবেশে থাকে যাদের মধ্যে কিছু রোগজীবাণুর পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। সেই কারণেও ইনোকুলামের পরিমাণ বেশী থাকলে সাফল্যের সম্ভাবনা বাড়ে। তাছাড়া আক্রমণ সফল হতে হলে রোগ উৎপাদককে গাছের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে যেভাবেই হোক ভেঙ্গে ফেলতে হবে। যদি একটি স্পোর, হাইফা বা ব্যাকটিরিয়ার কোষ দিয়ে কোন একটি জায়গা আক্রান্ত হয় তাহলে সেখানকার কোষগুলি হয়ত ঐ আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারবে। কিন্তু পাশাপাশি অনেকগুলি জায়গায় আক্রমণ (multiple infection) হলে ঐ অঞ্চলের কোষগুলির প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

খ। পুষ্টিকর খাদ্যের সরবরাহ

যেহেতু ইনোকুলাম পোটেনশিয়ালের সঙ্গে আক্রমণের শক্তির প্রশ্ন জড়িত, স্বাভাবিকভাবেই শক্তির উৎস হিসাবে খাদ্যের কথা এসে পড়ে। অধিকাংশ ছত্রাকের স্পোরের মধ্যে তাদের প্রাথমিক প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে পর্যাপ্ত খাদ্য জমা থাকে এবং সেক্ষেত্রে অঙ্কুরোদ্গমের জন্য শুধু জল ও অনুকূল তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। ঐ জমা খাবার ব্যবহার করেই স্পোরের অঙ্কুরোদ্গম থেকে

জার্ম টিউবের সাহায্যে গাছকে আক্রমণ পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন হতে পারে। কিন্তু স্পোরের বয়স বেশী হলে জমা খাবারের অনেকটাই শেষ হয়ে যায়, তখন স্পোর আর আগের মত সক্রিয় অবস্থায় থাকে না। বট্রাইটিস ফাবীর (*B. faboe*) সদ্য উৎপন্ন স্পোরের তুলনায় ২৫ দিন ও ৩৫ দিন বয়সের স্পোরের অঙ্কুরোদ্গমের ক্ষমতা অপরিবর্তিত থাকলেও আক্রমণের ক্ষমতা কমে আগের তুলনায় যথাক্রমে এক-দশমাংশ ও এক-শতাংশ হয়ে যায়। কিন্তু শক্তির উৎস হিসাবে গ্ল‌ুকোজ বা সুক্রোজ বাইরে থেকে সরবরাহ করলে ঐ সব স্পোর তাদের স্বাভাবিক আক্রমণ ক্ষমতা ফিরে পায়। কিছু ছত্রাকের স্পোর শুধু জল পেলেই অঙ্কুরিত হয় না, তাদের শক্তিদায়ক খাদ্যের প্রয়োজন হয়। গাছের শিকড়ের চারিপাশের জমিতে অর্থাৎ রাইজোস্ফিয়ারে (rhizosphere) যে সব ছত্রাক থাকে তাদের অনেকের স্পোরই শিকড় নিঃসৃত রসে যে নানারকম খাদ্য উপাদান থাকে সেগুলি পেলে তবে অঙ্কুরিত হয়। একই অবস্থায় হাইফার বৃদ্ধি ঘটে ও ব্যাকটিরিয়ার সংখ্যাবৃদ্ধি হয়। এর ফলে ইনোকুলামের পরিমাণ ও আক্রমণ ক্ষমতা দুইই বাড়ে।

গ। পরিবেশ

এখানে পরিবেশ বলতে আবহাওয়াকেই বোঝায়। আর্দ্রতার মাত্রা ও তাপমাত্রায় পরিবর্তন হলে ইনোকুলামের আক্রমণ ক্ষমতার তারতম্য ঘটতে পারে। ছত্রাকের স্পোরের অঙ্কুরোদ্গম ও ব্যাকটিরিয়ার কোষের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য উচ্চমাত্রায় আর্দ্রতার প্রয়োজন। কম আর্দ্রতায় ইনোকুলামের আক্রমণ ক্ষমতা কমে যায়। কিন্তু কিছু পাউডারি মিলডিউ জাতীয় ছত্রাকের স্পোর কম উষ্ণতায় অঙ্কুরিত হয়।

ঘ। রোগ উৎপাদকের উগ্রতা

রোগ উৎপাদকের উগ্রতা (virulence) তার অন্তর্নিহিত আক্রমণ ক্ষমতার পরিচায়ক। রোগ উৎপাদকের একই প্রজাতির বিভিন্ন জাতির মধ্যে জীন নিয়ন্ত্রিত এই ক্ষমতায় তারতম্য প্রায়ই দেখা যায়। অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি উগ্র কোন জাতির তুলনায় কম উগ্র অন্য একটি জাতির ইনোকুলামের পরিমাণ এক হলেও শেষোক্ত জাতির আক্রমণ ক্ষমতা কম হবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে ইনোকুলামের পরিমাণ বাড়ালে বা বাইরে থেকে পুষ্টিকর খাদ্যের যোগান দিলে তার আক্রমণ ক্ষমতা কিছুটা বাড়তে পারে।

ঙ। গাছের রোগ সংবেদনশীলতা

ইনোকুলামের আক্রমণ ক্ষমতার প্রসঙ্গে পোষক গাছের রোগ সংবেদনশীলতার (susceptibility) কোন গুরুত্ব আছে কি না এ সম্বন্ধে উদ্ভিদ রোগবিজ্ঞানীদের

মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। রোগ উৎপাদককে গাছের প্রতিরোধের প্রাচীর অতিক্রম করে দেহের মধ্যে প্রবেশ করতে হয় ও সেখানে ভিতরের বাধা অতিক্রম করে প্রতিকূল পরিবেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। সুতরাং মনে হয় গাছের বিভিন্ন জাতির রোগ সংবেদনশীলতা বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার তারতম্যের উপর একটি রোগ উৎপাদকের ইনোকুলামের আক্রমণ ক্ষমতা কিছুটা নির্ভর করবে। একটি উচ্চ রোগ সংবেদনশীলতা সম্পন্ন জাতির গাছের তুলনায় মাঝারি ধরণের রোগ সংবেদনশীলতা সম্পন্ন জাতির গাছে আক্রমণ চালাতে গেলে বেশি পরিমাণে ইনোকুলামের প্রয়োজন হতে পারে।

প্রাসঙ্গিক পুস্তক ও গবেষণাপত্রাদি

Broadbent, L. 1960. Dispersal of inoculum by insects and others including man. In "Plant Pathology : An Advanced Treatise" (J. G. Horsfall and A. E. Dimond eds.). Vol 3, 58—83. Academic Press, New York.

Ellingboe, A. H. 1968. Inoculum production and infection by foliage pathogens. *Ann. Rev. Phytopathol. 6 :* 317-330

Ingold, C. 1971. "The Fungal Spores—their liberation and dispersal". Clarendon Press, Oxford.

Powell. N. T. 1963. The role of plant parasitic nematodes in fungal diseasses. *Phytopathology*. **53.** 28—35.

Schrodter, H. 1960. Dispersal by air and water—the flight and landing. In "Plant Pathology—An Advanced Treatise" (J. G. Horsfall and A. E. Dimond, eds.). Vol. 3, 169—227. Academic Press, New York.

Wallace, H. R. 1978. Dispersal in time and space : soil pathogens. In "Plant Disease—An Advanced Treatise" (J. G. Horsfall and E. B. Cowling, eds.). Vol. 2, 181—202. Academic Press, New York.

১১ গাছের দেহে রোগ উৎপাদকের প্রবেশ

যে কোন সংক্রামক রোগের সৃষ্টিতে রোগ উৎপাদকের পক্ষে পোষক গাছের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসা একান্ত প্রয়োজন। গাছের দেহের মধ্যে রোগ উৎপাদকের প্রবেশ রোগের আক্রমণের প্রথম পর্যায়ের সূচনা করে। সব ভাইরাস, অনেক ব্যাকটিরিয়া ও কিছু ছত্রাক কেবলমাত্র ক্ষতের মাধ্যমেই গাছের দেহে প্রবেশ করে থাকে। বাকী ব্যাকটিরিয়া ও বেশ কিছু ছত্রাক ত্বকের স্টোমা (stoma), লেন্টিসেল (lenticel) ইত্যাদি যে সব স্বাভাবিক ছিদ্র আছে তাদের মধ্যে, আর অনেক ছত্রাক ও সব নিমাটোড সোজাসুজি ত্বক ভেদ করে দেহে প্রবেশ করে। কোন রোগ উৎপাদক তার পোষক গাছে কিভাবে প্রবেশ করবে তা নির্দিষ্ট এবং মনে হয় গাছ ও রোগ উৎপাদকের জীন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তবে অবস্থা বিশেষে বা প্রতিকূল পরিবেশে রোগ উৎপাদক তার স্বাভাবিক পথ ছেড়ে অন্য পথেও ভিতরে ঢুকতে পারে। বট্রাইটিস সিনেরিয়া, পাকসিনিয়া গ্র্যামিনিস, ক্ল্যাভিসেপস পারপিউরিয়া, ভেঞ্চুরিয়া ইনিক্যুয়ালিস ইত্যাদি ছত্রাক এবং এরউনিয়া অ্যামিলোভোরা নামক ব্যাকটিরিয়া একাধিক উপায়ে গাছের দেহের ভিতরে প্রবেশ করে থাকে।

ক। ত্বক ভেদ করে প্রবেশ (Direct penetration of host surface) গাছের দেহত্বক ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করা একমাত্র ছত্রাকের পক্ষেই সম্ভব। স্মাট, রাস্ট (যেখানে ব্যাসিডিওস্পোর থেকে আক্রমণের সূচনা হয়) পাউডারি মিলডিউ ও অনেক অ্যাসকোমাইসিটিস এবং ফাঞ্জাই ইমপারফেকটি শ্রেণীর ছত্রাক এইভাবে দেহে প্রবেশ করে। যারা গাছের মাটির উপরের অংশ আক্রমণ করে তাদের ভিতরে ঢোকার পথে প্রথমে কিউটিকল ও পরে এপিডার্মিস কোষের বাইরের দিকের দেওয়াল ভেদ করতে হয়। যারা মাটির নীচের অংশ বা শিকড় আক্রমণ করে তাদের শুধু এপিডার্মিস কোষের বাইরের দেওয়াল ভেদ করলেই হয় কেননা সেখানে কিউটিকল থাকে না। বট্রাইটিস সিনেরিয়া ভেঞ্চুরিয়া ইনিক্যুয়ালিস, কোলেটোট্রাইকাম লিণ্ডেমুথিয়ানাম *(C. lindemuthianum)*, পাকসিনিয়া গ্র্যামিনিস প্রভৃতি ছত্রাকের পোষক

গাছের দেহে এইভাবে প্রবেশের প্রামাণিক বর্ণনা পাওয়া যায়। এরকম না হলেও এদের প্রবেশ পদ্ধতির মধ্যে বড় রকমের কোন প্রভেদ নেই।

গাছের দেহে পরজীবীর প্রবেশ সফল হতে গেলে আর্দ্র আবহাওয়া একান্ত
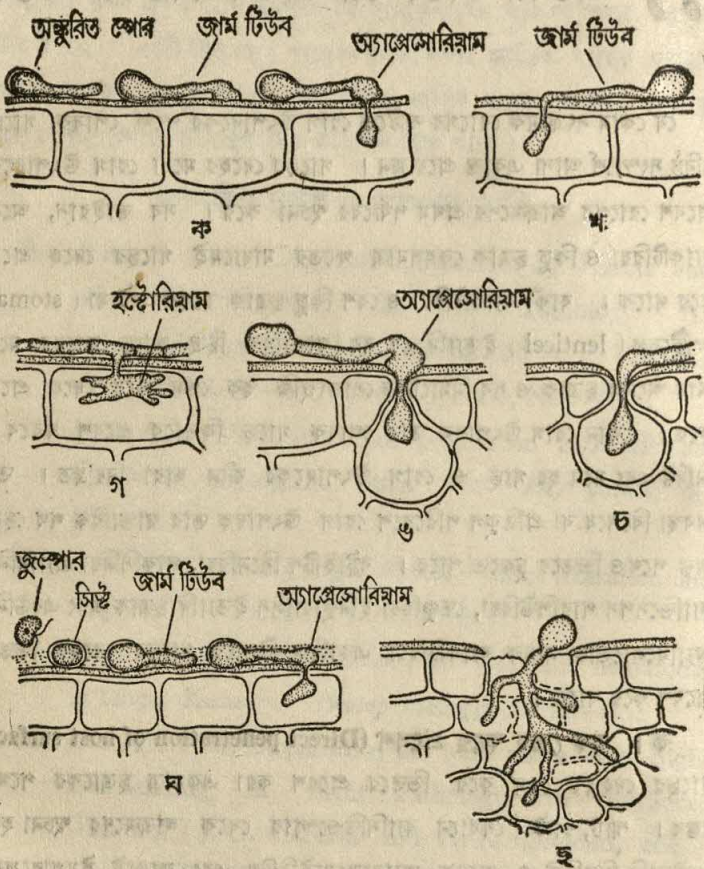
রেখাচিত্র—১২ পরজীবী ছত্রাকের গাছের দেহে প্রবেশ

(ক) অ্যাপ্রেসোরিয়াম গঠনের মাধ্যমে ত্বক ভেদ করে প্রবেশ, (খ) বিনা অ্যাপ্রেসোরিয়ামে ত্বক ভেদ করে প্রবেশ (গ) ত্বক ভেদ করে প্রবেশের পর এপিডার্মিস কোষে হস্টোরিয়াম গঠন (ঘ) জুস্পোরের দ্বারা আক্রমণ ও ত্বক ভেদ করে প্রবেশ (ঙ) অ্যাপ্রেসোরিয়াম গঠনের মাধ্যমের স্টোমার ছিদ্রের মধ্য দিয়ে (চ) বিনা অ্যাপ্রেসোরিয়ামে স্টোমার ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ (ছ) ক্ষতের মাধ্যমে প্রবেশ।

প্রয়োজন। শেষরাতে বা ভোর বেলায় কুয়াশা ও শিশিরপাতের জন্য পাতার গায়ে যে জলের ফোঁটা বা পাতলা স্তর দেখতে পাওয়া যায় তা গাছের উপরে

এসে পড়া ছত্রাকের স্পোরকে অঙ্কুরিত হতে সাহায্য করে। প্রস্বেদনের সঙ্গে গাছের দেহকোষ থেকে বেরিয়ে আসা বিভিন্ন ধরণের জৈব ও অজৈব যৌগ, যথা—শর্করা, অ্যামাইনো অ্যাসিড ইত্যাদি, এই জলে দ্রব অবস্থায় থাকে এবং সাধারণতঃ স্পোরের অঙ্কুরোদ্গমে ও জার্ম টিউবের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ত্বকে জমে থাকা বিভিন্ন ধরণের পদার্থের জন্য স্পোরের অঙ্কুরোদ্গম বা জার্ম টিউবের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এমন প্রমাণও দু-একটি ক্ষেত্রে রয়েছে। বীটে সার্কোস্পোরা বেটিকোলা ও পেঁয়াজে কোলেটোট্রাইকাম সারসিনানস (*C. circinans*) এর আক্রমণের ক্ষেত্রে এরকম হতে দেখা গেছে। অঙ্কুরোদ্গমের পর জার্ম টিউব ত্বকের উপর কিছুটা এগিয়ে থেমে যায়। কেন থেমে যায় তার কোন সঠিক ব্যাখ্যা অবশ্য এখনও জানা নেই। তখন জার্মটিউবের মাথাটি একটু চওড়া হয়ে কুশনের আকৃতি নেয়, যাকে বলে '**অ্যাপ্রেসোরিয়াম**' (appresorium)। জার্ম টিউবের মাথা থেকে ক্ষরিত এক ধরণের আঠালো পদার্থ অ্যাপ্রেসোরিয়ামকে ত্বকের সঙ্গে সুদৃঢ়-ভাবে জুড়ে যেতে সাহায্য করে। ছত্রাকের গাছের দেহে প্রবেশের ব্যাপারে অ্যাপ্রেসোরিয়ামের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। প্রথমতঃ যেখানে অ্যাপ্রেসোরিয়াম গঠিত হয় সেখানেই ছত্রাকের দেহে প্রবেশের স্থান নির্দিষ্ট হয় (রেখাচিত্র ১২-ক) দ্বিতীয়তঃ দেহত্বকের সঙ্গে অ্যাপ্রেসোরিয়াম সুদৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকার ফলে দেহে ত্বক ভেদ করে প্রবেশের জন্য ছত্রাকের পক্ষে যথেষ্ট শক্তি প্রয়োগ করা বা চাপ সম্ভব হয়। অধিকাংশ ছত্রাকের ক্ষেত্রে অ্যাপ্রেসোরিয়াম গঠিত হলেও কিছু ছত্রাক বিনা অ্যাপ্রেসোরিয়ামেই দেহে প্রবেশ করতে পারে (রেখাচিত্র ১২-খ) যেমন ভুট্টাতে উস্টিলাগো মেইডিস, বাদামে ক্ল্যাষ্টেরোস্পোরিয়াম কার্পোফাইলাম (*Chasterosporium carpophilum*), চীনাবাদামে অ্যাসকোকাইটা পিসি (*Ascochyta pisi*) ও মটরে ফিউজেরিয়াম অক্সিস্পোরাম এর কিছু বিশেষ জাতি।

প্রথমদিকে ধারণা ছিল অ্যাপ্রেসোরিয়াম গঠনের জন্য উদ্দীপনা যোগায় গাছের দেহনিঃসৃত বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগ। পরবর্তীকালে ব্রাউন (W. Brown) ও তাঁর সহকর্মীরা গাছের দেহত্বকের পরিবর্তে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত ও রাসায়নিক দিক থেকে নিষ্ক্রিয় সোনার পাত ও কলোডিয়ন (collodion), প্যারাফিন বা জেলাটিনের স্তরের উপর বট্রাইটিস সিনেরীয়ার স্পোর অঙ্কুরিত করিয়ে দেখতে পান যে সেখানে অনেক ক্ষেত্রেই জার্ম টিউবের মাথায় অ্যাপ্রেসোরিয়াম গঠিত হয়েছে। এই ধরণের বিশদ গবেষণার উপর ভিত্তি করে ব্রাউন সিদ্ধান্তে আসেন যে অ্যাপ্রে-সোরিয়াম গঠিত হবার ঘটনাটি স্পর্শদ্বারা উদ্দীপিত ছত্রাকের একটি প্রতিক্রিয়া (thigmotropic response), পোষক গাছের দেহনিঃসৃত রাসায়নিক পদার্থের

সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই। জার্ম টিউবের মাথা যখন যথেষ্ট কাঠিন্যবিশিষ্ট কোন কিছুর সংস্পর্শে আসে তখনই সেখানে অ্যাপ্রেসোরিয়াম গঠিত হবার সম্ভাবনা থাকে। দেখা গেছে যে ফাইটফথোরা, কোলেটোট্রাইকাম ও কিছু রাস্ট জাতীয় ছত্রাক গাছের ত্বকের কোন বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর না করেই অ্যাপ্রেসোরিয়াম তৈরী করতে পারে। ভ্যান বার্ঘ (P. Van Burgh, 1950) ফর্মালিন সহযোগে তৈরী বিভিন্ন মাত্রার কাঠিন্যযুক্ত জেলাটিনের স্তরের উপর কোলেটোট্রাইকাম (*C. phomoides*) এর স্পোর অঙ্কুরিত করিয়ে দেখতে পান যে কাঠিন্যের তারতম্য অনুসারে যেসব জায়গায় ছত্রাকের ভিতরে প্রবেশের পথে যথেষ্ট বাধা আছে মাত্র সেখানেই অ্যাপ্রেসোরিয়াম তৈরী হয়েছে। ডিকিনসনের (S. Dickinson, 1949) মতে যেখানে গাছের ত্বক পাতলা বা নরম একমাত্র সেখানেই বিনা অ্যাপ্রেসোরিয়ামে প্রবেশ সম্ভব হতে পারে।

কিছু রোগের ক্ষেত্রে অবশ্য গাছের দেহনিঃসৃত রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতির উপর ছত্রাকের অ্যাপ্রেসোরিয়াম গঠন নির্ভর করে এরকম প্রমাণ পাওয়া গেছে। পাকসিনিয়া ট্রিটিসিনা (*P. triticina*) ও পাকসিনিয়া স্ট্রাইফর্মিস এর জার্ম টিউব কাঁচ বা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত কোন স্তরের উপর অ্যাপ্রেসোরিয়াম গঠন করে যদি সেখানে সংবেদনশীল জাতির গাছের (পাতার) নির্যাস দেওয়া হয়। একই ভাবে দেখা গেছে যে পাকসিনিয়া করোন্যাটা (*P. coronata*) ও পাকসিনিয়া মেন্থীর (*P. menthae*) অ্যাপ্রেসোরিয়াম গঠনের জন্য যথাক্রমে দস্তা ও থাইমল (thymol) প্রয়োজন হয়। কিছু জমিবাহিত রোগ উৎপাদক ছত্রাক সম্বন্ধেও অনেকটা এই ধরণের তথ্য রয়েছে। রাইজোকটোনিয়া সোল্যানি, হেলমিনথো স্পোরিয়াম ভিকটোরিয়ী (*H. victoriae*) ও হেলমিনথোস্পোরিয়াম সোরোকি-নিয়ানাম (*H. sorokinianum*) প্রভৃতি ছত্রাক, যারা গাছের শিকড় বা জমি সংলগ্ন কাণ্ডের নীচের অংশ আক্রমণ করে, কেবলমাত্র রোগ সংবেদনশীল প্রজাতির গাছের ত্বকেই অ্যাপ্রেসোরিয়াম গঠন করে, কিন্তু অন্য প্রজাতির গাছে করে না। রাইজোকটোনিয়া সোল্যানি অবশ্য অ্যাপ্রেসোরিয়ামের পরিবর্তে আক্রমণকারী হাইফার অগ্রভাগে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের কুশন বা 'ইনফেকশন কুশন' (infection cushion) গঠন করে যেটি হাইফার অনেকগুলি ছোট ছোট শাখার সমন্বয়ে গঠিত। এই ধরণের তথ্য থেকে এমন সিদ্ধান্তে আসা যায় যে কোথাও কোথাও রোগ সংবেদনশীল প্রজাতির / জাতির গাছে এমন কিছু বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ থাকে যা নিঃসৃত হয়ে ত্বকের উপর ছত্রাককে অ্যাপ্রেসোরিয়াম গঠনে উদ্দীপনা যোগায়। অন্যত্র ঐ ধরণের পদার্থের অভাবে অ্যাপ্রেসোরিয়াম গঠন বিঘ্নিত হয়।

জমিতে এমন কিছু ছত্রাক আছে যারা জুস্পোরের মাধ্যমে পোষক গাছের শিকড়কে আক্রমণ করে। শিকড়নিঃসৃত কিছু রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে জুস্পোর শিকড়ের দিকে এগিয়ে যায় ও তার ত্বকের উপরে এসে পড়ে এরকম যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। যেহেতু জুস্পোর এইভাবে বিভিন্ন গাছের শিকড়ের দিকে আকৃষ্ট হয় সেজন্য একে জুস্পোরের উপর শিকড়নিঃসৃত রসের সাধারণ প্রভাব বলে ধরা হয়। কিন্তু কিছু রোগে দেখা যায় যে ছত্রাকের জুস্পোর শুধুমাত্র তার পোষক গাছের শিকড়ের দিকেই এইভাবে আকৃষ্ট হয়—অন্য কোন গাছের দিকে যায় না। লেবুতে ফাইটফথোরা সাইট্রফথোরা (*P. citrophthora*), অ্যাভোকাডোতে (avocado pear) ফাইটফথোরা সিনামমি (*P. cinnamomi*) ও কোকোতে ফাইটফথোরা পামিভোরার আক্রমণের ক্ষেত্রে শিকড়নিঃসৃত রসের এই বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। জুস্পোর শিকড়ের গায়ে এসে পড়ার পর তার ফ্ল্যাজেলা নষ্ট হয়ে যায় এবং নিজের চারিধারে একটি দেওয়াল সৃষ্টি করে সেটি একটি 'সিস্টে' (cyst) পরিণত হয় (রেখাচিত্র—১২ ঘ)। অল্পক্ষণ পরেই সিস্ট অঙ্কুরিত হয়ে জার্ম টিউবের সৃষ্টি করে। সেই জার্ম টিউব সোজাসুজি ত্বক ভেদ করতে পারে বা কিছুদূর এগিয়ে অ্যাপ্রেসোরিয়াম গঠন করে ত্বক ভেদ করে।

অ্যাপ্রেসোরিয়ামের তলার দিকে প্রায় মাঝামাঝি জায়গা থেকে একটি কোণবিশিষ্ট, সূক্ষ্মাগ্র 'ইনফেকশন পেগ' (infection peg) গড়ে ওঠে এবং সংলগ্ন কিউটিকলের উপর চাপ দিতে থাকে যার ফলে অনেক সময় কিউটিকলের কিছুটা অংশ বসে যায় (invaginated)। ইনফেকশন পেগ প্রথমে কিউটিকল ও পরে এপিডার্মিস কোষের বাইরের দেওয়াল ভেদ করে কোষের মধ্যে প্রবেশ করে (রেখাচিত্র ১২ ক)। ভিতরে প্রবেশের ঘটনাটি অতি দ্রুত ঘটে। শিকড়ে, খুব কচি পাতায় বা কচি চারায় আক্রমণ হলে সেখানে কিউটিকল না থাকায় ছত্রাককে শুধু এপিডার্মিস কোষের দেওয়াল ভেদ করতে হয়। ছত্রাক কিভাবে ত্বক ভেদ করে এপিডার্মিস কোষে প্রবেশ করে—শুধুমাত্র চাপ দিয়ে, শুধুমাত্র রাসায়নিক উপায়ে অর্থাৎ ছত্রাক দেহনিঃসৃত কোন এনজাইমের ক্রিয়ার ফলে বা যান্ত্রিক ও রাসায়নিক পদ্ধতির সমন্বয়ে সে বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। ত্বক ভেদ করে এপিডার্মিস কোষে প্রবেশের পর ইনফেকশন পেগ স্ফীত হয়ে থলির (vesicle) আকৃতি বা হাইফার স্বাভাবিক আকৃতি গ্রহণ করে আর পাউডারি মিলডিউ ছত্রাকের ক্ষেত্রে হস্টোরিয়াম গঠন করে (রেখাচিত্র ১২—গ)। কোথাও জার্ম টিউব অ্যাপ্রেসোরিয়াম গঠন না করেই সোজাসুজি ত্বক

ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করে (রেখাচিত্র ১২—খ), উদাহরণ উস্টিলাগো মেইডিস।

কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত বিভিন্ন নিষ্ক্রিয় পদার্থের পাত বা স্তরের উপর বট্রাইটিস সিনেরীয়ার স্পোর অঙ্কুরিত করিয়ে ব্রাউন দেখতে পান যে জার্ম টিউব সেখানে শুধু অ্যাপ্রেসোরিয়াম তৈরী করে না, চাপ দিয়ে শক্তি প্রয়োগ করে ঐ পাত বা স্তর ভেদ করতেও সমর্থ হয় যদি না এটি খুব মোটা বা শক্ত প্রকৃতির হয়। এর থেকে ব্রাউন (W. Brown, 1915) সিদ্ধান্তে আসেন যে ছত্রাক রাসায়নিক উপায়ে নয়, চাপ দিয়ে গাছের ত্বক ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করে। এইভাবে প্রবেশের স্বপক্ষে অন্য কিছু তথ্যও রয়েছে। দেখা গেছে যে গাছের কোষের তুলনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছত্রাকের হাইফার রসস্ফীতি জনিত চাপ (turgor pressure) অনেক বেশী যার ফলে ছত্রাক গাছের কোষের দেওয়াল ভেদ করে প্রবেশ করতে পারে। ছত্রাককে কৃত্রিম স্তর বা কিউটিকলকে চাপ দিয়ে বসিয়ে দিতে দেখা গেছে। বারবেরীর মরিচা, যবের ছাতাধরা, মটরের ব্লাইট (c. o. *Ascochyta pisi*) ইত্যাদি রোগের ক্ষেত্রে প্রতিরোধী জাতির গাছে রোগ সংবেদনশীল জাতির তুলনায় কিউটিকল ও এপিডার্মিস কোষের বাইরের দেওয়াল অপেক্ষাকৃত পুরু ও সুদৃঢ় হয়। তাছাড়া নূতন কিছু তথ্যের ভিত্তিতে মনে হয় যে সব সময় কিউটিকল হয়ত একটি অবিচ্ছিন্ন ধরণের নিশ্ছিদ্র স্তর নয় যেমন এতকাল ভাবা হয়েছে। টিউলিপের কিউটিকলে খাড়া ভাবে থাকা সূক্ষ্ম নালী ও আপেলে একইভাবে থাকা পেকটিন দিয়ে গঠিত নরম অংশ দেখতে পাওয়া গেছে। তাছাড়া কিউটিকলে এপিডার্মিস কোষের সাইটোপ্লাজমের সঙ্গে বাইরের যোগ-সূত্রস্থাপনকারী অনেক এক্টোডেসমা (ectodesmata) রয়েছে। এর থেকে মনে হয় কিউটিকলের এই ধরণের অপেক্ষাকৃত দুর্বল জায়গাগুলি দিয়ে ছত্রাকের প্রবেশ হয়ত খুব কঠিন নয়।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে ছত্রাকের গাছের ত্বক ভেদ করে প্রবেশের স্বপক্ষেও কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। ছত্রাক যেখানে কিউটিকল ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করেছে সেখানে ছিদ্রের চারিধার মসৃণ হলে মনে হয় না যে শুধুমাত্র চাপ দিয়ে জোর করে ভিতরে প্রবেশ করেছে। তাছাড়া প্রবেশ পথে ও সন্নিহিত অংশে কিউটিকল নষ্ট হয়ে যাবার ও কিউটিনের পরিমাণ কমে যাবার স্পষ্ট প্রমাণও কোথাও কোথাও পাওয়া গেছে। এর থেকে মনে হতে পারে যে ত্বক ভেদ করে ছত্রাকের দেহের ভিতরে প্রবেশের ব্যাপারে তার দেহনিঃসৃত এনজাইমের একটা ভূমিকা কোন কোন ক্ষেত্রে থাকতেও পারে। নিঃসন্দেহে ছত্রাকের প্রবেশ পথের

প্রধান বাধা হল কিউটিকল। কিউটিকলের ক্ষতি করতে পারে অর্থাৎ কিউটিকলকে ভাঙ্গতে পারে এরকম এনজাইম, কিউটিনেজ (cutinase), ছত্রাক উৎপাদন করে কি না সে সম্বন্ধে আগে স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না। ইদানীংকালে এই প্রসঙ্গে কিছু নূতন তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে। আপেল বা ন্যাসপাতিতে ভেঞ্চুরিয়া, কমলা লেবুতে কোলেটোট্রাইকাম গ্লিওস্পোরিঅয়ডেস (*C. gloeosporioides*), লেটুসে মারসোনিয়ানা প্যানাটোনিয়ানা (*Marssoniana panattoniana*) ও কিছু গাছে পাউডারি মিলডিউ জাতীয় ছত্রাকের আক্রমণ হলে ত্বকের যেখানে ছত্রাকের হাইফা রয়েছে সেখানে কিউটিকল কিছুটা ক্ষয়ে যেতে দেখা যায়। ত্বকের উপরেই থাকে এমন কিছু ছত্রাকের ক্ষেত্রেও অনুরূপ তথ্য পাওয়া গেছে। আপেল, শালগম ও গোলাপের ছাতাধরা এবং আপেলের স্ক্যাব রোগে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে আক্রান্ত অংশের ত্বকে সুস্থ অংশের তুলনায় কিউটিনের পরিমাণ অনেক কম। উপরের তথ্যগুলি ইঙ্গিত করে যে এই সব ছত্রাক কিউটিনেজ উৎপাদন করে। হাইনেন (W. Heinen, 1962) প্রথম দেখান যে একটি ছত্রাক—পেনিসিলিয়াম স্পাইনুলোসাম (*P. spinulosum*) কিউটিনেজ উৎপাদন করে। পরে জানা যায় যে রাইজোকটোনিয়া সোল্যানি, ক্ল্যাডোস্পোরিয়াম কুকুমেরিনাম, বট্রাইটিস সিনেরীয়া ও আরও কিছু রোগ উৎপাদক ছত্রাক কিউটিনেজ উৎপাদন করে। কিউটিনেজ অত্যন্ত শ্লথগতিতে কিউটিন ভাঙ্গে, আর ত্বক ভেদ করে ছত্রাকের প্রবেশ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ঘটে। বিভিন্ন ছত্রাক যে হারে কিউটিনেজ উৎপাদন করে তার থেকে এরকম ভাবা কঠিন যে জার্ম টিউবের অগ্রভাগে এত দ্রুত বেশী পরিমাণে কিউটিনেজ উৎপন্ন হয় যার ফলে তার পক্ষে কিউটিকল ভেদ করে দ্রুত ভিতরে প্রবেশ সম্ভব হতে পারে। উপরোক্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নয় সাধারণতঃ শক্তি প্রয়োগ করে, চাপ দিয়ে, ইনফেকশন পেগ কিউটিকল ভেদ করে। তবে স্থানীয়ভাবে কিউটিনেজের ক্রিয়ার ফলে ইনফেকশন সংলগ্ন কিউটিকল কিছুটা নরম হয়ে পড়তে পারে যার ফলে চাপ দিয়ে দ্রুত ভিতরে প্রবেশের সম্ভাবনা হয়ত আরও প্রশস্ত হয়। অতি সূক্ষ্মাগ্র ইনফেকশন পেগের ভিতরে প্রায় ৭ অ্যাটমসফিয়ার (atmosphere) চাপ সৃষ্টি হতে দেখা গেছে যা কিউটিকল ভেদ করার পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে করা হয়।

কিউটিকল ভেদ করার পর ইনফেকশন পেগকে এপিডার্মিস কোষের বাইরের দেওয়াল ভেদ করতে হয়। অধিকাংশ রোগ উৎপাদক ছত্রাকই দেওয়ালের দুটি মূল উপাদান ভাঙতে পারে এরকম দু ধরণের এনজাইম অর্থাৎ পেকটিকল ও সেলু-

লোলাইটিক এনজাইম উৎপাদন করতে পারে। ইনফেকশন পেগের অগ্রভাগ থেকে এই ধরণের এনজাইম ক্ষরিত হয়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে ইনফেকশন পেগ সংলগ্ন দেওয়াল কিছুটা স্ফীত হয়ে ওঠে। রঞ্জক পদার্থ ব্যবহার করলে দেখা যায় যে অংশ আক্রান্ত নয় সেই অংশের তুলনায় আক্রান্ত অংশ হালকা রঙ নিয়েছে। এপিডার্মিস কোষের দেওয়াল ভেদ করে প্রবেশ করতে ছত্রাকের সাধারণতঃ খুবই কম সময় লাগে—কখনও বা কয়েক মিনিট মাত্র। সুতরাং মনে হয় ছত্রাকের দেওয়াল ভেদ করার ঘটনাটি রাসায়নিক ও যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার যুগ্ম প্রভাবে ঘটে। এনজাইমের প্রভাবে দেওয়াল কিছুটা নরম হয়ে পড়লে তখন ইনফেকশন পেগের পক্ষে চাপ দিয়ে দ্রুত কোষের ভিতরে প্রবেশ সহজতর হয়। কোষের ভিতরে প্রবেশের পরেই ইনফেকশন পেগ স্ফীত হয়ে ছত্রাকের হাইফার স্বাভাবিক আকৃতি ধারণ করে।

খ। ত্বকের স্বাভাবিক ছিদ্রসমূহের মাধ্যমে প্রবেশ

স্টোমা : অনেক ব্যাকটিরিয়া ও বেশ কিছু ছত্রাক স্টোমার ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে গাছের দেহের ভিতর প্রবেশ করে। গমের পাতায় পাকসিনিয়া গ্র্যামিনিসের আক্রমণকে এইভাবে প্রবেশের ভাল একটি উদাহরণ বলে ধরা যায়। পাতার ত্বকের উপরে আর্দ্র পরিবেশে ঐ ছত্রাকের ইউরেডোস্পোর অঙ্কুরিত হলে জার্ম টিউবটি বড় হতে থাকে এবং কিছুদূর এগিয়ে একটি স্টোমার ছিদ্রের উপরে এসে থামে। তখন সমস্ত সাইটোপ্লাজম জার্ম টিউবের মাথার কাছে এসে জমে—পিছনের অংশ প্রায় ফাঁকা হয়ে যায়। কি কারণে জার্ম টিউব স্টোমার দিকে এগোয় এবং স্টোমার নিকটে এসে থামে ঠিক জানা নেই। মনে করা হয় স্টোমার ছিদ্রের ঠিক নীচে যে ফাঁকা জায়গা আছে (substomatal chamber) সেখানকার অতিশয় আর্দ্র অবস্থাই জার্ম টিউবের স্টোমার দিকে এগিয়ে যাবার ও ছিদ্রের মুখে এসে থামার প্রধান কারণ। একে জলের প্রতি আকর্ষণ বা 'হাইড্রোট্রপিজম' (hydrotropism) বলা যায়। স্টোমার উপরে এসে জার্ম টিউবের অগ্রগতি রুদ্ধ হবার অব্যবহিত পরে এর মাথার অংশ স্ফীত হয়ে কুশনের আকৃতি বিশিষ্ট অ্যাপ্রেসোরিয়াম তৈরী হয় যা ছিদ্রটিকে ঢেকে নিঃসৃত আঠালো পদার্থের সাহায্যে রক্ষী কোষের (guard cell) গায়ে সুদৃঢ়ভাবে আটকে যায়। এর পরে অ্যাপ্রেসোরিয়ামের তলার দিক থেকে একটি সরু আকৃতির 'ইনফেকশন হাইফা' (infection hypha) তৈরী হয় যেটি নীচের দিকে বেড়ে কিছুটা চাপ দিয়ে স্টোমার ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে নীচের ফাঁকা জায়গাটিতে প্রবেশ করে এবং ক্রমশঃ স্ফীত হয়ে একটি থলির (vesicle) আকৃতি নেয়। (রেখাচিত্র ১২—ঙ)

পরে ঐ থলি থেকে বেশ কয়েকটি অপেক্ষাকৃত সরু ধরণের ইনফেকশন হাইফা বেরোয় যেগুলি ঐ ফাঁকা জায়গার চারিপাশের প্যারেনকাইমা কোষগুলিকে আক্রমণ করে। অন্যান্য ছত্রাকের ক্ষেত্রে উপরের বর্ণনা থেকে কিছুটা তারতম্য হতে পারে। স্পোর অঙ্কুরিত হওয়া থেকে ইনফেকশন হাইফার ভিতরে প্রবেশ পর্যন্ত ঘটনা ঘটতে মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে। ক্ল্যাডোস্পোরিয়াম ফুলভাম (*C. fulvum*) ও পাকসিনিয়া স্ট্রাইফর্মিসের জার্ম টিউব অ্যাপ্রেসোরিয়াম গঠন না করেই স্টোমার ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে সোজাসুজি প্রবেশ করে। (রেখাচিত্র ১২—চ)।

অনেক ছত্রাক জুস্পোরের মাধ্যমে আক্রমণের সূচনা করে। আঙুরে প্লাজমোপারা ভিটিকোলার (*P. viticola*) জুস্পোর পাতার উপরে জমে থাকা জলের মধ্যে সাঁতার কেটে স্টোমার দিকে এগিয়ে যায় এবং ছিদ্রের উপর কয়েক-বার পাক খেয়ে একটি রক্ষী কোষের উপর নেমে পড়ে। তার পরেই জুস্পোর ফ্ল্যাজেলা ত্যাগ করে ও নিজের চারিদিকে একটা দেওয়াল তৈরী করে সিস্ট গঠন করে। সিস্টটি অঙ্কুরিত হওয়ার পর জার্ম টিউব মাত্র ১২ মিনিটের মধ্যে ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে নীচের ফাঁকা জায়গায় প্রবেশ করে। আঙুরে প্লাজমোপারা ও মৌরীতে ফাইটফথোরার আক্রমণের ক্ষেত্রে মনে হয় যে স্টোমার ছিদ্রের মধ্য দিয়ে নিঃসৃত কোন রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে জুস্পোর ঐ ছিদ্রের দিকে এগিয়ে যায়, যদিও সন্দেহাতীত কোন প্রমাণ নেই।

অনেক ব্যাকটিরিয়া স্টোমার মধ্যে দিয়ে গাছের দেহে প্রবেশ করে। এজন্য ত্বকের উপরের জলের পাতলা স্তরের সঙ্গে স্টোমার নীচের ফাঁকা জায়গায় যে জলের স্তর থাকে তার অবিচ্ছিন্ন সংযোগ থাকা একান্ত প্রয়োজন। ত্বকের উপরে কিছু ব্যাকটিরিয়া কোনওভাবে এসে পড়লে তাদের সক্রিয়ভাবে ভিতরে প্রবেশের বিশেষ কোন সম্ভাবনা থাকে না। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণতর পরিবেশে ত্বকের উপরের জলের স্তর ক্রমশঃ শুকিয়ে যেতে থাকে। একই সময়ে স্টোমার নীচের ফাঁকা জায়গা থেকে বাষ্পীভবনের ফলে সেখানে আর্দ্রতা কমে গেলে ত্বকের উপরের জলকে ভিতরে টেনে নেওয়া হয়। জলের সঙ্গে ব্যাকটিরিয়াও তখন ভিতরে চলে আসে। সেখানে আপেক্ষিক আর্দ্রতা খুব বেশী হলে তবেই ব্যাকটিরিয়ার সংখ্যাবৃদ্ধি সম্ভব হয়। দেখা গেছে যে আপেক্ষিক আর্দ্রতা শতকরা ৯৭ ভাগের নীচে থাকলে এরউইনিয়া অ্যামিলোভোরা ও অন্য অনেক ব্যাকটিরিয়া কোষ বিভাজনের মাধ্যমে সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে না।

হাইড্যাথোড ঃ অনেক গাছে ভোর বেলায় পাতার প্রান্তসীমায় হাই-

ড্যাথোডের (hydathode) মুখে যে জলের ফোঁটা জমে থাকতে দেখা যায় তাতে ছত্রাকের স্পোর বা ব্যাকটিরিয়া এসে পড়তে পারে। দিনের উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হাইড্যাথোডের মুখে জমে থাকা জল টানের ফলে পাতার ভিতরে ঢুকে যায়। এখানেও ব্যাকটিরিয়া বা ছত্রাকের স্পোর হাইড্যাথোডের ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে নিষ্ক্রিয়ভাবেই পাতার ভিতরে প্রবেশ করে। বাঁধাকপিতে জ্যান্থোমোনাস ক্যাম্পেস্ট্রিস, আপেলে এরউইনিয়া অ্যামিলোভোরা ও ম্যাথিওলাতে *(Mathiola incana)* বট্রাইটিস সিনেরীয়ার স্পোর এইভাবে প্রবেশ করে বলে জানা যায়।

লেন্টিসেল : লেন্টিসেলের মাধ্যমে প্রবেশ অনেকটা ক্ষতের মাধ্যমে প্রবেশের মত। এরউইনিয়া ক্যারটোভোরা, *(E. carotovora)* স্ট্রেপ্টোমাইসেস স্ক্যাবিজ, স্পঙ্গোস্পোরা সাবটেরানীয়া, নেকট্রিয়া গ্যালিজেনা *(Nectria galligena)*, পেনিসিলিয়াম এক্সপ্যানসাম *(P. expansum)* ইত্যাদি রোগ উৎপাদক তুভাবেই গাছের দেহে প্রবেশ করতে পারে। আক্রমণকারী ছত্রাকের জার্ম টিউব লেন্টিসেলের মধ্যে ঢুকে প্যারেনকাইমা কোষগুলির মাঝখানের ফাঁক দিয়ে ভিতর দিকে এগোতে থাকে। ছত্রাকের হাইফা ঐ সব কোষের ভিতরে ঢোকে বা তাদের থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে এরকম মনে হয় না। লেন্টিসেলের ভিতর দিয়ে ছত্রাক এইভাবে গাছের দেহের মধ্যে প্রবেশ করে দেহকোষকে আক্রমণ করে। লেন্টিসেলের বয়স কম হলে সেখানে আক্রমণ হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লেন্টিসেলের কিছুটা ভিতর দিকে কর্ক কোষবিশিষ্ট পেরিডার্ম স্তর গড়ে পঠে। কর্ক কোষের দেওয়ালে সুবেরিন জমার ফলে ঐ স্তরটি তখন ছত্রাকের পক্ষে তুর্ভেদ্য হয়ে ওঠে।

গ। ক্ষতের মধ্য দিয়ে প্রবেশ

সাধারণতঃ নিম্নস্তরের রোগ উৎপাদকেরা ক্ষতের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে থাকে ; তারা সোজাসুজি ত্বক ভেদ করে বা ত্বকের স্বাভাবিক ছিদ্রগুলি দিয়ে প্রবেশ করতে পারে না। প্রাকৃতিক পরিবেশে গাছের দেহে ছোট-বড় কোনও না কোনও ধরণের ক্ষত প্রায় সবসময়ই থাকে। কিছু ব্যাকটিরিয়া ও ছত্রাক এগুলির সুযোগ নিয়ে গাছের দেহে প্রবেশ করে। এদের মধ্যে কিছু আছে যারা ক্ষত ছাড়াও অন্যভাবে গাছের দেহে প্রবেশে সক্ষম, অধিকাংশের ক্ষেত্রে অবশ্য এটিই একমাত্র পথ। যেসব ব্যাকটিরিয়া সফট রট সৃষ্টি করে এবং যে সব ছত্রাক ক্যাঙ্কার ও কাঠের রট সৃষ্টি করে তারা সকলেই ক্ষতের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করে ও ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ে আক্রমণের সূচনা করে। একমাত্র ক্রাউন গল রোগ

উৎপাদক ব্যাকটিরিয়া—অ্যাগ্রোব্যাকটিরিয়াম টিউমিফেসিয়েন্স ক্ষতের মধ্যেই সংখ্যাবৃদ্ধি করে ও সেখানে থাকে।

কোন ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়া ক্ষতের উপরে এসে পড়লে প্রথম পর্বে ক্ষতের মৃত কোষগুলিতে মৃতজীবীর জীবন যাপন করে তারা নিজেদের সংখ্যাবৃদ্ধি করে ও ক্রমশঃ ক্ষতের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে বাড়তে বাড়তে ছত্রাকের হাইফা বা ব্যাকটিরিয়া যখন ক্ষতের প্রান্তসীমায় এসে সংলগ্ন অঞ্চলের কোন সুস্থ কোষের সম্মুখীন হয় তখন তাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে দুটি সম্ভাবনার উপর—অর্থাৎ তারা এনজাইম বা টক্সিন উৎপাদন করে ঐ কোষকে মেরে ফেলতে বা দেওয়াল ভেদ করে কোষের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে কি না। যারা ঐ গাছের পরজীবী কেবলমাত্র তারাই উপরোক্ত যে কোন একটি উপায়ে আক্রমণ করে সাফল্য লাভ করতে পারে (রেখাচিত্র—১২ ছ)। যারা ঐ গাছের পরজীবী নয় তারা ক্ষতের মধ্যেই সীমিত থাকে—আর ছড়াতে পারে না। কিছু ছত্রাক এনজাইমের সাহায্যে কোষের দেওয়াল নরম করে হাইফা দিয়ে সেটিকে ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করে বা দেওয়ালের গায়ে অ্যাপ্রেসোরিয়াম গঠন করে ইনফেকশন পেগের সাহায্যে দেওয়াল ভেদ করে প্রবেশ করে। শেষোক্ত শ্রেণীর কিছু ছত্রাক সাধারণ প্যারেনকাইমা কোষের কিউটিকল বিহীন দেওয়ালেও অ্যাপ্রেসোরিয়াম গঠন করতে পারে যা অন্যান্য ছত্রাক পারে না। এরা কিন্তু কিউটিকলের উপরে অ্যাপ্রেসোরিয়াম গঠনে অক্ষম। অন্যান্য ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়া তাদের দেহনিঃসৃত এনজাইম বা টক্সিন আগে চারিপাশে ছড়িয়ে সংলগ্ন অংশের জীবিত কোষগুলিকে মেরে ফেলে পরে মৃত কোষগুলি দখল করে। নামে পরজীবী হলেও মূলতঃ এরা মৃতজীবী। এদের বলা হয় নেক্রোট্রফ (necrotroph) বা পার্থোফাইট (perthophyte)।

প্রাসঙ্গিক পুস্তক ও গবেষণাপত্রাদি

Heitefuss, R., and E.B. Williams (eds.). 1976. "Physiological Plant Pathology". Springer-Verlag, Berlin. 890 p.

Aist, J. R. Cytology of penetration and infection by fungi. 197—221.

Goodman, R. N. Physiological and cytological aspects of bacterial infection process. 172—193.

Mitchell, J. E. The effect of roots on the activity of soil-borne plant pathogens. 104—128.

Dickinson, S. 1960. The mechanical ability to breach the host barriers. In "Plant Pathology : An Advanced Treatise" (J. G. Horsfall and A.E.Dimond. eds.). Vol. 2, 203 – 232. Academic Press, New York.

Emmett, R.W., and D.G. Parberry, 1975. Appressoria. *Ann. Rev. Phytopathol.* **13** : 147—167.

Friend, J., and D.R.Threlfall (eds.). 1976. "Biochemical aspects of plant-parasite relationship". Academic Press, New York.

Ingram, D.S. Structural aspects of infections by biotrophic fungi, 43 – 70.

Preece, T.F. Some observations on leaf surface during the early stages of infection by fungi, 1—10.

Lockwood, J.L. 1977. Fungistasis in soils. *Biol. Rev.* **52** : 1—43.

Webster, J.M. 1969. The host and parasite relationship of plant parasitic nematodes. *Adv. Parasitol.* **7** : 1—4.

Wynn, W. 1981. Tropic and taxic responses of pathogens to plants. *Ann. Rev. Phytopathol.* **9** : 237—255.

১২ গাছের দেহে পরজীবীর প্রতিষ্ঠা ও ক্রমবিস্তার

রোগ উৎপাদক জীবাণু গাছের দেহের ভিতরে প্রবেশ করে সেখানে প্রাথমিকভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে অর্থাৎ কিছু কোষকে সফলভাবে আক্রমণ করতে পারলে সেই পর্বকে বলা হয় 'ইনফেকশন' (infection)। কিন্তু ইনফেকশন হলেই যে রোগের আক্রমণ সফল হয় তা নয়, ইনফেকশনের পর গাছের সক্রিয় প্রতিরোধের দরুণ রোগ উৎপাদক নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়তে পারে। তবে রোগের আক্রমণের এই দ্বিতীয় পর্বে রোগ উৎপাদক যদি আক্রান্ত গাছের নূতন নূতন কোষে ছড়িয়ে পড়তে পারে তবেই তার সফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে সাফল্য বা অসাফল্য অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে ; যেমন—রোগ উৎপাদকের উগ্রতা, পোষক গাছের রোগ সংবেদনশীলতা, গাছের দেহের কলা সংস্থান এবং ভিতরের পরিবেশ। দেহের মধ্যে রোগজীবাণুর এই বিস্তারকে বলা হয় 'কলোনাইজেশন' (colonization)। এরই সাফল্যের উপর নির্ভর করে গাছ রোগগ্রস্ত হয়ে পড়বে কিনা এবং রোগের লক্ষণ স্থানীয়ভাবে অথবা বিস্তৃতভাবে দেখা যাবে। রোগ উৎপাদক প্রথম আক্রমণের জায়গাকে কেন্দ্র করে খুব অল্প জায়গায় বা আর একটু বিস্তৃতভাবে ছড়াতে পারে। যেখানে স্থানীয়ভাবে আক্রমণ বা 'লোকাল ইনফেকশন' (local infection) হয় সেখানে রোগ উৎপাদক প্রবেশ পথের চারিপাশের খানিকটা জায়গার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, গাছের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য বেশী ছড়াতে পারে না। গমের মরিচা, ধানের বাদামী দাগ, আলুর জলদি ধসা, চীনাবাদামের টিক্কা প্রভৃতি রোগ এই ধরণের আক্রমণের উদাহরণ। কোথাও বা রোগ উৎপাদক নিজে বেশী ছড়ায় না কিন্তু তার দেহনিঃসৃত টক্সিন জাতীয় বিষাক্ত পদার্থ জাইলেম কলার দ্বারা পরিবাহিত হয়ে বেশ অনেকদূর ছড়িয়ে পড়ে এবং ঐ সব পদার্থের ক্রিয়ার ফলে দূরবর্তী অঞ্চলে রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। জোয়ারের 'মাইলো' (milo disease), ওটের ভিক্টোরিয়া ব্লাইট ও প্লামের স্টিরিয়াম পারপিউরিয়াম *(Stereum purpureum)* জনিত 'সিলভার লীফ' (silver leaf) রোগে এই ধরণের স্থানীয় আক্রমণকে 'ইনফেকশন ফোকাস'

(infection focus) বলা হয়। কিছু রোগে ব্যাপক আক্রমণ বা 'জেনারেল ইনফেকশন' (general infection) ঘটে। এইসব ক্ষেত্রে দেহে প্রবেশের পর রোগ উৎপাদক ভিতরে বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়ে। রোগ উৎপাদক দেহের সমস্ত অঙ্গেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। তখন একে 'সিস্টেমিক ইনফেকশন' (systemic infection) বলা হয়। এর ফলে গাছের সারা দেহে রোগের লক্ষণ ফুটে উঠতে পারে, যেমন দেখা যায় অধিকাংশ ভাইরাস রোগের ক্ষেত্রে, বা বিশেষ কোন অঙ্গে রোগের লক্ষণ দেখা দেয় যার উদাহরণ হল গমের ও আরও অনেক শস্যের ভূষা ও দুর্গন্ধযুক্ত ভূষা রোগ। ফল বা সবজীর সফ্‌ট রটের ক্ষেত্রেও আক্রমণকারী ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়া খুব তাড়াতাড়ি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

দেহের ভিতরে রোগ উৎপাদকের সংখ্যাবৃদ্ধি

গাছের দেহের ভিতরে রোগ উৎপাদকের বিস্তার নির্ভর করে তার বৃদ্ধি বা সংখ্যাবৃদ্ধির উপর। ছত্রাকের ক্ষেত্রে নূতন কোষসৃষ্টির মাধ্যমে হাইফা শাখা প্রশাখা বিস্তার করে। ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রে কোষ ও ভাইরাসের ক্ষেত্রে ভাইরাস কণিকা আলাদা আলাদা পদ্ধতিতে নিজেদের সংখ্যাবৃদ্ধি করে। বৃদ্ধি বা সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য যে শক্তি ও বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান প্রয়োজন হয় তার প্রায় সব কিছুরই যোগান আসে পোষক গাছের কোষ থেকে। পরজীবী হয় গাছের কোষ থেকে এগুলি নিজের প্রয়োজন মেটাতে সংগ্রহ করে বা কোষের মধ্যেই নিজের প্রয়োজন মত ব্যবহার করে।

ছত্রাকের বৃদ্ধি হাইফার অগ্রভাগে কেন্দ্রীভূত। হাইফা মাথার দিকে বাড়ে ও সাধারণতঃ কিছুটা পিছনের দিক থেকে শাখা বিস্তার করে। শাখাগুলিও একইভাবে বাড়ে। ব্যাকটিরিয়া কোষ বিভাজনের মাধ্যমে সংখ্যাবৃদ্ধি করে। ভাইরাস আক্রান্ত কোষের শারীরবৃত্তীয় বিভিন্ন বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সেখানেই তার নিজস্ব নিউক্লিইক অ্যাসিড ও প্রোটিন তৈরী করে নেয়। এইভাবে তৈরী নিউক্লিইক অ্যাসিড ও প্রোটিন যুক্ত হয়ে ভাইরাস কণিকা গঠিত হয়।

দেহের মধ্যে রোগ উৎপাদকের বিস্তার

বিভিন্ন ধরণের রোগ উৎপাদকের মধ্যে একমাত্র ছত্রাকই গাছের দেহের মধ্যে সক্রিয়ভাবে ছড়াতে পারে। বিভিন্ন রোগ উৎপাদক ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে এক কোষ থেকে অন্য কোষে ছড়ায় যার ফলে কোষের গঠনে ও রাসায়নিক পরিবেশে নানা রকম পরিবর্তন ঘটতে পারে। এক কোষ থেকে অন্য কোষে—

এইভাবে রোগ উৎপাদক গাছের প্রায় সারা দেহে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এইভাবে ছড়ানোর সময় অনেক রোগ উৎপাদক নালিকা বাণ্ডিলের জাইলেম বা ফ্লোয়েম কলায় পৌঁছে যায় এবং তার পর সংবহন তন্ত্রের মাধ্যমে অতি দ্রুত বিভিন্ন অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। কোথাও কোথাও সক্রিয় প্রতিরোধের ফলে হয় রোগ উৎপাদক নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে বা তার ছড়িয়ে পড়ার পথে অন্য বাধার সৃষ্টি হয়।

ভাইরাস : অতি সহজেই ভাইরাস এক কোষ থেকে অন্য কোষে যায়। প্রমাণ পাওয়া গেছে যে দুটি সংলগ্ন কোষের মাঝখানের দেওয়ালের মধ্য দিয়ে যে প্রোটোপ্লাজমের যোগসূত্র বা প্লাজমোডেসমা রয়েছে তারই মধ্য দিয়ে ভাইরাস এককোষ থেকে অন্যকোষে যায় (রেখাচিত্র—১৩ ক)। সুগার বীট ইয়েলোজ ভাইরাস (sugar beet yellows virus) ও টম্যাটো রিং স্পট ভাইরাসের কণিকাগুলিকে প্লাজমোডেসমার মধ্যে সারিবদ্ধ অবস্থায় দেখা গেছে। বওডেনের (F. Bawden) মতে একটি কোষ থেকে সংলগ্ন কোষে ভাইরাস যাওয়ার ব্যাপারটা ঐ দুটি কোষের মধ্যে ঘনত্বের তফাতের উপর নির্ভর করে। আক্রান্ত কোষে ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে সেখানকার ঘনত্ব বেড়ে যায় ফলে পাশের কোষে ভাইরাস যাবার পথ সুগম হয়। পাতায় আক্রমণ হলে এইভাবে ভাইরাস একদিনে ৮-১০টি কোষে বা প্রায় ১ মি মি পর্যন্ত ছড়াতে পারে। ভাজক কলা আক্রান্ত হলে কোষ বিভাজনের মাধ্যমেও ভাইরাস এক কোষ থেকে অন্য কোষে ছড়িয়ে পড়ে। বেশ কিছু ভাইরাস; যেমন—বীটের কার্লি টপ (curly top of sugar beet virus), লেবুর ট্রাইস্টেজা ভাইরাস (citrus tristeza virus) ইত্যাদি সীভ নলের মাধ্যমে এবং আলফালফা ডোয়ার্ফ (alfalfa dwarf virus), ফোনি পীচ (phoney peach virus) প্রভৃতি কিছু ভাইরাস জাইলেমের ট্র্যাকীয়ার মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। যে সব ভাইরাস গাছের সারা দেহে আক্রমণ চালায় (systemic infection) তাদের মধ্যে কিছু ফ্লোয়েম বা জাইলেম কলা ও তৎসংলগ্ন কিছু প্যারেনকাইমা কোষে মাত্র ছড়ায়, যেমন আলুর লীফ রোল ও ধানের ইয়েলো ডোয়ার্ফ ভাইরাস। কিছু ভাইরাস আছে যারা গাছের প্রায় প্রতিটি কোষে ছড়ায় আর অন্যান্যরা বিস্তৃতভাবে ছড়ালেও মাঝে মাঝে কতগুলি কোষ বাদ থেকে যায়।

ছত্রাক : খুব নিম্নস্তরের কিছু এককোষী ছত্রাক, যেমন ওলপিডিয়াম ব্র্যাসিকি (*Olpidium brassicae*) ও প্লাজমোডিওফোরা ব্র্যাসিকি, গাছের দেহকোষের মধ্যেই অবস্থান করে এবং কোষ থেকে কোষে ছড়ায়। এরাও

ভাইরাসের মত আক্রান্ত কোষের বিভাজনের মাধ্যমে নূতন নূতন কোষে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

অধিকাংশ ছত্রাক মাঝখানের দেওয়াল ভেদ করে এক কোষ থেকে অন্য
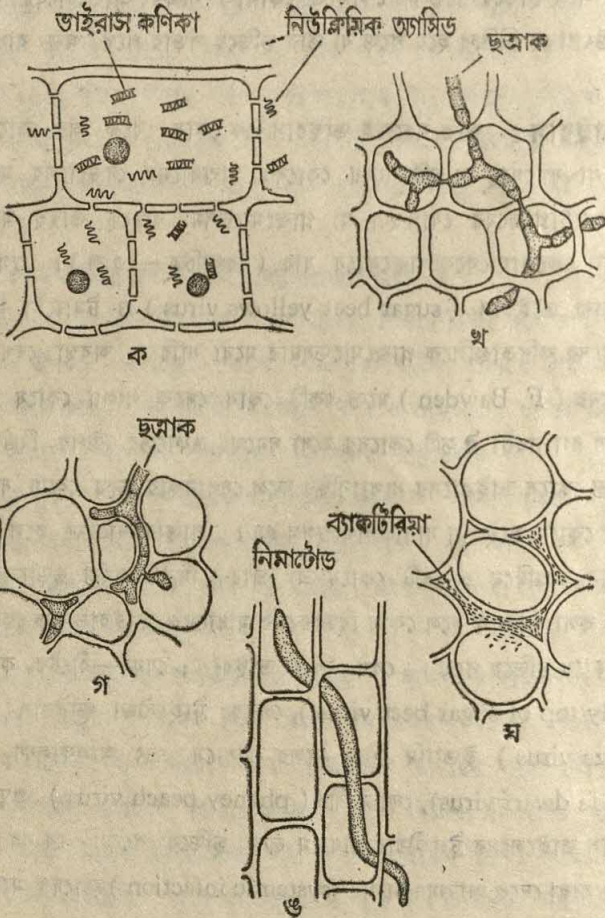
রেখাচিত্র—১৩ : পোষক গাছের দেহে পরজীবীর বিস্তার

(ক) প্লাজমোডেসমার মধ্য দিয়ে ভাইরাসের কোষ থেকে কোষে বিস্তার (খ) কোষ থেকে কোষে ছত্রাকের বিস্তার, (গ) দুটি কোষের মধ্যবর্তী অংশ দিয়ে ছত্রাকের বিস্তার, ও কোষে হস্টোরিয়ামের প্রবেশ, (ঘ) দুটি কোষের মধ্যবর্তী অংশে ব্যাকটিরিয়ার বিস্তার ও আক্রান্ত কোষে প্রবেশ (ঙ) নিমাটোডের এক কোষ থেকে অন্য কোষে গমন।

কোষে যায় (রেখাচিত্র—১৩ খ)। একে বলে অন্তঃকোষীয় বিস্তার বা 'ইণ্ট্রাসেলুলার কলোনাইজেশন' (intracellular colonization)। হাইফার

মাথা যখন দেওয়ালের গায়ে এসে লাগে তখন সেখান থেকে নিঃসৃত পেকটিক এনজাইম, সেলুলেজ ইত্যাদির ক্রিয়ার ফলে দেওয়ালের হাইফা সংলগ্ন অংশে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে এবং ঐ নরম ও কিছুটা স্ফীত অংশে সহজেই ভেদ করে হাইফার মাথা বেশ সরু হয়ে পাশের কোষে প্রবেশ করে। প্রবেশের পর আবার স্ফীত হয়ে হাইফা আগেকার স্বাভাবিক আকার ধারণ করে। ফিউজেরিয়াম সোল্যানি, গয়ম্যানোমাইসেস গ্র্যামিনিস, ফোমিস অ্যানোসাস প্রভৃতি ছত্রাক এই ধরণের বিস্তারের উদাহরণ। পিথিয়াম ডিব্যারীয়ানাম, স্কোরোটিনিয়া ফ্রাকটিজেনা ইত্যাদি কিছু ছত্রাক এইভাবে কোষ থেকে কোষে ছড়ালেও উচ্চ হারে এনজাইম উৎপাদন করার ফলে আক্রান্ত কোষগুলির শীঘ্রই মৃত্যু হয়। মৃত কোষগুলি থেকে খাদ্য আহরণ করে ছত্রাক নিজের শক্তিবৃদ্ধি করে ও জোরালো আক্রমণ চালিয়ে অনেকটা ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষতের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করে এমন কিছু ছত্রাকও অতি উচ্চ হারে এনজাইম উৎপাদন করে যা ছত্রাকের আগে আগে ছড়িয়ে পড়ে চারিপাশের কোষগুলিকে মেরে ফেলে। ছত্রাক তখন বিনা বাধায় মৃত কোষগুলি দখল করে। পেনিসিলিয়াম রাইজোপাস প্রভৃতি ছত্রাক এই ভাবে খুব দ্রুত ফল ও সবজীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

ফিউজেরিয়াম অক্সিস্পোরাম, ভার্টিসিলিয়াম অ্যালবো-এট্রাম, সেরোটোসিস্টিস উলমি প্রভৃতি ছত্রাক শিকড়ের ত্বক ভেদ করে বা ক্ষতের মধ্যে দিয়ে যেভাবেই গাছের দেহে প্রবেশ করুক না কেন তারা কটেক্সের প্যারেনকাইমা কোষগুলিকে ভেদ করে জাইলেমের দিকে এগিয়ে যায় এবং সেখানে পৌঁছানোর পর ট্র্যাকীয়ার মধ্যে থাকে, বৃদ্ধি পায় এবং হাইফা ও স্পোরের সাহায্যে বেশ তাড়াতাড়ি উপর দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

পরজীবী হিসাবে উন্নত এমন কিছু রোগ উৎপাদক ছত্রাকের হাইফা কখনও গাছের দেহকোষের মধ্যে প্রবেশ করে না। তারা দুটি কোষের মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় (intercellular space) ও মধ্যচ্ছদাকে এনজাইমের সাহায্যে কিছুটা ভেঙ্গে ফেলে সেখানে জায়গা করে নিয়ে তার মধ্যে দিয়ে ছড়াতে থাকে (রেখাচিত্র-১৩ গ ও ১৪ ক)। এইভাবে ছড়ানোকে বলা হয় আন্তঃকোষীয় বিস্তার বা 'ইন্টারসেলুলার কলোনাইজেশন' (intercellular colonization)। দুটি দেওয়ালের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে যাবার সময় ছত্রাক সংলগ্ন কোষের মধ্যে সরু ও অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের বিশেষ শাখা বা হস্টোরিয়াম (haustorium) ঢুকিয়ে দিয়ে তারই মাধ্যমে কোষ থেকে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে (রেখাচিত্র-১৩ গ)।

এর ফলে কোষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিশেষ বিপর্যস্ত হয় না ; ইউরেডিনেলস (Uredinales) ও পোরোনোস্পোরেলস (Peronosporales) বর্গের অন্তর্ভুক্ত বাধ্যতামূলকভাবে পরজীবী ছত্রাকেরা ; যথা—পাকসিনিয়া মেলাম্পসোরা, পেরোনোস্পোরা, অ্যালবিউগো (*Albugo spp.*) ইত্যাদি, এইভাবে আক্রান্ত গাছের দেহে ছড়ায় তবে কোন সময়েই প্রথম আক্রমণের জায়গা থেকে খুব বেশীদুর ছড়ায় না। তুটি কোষের মধ্যবর্তী হাইফার একটি অংশ সামান্য পরিবর্তিত ও স্ফীত হয়ে অ্যাপ্রেসোরিয়ামের আকার নেয় যেটি নিঃসৃত আঠালো পদার্থের সাহায্যে দেওয়ালের গায়ের সঙ্গে সুদৃঢ়ভাবে জুড়ে যায়। অ্যাপ্রেসোরিয়ামের তলার দিক থেকে সরু হাইফার মত কিছুটা সূক্ষ্মাগ্র একটা শাখা নিঃসৃত এনজাইমের সাহায্যে দেওয়াল ভেদ করে কোষের মধ্যে ঢুকে যায় (রেখাচিত্র—১৪ খ)। ভিতরে প্রবেশের মুখে কোষের প্রোটোপ্লাজম নিঃসৃত কিছু পদার্থ হস্টোরিয়ামের চারিধারে আবরণীর মত জমতে থাকে। শেষ পর্যন্ত হস্টোরিয়াম এই আবরণী ভেদ করে বেরিয়ে পড়লে এটি তার গোড়ায় চারিদিক ঘিরে একটি বন্ধনী বা কলারের (collar) মত অবস্থায় থেকে যায় (রেখাচিত্র—১৪ গ)। হস্টোরিয়াম বিভিন্ন ছত্রাকের ক্ষেত্রে নানা আকারের ও আয়তনের হতে দেখা যায় ; কখনও খুব ছোট কখনও বা বেশ বড় ধরনের হয়। হস্টোরিয়াম ছোট, বড় বা যে আকারের হোক না কেন এটি প্রোটোপ্লাস্টের বহিস্তর বা প্লাজমা আবরণীকে কখনই ভেদ করে না, সেটিকে ঠেলে নিয়ে কোষের ভিতরে ঢুকে যায় (invagination) মাত্র। হস্টোরিয়ামের প্রবেশের প্রতিক্রিয়ায় প্লাজমা আবরণী ঐ অংশে দ্রুত বাড়তে থাকে যার ফলে সেখানে কোন রকম প্রসারণের (stretching) চিহ্ন দেখা যায় না। এর পরে হস্টোরিয়ামের বাইরের দেওয়াল ও কোষের প্লাজমা মেমব্রেনের মাঝখানে একটি 800-3800°A পুরু নূতন স্তর গড়ে ওঠে যাকে বলা হয় 'জোন অফ অ্যাপোজিশন' (zone of apposition) বা 'এনক্যাপসুলেশন' (encapsulation) (রেখাচিত্র—১৪ ঘ)। স্পষ্ট ধারণা না থাকলেও মনে হয় এই স্তরটি ছত্রাকের ক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয়েছে কারণ হস্টোরিয়ামের প্রোটোপ্লাস্ট ও এই স্তরের মধ্যে উপাদানগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এই স্তরটির ঘনত্ব প্রোটোপ্লাজমের তুলনায় বেশী। এই স্তরটির মাধ্যমেই পরজীবী ও পোষক গাছের মধ্যে বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগের আদান-প্রদান ঘটে বলে মনে করা হয় যদিও ঠিক কিভাবে আদান প্রদান হয় সে সম্বন্ধে ধারণা এখনও স্পষ্ট নয়। বলা যেতে পারে যে হস্টোরিয়াম পোষক গাছের দেহ কোষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে পরজীবীকে সাহায্য করে। ভিতরে প্রবেশ

করলেও সম্ভবতঃ প্লাজমা মেমব্রেনের কোন ক্ষতি না হওয়ার এবং কোষের প্রোটোপ্লাস্টের সঙ্গে প্রত্যেক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত না হওয়ার জন্যই হস্টোরিয়াম কোষের স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় কাজকর্মে বড় রকমের কোন অসুবিধা বা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে না। এর ফলে ছত্রাক ও কোষের মধ্যে সাময়িকভাবে অন্ততঃ সহাবস্থানের অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং আক্রান্ত কোষ বেশ কিছুদিন এই
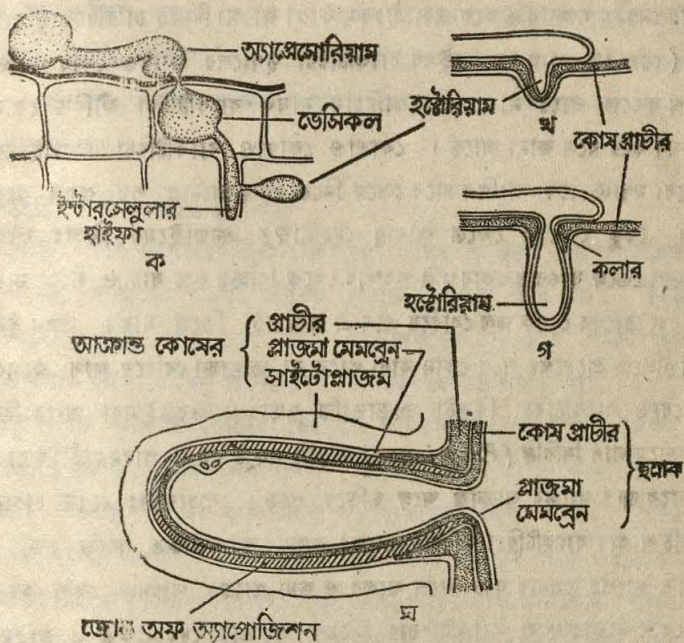
রেখাচিত্র ১৪ : পোষক গাছের দেহে ছত্রাকের হস্টোরিয়াম গঠনের বিভিন্ন পর্যায় (ক) ছত্রাকের দেহকোষে প্রবেশ ও দুটি কোষের মাঝখানের জায়গা দিয়ে বিচারের সময় হস্টোরিয়াম গঠনের মাধ্যমে নূতন কোষে আক্রমণ (খ)—(ঘ) দেহকোষে হস্টোরিয়াম গঠনের বিভিন্ন পর্যায়

অবস্থায় বেঁচে থাকতেও পারে। পরজীবী হিসাবে উন্নত নয় এমন ছত্রাকও আছে যারা কোষের মধ্য দিয়েও ছড়াতে পারে আবার দুটি কোষের মাঝখানের জায়গা দিয়েও ছড়ায় ও হস্টোরিয়ামের সাহায্যে কোষ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে ; যেমন ফাইটফথোরা ইনফেস্ট্যানস। তবে এক্ষেত্রে হস্টোরিয়াম দ্বারা আক্রান্ত কোষ বেশীদিন বাঁচেনা।

বীজবাহিত কিছু ছত্রাক বীজ থেকে চারা বেরোনর সঙ্গে সঙ্গে সেটিকে আক্রমণ করে তার শীর্ষভাগে ভাজক কলায় (apical meristem) আশ্রয় নেয়।

গাছের দৈর্ঘ্যে স্বাভাবিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছত্রাকও উপর দিকে এগোতে থাকে। উস্টিলাগো নুডা, উস্টিলাগো হোর্ডিআই *(U. hordeii)*, টিলেশিয়া ট্রিটিসি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের ভূষা রোগ উৎপাদনকারী ছত্রাক এইভাবে ছড়ায়।

ব্যাকটিরিয়া : অধিকাংশ রোগ উৎপাদক ব্যাকটিরিয়া গাছের দেহের ভিতরে প্রবেশের পর প্যারেনকাইমা কোষগুলির মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় আশ্রয় নেয় এ সংখ্যাবৃদ্ধি করে এবং ঐরকম ফাঁকা জায়গা দিয়েই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে (রেখাচিত্র-১৩ ঘ)। এইসব ব্যাকটিরিয়া দুপাশের জীবিত কোষগুলিতে প্রবেশ করতে পারে না। রাইজোবিয়াম নামক ব্যাকটিরিয়া জীবিত কোষ আক্রমণ করে বলে জানা আছে। কোথাও কোথাও ব্যাকটিরিয়া এনজাইমের সাহায্যে মধ্যচ্ছদাকে আংশিকভাবে ভেঙ্গে নিজেদের ছড়ানোর পথ সুগম করে নেয়। কিছু রোগের ক্ষেত্রে জীবাণু দেহনিঃসৃত এনজাইমের ক্রিয়ার ফলে মধ্যচ্ছদা ভেঙ্গে যাওয়ায় কোষগুলি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ও পরে মরে যায় এবং তাদের থেকে জল বেরিয়ে এসে ঐ জায়গাটা ভিজে যায়। তখন মৃত কোষগুলিতে প্রবেশের পথে কোন বাধা থাকে না, তাছাড়া বেরিয়ে আসা জলের সাহায্যেও ব্যাকটিরিয়া কিছুটা তাড়াতাড়ি ছড়ায়। এরউইনিয়া অ্যারয়ডি, সিউডোমোনাস সিরিঞ্জি *(P. syringae)* প্রভৃতি সফ্‌ট রট উৎপাদনকারী ছত্রাক এইভাবে দ্রুত গাছের আক্রান্ত অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণতঃ ছোট চারায় বা কচি শাখায় ব্যাকটিরিয়া পরিণত অংশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সহজে ছড়ায়। পরিণত অংশের তুলনায় কচি অংশে জলের ও জমা খাদ্যের পরিমাণ বেশি হয়। জল বেশি থাকার ফলে ব্যাকটিরিয়ার নিজের ও তার দেহনিঃসৃত এনজাইম, টক্সিন ইত্যাদির ছড়ানোর সম্ভাবনা যথেষ্ট বেড়ে যায়। সিউডোমোনাস সোল্যানেসীয়ারাম, এরউইনিয়া ট্রাকাইফাইলা, জ্যান্থোমোনাস স্টুয়ার্টিআই প্রভৃতি ব্যাকটিরিয়া ক্ষতের মধ্য দিয়ে শিকড়ে ঢুকে কর্টেক্সের প্যারেনকাইমা কোষের মধ্য দিয়ে জাইলেম অঞ্চলে পৌঁছে সেখানে ট্র্যাকীয়ার মধ্যে আশ্রয় নেয় ও সংখ্যাবৃদ্ধি করে এবং তার মধ্য দিয়েই প্রায় সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে।

নিমাটোড : মেলয়ডোগাইন, অ্যাঙ্গুইনা ও ডাইটিলেঙ্কাস প্রজাতির নিমাটোড গাছের দেহের মধ্যে থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক নিমাটোড ও তার শূককীট গাছের দেহের মধ্যেই অনায়াসে ছড়ায়। এই করতে গিয়ে নিমাটোড কিছুটা শক্তিপ্রয়োগ করেই দেওয়াল ভেদ করে এক কোষ থেকে অন্য কোষে প্রবেশ করে যার ফলে আক্রান্ত অংশের বেশ কিছু কোষের ক্ষতি হয়।

বিস্তারের গতি—গাছের দেহের ভিতরে রোগ উৎপাদকের বিস্তারের

হার অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে ; যেমন—রোগ উৎপাদকের উগ্রতা, তার এনজাইম বা টক্সিন উৎপাদন ক্ষমতা, গাছের বা বিশেষ অঙ্গের রসালতা (succulence) ও কলা সংস্থান। কোষ বিভাজনের মাধ্যমে বিস্তারের হার অত্যন্ত মন্থর, তুলনায় হাইফার বৃদ্ধি বা অগ্রগতির মাধ্যমে বিস্তার নিঃসন্দেহে দ্রুততর। জাইলেম বা ফ্লোয়েমের মাধ্যমে ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়া অতি দ্রুত গাছের দেহে ছড়িয়ে পড়তে পারে। রসাল ফলে বা সবজীতে বা গাছের কচি অংশে ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়া গাছের পরিণত অংশের তুলনায় অনেক দ্রুতগতিতে ছড়ায়। তুলনায় গাছের কাষ্ঠময় অংশে বিস্তারের গতি অত্যন্ত শ্লথ—বলা যায় সবথেকে কম।

বিস্তারের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য

নিম্নস্তরের রোগ উৎপাদকেরা প্রায় অবাধে গাছের আক্রান্ত অংশে ছড়িয়ে পড়ে। কলা সংস্থানের উপর তাদের ছড়ানো নির্ভর করে না। কিন্তু পরজীবিতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রোগ উৎপাদকদের আক্রমণ পদ্ধতিতেও কোষ ও কলার ব্যাপারে কিছু পক্ষপাতমূলক আচরণ দেখতে পাওয়া যায়।

কিছু ছত্রাক আক্রান্ত কোষের ভিতরেই জীবন কাটায় এবং সেখান থেকেই সংলগ্ন কোষে ছড়ায় ; যেমন—ওলপিডিয়াম, প্রাজমোডিওফোরা ও সিনকাইট্রিয়াম প্লাজমো। অন্যদিকে অনেক ব্যাকটিরিয়া ও বাধ্যতামূলকভাবে পরজীবী শ্রেণীর ছত্রাক সাধারণতঃ সংলগ্ন কোষগুলির মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় থাকে ও ছড়ায়। অ্যাগ্রোব্যাকটিরিয়াম টিউমিফেসিয়েন্স, পাকসিনিয়া, এরিসাইফি, পেরোনোস্পোরা, ইত্যাদি এই ধরণের রোগ উৎপাদক। অধিকাংশ ছত্রাক দেওয়াল ভেদ করে এক কোষ থেকে অন্য কোষে যায়। ফাইটফথোরা ইনফেসট্যানস সাধারণতঃ এইভাবে গেলেও কখনও কখনও দুটি কোষের মাঝখান দিয়েও যায়।

পিথিয়াম ডিব্যারীয়ানাম, ফাইটফথোরা ইনফেসট্যানস, স্ক্লেরোশিয়াম রলফসিআই প্রভৃতি কিছু ছত্রাক প্রায় সব রকম কলার কোষকেই আক্রমণ করে। অধিকাংশ রোগ উৎপাদক কিন্তু নিজেদের পছন্দমত কলায় ছড়ায়। এই ব্যাপারে রোগ উৎপাদকদের মধ্যে যে সব বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় এখানে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

কিছু রোগ উৎপাদক ছত্রাক পুরোপুরি বা আংশিকভাবে গাছের গায়ে বা ত্বকের উপরে বাস করে এবং হস্টোরিয়ামের সাহায্যে এপিডার্মিস কোষ থেকে খাদ্যদ্রব্য আহরণ করে। এরিসাইফি, স্ফিরোথিকা *(Sphaerotheca spp.)* ও অন্যান্য পাউডারি মিলডিউ ছত্রাকেরা এইভাবে বাঁচে। এরা ত্বকের উপরেই

ছড়ায় এবং কিছুদুর ছড়ানোর পর আবার নূতন এপিড়ার্মিস কোষকে আক্রমণ করে। আলুর ওয়ার্ট রোগ উৎপাদক সিনকাইট্রিয়াম এণ্ডোবায়োটিকাম কেবলমাত্র এপিডার্মিস কোষকে আক্রমণ করে ও সেখানেই থাকে—ভিতরদিকে আর ছড়ায় না।

অন্য কিছু ছত্রাক প্রধানতঃ দেহের ভিতরে বাস করে ও সেখানেই বিস্তার লাভ করে, কিন্তু মাঝে মাঝে ত্বকের বাইরে এসে ত্বকের উপরেও ছড়াতে থাকে এবং এখানে ওখানে নূতন আক্রমণের সূচনা করে আবার ভিতরে প্রবেশ করে। গয়ম্যানোমাইসেস গ্র্যামিনিস, ফোমিস অ্যানোসাস ও আর্মিলারিয়া মিলীয়া এই ধরণের ছত্রাকের উদাহরণ।

বেশীর ভাগ ছত্রাক ব্যাকটিরিয়ার মত গাছের দেহের মধ্যেই থাকে ও ছড়ায়। তবে এর মধ্যেও নানারকম বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই রোগ উৎপাদক ছত্রাকেরা (ক) পছন্দমত বিশেষ বিশেষ কলার মধোই নিজেকে সীমিত রাখে, (খ) গাছের বিশেষ কোন অঙ্গকে আক্রমণ করে অথবা (গ) গাছের দেহে যেখান দিয়েই প্রবেশ করুক না কেন প্রবেশের পর বিশেষ অঙ্গের বা বিশেষ কলার দিকেই এগিয়ে যায় এবং সেখানেই ছড়িয়ে পড়ে ও রোগের লক্ষণ সৃষ্টি করে। যে দুটি সম্ভাব্য কারণ ছত্রাকের এই ধরণের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তা হল— (১) গাছের বিশেষ কলা বা বিশেষ অঙ্গের প্রতি ছত্রাকের আকর্ষণ ও (২) ছত্রাকের প্রতি গাছের বিশেষ কলার বা বিশেষ অঙ্গের সংবেদনশীলতা। এমন হতে পারে যে ঐ সব কলায় বা অঙ্গে রোগ উৎপাদক বসবাসের ও ছড়ানোর উপযোগী পরিবেশ পায়।

(ক) বিশেষ কলাকে আক্রমণ

ডিপ্লোকার্পন রোজী *(Diplocarpon rosae)*, ভেঞ্চুরিয়া ইনইক্যুয়ালিস প্রভৃতি কিছু ছত্রাক পাতার কিউটিকল ভেদ করে প্রবেশের পর কিউটিকল ও এপিডার্মিসের মাঝখানে জায়গা করে নেয় এবং প্রধানতঃ সেখানেই ছড়ায় এবং অভিস্রবণ নিয়ন্ত্রিত ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এপিডার্মিস কোষ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। এরা কখনও কখনও এপিডার্মিস কোষকে আক্রমণ করলেও কেবলমাত্র বিশেষ কোন অবস্থায় ছাড়া প্যারেনকাইমা কোষকে আক্রমণ করে না;

পাকসিনিয়া, পোরোনোস্পোরা, অ্যালবিউগো প্রভৃতি বাধ্যতামূলকভাবে পরজীবী ছত্রাক প্যারেনকাইমা কলার বাইরে ছড়ায় না। তারা কোষের মাঝখানের জায়গায় থাকে ও হস্টোরিয়াম দিয়ে সংলগ্ন কোষ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। এরা কোন সময়েই খুব বেশিদুর ছড়াতে পারে না। কিছু ছত্রাক ও

ব্যাকটিরিয়া এনজাইম ও টক্সিনের সাহায্যে প্যারেনকাইমা কোষকে নষ্ট করে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে সক্ষম হয় কিন্তু ছড়ানোর পথে নালিকা বাণ্ডিল থাকলে সেখানে তাদের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। যবের লীফ স্ট্রাইপ রোগে হেলমিনথোস্পোরিয়াম গ্র্যামিনিয়াম, তুলার পাতায় কোণাচে দাগ রোগে জ্যান্থোমোনাস ম্যালভেসীয়ারাম ও ধানের লীফ স্ট্রীক রোগে জ্যান্থোমোনাস ট্রান্সলুসেনস *(X. translucens)* এর আক্রমণে ঐরকম ঘটতে দেখা যায়।

কিছু ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়া শেষ পর্যন্ত নালিকা বাণ্ডিলে—জাইলেমের ট্র্যাকীয়ার মধ্যে আশ্রয় নেয়, সেখানেই সংখ্যাবৃদ্ধি করে ও ছড়ায়। ফিউজেরিয়াম অক্সিস্পোরাম, ভার্টিসিলিয়াম অ্যালবো-এট্রাম, সেরাটোস্টোমেলা উল্‌মি, সিউডোমোনাস সোল্যানেসীয়ারাম প্রভৃতি রোগ উৎপাদকের ক্ষেত্রে এরকম দেখা যায়। ট্র্যাকীয়ার মধ্য দিয়ে প্রবহমান জলস্রোতের সঙ্গে ছত্রাকের স্পোর ও ব্যাকটিরিয়ার অতি দ্রুত উপর দিকে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। বেশ কিছু ভাইরাস প্রধানতঃ ফ্লোয়েমেই থাকে ও সেখানেই সংখ্যাবৃদ্ধি করে। চেস্টনাটের পিঙ্ক রোগ উৎপাদক ছত্রাক ফাইটফথোরা ক্যাম্বিভোরা *(P. cambivora)* শিকড় ও কাণ্ডের ক্যাম্বিয়ামকে আক্রমণ করে, অন্যত্র ছড়ায় না।

জঙ্গলের বড় গাছ বা তাদের কেটে ফেলে রাখা টুকরোগুলিকে আক্রমণ করে কাঠের প্রচুর ক্ষতি করে এরকম অনেক ছত্রাক আছে; যেমন—পলিস্টিক্টাস স্যাঙ্গুইনিয়াস *(Polystictus sanguineus)*, ট্র্যামেটিস পিনি *(Trametes pini)* ও ম্যারাসমিয়াস ক্যাম্পানেল্লা *(Marasmius campanella)*। এরা সকলেই ব্যাসিডিওমাইসিটিস শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কোন ফাটা জায়গা বা ক্ষতের মধ্য দিয়ে ঢুকে এরা গাছের কাষ্ঠময় অংশের দিকে এগিয়ে যায়। সেখানে জল সংবহনের পক্ষে অনুপযুক্ত পুরানো ট্র্যাকীয়াগুলিতে ছত্রাক ঢুকে পড়ে সেগুলির মধ্য দিয়ে ছড়াতে থাকে এবং লিগনেজ (lignase), ল্যাকেজ (laccase), সেলুলেজ (cellulase) প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের এনজাইম উৎপাদন করে ট্র্যাকীয়ার দেওয়াল ভেঙ্গে ফেলে কাঠকে নষ্ট করে দেয়।

(খ) বিশেষ অঙ্গকে আক্রমণ

অনেক রোগ উৎপাদকের গাছের বিশেষ কোন অঙ্গের প্রতি আকর্ষণ থাকে। তারা ঐ বিশেষ অঙ্গকেই আক্রমণ করে ও তার মধ্যে ছড়ায় এবং সেখানেই রোগের লক্ষণ দেখা যায়। প্লাজমোডিওফোরা ব্র্যাসিকি, অ্যাফোনোমাইসেস ইউটাইকেস, ফাইম্যাটোট্রিকাম ওমনিভোরাম ইত্যাদি ছত্রাক ও মেলয়ডোগাইন প্রজাতির নিমাটোড গাছের শিকড়কে আক্রমণ করে সেখানেই রোগের সৃষ্টি করে।

অ্যাগ্রোব্যাকটিরিয়াম সাধারণতঃ শিকড়ের উপরের অংশ (crown) আক্রমণ করে থাকে। পিথিয়াম ডিব্যারীয়ানাম ও রাইজোকটোনিয়া সোল্যানি সাধারণতঃ ছোট চারায় বীজপত্রের নীচে জমি সংলগ্ন কাণ্ডের গোড়ার অংশ (hypocotyl) আক্রমণ করে এই অংশ পচিয়ে দেয়। ফিউজেরিয়াম সোল্যানি, স্ক্লেরোশিয়াম রলফ্‌সিআই, স্ক্লেরোশিয়াম ওরাইজি *(S. oryzae)* ইত্যাদি কিছু ছত্রাক পরিণত গাছের গোড়ার অংশ আক্রমণ করে, ফলে ঐ অংশ পচে যায়। এ ছাড়াও নেকট্রিয়া গ্যালিজেনা, ম্যাক্রোফোমিনা ফ্যাসিওলিনা, সিউডোমোনাস সিরিঞ্জি, সিউডোমোনাস মর্স-প্রুনোরাম *(P. mors-prunorum)* প্রধানতঃ কাণ্ডকে আক্রমণ করে। অজস্র ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়া শুধু পাতাকেই আক্রমণ করে থাকে। এদের মধ্যে রয়েছে অলটারনেরিয়া সোল্যানি, সার্কোস্পোরা পার্সোন্যাটা*(C. personata)*, সার্কোস্পোরা মিউজি*(C. musae)*,সিউডোমোনাস ফ্যাসিওলিকোলা *(P. phaseolicola)*, ইত্যাদি। অনেক ছত্রাক ও কিছু ব্যাকটিরিয়া প্রধানতঃ পাতাকে আক্রমণ করলেও পরবর্তী পর্যায়ে কাণ্ডে ও অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে যেমন পাকসিনিয়া, এরিসাইফি, ফাইটফথোরা ইনফেস্ট্যানস, পিরিকুলারিয়া ওরাইজি, ও জ্যান্থোমোনাস ম্যালভেসীয়ারাম। ক্ল্যাভিসেপস পারপিউরিয়া *(Claviceps purpuria)* ও উস্টিলাগো নিউডা *(U. nuda)* শুধুমাত্র ফুলকে আক্রমণ করে। স্ক্লেরোটিনিয়া ল্যাক্সা *(S. laxa)* প্রথমে ফুলকে আক্রমণ করলেও পরে ফুলের মধ্য দিয়েই কাণ্ডের সংলগ্ন অংশকে আক্রমণ করে। শুধুমাত্র ফলকে আক্রমণ করে এরকম ছত্রাকও রয়েছে যেমন রাইজোপাস স্টোলনিফার *(R. stolonifer)*, পেনিসিলিয়াম এক্সপ্যানসাম *(P. expansum)*, ও কোলেটোট্রাইকাম সিডিআই *(C. psidii)*।

(গ) বিশেষ কলা বা অঙ্গ অভিমুখী বিস্তার

কখনও এমন দেখা যায় যে ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়া যেখানে গাছের দেহে প্রবেশ করে সেখানে না ছড়িয়ে এবং কোন ক্ষতি না করে অন্য একটি বিশেষ কলা বা বিশেষ অঙ্গের দিকে এগিয়ে যায় (histotropic or organotropic colonization) ও সেখানে ছড়িয়ে পড়ে। ফিউজেরিয়াম, ভার্টিসিলিয়াম, সিউডোমোনাস ইত্যাদি ভ্যাসকুলার উইল্ট রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়া ছোট শিকড় বা মূলরোম দিয়ে প্রবেশ করেলেও সেখানে কর্টেক্সের প্যারেনকাইমা কোষের মধ্যে না ছড়িয়ে সোজাসুজি নালিকা বাণ্ডিলের দিকে এগিয়ে যায় ও জাইলেমের ট্র্যাকীয়ার মধ্যে প্রবেশের পর সেখানেই ক্রমশঃ উপরদিকে ছড়াতে থাকে। বিভিন্ন ধরণের ভূষা রোগের ক্ষেত্রে দেখা যায় হয় বীজের ভিতরে ছত্রাক

সুপ্ত অবস্থায় থাকে অথবা বীজের গায়ে ছত্রাকের স্পোর লেগে থাকে। বীজটি অঙ্কুরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ছত্রাক ভিতরে থাকলে সক্রিয় হয়ে ওঠে আর বাইরে থাকলে স্পোর অঙ্কুরিত হয়ে চারাটিকে আক্রমণ করে ভিতরে প্রবেশ করে এবং শীর্ষমুকুলে নিজের জায়গা করে নেয়। গাছটি বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে ছত্রাকের অগ্রগতিও অব্যাহত থাকে এবং ফুল ফোটার সময় হলে ছত্রাক ফুলে প্রবেশ করে তার বিশেষ কোন অংশকে আক্রমণ করে সেখানেই রোগ লক্ষণের সৃষ্টি করে বা সেটিকে নষ্ট করে দেয়। গমের আলগা ভুষা (উস্টিলাগো নিউডা) ও দুর্গন্ধযুক্ত ভুষায় (টিলেশিয়া ট্রিটিসি) গর্ভকোষে ও ক্যারিওফাইলেসি পরিবারভুক্ত গাছের অ্যান্থার স্মাটে (উস্টিলাগো ভায়োলেসিয়া—*U. violacea*) পুংকেশরে এইভাবে রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। সেলেরির লীফস্পট রোগে (সেপ্টোরিয়া এপিআই : *S. apii*) চারা একেবারে শুরুতে আক্রান্ত হলেও পরিণত গাছের পাতাতে রোগের লক্ষণ দেখা দেয়।

১৩ রোগসৃষ্টিতে পরজীবীর দেহনিঃসৃত বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের ভূমিকা

গাছের দেহের মধ্যে দিয়ে ছড়ানোর সময় রোগ উৎপাদক দেহকোষের ঘনিষ্ঠ-সংস্পর্শে আসে। তখন তাদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া চলতে থাকে। একদিকে রোগ উৎপাদক যেমন গাছের দেহকোষের বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগের দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হয় অন্যদিকে রোগ উৎপাদকের দেহনিঃসৃত বিভিন্ন যৌগও গাছের কোষের জীবনযাত্রা বা কার্যকলাপ নানাভাবে প্রভাবিত করে। মিথ-ক্রিয়ার সময় রোগ উৎপাদক ও আক্রান্ত গাছের দেহের মধ্যে রাসায়নিক যৌগের বিনিময় ঘটতে থাকে (exchange of metabolites)। অনেকটা এর উপরই নির্ভর করে মিথস্ক্রিয়ার চূড়ান্ত ফলাফল, অর্থাৎ রোগ হবে কি হবে না এবং যদি হয় রোগের তীব্রতা কতটা হবে। রোগ উৎপাদকের দেহনিঃসৃত যে সব রাসায়নিক পদার্থ গাছে রোগসৃষ্টিতে সহায়তা করে তাদের রোগ উৎপাদকের জীব-রাসায়নিক অস্ত্র (biochemical weapons) হিসাবে ধরা যেতে পারে। অধিকাংশ রোগ লক্ষণেরই এই ধরণের রাসায়নিক ক্রিয়ার থেকে উৎপত্তি। এদের মধ্যে গুরুত্বের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য হল এনজাইম্ (enzyme), টক্সিন (toxin) ও হরমোন (hormone) প্রকৃতির যৌগগুলি। কিছু এনজাইমের ক্রিয়ার ফলে কোষের দেওয়াল নষ্ট হয়ে যায় বা ভেঙ্গে যায়। এর ফলে কোষটির শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয়। যে সব যৌগ টক্সিন প্রকৃতির তাদের বিষক্রিয়ার প্রভাবে কোষের শারীরবৃত্তীয় বিভিন্ন ক্রিয়ার নানারকম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় যার ফলে কোষের মৃত্যু ঘটে। হরমোনের ক্রিয়ার ফলে কোষের মৃত্যু হয় না , তাদের স্বাভাবিক কোষ বিভাজন ও বৃদ্ধিতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। উপরোক্ত তিন ধরণের যৌগ ছাড়াও অনেক রোগ উৎপাদক জটিল গঠনের শর্করা ও অন্যান্য শ্রেণীর যৌগ উৎপাদন করে যেগুলির কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করা হয়।

ভাইরাস ছাড়া প্রায় সব রোগ উৎপাদকই এনজাইম ও হরমোন উৎপাদন করে থাকে। কেবল ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়া টক্সিন উৎপাদন করে। ভাইরাস এই ধরণের কোন যৌগ উৎপাদনে সক্ষম না হলেও তার আক্রমণের ফলে কিছু

রাসায়নিক যৌগ গাছে স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হয়। তাছাড়া কিছু নূতন যৌগেরও সৃষ্টি হতে পারে বা হরমোন উৎপাদনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়া কৃত্রিম মাধ্যমে চাষের সময় এনজাইম, টক্সিন বা হরমোন উৎপাদন করলেও আক্রান্ত গাছের দেহে সেগুলি সমান সক্রিয়ভাবে উৎপাদন না করতেও পারে। আবার কৃত্রিম পরিবেশে যাদের উৎপাদন ক্ষমতা কম দেখতে পাওয়া যায় তারাও অনেকসময় দেহের পরিবেশে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে। রোগসৃষ্টিতে এনজাইম, টক্সিন ও হরমোনের ভূমিকা নিয়ে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে।

এনজাইম

এক ধরণের প্রোটিন অণু যা বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ায় অনুঘটক (catalyst) এর কাজ করে ক্রিয়াটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে বা ত্বরান্বিত করে তাদের উৎসেচক বা এনজাইম বলে। জীবকোষের মধ্যে যে নানা ধরণের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপ সবসময় চলেছে সেগুলির প্রত্যেকটি পর্যায়ক্রমিকভাবে অনেকগুলি রাসায়নিক বিক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। প্রতিটি বিক্রিয়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন এনজাইমের প্রয়োজন হয়। সাধারণ একটি উদ্ভিদ কোষে প্রায় দশ হাজার বিভিন্ন ধরণের এনজাইম থাকে। এর থেকে জীবকোষের ও তার শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াগুলির জটিলতা বোঝা যাবে। কোষের সাইটোপ্লাজমে, নিউক্লিয়াসে এবং সম্ভবতঃ মাইটোকনড্রিয়ার ও সাইটোপ্লাজমের মেমব্রেনে এনজাইম উৎপন্ন হয়। এই সব জায়গা ছাড়া কোষের দেওয়ালেও এনজাইম জমে বা দেহকোষের ভিতরে বা বাইরে ক্ষরিত হয়। রোগ উৎপাদকের দেহনিঃসৃত কিছু এনজাইম (extracellular enzyme) কোষের গঠনে বা স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। এদের মধ্যে অনেকেই গাছের দেহে রোগসৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায়ে অংশ নেয়। তবে যে সব এনজাইম কোষের দেওয়ালের ক্ষতিসাধন করে বা সেটিকে ভেঙ্গে ফেলে দেয় তাদের গুরুত্বই সবথেকে বেশী এবং এখানে আলোচনা মূলতঃ তাদের মধ্যেই সীমিত রাখা হবে। দেওয়ালের উপর এই এনজাইমগুলি কিভাবে কাজ করে তা বুঝতে হলে আগে দেওয়ালের গঠন ও তার উপাদানগুলি সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন।

কোষের দেওয়ালের গঠন: ভাজক কলায় বিভাজনের ফলে একটি কোষ থেকে যখন দুটি কোষের সৃষ্টি হয় তখন তাদের মাঝখানে যে নূতন দেওয়াল গড়ে ওঠে সেটি হল এদের এজমালী দেওয়াল, মধ্যচ্ছদা বা 'মিডল ল্যামেলা' (middle lamella)। এই দেওয়ালটি প্রধানতঃ ক্যালসিয়াম পেকটেট

(calcium pectate) ধরণের যৌগ দিয়ে গঠিত ; খুব অল্প পরিমাণে প্রোটিন এর সঙ্গে মিশে থাকে। কোষগুলি যখন বড় হতে থাকে তখন মধ্যচ্ছদার ভিতর দিকে প্রথমে দেওয়ালের একটি নূতন স্তর গড়ে ওঠে যাকে বলা হয় কোষের দেওয়ালের প্রথম স্তর বা 'প্রাইমারী ওয়াল' (primary wall) (রেখাচিত্র-১৫ক)। এই স্তরটির প্রধান তিনটি উপাদান হল পেকটিক যৌগ (pectic compounds),
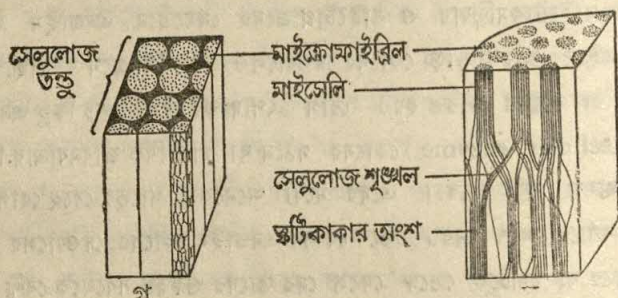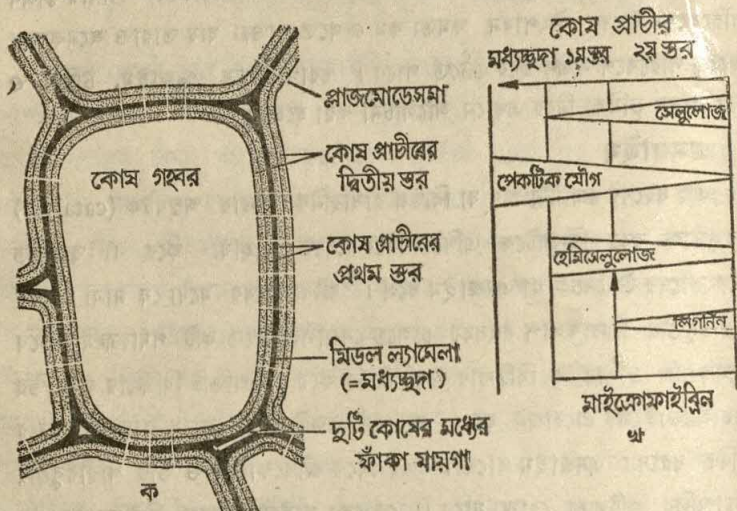
রেখাচিত্র ১৫ : উদ্ভিদের কোষ প্রাচীরের গঠন (ক) ও (খ) উদ্ভিদ কোষ প্রাচীরের বিভিন্ন অংশ ও উপাদান (গ) কোষ প্রাচীরে সেলুলোজ তন্তুতে মাইক্রোফাইব্রিলের অবস্থান (ঘ) সেলুলোজ মাইক্রোফাইব্রিলে সেলুলোজ শৃঙ্খলের অবস্থান।

হেমিসেলুলোজ (hemicellulose) ও সেলুলোজ (cellulose) যার মধ্যে প্রথমটি অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে থাকে। কোষের পরিণতি প্রাপ্তির পথে পরবর্তী পর্যায়ে দেওয়ালে প্রথম স্তরের ভিতর দিকে আর একটি নূতন স্তর গড়ে ওঠে যাকে বলা হয় দেওয়ালের দ্বিতীয় স্তর বা 'সেকেণ্ডারী ওয়াল' (secondary

wall)। এই স্তরে সেলুলোজ, পেকটিক যৌগ ও হেমিসেলুলোজ তিনটি উপাদানই থাকে। সব থেকে বেশী পরিমাণে থাকে সেলুলোজ। কোষের দেওয়ালের উপরোক্ত তিনটি স্তর একটি থেকে অন্যটি আলাদা নয় বরঞ্চ বলা যায় অবিচ্ছিন্নভাবে গড়ে উঠেছে, শুধু স্তরভেদে বিভিন্ন উপাদানগুলির আনুপাতিক হারের তারতম্য ঘটে (রেখাচিত্র—১৫খ)। মধ্যচ্ছদা থেকে দ্বিতীয় স্তর পর্যন্ত ক্রমশঃ সেলুলোজের পরিমাণ বাড়ে আর হেমিসেলুলোজের পরিমাণ কমে। কিছু বিশেষ ধরণের কোষে পরিণত অবস্থায় দেওয়ালের দ্বিতীয় স্তরের উপর অন্য কিছু উপাদান ; যেমন—লিগনিন (lignin), সুবেরিন (suberin) ইত্যাদি জমে। এর ফলে কোষগুলি স্বকীয়তা পায় এবং বিশেষ বিশেষ কাজের উপযোগী হয়ে ওঠে। দেওয়ালের প্রধান উপাদানগুলি সম্বন্ধে এখানে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হচ্ছে।

(ক) পেকটিক যৌগঃ মধ্যচ্ছদা ও দেওয়ালের প্রাথমিক স্তরের মুখ্য উপাদান হল পেকটিক যৌগ সমূহ। বলা যায় মধ্যচ্ছদাতে ক্যালসিয়াম পেকটেট প্রায় সিমেণ্টের মত সংলগ্ন কোষ দুটিকে জুড়ে রাখে। একশ বা ততোধিক ছয়টি কার্বনের রিং যুক্ত আলফা-ডি-গ্যালাকটুরোনিক অ্যাসিডের অণু (α—D-galacturonic acid) পরপর সারিবদ্ধ অবস্থায় একটির ১ নম্বর ও অন্যটির ৪ নম্বর কার্বন পরমাণুর মাধ্যমে (α—1.4 linkage) শৃঙ্খলের মতভাবে যুক্ত হলে পলিগ্যালাকটুরোনিক অ্যাসিডের (polygalacturonic acid) অণু গড়ে ওঠে। গ্যালাকটুরোনিক অ্যাসিড অণুতে ৫ নং কার্বন পরমাণুর সঙ্গে একটি COOH অর্থাৎ কার্বক্সিল(carboxyl)মূলক বা 'র‍্যাডিকাল' (radical) যুক্ত থাকে যার হাইড্রোজেন পরমাণুটি ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম বা মিথানল (methanol) ধরণের অ্যালকোহলের মেথিল মূলক (methyl) দ্বারা প্রতিস্থাপনযোগ্য। ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেশিয়াম পরমাণু দ্বারা COOH এর হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হলে পেকটিক অ্যাসিডের লবণ অর্থাৎ ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেশিয়াম পেকটেট তৈরী হয়। হাইড্রোজেন মেথিল মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হলে **'মেথিলেশন'** (methylation) বা এস্টেরীভবন (esterification) হয়েছে বলা হয়। যে পেকটিক যৌগের লম্বা শৃঙ্খলে কোন প্রতিস্থাপনের ঘটনা ঘটেনি তাকে পেকটিক অ্যাসিড (pectic acid) বলে। যদি অল্প সংখ্যক গ্যালাকটুরোনিক অ্যাসিডের অণুতে মেথিলেশন হয় তখন যৌগটিকে **পেকটিনিক অ্যাসিড** (pectinic acid) বলা হয় আর অধিকাংশ অণুতে মেথিলেশন হলে **পেকটিন** (pectin) বলে। মেথিলেশন

বেশী হলে পেকটিক যৌগের দ্রাব্যতা ও নমনীয়তা বাড়ে ও এনজাইমের ক্রিয়া সহজতর হয়। পেকটিক যৌগের লম্বা শৃঙ্খলগুলি পাশাপাশি থাকা অবস্থায় নিজেদের মধ্যে বা সেলুলোজ অথবা হেমিসেলুলোজের অনুরূপ শৃঙ্খলের সঙ্গে আড়াআড়ি সংযোগ (cross-linkage) স্থাপন করে। দুটি পেকটিক শৃঙ্খলের দুটি গ্যালাকটুরোনিক অ্যাসিডের অণুর পাশাপাশি থাকা দুটি COOH মূলকের মধ্যে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম বা হাইড্রোজেন 'বণ্ড' (bond) এর মাধ্যমে বা পেকটিক যৌগের COOH এর সঙ্গে সেলুলোজ বা অন্যান্য শর্করার অণুর OH মূলকের এস্টার (ester) বণ্ডের মাধ্যমে এই ধরণের আড়াআড়ি সংযোগ স্থাপিত হয়। এর ফলে দেওয়ালের গঠন আরও সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। বিভিন্ন পেকটিক যৌগের মধ্যে শৃঙ্খলের দৈর্ঘ্যে, মেথিল মূলকের অন্তর্ভূক্তির আনুপাতিক হারে ও আড়াআড়ি যোগাযোগের ধরণে কিছুটা তফাৎ থাকে।

পেকটিক এনজাইম : পেকটিক যৌগের উপর ক্রিয়া করে এরকম কিছু এনজাইম আছে। যৌগের প্রকারভেদে এনজাইম বিভিন্ন প্রকৃতির হয়। মাত্র এক ধরণের এনজাইম এখনও পর্যন্ত জানা আছে যা যৌগের লম্বা শৃঙ্খলকে ভাঙ্গতে পারে না, বাকী সবগুলি দুটি গ্যালাকটুরোনিক অ্যাসিডের অণুর ১—৪ সংযুক্তিতে আঘাত করে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শৃঙ্খলটিকে কমবেশি টুকরো টুকরো করে দেয়। এদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নীচে দেওয়া হল।

পেকটিনমেথিল এস্টারেজ (Pectinmethylesterase), সংক্ষেপে PME, আর্দ্রবিশ্লেষণের (hydrolysis) মাধ্যমে পেকটিন বা পেকটিনিক অ্যাসিডে ৫নং কার্বন পরমাণুতে COOH এর সংযুক্ত অবস্থা থেকে মেথিল মূলককে বিযুক্ত করে তাদের পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনে। এনজাইম প্রভাবিত এই বিক্রিয়াকে **'ডিমেথিলেশন'** (demethylation) বা 'ডিএস্টেরিফিকেশন' (deesterification) বলে। পেকটিক যৌগ থেকে মেথিল মূলক আংশিকভাবে দূরীভূত হলে পেকটিনিক অ্যাসিড আর সম্পূর্ণ দূরীভূত হলে পেকটিক অ্যাসিড পাওয়া যায়।

পেকটিন বা পেকটিনিক অ্যাসিডের উপর PME ক্রিয়া করার ফলে পেকটিক যৌগের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে কিছু পরিবর্তন হলেও পেকটিক শৃঙ্খলের কোন ক্ষতি হয় না। তবে COOH মূলক মুক্ত হয়ে যাবার ফলে ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেশিয়াম লবণ বা হাইড্রোজেনের মাধ্যমে বণ্ড গঠনের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

পেকটিক যৌগের শৃঙ্খলকে ১—৪ জোড়ের (1-4 linkage) জায়গায় ভেঙ্গে মাঝারি বা ছোট টুকরোয় এমনকি মনোগ্যালাকটুরোনিক অ্যাসিডে

পরিণত করে ফেলতে পারে এমন এনজাইম আছে। জোড় ভাঙ্গার ধরণের উপর নির্ভর করে এই সব এনজাইমকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা হয়। কিছু এনজাইম আর্দ্র বিশ্লেষণ বা হাইড্রোলিসিস (hydrolysis) প্রক্রিয়ায় ও কিছু

PME
H_2O
$+3CH_3OH$
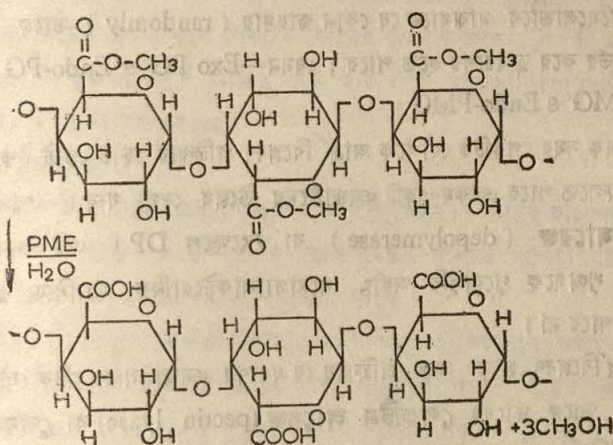
পেকটিনের উপর পেকটিনমেথিলএস্টারেজের ক্রিয়া

অন্য প্রক্রিয়ায় জোড় ভাঙ্গে। এই দুই ধরণের শৃঙ্খল ভঙ্গকারী এনজাইমকে (chain splitting enzymes) যথাক্রমে **হাইড্রোলেজ** (hydrolase) ও **লায়েজ** (lyase) বলা হয়।

আর্দ্র বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় যারা পেকটিক যৌগকে ভাঙ্গে সেই ধরণের এনজাইমকে সাধারণভাবে **পলিগ্যালাকটুরোনেজ** (polygalacturonase) বা **পেকটিন গ্লাইকোসাইডেজ** (pectin glycosidase) বলে। পেকটিক যৌগে মেথিলেশনের উপর নির্ভর করে এই ধরণের এনজাইমকে দু ভাগে ভাগ করা হয়। যে এনজাইম পেকটিক অ্যাসিডের উপর ক্রিয়া করে তাকে **পলি-**

PG
H_2O
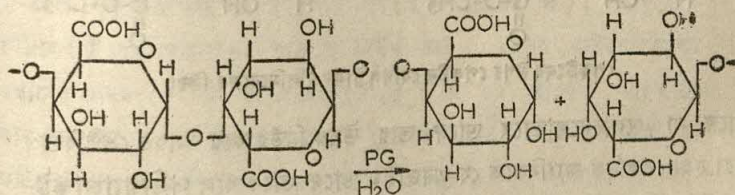
পেকটিক অ্যাসিডের উপর পলিগ্যালাকটুরোনেজের ক্রিয়া

গ্যালাকটুরোনেজ বা সংক্ষেপে PG বলা হয়। পেকটিন বা পেকটিনিক অ্যাসিডকে যে এনজাইম ভাঙ্গে তাকে **পলিমেথিলগ্যালাকটুরোনেজ**

(polymethylgalacturonase) বা পেকটিনমেথিলগ্যালাকটুরোনেজ (pectinmethylgalacturonase) সংক্ষেপে PMG, বলে। আবার এই দুই এনজাইমই পেকটিক যৌগের শৃঙ্খল এক ধার থেকে (terminally) ভাঙ্গে না এলোমেলোভাবে মাঝখানে যে কোন জায়গায় (randomly) ভাঙ্গে তার উপর নির্ভর করে দু ধরণের হতে পারে ; যেমন—Exo-PG ও Endo-PG এবং Exo-PMG ও Endo-PMG।

অনেক সময় পেকটিক যৌগকে আর্দ্র বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ছোট ছোট টুকরোয় ভেঙ্গে ফেলতে পারে এরকম একটি এনজাইমের উল্লেখ দেখা যায়। এর নাম **ডিপলিমারেজ** (depolymerase) বা সংক্ষেপে DP। এটি পেকটিক যৌগের শৃঙ্খলকে পুরোপুরি অর্থাৎ মনোগ্যালাকটুরোনিক অ্যাসিডে ভেঙ্গে ফেলতে পারে না।

আর্দ্র বিশ্লেষণ ছাড়া অন্য প্রক্রিয়ায় যে ধরণের এনজাইম পেকটিক যৌগের শৃঙ্খলকে ভাঙ্গে তাদের **পেকটিন লায়েজ** (pectin lyase) বা **পেকটিন ট্রানসএলিমিনেজ** (pectin transeliminase) বলে। এই প্রক্রিয়ায় ১—৪ কার্বনের জোড় ভাঙ্গার সময় একটি অণুর ৫ নম্বর কার্বন থেকে একটি হাইড্রোজেন অপসারিত হয়ে অন্য অণুর ১ নম্বর কার্বনে স্থানান্তরিত হয় ও প্রথম অণুর ৪ ও ৫ নম্বর কার্বনের মধ্যে একটি জোড়া বণ্ড (double bond) গড়ে ওঠে। এখানেও পেকটিক যৌগে মেথিলেশন হয়েছে কি না এবং এনজাইম যৌগটিকে একধার থেকে
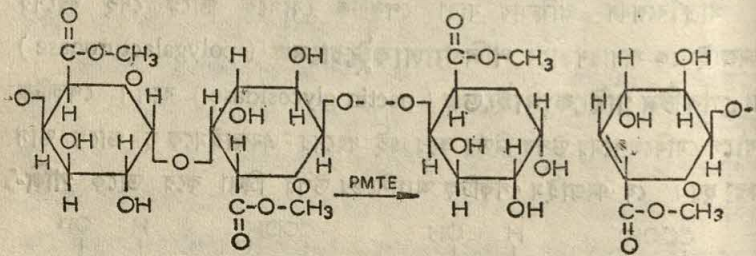
পেকটিনের উপর পেকটিন মেথিল ট্রানসএলিমিনেজের ক্রিয়া

ভাঙ্গে না এলোমেলোভাবে ভাঙ্গে তার উপর নির্ভর করে আরও শ্রেণীবিভাগ করা হয়। পেকটিক অ্যাসিডকে যে এনজাইম ভাঙ্গে তাকে বলে **পলিগ্যালাকটুরোনিক অ্যাসিড ট্রানস-এলিমিনেজ** (polygalacturonic acid transeliminase) বা সংক্ষেপে PGTE। এদের মধ্যে দুরকম আছে যথা Exo-PGTE ও Endo-PGTE। অনুরূপভাবে যারা পেকটিন বা পেকটিনিক অ্যাসিডকে ভাঙ্গে তাদের বলা হয় **পেকটিনমেথিল ট্রানসএলিমিনেজ**

(pectinmethyl transeliminase) বা সাধারণভাবে **পেকটিন ট্রান্স-এলিমিনেজ,** সংক্ষেপে PTE। কাজের ধরণ অনুযায়ী এই এনজাইম দু-রকম হতে পারে, যথা Exo-PTE ও Endo-PTE। ট্রান্সএলিমিনেজ জাতীয় এনজাইমের ক্রিয়ার ফলে পেকটিক যৌগের শৃঙ্খল ভাঙলে ১ ও ৪ নম্বর কার্বনের মাধ্যমে যুক্ত যে অনুটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সেটি মনোগ্যালাকটুরোনিক অ্যাসিড নয়—কিছুটা অন্য ধরণের।

(খ) সেলুলোজ

গাছের কোষ প্রাচীরের প্রধান উপাদান হল সেলুলোজ। গাছের কচি অংশে শতকরা ১২ ভাগ থেকে কাষ্ঠময় অংশে ৫০ ভাগ পর্যন্ত সেলুলোজ পাওয়া যায়। তুলার তন্তুতে শতকরা ৯০ ভাগ মত সেলুলোজ থাকে।

অসংখ্য বিটা ডি গ্লুকোজ (β D-glucose) অনু সারিবদ্ধভাবে পরস্পরের ১ ও ৪ নম্বর কার্বন পরমাণুর মাধ্যমে যুক্ত হলে সেলুলোজ পাওয়া যায়। একে গ্লুকোজের 'পলিমার' (polymer) বলা হয়। প্রতিটি শৃঙ্খলে ১,৪০০ থেকে ১০,০০০ পর্যন্ত গ্লুকোজের অনু থাকে যার দৈর্ঘ্য 50000 A° (৫ মাইক্রণ) পর্যন্ত হতে পারে। সমান্তরালভাবে থাকা সেলুলোজের অনেকগুলি শৃঙ্খল একত্রে একটি গুচ্ছ হয়ে 'মাইসেলি' (micellae গঠন করে (রেখাচিত্র-১৫ ঘ)। কিছুটা একসঙ্গে থাকার পর কতগুলি শৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন হয়ে পাশের সমান্তরালভাবে থাকা আর একটি গুচ্ছের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অন্য মাইসেলির অঙ্গীভূত হয়। মাইসেলির অংশে সেলুলোজ স্ফটিকাকার (crystalline) কিন্তু অন্য অংশ তা নয় (amorphous)। অনেকগুলি মাইসেলি বা শৃঙ্খলের গুচ্ছ একত্রিত হয়ে একটি 'মাইক্রোফাইব্রিল' (microfibril) গঠন করে (রেখাচিত্র-১০ গ, ঘ)। প্রতি মাইক্রোফাইব্রিলে ৩০০—৮০০ শৃঙ্খল থাকে। অনেকগুলি মাইক্রোফাইব্রিল নিয়ে একটি সেলুলোজ তন্তু বা ফাইবার হয় (রেখাচিত্র-১৫ গ)। মাইক্রো-ফাইব্রিলের উপরই দেওয়ালের কাঠামো নির্ভর করে। এদের মাইসেলিগুলির মাঝখানের জায়গা পেকটিন ও হেমিসেলুলোজ দিয়ে ভরা থাকে। এইভাবে থাকার সময় সেলুলোজের বিভিন্ন শৃঙ্খলভুক্ত গ্লুকোজ অনুগুলি নিজেদের মধ্যে বা পেকটিক যৌগের বা হেমিসেলুলোজের শৃঙ্খলভুক্ত অন্যান্য অনুর সঙ্গে আড়াআড়ি ভাবে যুক্ত হয়ে যায় (cross-linked)।

সেলুলেজ ঃ

সেলুলোজকে ভাঙ্গে যে এনজাইম তাকে বলা হয় সেলুলেজ (cellulase)। আগে ধারণা ছিল কোন একটি এনজাইমের ক্রিয়ায় সেলুলোজ ভেঙ্গে গ্লুকোজ

পাওয়া যায়। কিন্তু সেলুলোজের গঠন এত জটিল যে এরকম হওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না। রীজ (E. T. Reese, 1956) এর মতে একাধিক এনজাইম পর্যায়ক্রমিকভাবে কাজ করার ফলে সেলুলোজ ভেঙ্গে গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়। এই সব এনজাইমকে একত্রে সেলুলেজ বা 'সেলুলোলাইটিক' (celluloytic) এনজাইম বলা হয়। সেলুলোজের তন্তুর উপর প্রথম কাজ C_1 এনজাইম যার ক্রিয়ায় মাইসেলি বা সেলুলোজের সূক্ষ্ম তন্তুর মধ্যেকার শৃঙ্খলগুলি পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে Cx এনজাইম বা বিটা ১,৪-এণ্ডোগ্লুকানেজ (β—1,4-endogluenase) এর ক্রিয়ায় সেলুলোজের শৃঙ্খল ভেঙ্গে সেলোবায়োজ (cellobiose) বা অনধিক ছয়টি গ্লুকোজ অনুবিশিষ্ট শর্করায় পরিণত হয়। এই এনজাইম সাধারণতঃ শৃঙ্খলটিকে মাঝখান থেকে ভাঙ্গে (endoenzyme), তবে যখন ধার থেকে ভাঙ্গে তখনই সেলোবায়োজ উৎপন্ন হয়। শেষ পর্যন্ত Cx এনজাইমের ক্রিয়ার ফলেই ছোট টুকরোগুলিও আরও ভেঙ্গে সেলোবায়োজ বা কদাচিৎ গ্লুকোজে পরিণত হয়। শেষ পর্যায়ে বিটা-গ্লুকোসাইডেজ (β-gulcosidase) ধরণের এনজাইম সেলোবায়োজকে ভেঙ্গে গ্লুকোজে পরিণত করে। সেলোবায়েজ ও Cx আর্দ্র-বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কাজ করে।

সেলুলোজ তন্তু —C_1→ সেলুলোজ শৃঙ্খল —Cx→ শর্করার ছোট শৃঙ্খল ও সেলোবায়োজ —Cx→ সেলোবায়োজ ও গ্লুকোজ —β—glucosidase→ গ্লুকোজ
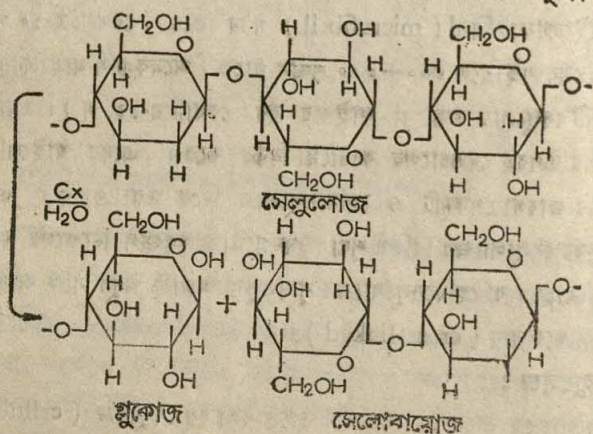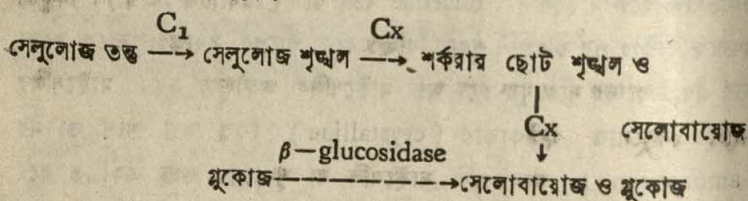
সেলুলোজ শৃঙ্খল ও তার উপর Cx এনজাইমের ক্রিয়া

(গ) হেমিসেলুলোজ ও হেমিসেলুলেজ

হেমিসেলুলোজ গাছের কোষের দেওয়ালের অন্যতম উপাদান। বিভিন্ন গাছে হেমিসেলুলোজ শতকরা ১১—৩২ ভাগ থাকে। বিভিন্ন ধরণের পাঁচ ও ছয় কার্বনযুক্ত শর্করার সমন্বয়ে হেমিসেলুলোজ তৈরী হয়। এদের মধ্যে আছে গ্লুকোজ (glucose), জাইলোজ (xylose), অ্যারাবিনোজ (arabinose), র‍্যামনোজ (rhamnose), ম্যানোজ (mannose), গ্যালাকটোজ (galactose), গ্যালকটুরোনিক অ্যাসিড ও অন্যান্য শর্করা। বিভিন্ন শর্করার কয়েকটি অণুর সমন্বয়ে গঠিত ছোট ছোট শৃঙ্খল পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে নানারকম শর্করা অণুবিশিষ্ট হেবিসেলুলোজ যৌগটি গড়ে ওঠে।

হেমিসেলুলোজ কিভাবে ভাঙ্গে সে সম্বন্ধে কোন ধারণা এখনও গড়ে ওঠেনি। তবে বিভিন্ন ধরণের জীবাণু এমন সব এনজাইম উৎপাদন করে বলে জানা গেছে যা আর্দ্র বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হেমিসেলুলোজকে ভেঙ্গে তার বিভিন্ন উপাদানে পরিণত করে। এদের একত্রে বলা হয় হেমিসেলুলেজ (hemicellulase)।

(ঘ) লিগনিন

গাছের দেহে লিগনিন প্রধানতঃ সেই সব কোষের দেওয়ালে থাকে যাদের কাজ হল দেহকে সুদৃঢ় করে তোলা, যেমন জাইলেম কলার ট্র্যাকীয়া, ট্র্যাকাইড (tracheid) ও ফাইবার (fibre)। এছাড়া হাইপোডার্মিসের কোলেনকাইমা (collenchyma) কোষের দেওয়ালে ও কদাচিৎ এপিডার্মিস কোষের দেওয়ালে লিগনিন জমে। লিগনিনের প্রধান উপাদান হল ফিনাইল-প্রোপানয়েড (phenyl propanoid) জাতীয় অণু যার সঙ্গে বেনজিন (benzene) অণুর সংযুক্তি ঘটে। লিগনিন একটি বেশ জটিল প্রকৃতির রাসায়নিক পদার্থ যাতে প্রায় ১০০ ফিনাইল-প্রোপানয়েড ও বেনজিনের অণু থাকে। বড় গাছের কাঠকে পচাতে পারে ব্যাসিডিওমাইসিটিস শ্রেণীর এমন অনেক ছত্রাক লিগনিন ভেঙ্গে ফেলতে পারে। লিগনিনেজ (ligninase) জাতীয় এনজাইমের ক্রিয়ায় লিগনিন ভাঙ্গে বলে ধারণা। কয়েকটি অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেণীর ছত্রাকও লিগনিন ভাঙ্গতে পারে। এইসব ছত্রাক এনজাইমের সাহায্যে কিভাবে লিগনিন ভাঙ্গে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণা এখনও গড়ে ওঠেনি। মনে হয় এদের দেহনিঃসৃত পলিফেনলঅক্সিডেজ ধরণের এনজাইম **ল্যাকেজ** (laccase) লিগনিন ভাঙ্গতে সাহায্য করে।

রোগসৃষ্টিতে বিভিন্ন এনজাইমের ভূমিকা

অধিকাংশ রোগ উৎপাদক ছত্রাক গাছের ত্বক ভেদ করে দেহের ভিতরে

প্রবেশ করে ও পরবর্তী পর্যায়ে দেওয়াল ভেদ করে এক কোষ থেকে অন্য কোষে বা দুটি কোষের দেওয়ালের মাঝাখানে জায়গা করে নিয়ে ছড়ায়। ব্যাকটিরিয়াও অনেক সময় দেওয়াল ভেঙ্গে কোষে ঢোকে। অনেকেই তাদের পরজীবী জীবনের বেশীর ভাগ সময় এইভাবে কাটায় এবং স্বাভাবিকভাবেই গাছের দেয়াগুলের অন্ততঃ কিছুটা বা বড় রকমের ক্ষতি করে। রোগসৃষ্টিতে এনজাইমের সম্ভাব্য ভূমিকা সম্বন্ধে প্রথম উল্লেখ করেন ডি ব্যারী (১৮৮৮)। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জোনস (L. R. Jones, 1912) ব্যাকটিরিয়াজনিত নরমপচা ধরণের (সফ্‌ট রট) রোগলক্ষণের ক্ষেত্রে ও পরবর্তীকালে ব্রাউন (W. Brown, 1922-36) ছত্রাকজনিত বিভিন্ন ধরণের পচনের ক্ষেত্রে পেকটিক এনজাইমের ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। বিভিন্ন রোগের সৃষ্টিতে কখনই সেলুলেজের উপর পেকটিক এনজাইমের মত গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। তবে ইদানীংকালে কিছু রোগের ক্ষেত্রে অন্ততঃ সেলুলেজের একটা ভূমিকা থাকতে পারে এই ধারণা ক্রমশঃ গড়ে উঠছে।

(ক) পেকটিক এনজাইম

অধিকাংশ রোগ উৎপাদক ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়া কৃত্রিম মাধ্যমে PME ছাড়াও পেকটিক যৌগকে ভেঙ্গে ফেলতে পারে এরকম এনজাইম (chain-splittng enzyme) উৎপাদন করে। কৃত্রিম মাধ্যমে এনজাইমের উৎপাদন মাধ্যমের অম্লতা-ক্ষারতার মাত্রা অর্থাৎ pH, মাধ্যমে কার্বন ও নাইট্রোজেনের আনুপাতিক হার (C/N ratio) ও ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়ার বয়সের উপর নির্ভর করে। কিছু রোগ উৎপাদকের বিভিন্ন জাতির ক্ষেত্রে কৃত্রিম মাধ্যমে এই ধরণের এনজাইম উৎপাদন ও রোগ সৃষ্টির ক্ষমতার মধ্যে একটা সম্পর্ক দেখতে পাওয়া গেছে। এরউইনিয়া অ্যারয়ডি, এরউইনিয়া ক্যারটোভোরা ও ভার্টিসিলিয়াম অ্যালবো-এট্রামের যে সব ধারার (isolate) রোগ উৎপাদন ক্ষমতা বেশী তারা সকলেই বেশী পরিমাণে এইসব এনজাইম উৎপাদন করে। আবার জ্যান্থোমোনাস ক্যারটির *(X. carotae)* ক্ষেত্রে রোগ সৃষ্টির ক্ষমতা কম অথচ যথেষ্ট পরিমাণে এনজাইম উৎপাদন করতে পারে এরকম ধারার সন্ধান পাওয়া যায়। এর থেকে বোঝা যায় যে পেকটিক এনজাইম সৃষ্টির ক্ষমতা থাকলেই কোন ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়া রোগসৃষ্টিতে সফল হয় না। তবে পচন জাতীয় রোগলক্ষণ সৃষ্টিতে যেসব রোগ উৎপাদক কম এনজাইম উৎপাদন করে তাদের সাফল্যের সম্ভাবনা সীমিত বলেই মনে হয়। খুব কম রোগে আক্রান্ত গাছে রোগ উৎপাদকের যথেষ্ট পরিমাণে PG বা PGTE জাতীয়

এনজাইম উৎপাদনের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। এর থেকে অবশ্য বোঝায় না যে রোগ উৎপাদক গাছের দেহে ঐ ধরণের এনজাইম উৎপাদন করেনি এবং সেই এনজাইম রোগসৃষ্টিতে সহায়তা করেনি। এনজাইম উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে যেতে পারে, অর্থাৎ বিশেষ জমে না বা কোষের দেওয়ালের গায়ে লেগে থাকতেও পারে। তাছাড়া আক্রান্ত বা মৃত কোষ থেকে যে নানা ধরনের যৌগ বাইরে বেরিয়ে আসে তাদের মধ্যে কিছু পেকটিক এনজাইমের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে যুগ্ম অবস্থা ধারণ করতে পারে বা রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে তাকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলতে পারে। এর ফলে গাছের আক্রান্ত অংশে পেকটিক এনজাইমের যথাযথ পরিমাপ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিছু রোগে সুস্থ অংশের তুলনায় আক্রান্ত অংশে পেকটিক যৌগের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যেতে দেখা গেছে। স্ক্লেরোটিনিয়া স্ক্লেরোশিয়োরামের আক্রমণে সূর্যমুখীতে (৬৪—৯৩%), স্ক্লেরোশিয়াম রলফসিআই এর আক্রমণ বীনে (৯০%) ও স্ক্লেরোটিনিয়া ফ্রাকটিজেনার আক্রমণে আপেলে (১৫%) আক্রান্ত অংশে পেকটিক যৌগের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। আপেলে বট্রাইটিস সিনেরীয়া ও পেনিসিলিয়াম এক্সপ্যানসাম-এর আক্রমণে ৫০—৭০ শতাংশ পেকটিক যৌগ নষ্ট হয়ে যায়। এই সব তথ্য থেকে পচন বা রট জাতীয় রোগের ক্ষেত্রে অন্ততঃ পেকটিক এনজাইমের রোগসৃষ্টিতে একটি সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে এমন মনে করা যায়। গাছের দেহে রোগজীবাণু দ্বারা উৎপন্ন এনজাইম রোগ সৃষ্টিতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করলেও পরবর্তী পর্যায়ে জমে না থাকায় বা কোন কারণে পরিবর্তিত বা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ার ফলে সেখানে তাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতে পারে।

পেকটিক এনজাইমের গুরুত্ব প্রধানতঃ সেই সব রোগেই আছে যেখানে আক্রান্ত অংশে নরম পচা ধরণের রোগলক্ষণ দেখা যায়। ম্যাসিরেশনের (maceration) ফলে সংলগ্ন কোষগুলির মধ্যচ্ছদা এনজাইমের ক্রিয়ায় নষ্ট হয়ে গেলে সেগুলি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। যেহেতু মধ্যচ্ছদার মূল উপাদান হল পেকটিন, সেজন্য PGTE জাতীয় এনজাইমের পক্ষে একে ভেঙ্গে ফেলা খুবই সহজ বলে মনে হয়। মধ্যচ্ছদায় ক্যালসিয়াম পেকটেটের পরিমাণ বেশী বা কম হলে এই এনজাইমের পক্ষে একে ভেঙ্গে ফেলা যথাক্রমে কঠিন ও সহজ হয়ে পড়ে। জমিতে যদি ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কম হয় তাহলে সয়াবীন ও টম্যাটো গাছে যথাক্রমে রাইজোকটোনিয়া সোল্যানি ও ফিউজেরিয়াম অক্সিস্পোরামের আক্রমণের তীব্রতা অনেক বেড়ে যায়। রোগ উৎপাদক

কৃত্রিম মাধ্যমে যে PG এনজাইম উৎপাদন করে সবসময় তাদের যে ম্যাসিরেশন করার ক্ষমতা থাকে তা নয়। উদাহরণ হল: ফাইটফথোরা ইনফেসট্যানস ও ক্লস্ট্রিডিয়াম ফেলসিনিয়াম (*Clostridium felsinium*)। আবার পিথিয়াম ডিব্যারীয়ানাম ও স্ক্লেরোটিনিয়া ফ্রাকটিজেনার ক্ষেত্রে কৃত্রিম মাধ্যমে উৎপন্ন ম্যাসিরেশনে সক্ষম যে এনজাইম পাওয়া গেছে তাদের PG এনজাইমের মত পেকটিক যৌগ ভাঙ্গার ক্ষমতা নেই। অ্যাসপারজিলাস কাওয়াচিআই (*Aspergillus kawachie*) কৃত্রিম মাধ্যমে চাষের পর সেখানে উৎপন্ন ম্যাসিরেশনে সক্ষম এমন একটি এনজাইম থেকে PG আলাদা করা সম্ভব হয়েছে। এই সব তথ্যাদি পর্যালোচনা করলে মনে হতে পারে যে সবসময় PG/PGTE জাতীয় এনজাইম দিয়ে ম্যাসিরেশন সম্ভব হয় না, প্রারম্ভিক পর্বে হয়ত প্রোটিএজ (protease), হেমিসেলুলেজ, সেলুলেজ বা অন্য কোন এনজাইমের কোন ভূমিকা থাকতে পারে। অবশ্য এই চিন্তার স্বপক্ষে বিশেষ কোন প্রমাণ নেই।

ম্যাসিরেশনের ফলে গাছের আক্রান্ত অংশে কোষগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে রোগ উৎপাদকের দেহনিঃসৃত এনজাইম, টক্সিন ইত্যাদির ছড়িয়ে পড়া সহজ হয়, তবে এর সব থেকে উল্লেখযোগ্য ফল হল বিচ্ছিন্ন কোষগুলির প্রোটোপ্লাস্টের (protoplast) মৃত্যু। একটি উদ্ভিদ কোষের দেওয়ালের সব থেকে ভিতরের স্তর থেকে প্রোটোপ্লাস্টের প্লাজমা আবরণী সম্পূর্ণ পৃথক। সুতরাং দেওয়াল পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেলে কোষের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটার কোন কারণ নেই। অথচ দেখা যায় যে ম্যাসিরেশনের পরে, দেওয়ালের প্রাথমিক স্তরের বিশেষ কোন ক্ষতি হওয়ার আগেই, কোষের মৃত্যু ঘটে। এর কারণ এখনও পরিস্কার নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে PG এনজাইমের ম্যাসিরেশন করার ক্ষমতা থেকে কোষকে মেরে ফেলার ক্ষমতা আলাদা করা সম্ভব হয়নি। ব্রাউন (W. Brown, 1915) এর মতে দেওয়ালের পেকটিক যৌগকে ভেঙ্গে ফেলা, ম্যাসিরেশন ও কোষের মৃত্যু সবই PG জাতীয় পেকটিক এনজাইমের ক্রিয়ার ফলে পর্যায়ক্রমে ঘটে। কিন্তু এই এনজাইম কিভাবে কোষের মৃত্যু ঘটায় তার কোন ব্যাখ্যা তিনি দেননি। এ সম্পর্কে নানারকম মতবাদ আছে। তার মধ্যে যেটি সবথেকে গ্রহণযোগ্য সেটি হল এই রকম। স্বাভাবিক অবস্থায় দেওয়ালের শক্ত কাঠামোর জন্য প্রোটোপ্লাস্ট প্রসারিত হতে পারে না। কিন্তু ম্যাসিরেশনের ফলে দেওয়ালের সেই কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়ে আর প্রোটোপ্লাস্ট পরিবেশ থেকে জল শোষণ করে স্ফীত হতে থাকে। তখন দেওয়ালের চাপ আগের থেকে অনেক কম হওয়ায় প্রোটোপ্লাস্ট স্ফীত হতে হতে একসময় তার বাইরের আবরণীটি ফেটে

যায় এবং তখনই কোষের মৃত্যু ঘটে। ট্রাইব (H. T. Tribe, 1955) পরীক্ষামূলকভাবে দেখিয়েছেন যে প্রোটোপ্লাস্টকে দেওয়াল থেকে ভিতর দিকে গুটিয়ে আনতে পারে অর্থাৎ প্লাজমোলিসিস (plasmolysis) করাতে পারে এরকম রাসায়নিক পদার্থ (plasmolysing agent) আগে প্রয়োগ করলে এনজাইমের ক্রিয়ায় ম্যাসিরেশন হলেও কোষের মৃত্যু অনেক বিলম্বিত হয় বা হয় না।

সফ্‌ট রট জাতীয় রোগে, যেখানে আক্রান্ত অংশটি নরম, ভিজে পচা অবস্থায় পরিণত হয়, পেকটিক এনজাইমের গুরুত্ব সর্বাধিক স্বীকৃত। এই ধরণের রোগ উৎপাদক সাধারণতঃ ক্ষতের মাধ্যমে গাছের দেহে প্রবেশ করে। ক্ষত অংশে মৃত কোষগুলির দেওয়ালের পেকটিক যৌগ অনেক সময় অনাবৃত অবস্থায় থাকার ফলে ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়া পেকটিক এনজাইম উৎপাদনে উদ্দীপিত হয়। দ্রুত এনজাইম উৎপাদনের ফলে ম্যাসিরেশন হতে থাকে, কোষগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ও মরে যায় এবং আক্রান্ত অঞ্চলের জাইলেম কলা বিপর্যস্ত হওয়ায় তার থেকে জল বেরিয়ে আসে। জল জমে যাওয়ায় রোগ উৎপাদকের দেহনিঃসৃত এনজাইম সহজেই চারিপাশে ছড়িয়ে পড়ে ও মৃত কোষগুলির খাদ্যদ্রব্যাদি রোগ উৎপাদকের পেতে সুবিধা হয়। রোগ উৎপাদক যদি ব্যাকটিরিয়া হয়, এই অবস্থায় তার ছড়িয়ে পড়তে আরো সুবিধা হয়। এর ফলে রোগের দ্রুত প্রসার ঘটে এবং আক্রান্ত অঙ্গটি ভেজা ও নরম ধরণের হয়ে পড়ে এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই পচে নষ্ট হয়ে যায়। এরউইনিয়া অ্যারয়ডি, এরউইনিয়া ক্যারটোভোরা, সিউডোমোনাস মার্জিনালিস *(P. marginalis)*, পেনিসিলিয়াম এক্সপ্যানসাম, স্ক্লেরোটিনিয়া ফ্রাকটিজেনা, রাইজোপাস সেটোলনিফার প্রভৃতির আক্রমণ থেকে এইরকম রোগ হয়। ছোট চারায় চারা ধসা *(c. o. P. debaryanum)* ও পাতায় ভিজে, পচা ধরণের দাগও (c.o.*B. cinerea, B. fabae)* এই ধরণের রোগ থেকেই হয়। পেকটিক যৌগের শৃঙ্খলকে মাঝখান থেকে ভাঙ্গে এই রকম এনজাইম (endo—PG, endo—PGTE ইত্যাদি) সফ্‌ট রট রোগে সবথেকে সক্রিয়। সফ্‌ট রট যেহেতু দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সেজন্য পচা অংশটির বিশেষ কোন আকৃতি থাকে না। কোথাও কোথাও এর কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যায়। বীনের চকোলেট স্পট (c. o. *Botrytis fabae*) রোগে দ্রুত দেওয়াল ভেঙ্গে যাবার ফলে কোষের মৃত্যু ঘটলে কোষ গহ্বর (vacuole) এর আবরণীটি নষ্ট হয়ে যাবার ফলে গহ্বরের মধ্যের (cell sap) ফেনল অনাবৃত হয়ে পড়ে ও ভাঙ্গা দেওয়াল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে

আসা গাছের নিজস্ব ও ছত্রাক উৎপাদিত ফেনল অক্সিডেজ দ্বারা জারিত হয়ে কুইনোন (quinone) জাতীয় যৌগে রূপান্তরিত হয়। কুইনোন ছত্রাকের বৃদ্ধি ও পেকটিক এনজাইমের কার্যক্ষমতা দুইই ব্যাহত করে। ফলে আক্রান্ত অংশে কিছুটা কুইনোন বা তার 'পলিমার' (polymer) মেলানিন নামক রঞ্জক পদার্থ জমে গেলে ছত্রাক আর ছড়াতে পারে না এবং ক্রমশঃ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। কিছু ফলের ব্রাউন রটের *(c. o. Sclerotinia fructigena)* ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে।

অনেক রোগে মধ্যচ্ছদা ভেঙ্গে গেলেও সংলগ্ন কোষগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে স্থানচ্যুত হয় না যার ফলে আক্রান্ত অংশ নষ্ট হয়ে গেলেও সেখানে সফ্‌ট রটের মত কোন ভিজে ও নরম ভাব থাকে না। এই ধরণের রোগ লক্ষণকে বলা হয় শুকনো পচা বা ড্রাই রট (dry rot)। আলুর ড্রাই রট (c. o. *Fusarium caeruleum*), ধানের গোড়া পচা (c. o. *Sclerotium oryzae*), মটরের শিকড় পচা (c. o. *Aphanomyces euteiches*), পাটের ডাঁটা পচা (c. o. *Macrophomina phaseolina*), শশার স্ক্যাব (c. o. *Cladosporium cucumerinum*) লঙ্কার অ্যানথ্যাকনোজ (c. o. *Colletotrichum capsici*) ইত্যাদি বিভিন্ন রোগ ড্রাই রটের উদাহরণ। এই জাতীয় রট সীমিত ধরণের হয় এবং এর সাধারণতঃ একটা আকৃতি থাকে। তবে সফ্‌ট রটের তুলনায় ড্রাই রটে দেওয়াল প্রায় সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে যায়। যেখানে দ্রুত হারে ম্যাসিরেটিং এনজাইম উৎপন্ন হয় এবং এই অবস্থা চলতে থাকে সেখানে সফট রটের সৃষ্টি হয়। মধ্যচ্ছদা নষ্ট হয়ে যাবার ফলে কোষগুলি এত তাড়াতাড়ি পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যে কোষের স্তরে আক্রমণের বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে ওঠার সময় থাকে না। এনজাইম উৎপাদন শ্লথগতিতে হতে থাকলে মধ্যচ্ছদা ভাঙতে সময় লাগে, তাছাড়া কোষগুলিও পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে না। এর ফলে কোষের স্তরে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে এবং রোগ উৎপাদকের অগ্রগতিতে বাধা পড়ে ও সীমিতক্ষতি হয়। তবে কোষগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে না যাওয়ায় তাদের দেওয়ালের উপর এনজাইমের ক্রিয়া বেশি সময় ধরে চলতে পারে, ফলে দেওয়াল অনেক বেশি ভেঙ্গে যায়।

ভার্টিসিলিয়াম, ফিউজেরিয়াম, সিউডোমোনাস প্রভৃতি ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়া যারা 'ভ্যাস্কুলার উইল্ট' (vascular wilt) বা ঢলে পড়া রোগের সৃষ্টি করে তারা সকলেই কৃত্রিম মাধ্যমে পেকটিক এনজাইম উৎপাদন করে থাকে। ভার্টিসিলিয়াম কেবলমাত্র PG এনজাইম উৎপাদন করে, PME করে বলে জানা

নেই। কিন্তু ফিউজেরিয়াম ও সিউডোমোনাস এই দু ধরণের এনজাইমই উৎপাদন করে। টম্যাটোর রোগ উৎপাদনকারী ভার্টিসিলিয়াম অ্যালবো-অ্যাট্রাম ও ফিউজেরিয়াম অক্সিস্পোরামের কিছু জাতির ক্ষেত্রে কৃত্রিম মাধ্যমে PG উৎপাদন ক্ষমতার ও রোগসৃষ্টির ক্ষমতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা গেছে। বিভিন্ন পরীক্ষামূলক তথ্যের উপর ভিত্তি করে উইল্ট রোগ সৃষ্টিতে PG এনজাইমের সম্ভাব্য ভূমিকা সম্বন্ধে যে ধারণা গড়ে উঠেছে তা হল এইরকম। ফিউজেরিয়াম, ভার্টিসিলিয়াম ইত্যাদি ছত্রাক জাইলেমের ট্র্যাকীয়ার মধ্যে দিয়ে উপরদিকে ছড়িয়ে পড়ার সময় দেওয়ালের কূপ পর্দা বা 'পিট মেমব্রেন' (pit membrane) এর সংস্পর্শে আসে। দেওয়ালের কূপ অঞ্চল বা 'পিট' এর এই অংশে শুধুমাত্র মধ্যচ্ছদা থাকে, অন্য দুটি স্তর থাকে না। হাইফার অগ্রভাগ থেকে নিঃসৃত পেকটিক এনজাইমের প্রভাবে পিট মেমব্রেনের পেকটিক যৌগের শৃঙ্খল ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং টুকরোগুলি প্রবহমান জাইলেম রস (xylem sap) এর মধ্যে এসে পড়ে। এর ফলে জাইলেম রসের ঘনত্ব বা সান্দ্রতা (viscosity) বাড়তে থাকে ও উর্ধ্বমুখী প্রবাহের গতি কিছুটা মন্দীভূত হয়। তাছাড়া পেকটিক শৃঙ্খলের মাঝারি দৈর্ঘ্যের টুকরোগুলি জাইলেম রসের সঙ্গে উপরদিকে যেতে যেতে দুটি ট্র্যাকীয়া কোষের মাঝখানে ছিদ্রযুক্ত যে দেওয়াল আছে (perforated end plate) তার ছিদ্রগুলি বন্ধ করে দেয়। তখন ঐ ট্র্যাকীয়ার মধ্য দিয়ে জলের উর্ধ্বমুখী প্রবাহ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। একটি নালিকা বাণ্ডিলে অনেক ট্র্যাকীয়া এইভাবে বন্ধ হয়ে গেলে ঐ দিকের জলের সরবরাহ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ও পাতা জলের অভাবে ঢলে পড়ে। ফিউজেরিয়াম ও ভার্টিসিলিয়াম আক্রান্ত টম্যাটো গাছের প্রস্থচ্ছেদ (transverse section) মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে পরীক্ষা করে আক্রান্ত ট্র্যাকীয়ার দেওয়ালে পেকটিক যৌগের ভাঙ্গনের প্রমাণ পাওয়া গেছে। ভার্টিসিলিয়াম আক্রান্ত টম্যাটো ও ফিউজেরিয়াম আক্রান্ত ক্লোভার গাছে ট্র্যাকীয়ার মাঝখানের দেওয়ালের ছিদ্রগুলি বন্ধ করে আছে এরকম পেকটিক যৌগের ছিপিও (plug) দেখা গেছে। ফিউজেরিয়াম আক্রান্ত টম্যাটো গাছে এইরকম ছিপির অস্তিত্ব দাবী করা হয়েছে যদিও পরবর্তী পর্যায়ে তা সমর্থিত হয়নি। ফিউজেরিয়ামের 'কালচার ফিলট্রেটে' (culture filtrate) বা পেকটিক এনজাইমের দ্রবণে টম্যাটো গাছের কাটা ডালের (cutting) গোড়ার অংশ ডুবিয়ে রাখলে কিছু সময় পরে দেখা যায় যে পাতাগুলি নেতিয়ে পড়েছে। তলার অংশের প্রস্থচ্ছেদ অণুবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা করলে ট্র্যাকীয়ার দেওয়ালে ক্ষয়ের চিহ্ন ও ট্র্যাকীয়ার মধ্যের ছিদ্রযুক্ত

দেওয়ালে পেকটিক যৌগের ছিপি দেখতে পাওয়া যায়। পেকটিক এনজাইম (PG)-কে নিষ্ক্রিয় করে ফেলতে পারে এরকম এক যৌগ—রুফিয়ানিক অ্যাসিড (rufianic acid) টম্যাটো গাছে প্রয়োগ করার পরে ফিউজেরিয়ামের আক্রমণ হলে আক্রমণের তীব্রতা অনেক কম হয়। এ ছাড়াও দেখা গেছে যে জমিতে ক্যালসিয়ামের অভাব থাকলে ফিউজেরিয়াম ও ভার্টিসিলিয়াম উইল্ট রোগের প্রকোপ বেশী হয় আর ক্যালসিয়াম বেশি থাকলে, সম্ভবত দেওয়ালে পেকটিক যৌগের ক্যালসিয়াম পেকটেটে রূপান্তরের মাধ্যমে, রোগের প্রকোপ কমে। উপরোক্ত বিভিন্ন ধরণের তথ্য প্রমাণাদি থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে ফিউজেরিয়াম, ভার্টিসিলিয়াম ইত্যাদি ছত্রাকের আক্রমণে গাছে ঢলে পড়া রোগ সৃষ্টিতে পেকটিক এনজাইমের বিশেষ ভূমিকা আছে।

(খ) সেলুলেজ ঃ গাছে রোগের আক্রমণে, বিশেষ করে যেখানে আক্রান্ত অংশ পচে যায়, সেলুলেজ এনজাইমের ভূমিকা কি সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা এখনও গড়ে ওঠেনি। অধিকাংশ রোগ-উৎপাদক ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়া কেবলমাত্র সেলুলোজ উপাদান আছে এমন কৃত্রিম মাধ্যমেই সেলুলেজ উৎপাদন করতে পারে। কিন্তু ক্ল্যাডোস্পোরিয়াম কুকুমেরিনাম, পিথিয়াম অ্যাফানিডার-মেটাম ইত্যাদি কিছু ছত্রাক মাধ্যমে সেলুলোজ না থাকলেও সেলুলেজ উৎপাদন করতে পারে। এই সব সেলুলেজ সাধারণতঃ জলে দ্রবণীয় সেলুলোজ ভাঙতে পারে। রোগের আক্রমণ হলে জলে দ্রবণীয় নয় এরকম সেলুলোজ (native cellulose) ভাঙ্গার প্রয়োজন হয়। স্ক্লেরোশিয়াম রলফ্‌সিআই, রাইজোক-টোনিয়া সোল্যানি, কোলেটোট্রইকাম লিনিকোলা *(C. linicola)* ইত্যাদি কিছু ছত্রাক উৎপাদিত সেলুলেজের ঐ ক্ষমতা আছে। কৃত্রিম মাধ্যমে চাষের সময় কোন এনজাইমের উপস্থিতি অবশ্য প্রমাণ করে না যে একই এনজাইম আক্রান্ত গাছের দেহেও উৎপন্ন হয়। কিছু রোগের ক্ষেত্রে ; যেমন—পেঁয়াজে বট্রাইটিস স্কোয়ামোসা *(B. squamosa)*, বীনে রাইজোকটোনিয়া সোল্যানি, টম্যাটোতেস্ক্লেরোশিয়াম রলফ্‌সিআই ও শশাতে ক্ল্যাডোস্পোরিয়াম কুকুমেরিনাম-এর আক্রমণ হলে আক্রান্ত অংশে সেলুলেজের উপস্থিতির ও কোষের দেওয়ালে সেলুলোজ উপাদানের ভাঙ্গনের প্রমাণ পাওয়া যায়। এর থেকে মনে হতে পারে যে এই সব রোগের সৃষ্টিতে সেলুলেজের একটা ভূমিকা আছে। যেহেতু মধ্যচ্ছদাতে সেলুলোজ থাকে না, সেই কারণে আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে মধ্যচ্ছদা ভাঙ্গার কাজে সেলুলেজের কোন সক্রিয় ভূমিকা আছে বলে মনে হয় না। তবে দেওয়ালের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর ভাঙ্গার কাজে সেলুলেজ অবশ্যই সক্রিয়

অংশ গ্রহণ করে। সফ্‌ট রট জাতীয় রোগে, যেখানে প্রচুর পরিমাণে পেকটিক এনজাইম উৎপন্ন হবার ফলে মধ্যচ্ছদা ভেঙ্গে যাওয়ায় কোষগুলি দ্রুত পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, বা ছোট চারায়, যেখানে কোষের দেওয়ালে সেলুলোজের পরিমাণ খুবই অল্প থাকে, চারা ধসা রোগে সেলুলেজ উৎপাদনের উপর পচনের কম বেশি নির্ভর করে বলে মনে হয় না। তবে রাইজোকটোনিয়া সোল্যানি, ফিউজেরিয়াম মনিলিফর্মি (*F. moniliforme*), স্ক্লেরোশিয়াম রলফ্‌সিআই, বট্রিওস্ফেরিয়া রাইবিস (*Botryosphaeria ribes*) প্রভৃতি যে সব ছত্রাক পরিণত বয়সের গাছে শিকড় পচা, গোড়া পচা, অ্যানথ্র্যাকনোজ ইত্যাদি রোগের সৃষ্টি করে, তারা সেলুলেজ উৎপাদন করে এবং স্বাভাবিকভাবেই পরিণত কোষের সুগঠিত দেওয়াল ভেঙ্গে ফেলতে সক্ষম। আক্রান্ত অংশে সেলুলেজ আছে এরকম প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ না থাকলেও এই এনজাইম এই সব রোগের আক্রমণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে বলে মনে হয়। ভার্টিসিলিয়াম, ফিউজেরিয়াম, সিউডোমোনাস প্রভৃতি উইল্ট রোগ উৎপাদক ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়া সকলেই কৃত্রিম মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে সেলুলেজ উৎপাদন করে থাকে। উড (R.K.S. Wood, 1960) মনে করেন যে ট্র্যাকীয়ার পরিবেশ সেলুলেজ উৎপাদনের পক্ষে অনুকূল এবং সেখানে ছত্রাক উৎপাদিত সেলুলেজ স্থানীয়ভাবে কাজ করে সেলুলোজ ভেঙ্গে পেকটিনেজের মতই ট্র্যাকীয়ার মধ্যে দিয়ে জলের উর্ধ্বগামী প্রবাহে কিছুটা বাধার সৃষ্টি করতে পারে। অবশ্যই সেলুলেজের ভূমিকা এখানে মুখ্য নয়, পেকটিক এনজাইম প্রাথমিক পর্যায়ে কাজ করার পর সেলুলেজ সক্রিয় হয়। সিউডোমোনাস সোল্যানেসীয়ারাম এর বিভিন্ন জাতির রোগসৃষ্টির ক্ষমতা ও সেলুলেজ উৎপাদন ক্ষমতার মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক দেখা গেছে। আক্রান্ত টম্যাটো গাছে সেলুলোজের পরিমাণ নীরোগ গাছের তুলনায় শতকরা ৩০ ভাগ কম হতে দেখা গেছে। এর থেকে এমন ধারণা হতে পারে যে সিউডোমোনাস উইল্ট রোগে সেলুলেজ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু এও দেখা গেছে যে সব জাতির ব্যাকটিরিয়া আঠাল হড়হড়ে ধরণের পদার্থ বা 'স্লাইম' (slime) উৎপাদনে সক্ষম একমাত্র তারাই এই রোগের সৃষ্টি করতে পারে।

সেলুলেজ যে বড় বড় গাছের কাঠের পচনে অংশগ্রহণ করে এ তথ্য স্বীকৃত। প্রধানতঃ ব্রাউন রটের ক্ষেত্রেই এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই ধরণের পচনে সেলুলেজের ক্রিয়ায় আক্রান্ত অংশে ট্র্যাকীয়া, ট্র্যাকাইড প্রভৃতির দেওয়ালের সেলুলেজ ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু দেওয়ালের অন্যতম উপাদান লিগনিন নষ্ট হয়না। এর ফলে আক্রান্ত অংশে লিগনিনের হালকা

বাদামী রঙ যা সেলুলোজের উপস্থিতির ফলে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় ছিল তা ফুটে ওঠে।

(গ) **হেমিসেলুলেজ:** হেমিসেলুলোজ গাছের দেহকোষের দেওয়ালের অন্যতম উপাদান। কিছু মৃতজীবী ও পরজীবী ছত্রাক বিভিন্ন রকমের হেমি-সেলুলেজ উৎপাদন করে বলে জানা যায়। দেখা গেছে যে রাইজোকটোনিয়া সোল্যানি, স্ক্লেরোটিনিয়া স্ক্লেরোশিয়োরাম, ফিউজেরিয়াম রোজিয়াম *(F. roseum)*, ডিপ্লোডিয়া ভিটিকোলা *(D. viticola)* প্রভৃতি ছত্রাকের হেমিসেলুলোজ ভাঙ্গার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। তবে বিভিন্ন রোগ উৎপাদক ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়ার হেমিসেলুলেজ উৎপাদন ও সেই এনজাইমের রোগসৃষ্টিতে সম্ভাব্য গুরুত্ব নিয়ে বিশেষ গবেষণা এখনও হয়নি। তা হলে হয়ত দেখা যাবে বিশেষ বিশেষ রোগের ক্ষেত্রে এই এনজাইমের একটা সক্রিয় ভূমিকা থাকতেও পারে।

(ঘ) **লিগনিনেজ:** লিগনিন গাছের পরিণত অংশের অন্যতম উপাদান। বিশেষ কিছু কোষের দেওয়ালে লিগনিন জমে। কাঠের ব্রাউন রট সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। অন্য ধরণের রটের নাম 'হোয়াইট রট' (white rot)। এই রোগে রোগ উৎপাদক ছত্রাকের আক্রমণে লিগনিন নষ্ট হয়ে গেলে আক্রান্ত অংশ স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশী সাদা দেখায়। যে সব ব্যাসিডিওমাইসিটিস শ্রেণীর ছত্রাক কাঠের হোয়াইট রট ধরণের রোগ সৃষ্টি করে তাদের দেহনিঃসৃত লিগনিন ভাঙ্গার এনজাইম (ligninase) কিভাবে কাজ করে তা জানা নেই। কাঠের রট ছাড়া অন্য রোগে এদের বিশেষ কোন গুরুত্ব থাকতে পারে বলে মনে হয় না। যে সব একবীজপত্রী গাছে লিগনিনযুক্ত কলা বেশী থাকে তাদের গোড়া পচা বা কাণ্ড পচা রোগের আক্রমণ হলে সেখানেও রোগ উৎপাদকের পক্ষে লিগনিন ভাঙ্গার প্রয়োজন হতে পারে। দেখা গেছে এই রকম রোগের সৃষ্টি করে এমন দুটি ছত্রাক, যথা ফিউজেরিয়াম ল্যাকটিস *(F. lactis)* ও ফিউজেরিয়াম নিভেল *(F. nivale)*, এই ধরণের এনজাইম উৎপাদন করে ও সহজেই আক্রান্ত (snow mold of cereals) অংশের লিগনিন ভেঙ্গে ফেলে দেয়।

টক্সিন:

উদ্ভিদ-রোগবিজ্ঞানে 'টক্সিন' (toxin) বলতে জীবাণুদেহনিঃসৃত এমন ধরণের রাসায়নিক পদার্থকে বোঝায় যা অতি অল্প মাত্রায় থাকলেই গাছের দেহের পক্ষে ক্ষতিকর। এই জাতীয় পদার্থ কোষের প্রোটোপ্লাস্টের উপর প্রত্যক্ষ-ভাবে ক্রিয়া করে সেখানে শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ায় নানাভাবে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে

যার ফলে কোষের অকালমৃত্যু ঘটে। গয়ম্যান (E. Gaumann, 1954) মনে করতেন যে সব জীবাণু টক্সিন উৎপাদন করে তারাই কেবল গাছে রোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। তথ্য প্রমাণাদি অবশ্য গয়ম্যানের এই বক্তব্যকে সমর্থন করে না। অন্য নানা কারণেও গাছে রোগের সৃষ্টি হতে পারে।

অনেক রোগ দেখা যায় যে গাছের আক্রান্ত অংশ যেখানে ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়া রয়েছে তার থেকে অনেক দূরে রোগের লক্ষণ দেখা যায়। এর থেকেই গাছের রোগের প্রসঙ্গে টক্সিন নিয়ে চিন্তার সূত্রপাত। টক্সিন সংক্রান্ত গবেষণার শুরুতে রোগ উৎপাদক ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়া কৃত্রিম তরল মাধ্যমে চাষ করার পর ছেঁকে নেওয়া তরল পদার্থ বা 'কালচার ফিলট্রেট' (culture filtrate) গাছে প্রয়োগ করে দেখা হত সেখানে কোনও রোগলক্ষণ বা বিকৃতির চিহ্ন ফুটে ওঠে কি না। বিভিন্ন রোগ উৎপাদক ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়াকে কৃত্রিম মাধ্যমে নানা ধরণের বিষাক্ত পদার্থ উৎপাদন করতে দেখা যায় যা পোষক গাছে প্রয়োগ করলে সেখানে নানা রকম বিকৃতির চিহ্ন ফুটে ওঠে যার সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়ত স্বাভাবিক রোগলক্ষণের কোন মিল থাকে না। অথচ ঐ ধরণের প্রাথমিক পদার্থের পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে অনেক গবেষকই দাবী করতেন যে এই সব বিষাক্ত পদার্থ বা টক্সিনই রোগ সৃষ্টির অন্যতম কারণ। এই রকম অযৌক্তিক দাবীর বিরুদ্ধে সতর্কতা হিসাবে ডায়মণ্ড ও ওয়াগোনার (A. E. Dimond and P. E. Waggoner, 1953) 'ভিভোটক্সিন' (vivotoxin) তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন। তাঁদের মতে ভিভোটক্সিন হল রোগ উৎপাদক সৃষ্ট সেই ধরণের টক্সিন যা রোগগ্রস্ত গাছে পাওয়া যায় এবং আংশিক বা পুরোপুরি শোধিত অবস্থায় পোষক গাছে প্রয়োগ করলে সেখানে স্বাভাবিক রোগলক্ষণের অন্ততঃ কিছুটা ফুটে ওঠে।

পরবর্তীকালে এই সংজ্ঞা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রথমতঃ টক্সিন অতি অল্প মাত্রাতেই কার্যকরী। দ্বিতীয়তঃ টক্সিন উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে যেতে পারে অথবা কোষের অন্য কোন যৌগের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে বা রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। সেই অবস্থায় আক্রান্ত অংশে টক্সিনের সন্ধান না পেলে টক্সিন সেখানে উৎপন্ন হয়নি বা রোগ সৃষ্টিতে সক্রিয় কোন অংশ নেয়নি এই সিদ্ধান্তে আসা যায় না। গাছের রোগের প্রসঙ্গে হুইলার ও লিউক (H. Wheeler and H. H. Luke, 1963) তিন ধরণের টক্সিনের কথা উল্লেখ করেছেন ; যেমন—'ফাইটোটক্সিন' (phytotoxin), 'ভিভোটক্সিন' (vivotoxin) ও 'প্যাথোটক্সিন' (pathotoxin)।

ফাইটোটক্সিন ঃ পরজীবী জীবাণু দ্বারা উৎপন্ন বিষাক্ত পদার্থ যা পোষক গাছে প্রয়োগ করলে গাছের যে ধরণের ক্ষতি হয় তা স্বাভাবিক রোগ লক্ষণের থেকে পৃথক এবং রোগসৃষ্টিতে যার কোন ভূমিকাই নেই তাকে বলা হয় ফাইটোটক্সিন।

ভিভোটক্সিন ঃ পরজীবী জীবাণু দ্বারা উৎপন্ন যে বিষাক্ত পদার্থ যা রোগের সূত্রপাত করে না অথচ রোগগ্রস্ত গাছ থেকে অন্তরণের (isolation) পর কিছুটা শোধন করে পোষক গাছে প্রয়োগ করলে সেখানে পুরোপুরি বা অন্ততঃ কিছুটা স্বাভাবিক রোগলক্ষণ ফুটে ওঠে তাকে বলা হয় ভিভোটক্সিন।

প্যাথোটক্সিন ঃ পরজীবী জীবাণু দ্বারা উৎপন্ন বিষাক্ত পদার্থ যা পোষক গাছে প্রয়োগ করলে সেখানে রোগের লক্ষণ সম্পূর্ণভাবে ফুটে ওঠে তাকে বলা হয় প্যাথোটক্সিন। এই জাতীয় টক্সিনের উৎপাদন ক্ষমতার সঙ্গে পরজীবীর রোগ উৎপাদন ক্ষমতার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। পরজীবী যে সব জাতির গাছে আক্রমণ করে রোগসৃষ্টি করে প্যাথোটক্সিন কেবল তাদের উপরই সক্রিয়। এই ধরণের টক্সিনকে রোগ সৃষ্টির প্রাথমিক নিয়ামক (primary determinant of disease) বলে গণ্য করা হয়। যেহেতু শুধুমাত্র পোষক গাছ ও তার রোগ সংবেদনশীল জাতির উপরই এই টক্সিন সক্রিয় সেজন্য একে host-specific toxinও বলা হয়।

উপরের শ্রেণীবিভাগ কিছুটা কৃত্রিম তাতে সন্দেহ নেই। তবে আলোচনার সুবিধার জন্য এটিকে মেনে নিতে হয়। কিছু টক্সিন আছে যা সুস্থিত নয়, সহজেই ভেঙ্গে যায় বা অন্যান্য যৌগের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় লিপ্ত হয়। কিছু আবার কোষের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে আবদ্ধ (bound) হয়ে থাকতে পারে। এর ফলে পরজীবী আক্রমণের সময় গাছের দেহে টক্সিন উৎপাদন করলেও তার অন্তরণ (isolation), রাসায়নিক চরিত্র নির্ণয় (chemical characterization) ও ক্রিয়া প্রকরণ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে আসা অনেক সময় বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

বিভিন্ন টক্সিন ও তাদের ক্রিয়া পদ্ধতি ঃ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে টক্সিন কোষের আস্রবণ সংক্রান্ত অবস্থার (osmotic relations) পরিবর্তন ঘটানোর ফলেই কোষের মৃত্যু হয়। টক্সিন কোষের প্লাজমা আবরণীর ('প্লাজমালেমা' = plasmalemma) উপর ক্রিয়া করে তার ক্ষতি করে যার ফলে তার ভেদ্যতায় (permeability) পরিবর্তন ঘটে। স্বাভাবিকভাবেই তখন কোষের আয়নিক ভারসাম্যেরও (ionic balance) পরিবর্তন ঘটে যার ফলে প্রোটোপ্লাস্টের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলি ভীষণভাবে বিঘ্নিত হয়। তখন

কোষটির মৃত্যু ঘটে। টক্সিন এনজাইমের সঙ্গে যুক্ত (chelation) হয়ে বা রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে তাকে নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে। এইসব এনজাইম যে বিক্রিয়াগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলি তখন শ্লথগতিতে চলে বা থেমেও যেতে পারে যার ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় ও কিছু যৌগ বেশী পরিমাণে জমে যায় বা প্রয়োজনীয় যৌগ উৎপন্ন হয় না। কিছু টক্সিন বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ অংশ নেয় এমন কোন যৌগের বিরোধী (antimetabolite) হিসাবে কাজ করে। সাধারণতঃ আকৃতিগত সাদৃশ্য থাকার ফলেই টক্সিন এই যৌগের পরিবর্তে অনেক বিক্রিয়ায় অংশ নেয়। এইভাবে গুরুত্বপূর্ণ যৌগটি বিক্রিয়ার বাইরে থেকে যাওয়ায় গাছ তার অভাবজনিত অপুষ্টি থেকে ভোগে। এছাড়া অধিকাংশ টক্সিনই কোষের শ্বসনক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এর ফলে কোষের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

ফিউজেরিয়াম টক্সিন ঃ গাছের রোগ সংক্রান্ত টক্সিন নিয়ে গবেষণার সূত্রপাত হয় টম্যাটোর ফিউজেরিয়াম উইল্ট রোগের প্রসঙ্গে। গটলিব (D. Gottlieb, 1943) সুস্থ ও রোগগ্রস্ত টম্যোটো গাছের থেকে জাইলেম রস (xylem sap) সংগ্রহ করে তাতে টম্যাটো চারার গোড়া কেটে ডুবিয়ে রেখে দেখতে পান যে রোগগ্রস্ত গাছ থেকে সংগৃহীত তরলে রাখা গাছটির পাতাগুলি রোগে আক্রান্ত গাছে যেমন দেখা যায় সেইভাবে নেতিয়ে পড়েছে। এর থেকে গটলিব এই সিদ্ধান্তে আসেন যে আক্রান্ত গাছের দেহে ট্র্যাকীয়ার মধ্যে ফিউজেরিয়াম কোন বিষাক্ত পদার্থ উৎপাদন করে যার ক্রিয়ায় পাতাগুলি নেতিয়ে পড়ে। দুর্ভাগ্যক্রমে পরবর্তীকালে এই প্রসঙ্গে গটলিব আর কোন অনুসন্ধান চালান নি। পরবর্তী পর্যায়ে গয়ম্যান ও তাঁর সহযোগীরা টম্যাটোর উইল্ট রোগ উৎপাদক ফিউজেরিয়াম অক্সিস্পোরাম—বিশেষ জাতি লাইকোপার্সিকিকে *(F. oxysporum* f. sp. *lycopersici)* কৃত্রিম মাধ্যমে চাষ করে তার কালচার ফিলট্রেটে একাধিক টক্সিনের সন্ধান পান। এদের মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য টক্সিন হল লাইকোম্যারাসমিন (lycomarasmin) ও ফিউজেরিক অ্যাসিড (fusaric acid)। লাইকোম্যারাসমিন কোন গাছের রোগ উৎপাদক থেকে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া প্রথম টক্সিন। গয়ম্যান দাবী করলেও লাইকোম্যারাসমিন প্রয়োগে টম্যাটো গাছে স্বাভাবিক রোগলক্ষণের মত কোন লক্ষণ ফুটে ওঠে এরকম কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। লাইকোম্যারাসমিন একটি ডাইপেপটাইড। রোগসৃষ্টিতে এর কোন ভূমিকা আছে বলে মনে হয় না। ফিউজেরিক অ্যাসিড হল বিউটিল পিকোলিনিক অ্যাসিড (5 n-butylpicolinic acid) যা

শুধু কৃত্রিম মাধ্যমে চাষ করলেই নয় আক্রান্ত গাছ থেকেও পাওয়া গেছে। ফিউজেরিয়ামের একাধিক প্রজাতি কৃত্রিম মাধ্যমে এই টক্সিন উৎপাদন করে। তাছাড়া ফিউজেরিয়াম অক্সিস্পোরাম আক্রান্ত টম্যাটো, তুলা, কলা, তিসি ও তরমুজ গাছেও এর সন্ধান পাওয়া গেছে। ফিউজেরিক অ্যাসিড গাছে প্রয়োগ করলে সেখানে যে নানা ধরণের লক্ষণ বা ক্ষতির চিহ্ন ফুটে ওঠে তার মধ্যে পাতার জায়গায় জায়গায় শুকিয়ে যাওয়া (necrosis) ছাড়া আর কিছুর সঙ্গেই স্বাভাবিক রোগলক্ষণের বিশেষ মিল দেখা যায় না। তাছাড়া আক্রান্ত গাছে ক্ষতি করার মত যথেষ্ট পরিমাণে ফিউজেরিক অ্যাসিড জমে কি না এ ব্যাপারেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই সব নানা কারণে আক্রান্ত গাছে এই টক্সিন পাওয়া গেলেও উইন্ট রোগ সৃষ্টিতে ফিউজেরিক অ্যাসিডের গুরুত্ব কখনও স্বীকৃত হয় নি। তরমুজের উইন্ট রোগ উৎপাদক ফিউজেরিয়াম *(F. oxysporum* f. sp. *niveum)* থেকে ও আক্রান্ত তরমুজ গাছ থেকে আর একটি টক্সিন পাওয়া গেছে যার নাম দেওয়া হয়েছে ফাইটোনিভিইন (phytonivein)। হিরো ও নিশিমুরা (I. Hiroe and S. Nishimura, 1956) মনে করেন যে এই টক্সিন আক্রান্ত গাছে পাতা নেতিয়ে পড়ার জন্য দায়ী।

রাইজোপাস-টক্সিন :

রাইজোপাস স্টোলনিফার *(R. stolonifer)*, রাইজোপাস এরাইজাস (*R. arrhizus*) ইত্যাদির আক্রমণে বাদামের 'হাল রট' (hull rot of almond) রোগে ফলটি প্রাথমিক পর্যায়ে আক্রান্ত হলেও পরবর্তী পর্যায়ে ফলের নীচের ছোট শাখাটি ও তার পাতাগুলি শুকিয়ে যায়। পরজীবী দ্বারা উৎপন্ন ফিউম্যারিক অ্যাসিড (fumaric acid) এই রোগের কারণ বলে প্রমাণিত হয়েছে। গাছের আক্রান্ত অংশে এই অ্যাসিড খুব অল্প পরিমাণে পাওয়া গেছে। আক্রান্ত বাদামে ছত্রাক যে ফিউম্যারিক অ্যাসিড উৎপাদন করে তার কিছুটা সংলগ্ন শাখায় ও পাতায় ছড়িয়ে পড়ে সেগুলিকে দ্রুত মেরে ফেলে বলে ধারণা।

সিউডোমোনাস ট্যাবাসি টক্সিন :

তামাকের 'ওয়াইল্ড ফায়ার' (wild fire) রোগে সিউডোমোনাস ট্যাবাসির *(P. tabaci)* আক্রমণে পাতায় গোলাকৃত পচা দাগের (necrotic spot) চারিধারে বৃত্তাকারে হলুদ আভা (yellow halo) দেখা যায়। শুধুমাত্র কেন্দ্রের পচা অংশটিতে ব্যাকটিরিয়া পাওয়া যায়। এই ব্যাকটিরিয়া কৃত্রিম মাধ্যমে একটি টক্সিন উৎপাদন করে যা তামাক পাতায় প্রয়োগ করলে সেখানেও বৈশিষ্ট্যসূচক হলুদ আভা ফুটে ওঠে। এই কারণে গাছে পাওয়া না গেলেও

এটিকে ভিভোটক্সিন বলেই গণ্য করা যায়। তবে তামাক ছাড়া অন্যান্য অনেক প্রজাতির গাছেও এই টক্সিন প্রয়োগ করলে একই রকম প্রতিক্রিয়া হতে দেখা গেছে। সিউডোমোনাস ট্যাবাসির যে সব জাতি টক্সিন উৎপাদন করে না তারা তামাক গাছে হলুদ আভার সৃষ্টি করতে পারে না। এই টক্সিনের নাম দেওয়া হয়েছে ট্যাবটক্সিন (tabtoxin)। এটি আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে দুটি অ্যামাইনো অ্যাসিড যথা ট্যাবটক্সিনিন (tabtoxinine) ও থ্রিওনিন (theronine) পাওয়া যায়। এই টক্সিনের ক্রিয়াপদ্ধতি সম্বন্ধে প্রথমদিকে ধারণা ছিল যে গঠনগত সাদৃশ্যের জন্য এটি অতি প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড মিথায়োনিন (methionine) এর বিরুদ্ধকামী (antagonist) হিসাবে কাজ করে যায় ফলে গাছের দেহে মিথায়োনিনের অভাবজনিত ক্ষতির চিহ্ন দেখা যায়, প্রোটিন সংশ্লেষ ব্যাহত হয় ও আক্রান্ত অংশের চারিধারে হলুদ আভা ফুটে ওঠে। এককোষী অ্যালগা (alga) ক্লোরেলা *(Chlorella vulgaris)* তে এই টক্সিন বা মিথায়োনিন বিরোধী যৌগ মিথায়োনিন সালফক্সিম (methionine sulfoxime) প্রয়োগ করলে তার অগ্রগতি ব্যাহত হয় ও শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় নানাবিধ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় যা একই সঙ্গে মিথায়োনিন প্রয়োগ করলে আর হয় না। কিন্তু আক্রান্ত গাছে মিথায়োনিন প্রয়োগ করলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে না। পরবর্তীকালে সিণ্ডেন ও ডারবিন (S. L. Sinden and R Durbin, 1968) এই সিদ্ধান্তে আসেন যে ট্যাবটক্সিন প্রোটিন সংশ্লেষের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এনজাইম গ্লুটামিন সিনথেটেজকে (glutamine synthetase) নিষ্ক্রিয় করে দেয় যার ফলে গ্লুটামিন তৈয়ী হবার পথে বাধার সৃষ্টি হয় প্রোটিন সংশ্লেষ ব্যাহত হয়। তাঁরা আরও দেখান যে এই টক্সিনের সঙ্গে গ্লুটামিন প্রয়োগ করলে পাতায় রোগলক্ষণ সৃষ্টি হয় না। তাঁরাই আবার দেখিয়েছেন যে পরিশুদ্ধ অবস্থায় ট্যাবটক্সিন গ্লুটামিন সিনথেটেজকে নিষ্ক্রিয় করতে পারে না। পরে সিউডোমোনাস ট্যাবাসি উৎপাদিত আর একটি টক্সিনের সন্ধান পাওয়া যায় যা ট্যাবটক্সিনের সমগোত্রীয় এবং একইভাবে কাজ করে ও একই রোগলক্ষণের সৃষ্টি করে। এই টক্সিনে যেহেতু থ্রিওনিনের জায়গায় সেরিন (serine) থাকে সেজন্য একে 2-serine tabtoxin বলে। পরবর্তীকালে জানা গেছে যে সিউডোমোনাস ট্যাবাসি ছাড়াও সিউডোমোনাস করোনোফ্যাসিয়েন্স *(P. coronofaciens)* যা ওটের রোগ উৎপাদক সিউডোমোনাস গার্সি *(P. garcae)* যা টিমথি (timothy) গাছকে আক্রমণ করে তারাও এই দুটি টক্সিন উৎপাদনে সক্ষম।

সিউডোমোনাস ফ্যাসিওলিকোলা টক্সিন :

বীন গাছের হ্যালো ব্লাইট রোগ-সৃষ্টিকারী সিউডোমোনাস ফ্যাসিওলিকোলা যে টক্সিন উৎপাদন করে সেটি পাতায় এই রোগের বৈশিষ্ট্যমূলক হলুদ আভার সৃষ্টি করে। যেসব জাতির রোগ সৃষ্টির ক্ষমতা বেশী তারা দেখা গেছে বেশী পরিমাণে টক্সিন উৎপাদন করে। এই টক্সিনটির নাম দেওয়া হয় ফ্যাসিওটক্সিন (phaseotoxin)। এই টক্সিন কিভাবে কাজ করে সে সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে কিছু জানা নেই। দেখা গেছে এই টক্সিন অর্নিথিন কার্বামিয়ল ট্রান্সফারেজ (ornithin carbamoyl transferase) এনজাইমের কাজে বাধা দেয় যার ফলে এটি প্রয়োগ করলে পাতায় অর্নিথিনের পরিমাণ প্রায় ১০০ গুণ বেড়ে যায়। সন্দেহ করা হয় যে ফ্যাসিওটক্সিনের ক্রিয়ায় গাছে দুটি অ্যামাইনো এসিড – যথা আর্জিনিন (arginine) বা সাইট্রুলিন (citrulline) এর ঘাটতির সৃষ্টি হয় যার ফলে শুধুমাত্র যে প্রোটিন সংশ্লেষ ব্যাহত হয় তাই নয়, ক্লোরোফিল সংশ্লেষে অংশগ্রহণকারী এনজাইমের উৎপাদনও বিঘ্নিত হয়।

হেলমিনথোস্পোরিয়াম ওরাইজি টক্সিন :

ধানের বাদামী দাগ রোগ উৎপাদক ছত্রাক হেলমিনথোস্পোরিয়াম ওরাইজি *(H. oryzae)* কৃত্রিম মাধ্যমে চাষ করে ওকু (H. Oku, 1964) একটি টক্সিনের সন্ধান পান যার নাম দেন ওফিওবোলিন (ophiobolin)। এটিকে কক্লিওবোলিন (cochliobolin) ও বলা হয়। এই রোগে পাতার বাদামী দাগের চারিধারে যে হলুদ আভা দেখা যায় পাতায় টক্সিন প্রয়োগ করলে সেরকমই হয়। তাছাড়া রোগাক্রান্ত অঞ্চলে যেমন বেশী মাত্রায় পলিফেনল জমে, পাতায় টক্সিন প্রয়োগ করলেও সেরকম দেখা যায়। এই টক্সিন রোগাক্রান্ত অংশ থেকে পাওয়া গেছে।

পিরিকুলারিয়া ওরাইজি টক্সিন :

ধানের ঝলসা রোগ উৎপাদক ছত্রাক পিরিকুলারিয়া ওরাইজি *(Pyricularia oryzae)* একাধিক টক্সিন উৎপাদন করে বলে জানা গেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পিরিকুলারিন (piricularin)। ছোট চারায় বা পাতায় যে গাঢ় বাদামী রঙের পোড়া দাগের সৃষ্টি হয় টক্সিন তার জন্ম কিছুটা দায়ী বলে মনে করা হয়। পিরিকুলারিন রোগ প্রতিরোধী জাতির তুলনায় রোগ সংবেদনশীল জাতির গাছের উপর বেশী সক্রিয় সেজন্য একে অনেকে semi host-specific toxinও বলেন।

এ পর্যন্ত যে সব টক্সিন নিয়ে আলোচনা করা হল তাদের কোনটিই প্রাথমিক-ভাবে রোগসৃষ্টি জন্য দায়ী নয়। তবে এমন কিছু টক্সিনও পাওয়া গেছে যেগুলি গাছের রোগ সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এদের রোগসৃষ্টির প্রাথমিক নিয়ামক (primary determinant of disease) বলে ধরা হয়। এখন এই ধরণের কিছু টক্সিন নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

হেলমিনথোস্পোরিয়াম ভিক্টোরিয়ী টক্সিন: ওটের ভিক্টোরিয়া ব্লাইট রোগ উৎপাদক ছত্রাক হেলমিনথোস্পোরিয়াম ভিক্টোরিয়ী কৃত্রিম মাধ্যমে যে টক্সিন উৎপাদন করে সেটি গাছে প্রয়োগ করলে সেখানে এই রোগের লক্ষণ পুরোপুরি ফুটে ওঠে। এই টক্সিন শুধুমাত্র ওট গাছের উপর এবং কেবলমাত্র ওটের রোগ সংবেদনশীল ভিক্টোরিয়া ও সঙ্করায়ণের মাধ্যমে তার থেকে উদ্ভূত অন্যান্য সংবেদনশীল জাতির উপরই সক্রিয়, ওটের রোগ প্রতিরোধী জাতির উপর এর কোন ক্ষতিকর প্রভাব নেই (F. Meehan and H.C. Murphy, 1947)। তাছাড়া টক্সিন উৎপাদন ক্ষমতার সঙ্গে এই ছত্রাকের রোগ সৃষ্টির ক্ষমতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই টক্সিনের নাম দেওয়া হয় **ভিক্টোরিন** (victorin)। এটি একটি প্যাথোটক্সিন যা রোগ উৎপাদন ক্ষমতার প্রাথমিক নিয়ামক।

হেলমিনথোস্পোরিয়াম ভিক্টোরিয়ী কৃত্রিম মাধ্যমে চাষ করে পাওয়া কালচার ফিলট্রেট ১২,০০,০০০ গুন পাতলা করে প্রয়োগ করলেও রোগ সংবেদনশীল জাতির গাছের শিকড়ের বৃদ্ধি শতকরা ৫০ ভাগ কমে। রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছে খুব ঘন দ্রবণ প্রয়োগ না করলে কোন ক্ষতি হতে দেখা যায় না। এই ছত্রাক বীজে ও জমিতে থাকে। ওট গাছের শিকড় ও কাণ্ডের গোড়ার অংশ আক্রান্ত হয়। ছত্রাক উপরের দিকে বেশী ছড়ায় না। কিন্তু উৎপন্ন টক্সিন জাইলেমে উর্দ্ধমুখী প্রবাহের ফলে পাতায় পৌঁছে যায় ও সেখানে রোগের লক্ষণগুলি ফুটে ওঠে। পাতা হলদে হয়ে যায় ও সেখানে লম্বা লম্বা দাগ দেখা দেয়, শেষ পর্যন্ত পাতা শুকিয়ে যায়। রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছে ছত্রাক সক্রিয় প্রতিরোধের জন্য বিশেষ ছড়াতে পারে না। দেখা গেছে শুধু রোগ-লক্ষণ সৃষ্টিতেই নয় আক্রমণের প্রাথমিক পর্বেও টক্সিনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। রোগ উৎপাদন ক্ষমতাবিহীন জাতির ছত্রাক ওট গাছের দেহের ভিতরে প্রবেশ করলেও সেখানে ছড়াতে পারে না কিন্তু বাইরে থেকে ভিক্টোরিন সরবরাহ করলে তখন দেহের মধ্যে ছড়াতে সক্ষম হয়।

ভিক্টোরিনের দুটি উপাদান—একটি **পেন্টাপেপটাইড** (pentapeptide) ও অন্যটি ট্রাইসাইক্লিক সেকেণ্ডারী অ্যামাইন (tricyclic secondary

amine) **ভিক্‌টক্সিনিন** (victoxinine)। ঐ পেন্টাপেপটাইড থেকে অ্যাসপারটিক অ্যসিড (aspartic acid), গ্লুটামিক অ্যাসিড (glutamic acid), গ্লাইসিন (glycine), ভ্যালিন (valine) ও লিউসিন (leucine) পাওয়া যায়। ভিক্টোরিনের বিষাক্ত প্রকৃতি নির্ভর করে ভিক্‌টক্সিনিনের উপর যদিও প্রথমটি দ্বিতীয়টির তুলনায় ৭৫০০ গুণ বিষাক্ত। টক্সিনের শুধুমাত্র রোগ সংবেদনশীল গাছের ক্ষতি করার ক্ষমতা অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্যমূলক সক্রিয়তা (specificity of action) নির্ভর করে পলিপেপটাইডের উপর।

শেফার (R. P. Scheffer) ও তাঁর সহকর্মীদের মতে ভিক্টোরিনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া সাধারণতঃ কোষের প্লাজমা আবরণীর উপর ঘটতে দেখা যায়। টক্সিনের ক্রিয়ার ফলে খুব শীঘ্রই তড়িৎবিশ্লেষ্য কিছু পদার্থ (electrolytes) কোষ থেকে বেরিয়ে আসে। কোষের প্লাজমোলিসিসের ক্ষমতা ও বাইরে থেকে দ্রব অবস্থায় বিভিন্ন যৌগ ভিতরে নেবার ক্ষমতাও দ্রুত কমে যায়। দেওয়াল থেকে বিযুক্ত অবস্থায় থাকলে প্লাজমা আবরণীটি ফেটে যায় ও প্রোটোপ্লাষ্ট নষ্ট হয়ে যায়। কোষের ব্যবহার বা ক্ষমতায় এই ধরণের পরিবর্তন একমাত্র প্লাজমা আবরণীর ক্ষতি হলেই সম্ভব। টক্সিন প্রয়োগের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই কোষের দেওয়াল, প্লাজমা আবরণী ও এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে (endoplasmic reticulum) পরিবর্তনের চিহ্ন দেখা যায়। প্লাস্টিডের ক্ষতি হলেও মাইটোকনড্রিয়া অক্ষত থাকে। টক্সিনের আগে ইউর‍্যানিল (uranyl) প্রয়োগ করলে আবরণীর অনেক কম ক্ষতি হয়। তাছাড়া প্রোটিন সংশ্লেষে বাধাদানকারী যৌগ সাইক্লোহেক্সিমাইড (cyclohexi-mide) প্রয়োগ করে দেখা গেছে যে ওট গাছের টক্সিন সংবেদনশীলতা ধীরে ধীরে কমে আসে। এই সব তথ্যের উপর নির্ভর করে শেফার ও তাঁর সহকর্মীরা সিদ্ধান্তে আসেন যে রোগ সংবেদনশীল জাতির ওট গাছের প্লাজমা আবরণীতে কিছু টক্সিন-গ্রাহী স্থান (toxin receptive site) আছে যার মূল উপাদান হল প্রোটিন এবং তার ফলেই আবরণীটি টক্সিনের প্রতি সংবেদনশীল হয় ও টক্সিনের ক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে ভিক্টোরিনের প্রসঙ্গে এই মতবাদের স্বপক্ষে স্পষ্ট কোন প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। প্লাজমা আবরণীর উপর প্রত্যক্ষ ক্রিয়া ছাড়াও এই টক্সিন গাছের শ্বসন ক্রিয়ার হার বাড়িয়ে দেয় ও প্রোটিন সংশ্লেষ ব্যাহত করে।

ভিক্টোরিন ছাড়া বিভিন্ন রোগের সৃষ্টির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আরও কিছু টক্সিন আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের মধ্যে যেগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাদের একটি তালিকা এখানে দেওয়া হল (সারণী—১) এবং গঠন ও ক্রিয়াগত কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনাও করা হচ্ছে।

সারণী—১

কিছু উল্লেখযোগ্য প্যাথোটক্সিন সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক তথ্য

পোষক গাছ	রোগ উৎপাদক ছত্রাক	টক্সিন	প্রথম উল্লেখ
জোয়ার *(Sorghum vulgare)*	পেরিকোনিয়া সার্সিনাটা *(Periconia circinata)*	পি সি টক্সিন (PC *Toxin)*	R. P. Scheffer & R. B. Pringle, 1961
ভুট্টা *(Zea mays)*	১) হেলমিনথোস্পোরিয়াম কার্বনাম *(H. carbonum)*	এইচ সি টক্সিন (HC Toxin)	R. P. Scheffer & A. J. Ullstrup, 1965
	২) হেলমিনথোস্পোরিয়াম মেইডিস *(H. maydis,* race T)	এইচ এম-টি টক্সিন (HM-T Toxin)	A. L. Hooker, 1971
আখ *(Saccharum* sp.)	হেলমিনথোস্পোরিয়াম স্যাকারি *(H. sacchari)*	হেলমিনথোস্পোরোসাইড (Helminthosporoside)	G. W. Steiner & R.S. Byther, 1971
জাপানী ন্যাসপাতি *(Pyrus serotina)*	অলটারনেরিয়া কিকুচিয়ানা *(A. kikuchiana)*	ফাইটো অলটারনেরিন (Phytoalternarin)	M. Okhawa & H. Torikata, 1967

উপরে যে সব টক্সিনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তারা সকলেই ভিক্টোরিনের মত রোগ উৎপাদন ক্ষমতার প্রাথমিক নিয়ামক। এগুলি ছাড়া ভুট্টার ফাইলোস্টিকটা মেইডিস *(Phyllosticta maydis)* ও আপেলে অলটারনেরিয়া মালি *(A. mali)* উৎপাদিত টক্সিন একইভাবে কাজ করে বলে জানা যায়। সব কটি ক্ষেত্রেই ছত্রাকের টক্সিন উৎপাদন ও রোগ উৎপাদন ক্ষমতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হেলমিনথোস্পোরোসাইড় ছাড়া বাকী সবকটিই পেপটাইড। এটি একটি গ্যালাকটোপাইর‍্যানোসাইড (D—galactopyranoside) জাতীয় যৌগ।

পেরিকোনয়া সার্সিনাটা টক্সিনঃ পি সি টক্সিন মাইলো রোগ (milo disease) সংবেদনশীল জোয়ারের সাবগ্ল্যাব্রেসেন্স (subglabrescens) জাতি ও তার থেকে সঙ্করায়ণের মাধ্যমে উদ্ভূত অন্যান্য জাতির উপর সক্রিয়। এই ছত্রাক জমিতে থাকে ও জোয়ার গাছের শিকড় আক্রমণ করে কিন্তু রোগের লক্ষণ দেখা যায় পাতায়। পি সি টক্সিন একটি অল্প আণবিক ভরবিশিষ্ট পলিপেপটাইড যা আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে অ্যাসপারটিক অ্যাসিড, গ্লুটামিক অ্যাসিড, অ্যালানিন (alanine) ও সেরিন এই চারটি অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া যায়। এই টক্সিনের গঠন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তথ্য এখনও জানা যায়নি, তবে সংশ্লিষ্ট গবেষকদের ধারণা তিন-চারটি প্রায় এক ধরণের টক্সিন রয়েছে যাদের সংবেদনশীল বিভিন্ন জাতির জোয়ার গাছের উপর ক্রিয়ায় কিছুটা পার্থক্য থাকতে পারে। কোষের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার উপর এর প্রভাব ভিক্টোরিনের অনুরূপ এবং আক্রমণের প্রাথমিক পর্বেও এর একই ভূমিকা রয়েছে।

হেলমিনথোস্পোরিয়াম কার্বনাম টক্সিনঃ প্রিঙ্গলের (R. B. Pringle) মতে **এইচ সি টক্সিন** একটি সাইক্লিক পেপটাইড (cyclic peptide) যার থেকে প্রোলিন (proline),অ্যালানিন আর দুটি সুস্থিত নয় এমন অ্যামাইনো অ্যাসিড ২ : ১ : ১ : ১ অনুপাতে পাওয়া যায়। এই টক্সিন কার্যকলাপের দিক থেকে প্রায় ভিক্টোরিনের মত হলেও কিছু উল্লেখযোগ্য তফাৎও রয়েছে। এইচ সি টক্সিন প্রয়োগের ফলে কোষ থেকে তড়িৎবিশ্লেষ্য পদার্থ খুব ধীরে ধীরে বেরোতে থাকে আর শ্বসনের হারও ঐভাবে বাড়ে। এর প্রোটিন সংশ্লেষের উপর কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই। ইয়োডার ও শেফার (O. C. Yoder and R. P. Scheffer, 1975) এর মতে এই টক্সিন প্লাজমা আবরণীর ক্ষতি করে না তবে বিশেষ বিশেষ দ্রাব (solute) পদার্থের প্রসঙ্গে ঐ আবরণীর ভেদ্যতায় পরিবর্তন আনে।

হেলমিনথোস্পোরিয়াম স্যাকারি টক্সিন : হেলমিনথোস্পোরিয়াম স্যাকারির আক্রমণে আখ গাছে যে 'আই স্পট' (eye spot) রোগের সৃষ্টি হয় সেখানে পাতায় চোখের আকৃতির দাগ থেকে পাতার মাথার দিকে ছিটের মতন দাগ বেরোতে দেখা যায় যেখানে কোন ছত্রাক থাকে না। এর থেকেই সন্দেহ হয় যে কোন টক্সিন ঐ ছিটের মতন দাগ সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত। এটি একটি ডি—গ্যালাকটোপাইর্যানোসাইড (D—galactopyranoside) যার নাম দেওয়া হয়েছে **হেলমিনথোস্পোরোসাইড**। এই টক্সিন প্রয়োগে কেবল রোগ সংবেদনশীল জাতির পাতাতেই ছিটের মত দাগ সৃষ্টি হয় রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছে হয় না। রোগাক্রান্ত গাছে এবং বাইরে থেকে টক্সিন প্রয়োগ করলে কোষের স্তরে একই ধরণের পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। আক্রান্ত গাছেও এই টক্সিন পাওয়া গেছে। স্ট্রোবেল (G. Strobel, 1973) রোগ সংবেদনশীল জাতির গাছের প্লাজমা আবরণীতে টক্সিন গ্রাহী স্থানের (toxin receptor site or binding sitex) অস্তিত্ব দেখতে পান যেখানে হেলমিনথোস্পোরাইড যুক্ত হয়ে ঐ আবরণীর ক্ষতি করে। প্লাজমা আবরণীর খণ্ড অংশে তিনি টক্সিনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে এরকম একটি প্রোটিন পান যার আণবিক ভর ৪৫,০০০ থেকে ৪৯,০০০ এর মধ্যে এবং যাতে চারটি অংশ (sub unit) ও টক্সিন এসে যুক্ত হতে পারে এরকম দুটি স্থান আছে। রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছের আবরণীতে প্রায় অনুরূপ আণবিক ভরও অন্যান্য গুণবিশিষ্ট প্রোটিন রয়েছে কিন্তু তার টক্সিনকে আবদ্ধ করার ক্ষমতা নেই। দেখা যায় আখের যে সব জাতির গাছের রোগ-সংবেদনশীলতা মাঝারি তাদের আবরণীর টক্সিন আবদ্ধ করার ক্ষমতাও মাঝারি। যদি আখের রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছ থেকে সংগৃহীত প্রোটো-প্লাস্টকে ঐ প্রোটিন ও হেলমিনথোস্পোরোসাইডের সঙ্গে একত্রে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রাখা হয় অর্থাৎ 'ইনকিউবেট' (incubate) করা হয়, তাহলে প্রোটাপ্লাস্ট নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু শুধু টক্সিনের সঙ্গে রাখলে কোন ক্ষতি হয় না। এই সব তথ্য থেকে মনে হয় যে আখের বিভিন্ন জাতির রোগ সংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে প্লাজমা আবরণীর টক্সিন গ্রাহী প্রোটিনের একটি মুখ্য ভূমিকা রয়েছে।

হেলমিনথোস্পোরিয়াম মেইডিস টক্সিন : ভুট্টার সাদার্ন লীফ ব্লাইট (southern leaf blight) উৎপাদক হেলমিনথোস্পোরিয়াম মেইডিস-এর টি জাতি (T race) একটি প্যাথোটক্সিন উৎপাদন করে যা আক্রান্ত গাছের মধ্যেও পাওয়া গেছে। একে বলা হয় এইচ এম-টি টক্সিন (HM-T-toxin)। তবে বিভিন্ন তথ্য থেকে মনে হয় যে এই ছত্রাকের রোগ উৎপাদন ক্ষমতা শুধুমাত্র

এই টক্সিনের উপর নির্ভর করে না, অন্য কোন নিয়ামকও আছে। ভুট্টার ইয়েলো লীফ ব্লাইট উৎপাদক ছত্রাক ফাইলোস্টিক্টা মেইডিসও প্রায় সর্বতোভাবে অনুরূপ একটি টক্সিন উৎপাদন করে। এই দুটি টক্সিনই সংবেদনশীল জাতির গাছের মাইটোকনড্রিয়ার ক্ষতি করে কিন্তু প্রতিরোধী জাতির গাছের মাইটো-কনড্রিয়ার উপর এদের কোন প্রভাব নেই।

অলটারনেরিয়া কিকুচিয়ানা টক্সিন: অলটারনেরিয়া কিকুচিয়ানা দ্বারা উৎপন্ন টক্সিন, **ফাইটোঅলটারনেরিন** (Phytoalternarin), আক্রান্ত জাপানী ন্যাসপাতি গাছ থেকেও পাওয়া গেছে। গাছের উপর এই টক্সিনের ক্রিয়া সর্বাংশে ওটের উপর ভিক্টোরিনের ক্রিয়ার অনুরূপ। এর রাসায়নিক গঠন সম্বন্ধে এখনও স্পষ্টভাবে কিছু জানা যায় নি। তবে সন্দেহ করা হয় যে পোষক গাছের বিভিন্ন জাতির উপর বিষক্রিয়ায় সামান্য পার্থক্য রয়েছে এমন তিনটি টক্সিন আছে।

প্যাথোটক্সিনের ক্রিয়াগত বৈশিষ্ট্যের কারণ: প্যাথোটক্সিন কেন শুধুমাত্র রোগ সংবেদনশীল জাতির গাছের উপর সক্রিয় বা কেন রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছের কোন ক্ষতি করে না তা এখনও স্পষ্ট নয়। টক্সিন সংক্রান্ত গবেষণার প্রথম দিকে মনে করা হত যে রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছের কোষগুলি প্যাথোটক্সিনকে কোন না কোনভাবে নিষ্ক্রিয় করে ফেলার ক্ষমতা রাখে। এর স্বপক্ষে অবশ্য স্পষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সমাদ্দার ও শেফার (K. R. Samaddar and R. P. Scheffer, 1970) মনে করেন রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছের টক্সিনের প্রতি সংবেদনশীল না হওয়াটা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ব্যাপার, কারণ টক্সিন প্রয়োগের অব্যবহিত পরেই এই প্রতিরোধ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়; সক্রিয় প্রতিরোধ হলে তার আভাস পেতে সময় লাগত। হেলমিনথোস্পোরিয়াম স্যাকারি দ্বারা উৎপন্ন টক্সিন হেলমিনথোস্পোরো-সাইডের ক্ষেত্রে স্ট্রোবেল (১৯৭৩) দেখিয়েছেন যে সংবেদনশীল জাতির আখ গাছের প্লাজমা আবরণীতে কতকগুলি বিশেষ জায়গা বা টক্সিন গ্রাহী স্থান রয়েছে যেখানে টক্সিন যুক্ত হয়ে যাবার ফলে ঐ আবরণীর কর্মক্ষমতা বিঘ্নিত হয় এমনকি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যেতেও পারে। আবরণীর এই অংশে যে বিশেষ প্রোটিন পাওয়া গেছে তার টক্সিনের সঙ্গে যুক্ত হবার ক্ষমতাও দেখানো হয়েছে। রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছে প্লাজমা আবরণীতে এই ধরণের টক্সিনগ্রাহী প্রোটিন নেই। ভিক্টোরিন, পেরিকোনিয়া টক্সিন বা এইচ এম-টি টক্সিনের ক্ষেত্রে এরকম কোন প্রত্যক্ষ প্রমান না থাকলেও অবস্থা বিচার করে মনে হয় প্রতিরোধী

জাতির গাছের ঐ সব টক্সিনের বিষাক্ত ক্রিয়া প্রতিরোধের ক্ষমতা কোষের প্লাজমা আবরণীতে টক্সিনগ্রাহী স্থান না থাকার উপরই নির্ভর করে।

রোগ সৃষ্টিতে টক্সিনের ভূমিকার জীনজনিত ব্যাখ্যা: যেহেতু প্যাথোটক্সিন রোগসৃষ্টির প্রাথমিক নিয়ামক হিসাবে স্বীকৃত, সেজন্য এর ভূমিকার জীনজনিত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে স্বাভাবিকভাবেই আগ্রহ দেখা যায়। ছত্রাকের টক্সিন উৎপাদন ক্ষমতা ও রোগসৃষ্টির ক্ষমতা যেমন একই জীনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সেইমত গাছের রোগ সংবেদনশীলতা ও টক্সিনের প্রতি সংবেদনশীলতাও একই জীনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। রোগ সংবেদনশীল ও রোগ প্রতিরোধী জাতির মধ্যে সঙ্করায়ণ করে পাওয়া বিভিন্ন জন্মুর গাছের গুণগত বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ করে জানা গেছে যে ওট, জোয়ার ও জাপানী ন্যাসপাতি গাছের ক্ষেত্রে টক্সিন ও রোগের প্রতি সংবেদনশীলতা এক জোড়া প্রকট বা মুখ্য জীন (dominant gene) এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ঐ জোড়ার প্রচ্ছন্ন জীনটি (recessive gene) টক্সিন ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার বাহক। ভুট্টায় এইচ এম-টি টক্সিনের প্রতি সংবেদনশীলতা ও প্রতিরোধ ক্ষমতাও অনুরূপভাবে এক জোড়া জীনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে সেখানে প্রকট জীন প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য দায়ী, সংবেদনশীলতা প্রচ্ছন্ন জীনের উপর নির্ভর করে।

উদ্ভিদ হরমোন: অনেক রোগগ্রস্ত গাছ ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলে সেখানে কোষের মৃত্যুর কোন প্রমাণ মেলে না বরঞ্চ আক্রান্ত গাছটিতে বা তার আক্রান্ত অংশে অসমঞ্জস বৃদ্ধিজনিত বিকৃতির চিহ্ন চোখে পড়ে। গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি উদ্ভিদ হরমোনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এদের মধ্যে রয়েছে অক্সিন (auxins), জিবারিলিন (gibberellins), সাইটোকাইনিন (cytokinins) ও ইথিলিন (ethylene)। এই সব হরমোন গাছে যে মাত্রায় থাকে তা গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল। রোগের আক্রমণ হলে গাছে এই সব হরমোনের মাত্রায় বিশেষ তারতম্য ঘটতে পারে যার ফলে তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। রোগগ্রস্ত গাছে অধিকাংশ সময় হরমোনের পরিমাণ স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশী হতে দেখা যায়। অনেক রোগ উৎপাদক ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়া নিজেও এই সব হরমোন উৎপাদনে সক্ষম। এর থেকে মনে হয় রোগসৃষ্টিতে এনজাইম ও টক্সিনের মত উদ্ভিদ হরমোনেরও কিছু ভূমিকা থাকা অসম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে আলোচনার আগে বিভিন্ন হরমোন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু সাধারণ আলোচনা করা প্রয়োজন।

উদ্ভিদ হরমোন অতি অল্প পরিমাণই সক্রিয়। গাছের দেহে এদের পরিমাণে

কিছুটা পরিবর্তন ঘটলেই তার স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে বা চেহারায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। গাছের বৃদ্ধি ও পূর্ণতা প্রাপ্তি নির্ভর করে কোষ বিভাজন (cell division), কোষের বৃদ্ধি (cell enlargement) ও কোষের পরিণত অবস্থা বা পূর্ণতা প্রাপ্তির (cell differentiation) উপর। এই সব ঘটনা বিভিন্ন হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ছাড়াও কোষের উপর হরমোনের অন্য নানা রকম ক্রিয়া আছে বলে জানা গেছে।

অনেক রোগ উৎপাদক স্বাভাবিকভাবেই উদ্ভিদ হরমোন উৎপাদন করে থাকে। কিছু রোগ উৎপাদক গাছে পাওয়া যায় না অথচ গাছের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এমন হরমোন উৎপাদন করে। রোগ উৎপাদক ছত্রাক ও ব্যাক-টিরিয়া যেমন গাছের নিজস্ব হরমোন উৎপাদন ক্ষমতাকে উদ্দীপিত বা দমন করে হরমোন উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিতে পারে তেমনি গাছে যে সব যৌগ স্বাভাবিক অবস্থায় হরমোনের বিরুদ্ধে কাজ করে তাদের উৎপাদন কমিয়ে বা বাড়িয়ে একই অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে।

অক্সিন: অক্সিন বলতে সাধারণতঃ বোঝায় ইনডোল-৩-অ্যাসেটিক অ্যাসিড (indole-3-acetic acid) বা সংক্ষেপে আই এ এ (IAA)। এটি প্রায় সব গাছেই পাওয়া যায়। কোন কোন গাছে ইণ্ডোল জাতীয় অন্যান্য যৌগ, যেমন ইণ্ডোল অ্যাসিটোনাইট্রাইল (indole aceto nitrile), ইণ্ডোল অ্যাসিটামাইড (indole acetamide), ইণ্ডোল অ্যাসিটালডিহাইড (indole acetaldehyde) ইত্যাদি অক্সিনও পাওয়া গেছে। প্রধানতঃ গাছের শীর্ষভাগে, কচি পাতায়, IAA উৎপন্ন হয় ও সেখান থেকে নীচের দিকে ছড়িয়ে পড়ে ও গাছের বিভিন্ন অঙ্গের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। কোষের আয়তন বৃদ্ধি ও পূর্ণতা প্রাপ্তি IAA দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বিভাজনের ফলে উৎপন্ন নূতন কোষের দ্রুত বৃদ্ধি সম্ভব হয় যদি কোষের দেওয়াল বিশেষ করে মধ্যচ্ছদা নমনীয় অবস্থায় থাকে। দেওয়ালের পেকটিক যৌগে মেথিলেশনের মাত্রা বেশী হলে নমনীয়তা বাড়ে। এরকম ধারণাও আছে যে IAA PME এনজাইমের সঙ্গে মিশে জটিল যৌগ (complex compound) গঠন করে তাকে নিষ্ক্রিয় করে দেয় ফলে পেকটিক যৌগ থেকে মেথিল মূলকের অপসারণ (demethylation) সম্ভব হয় না, দেওয়াল নমনীয় অবস্থায় থাকে এবং তার দ্রুত প্রসারণ সম্ভব হয়। তাছাড়া IAA এর প্রভাবে পেকটিক যৌগে দ্রুত মেথিলেশন হয় এরকম কিছু প্রমাণও পাওয়া গেছে। কোষের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও IAA শ্বসনক্রিয়া, ফেনলের বিপাক সংক্রান্ত ক্রিয়া, প্লাজমা আবরণীর ভেদ্যতা ইত্যাদির উপর প্রভাব বিস্তার করে

বলে জানা গেছে। এরকম ধারণাও গড়ে উঠেছে যে অক্সিন (IAA) এর সর্বপ্রধান কাজ হল নিউক্লিয়িক অ্যাসিড ও প্রোটিন সংশ্লেষের উপর নিউক্লিয়াসের যে নিয়ন্ত্রণ আছে তাকে প্রভাবিত করে নিউক্লিয়িক অ্যাসিড (RNA), বিভিন্ন ধরণের এনজাইম ও প্রোটিনের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা। অক্সিন নিয়ন্ত্রিত প্রোটিন সংশ্লেষের সঙ্গে অক্সিন নিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধির একটা সম্পর্ক দেখা গেছে। গাছে IAA নিয়মিতভাবে উৎপন্ন হলেও এই হরমোন কদাচিৎ প্রয়োজনের তুলনায় বেশী মাত্রায় জমে। গাছে এক ধরনের পেরোক্সিডেজ (Peroxidase) জাতীয় এনজাইম, আই এ এ অক্সিডেজ (IAA oxidase), আছে যা IAA কে জারিত করে তার হরমোনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে নষ্ট করে ফেলতে পারে। এই ক্রিয়ার ফলেই গাছে স্বাভাবিক অবস্থায় অক্সিনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে।

জিবারিলিন: মোটামুটি এক রকম রাসায়নিক গঠন বিশিষ্ট আটত্রিশটি জিবারিলিন শ্রেণীর হরমোন এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। ধানের 'বাকানী' (Bakanae) রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাক জিবারেলা ফুজিকুরোই (*Gibberella fujikuroi*) এর কালচার ফিলট্রেটে প্রথম এই হরমোনের সন্ধান পাওয়া যায় (Brian et al, 1954)। পরবর্তীকালে জানা গেছে যে এই ছত্রাক আঠারোটি এই ধরণের হরমোন উৎপাদন করে থাকে। মনে করা হয় যে অধিকাংশ গাছেই জিবারিলিন উৎপন্ন হয়। কিছু ছত্রাক ও অ্যালগাও জিবারিলিন উৎপাদন করে বলে জানা গেছে। গাছের কোথায় জিবারিলিন উৎপন্ন হয় সঠিকভাবে জানা নেই তবে বিভিন্ন তথ্যাদি থেকে মনে হয় যে IAA এর মত এই হরমোনও গাছের শীর্ষভাগে ও কচি পাতায় উৎপন্ন হয়। জিবারিলিন IAA এর বৃদ্ধি সংক্রান্ত ক্রিয়ায় তাকে সাহায্য করে এরকম প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাছাড়া এই হরমোন পর্বমধ্য (internode) অঞ্চলের স্বাভাবিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে ও অঙ্কুরোদ্গমের সময় বীজে আলফা অ্যামাইলেজ (α-amylase) এর সংশ্লেষ ত্বরান্বিত করে। জিবারিলিন DNA নিয়ন্ত্রিত RNA সংশ্লেষকে প্রভাবিত করে বিভিন্ন ধরণের এনজাইমের উৎপাদন ও ক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে এরকম কিছু তথ্যও জানা গেছে।

সাইটোকাইনিন: তৃতীয় ধরণের হরমোন হল সাইটোকাইনিন শ্রেণীর যৌগ যা মাইটোসিস ঘটিয়ে কোষ বিভাজন সম্ভব করে তোলে ও কোষের পূর্ণতা প্রাপ্তি (cell differentiation)-তে সহায়তা করে। তাছাড়া এই হরমোন যেখানে জমে, পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে অ্যামাইনো অ্যাসিড, শর্করা ও অন্য খাদ্য-বস্তুর পরিবহনের গতিপ্রবাহ সেইদিকে ঘুরিয়ে দেয়।

গাছ থেকে পাওয়া প্রথম সাইটোকাইনিনের নাম জিয়াটিন (Zeatin)। এটি ভুট্টা গাছ থেকে পাওয়া গেছে। পরবর্তীকালে বেশ কিছু এই ধরণের যৌগের সন্ধান পাওয়া গেছে। কিছু ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়াও এই জাতীয় হরমোন উৎপাদন করে। গাছে প্রধানতঃ শিকড়ে সাইটোকাইনিন উৎপন্ন হয়। এই রকম যে হরমোন নিয়ে প্রচুর কাজ হয়েছে সেটি হল কৃত্রিম উপায়ে সংশ্লেষিত কাইনেটিন (Kinetin)। এটি এখনও কোন গাছ থেকে পাওয়া যায়নি।

ইথিলিন ঃ উদ্ভিদ হরমোন হিসাবে ইথিলিনই সর্বপ্রথম জানা যায়। এটি খুব অল্প মাত্রাতেই সক্রিয়। উদ্বায়ী প্রকৃতির জন্য ইথিলিন গাছের দেহে বিশেষ জমে না, পাতা দিয়ে বেরিয়ে যায়। গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি (gas chromatography) পদ্ধতি চালু হবার ফলে ইদানীং বহু গাছে ইথিলিনের সন্ধান পাওয়া সম্ভবপর হয়েছে। ইথিলিনের প্রভাবে DNA সংশ্লেষ ও কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়, পাতার ডাঁটা নীচের দিকে বেঁকে যায় (petiolar epinasty), এনজাইম বিশেষ করে পেরোক্সিডেজ সংশ্লেষ উদ্দীপিত হয় ও ফল পেকে যায়।

রোগসৃষ্টিতে হরমোনের ভূমিকা ঃ

অনেক রোগেই সুস্থ গাছের তুলনায় আক্রান্ত গাছে বেশী পরিমাণে অক্সিন জমতে দেখা যায়। এই অবস্থাকে 'হাইপারঅক্সিনি' (hyperauxiny) বলা হয়। এদের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আক্রান্ত গাছের বৃদ্ধিতে বা গঠনে বিকৃতির চিহ্ন দেখা যায়। এইসব রোগে IAA বেশী পরিমাণে জমে থাকার সঙ্গে রোগ লক্ষণের একটা সম্পর্ক আছে স্বাভাবিকভাবেই এরকম মনে হতে পারে। সব রোগে অবশ্য IAA জমলেই গাছে বিকৃতির চিহ্ন ফুটে ওঠে না। তখন মনে হয় IAA বৃদ্ধি সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার না করে অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে রোগসৃষ্টিতে সহায়তা করে।

জাফরান (*Carthamus tinctorius*) গাছের বীজপত্রের ঠিক নীচের অংশ বা 'হাইপোকটিল' (hypocotyl) পাকসিনিয়া কার্থামি (P. carthami) দ্বারা আক্রান্ত হলে ৮-১০ দিনের মধ্যে ভীষণভাবে লম্বা হয়ে যায়। আক্রান্ত অংশে স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় ৪ গুণ IAA জমে যার ফলে ঐ রকম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটা সম্ভব। ইউরোমাইসেস পিসি (*U. pisi*) দ্বারা আক্রান্ত ইউফরবিয়া (*Euphorbia cyparissias*) গাছেও অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হতে দেখা যায়। রোগগ্রস্ত গাছে IAA স্বাভাবিকের তুলনায় ৫-৬ গুণ জমে। মনে করা হয় এটাই অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কারণ।

অনেক রোগজীবাণুর আক্রমণের ফলে পোষক গাছে ছোট-বড় নানারকম

অর্বুদ বা 'গল' (gall) এর সৃষ্টি হয়। উদাহরণ—ভুট্টাতে উষ্টিলাগো মেইডিস, সরিষাতে অ্যালবিউগো ক্যানডাইডা (*Albugo candida*), বাঁধাকপিতে প্লাজমোডিওফোরা ব্র্যাসিকি, ধনেতে প্রোটোমাইসেস ম্যাক্রোস্পোরাস (*Protomyces macrosporus*), আলুতে সিনকাইট্রিয়াম এণ্ডোবায়োটিকাম (*Synchytrium endobioticam*), জলপাইতে সিউডোমোনাস স্যাভাস্টনই (*P. Savastonoi*) ও বিভিন্ন ধরণের সবজীতে মেলয়ডোগাইনের বিভিন্ন প্রজাতির (*Meloidogyne spp.*) আক্রমণের ফলে সৃষ্ট অর্বুদ। এদের মধ্যে প্রোটোমাইসেস ও প্লাজমোডিওফোরা ছাড়া সব কটি রোগজীবাণুই কৃত্রিম মাধ্যমে IAA উৎপাদনে সক্ষম। তাছাড়া প্রতিটি ক্ষেত্রেই আক্রান্ত অংশে বা অর্বুদে হাইপারঅক্সিনি লক্ষ্য করা গেছে।

বিভিন্ন গাছের ঢলে পড়া বা 'উইল্ট' রোগ উৎপাদক ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়া; যথা ফিউজেরিয়াম অক্সিস্পোরাম, ভার্টিসিলিয়াম অ্যালবো-এট্রাম, সেরাটোসিস্টিস ফ্যাগেসীয়ারাম (*Ceratocystis fagacearum*), সিউডোমোনাস সোল্যানেসীয়ারাম ইত্যাদি প্রায় সকলেই কৃত্রিম মাধ্যমে IAA উৎপাদন করে। উইল্ট রোগের প্রধান লক্ষণ পাতা নেতিয়ে পড়া বা ঢলে পড়া হলেও আক্রান্ত গাছে আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ দেখা যায়; যেমন—পাতায় 'এপিন্যাস্টি' (epinasty) ও কাণ্ডের গোড়ায় আস্থানিক মূলের সূচনা (initiation of adventitious roots), জাইলেম প্যারেনকাইমা কোষের অস্বাভাবিক সংখ্যাবৃদ্ধি (proliferation of xylem parenchyma) ইত্যাদি। এগুলি এনজাইম বা টক্সিনের ক্রিয়ায় ঘটা সম্ভব নয়—বরঞ্চ বৃদ্ধিজনিত বিকৃতি বলেই মনে হয়। প্রায় সব কটি ক্ষেত্রেই আক্রান্ত গাছে স্বাভাবিকের তুলনায় IAA অনেক বেশী পরিমাণে পাওয়া গেছে। ভার্টিসিলিয়াম ও ফিউজেরিয়ামের আক্রমণে টম্যাটো গাছে যথাক্রমে ৬ ও ১২ গুণ এবং সিউডোমোনাসের আক্রমণে সোল্যানেসি পরিবারভূক্ত বিভিন্ন গাছে প্রায় ১০০ গুণ পর্য্যন্ত IAA এর পরিমাণ বাড়তে দেখা গেছে। টম্যাটো গাছে বাইরে থেকে খুব অল্প মাত্রায় IAA প্রয়োগ করলেও সেখানে উইল্ট রোগের কিছু লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় (A.K. Sinha. 1967)। এমনকি কিছুদিন ধরে খুব অল্পমাত্রায় (1-5 ppm) IAA সরবরাহ করলে পাতা নেতিয়ে পড়ার লক্ষণও দেখা যায়। স্বাভাবিকভাবেই উইল্ট রোগসৃষ্টিতে অক্সিনের একটা ভূমিকা আছে এরকম ধারণা গড়ে উঠেছে। তবে যেহেতু ইথিলিন প্রয়োগ করেও এই ধরণের রোগলক্ষণ কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা যায়, সেজন্য উইল্ট রোগে অক্সিনের ভূমিকা সম্বন্ধে এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

রোগের আক্রমণ হলে সবসময় যে IAA পরিমাণে বেড়ে যায় তা নয় অনেক সময় পরিমাণ কমেও যেতে পারে। অধিকাংশ ভাইরাস রোগের আক্রমণে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। ভাইরাস আক্রান্ত আলু, টম্যাটো, ফ্রেঞ্চবীন ও বীট গাছে IAA স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক কম পরিমাণে পাওয়া যায়। এর থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে অক্সিনের পরিমাণ কমে যাওয়াতেই গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়েছে। এই ধরণের কিছু রোগে, আক্রান্ত গাছে IAA প্রয়োগ করলে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ফিরে আসে, তবে সব রোগের ক্ষেত্রে তা হয় না। এর থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে রোগাক্রান্ত গাছে স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়াটা সবসময় অক্সিনের পরিমাণ কমে যাওয়ার উপর নির্ভর করে না, কোন কোন ক্ষেত্রে এর পরিমাণ খুব বেশী বেড়ে যাওয়ার জন্যও এরকম ঘটতে পারে। ভাইরাস আক্রান্ত আঙুর গাছে রোগের তীব্রতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে IAA-এর পরিমাণ বহুগুণ বেড়ে যেতে দেখা গেছে। আলু গাছে PVX ভাইরাসের আক্রমণ হলে প্রথমদিকে IAA-এর পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়।

কিছু ভাইরাসজনিত রোগে এবং কফির 'লীফ ফল' (c. o. *Omphalia flavida*) ও গোলাপের 'ব্ল্যাক স্পট' (c.o. *Diplocarpon rosae*) রোগে পাতা অকালে ঝরে যায়। পাতায় অক্সিনের পরিমাণ কমে যাওয়ায় এরকম হয় বলে ধারণা। এই সব ক্ষেত্রে পাতায় IAA spray করলে পাতা ঝরে যাওয়া সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। আক্রান্ত কফি গাছে IAA-oxidse বেশী সক্রিয় হয়ে ওঠার ফলে IAA এর পরিমাণ কমে যায় এরকম দাবী করা হয়েছে।

গাছের রোগের ক্ষেত্রে জিবারিলিনের কোন ভূমিকা থাকতে পারে এরকম ধারনা প্রথম হয় ধানের 'বাকানী' (Bakanae) রোগের ক্ষেত্রে। জিবারেলা ফুজিকুরোই আক্রান্ত ধান গাছে জিবারিলিন জমার সঙ্গে অস্বাভাবিক বৃদ্ধির একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে দেখা যায়। লতানো 'থিসল' (*Cirsium arvense*) গাছের মরিচা রোগের ক্ষেত্রেও ঠিক একই ব্যাপার ঘটে। কিছু রোগে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ার সঙ্গে জিবারিলিনের পরিমাণ কমে যাওয়ার একটা সম্পর্ক থাকতে পারে বলে মনে করা হয়। ম্যারামোরোশ (K. Maramorosch, 1957) দেখিয়েছেন যে ভাইরাসজনিত ভুট্টার 'স্টাণ্ট' (corn stunt), অ্যাস্টারের 'ইয়েলো' (aster yellows) ও কিছু গাছের 'উণ্ড টিউমার' (wound tumour) রোগে জিবারিলিন স্প্রে করে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি আংশিকভাবে ফিরিয়ে আনা যায় কিন্তু রোগের অন্য লক্ষণগুলির উপশম হয়না। 'সি ক্যাম্পিয়ন' এর ভুষা (c. o. *Ustilago violacea*), যবের ইয়েলো

ডোয়ার্ফ (yellow dwarf) ভাইরাস ও শশার মোজেইক (Cucumber mosaic) ভাইরাস রোগে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ার সঙ্গে জিবারিলিনের পরিমাণ কমে যাওয়ার নিকট সম্পর্ক রয়েছে দেখা গেছে।

কিছু রোগে গাছের আক্রান্ত অংশে সাইটোকাইনিনের পরিমাণ স্বাভাবিকের তুলনায় কম বেশী হতে দেখা গেছে। সীম ও ফ্রেঞ্চ বীনের মরিচা রোগে, যথাক্রমে ইউরোমাইসেস ফাবি (*Uromyces fabae*) ও ইউরোমাইসেস ফ্যাসিওলির (*U. phaseoli*) আক্রমণ হলে আক্রান্ত অংশটিকে কেন্দ্র করে ঘন সবুজ রঙের দ্বীপের মত (green island) অঞ্চল গড়ে ওঠে যার চারিপাশের অংশ হলুদ রঙ নেয়। কিরাই (Z. Kiraly et. al., 1966) ও তাঁর সহকর্মীরা দেখিয়েছেন যে ঐ অঞ্চলে সাইটোকাইনিন এবং স্টার্চ ও অন্যান্য কিছু খাদ্যদ্রব্য বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। তাঁরা আরও দেখিয়েছেন যে সুস্থ গাছের পাতায় কাইনেটিন প্রয়োগ করে সেখানেও ঐ ধরণের রোগ লক্ষণ সৃষ্টি করা সম্ভব। এর ফলে ধারণা হয়েছে যে আক্রান্ত অংশে সাইটোকাইনিন বেশী জমার ফলে ক্লোরোপ্লাস্টগুলি সহজে নষ্ট হয় না আর চারিপাশের জায়গা থেকে খাদ্য-দ্রব্যগুলি তাদের প্রবাহের স্বাভাবিক গতিপথ পরিবর্তিত হওয়ায় সেখানে এসে জমে। কোরাইনিব্যাকটিরিয়াম ফ্যাসিয়ানস (*Corynebacterium fascians*) এর আক্রমণ হলে অনেক দ্বিবীজপত্রী গাছে উইচেস ব্রুম রোগের লক্ষণ দেখা যায়। এই ব্যাকটিরিয়া কৃত্রিম মাধ্যমে সাইটোকাইনিন উৎপাদন করে আর আক্রান্ত অংশেও সাইটোকাইনিন জমতে দেখা গেছে। তাছাড়া সুস্থ মটর গাছে সাইটোকাইনিন বা ব্যাকটিরিয়ার ক্লোরোফর্ম নির্যাস প্রয়োগ করলেও একই ধরণের রোগলক্ষণের সৃষ্টি হয়। এর থেকে থিমান (K. V. Thiman, 1965) এই সিদ্ধান্তে আসেন যে উইচেস ব্রুম ধরণের রোগ সৃষ্টিতে সাইটোকাইনিনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, যদিও সেটি রোগের প্রাথমিক নিয়ামক নয়। কোরাইনিব্যাকটিরিয়ামের প্রভাবে গাছে বেশী পরিমাণে সাইটোকাইলিন উৎপন্ন হওয়ার ফলেই এই ধরণের রোগজনিত বিকৃতি দেখা দেয়। বেশ কিছু রোগের ক্ষেত্রে আক্রান্ত অংশে সাইটোকাইনিনের পরিমাণ স্বাভাবিকের তুলনায় কমবেশী হতে দেখা গেলেও রোগ সৃষ্টির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়নি।

পেনিসিলিয়াম ডিজিটেটাম (*P. digitatum*) আক্রান্ত লেবুতে প্রথম ইথিলিন (ethylene) জমতে দেখা যায়। পরবর্তীকালে অনেক রোগের ক্ষেত্রেই এ'রকম প্রমাণ পাওয়া গেছে। ডাইমণ্ড ও ওয়াগোনার (১৯৫৩)

প্রথম দেখান যে ফিউজেরিয়াম অক্সিস্পোরাম আক্রান্ত টম্যাটো গাছে যে পরিমাণে ইথিলিন জমে তাতে এপিন্যাস্টি, পাতা হলদে হয়ে যাওয়া ও ঝরে পড়া, আস্থানিক মূলের সূচনা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যমূলক রোগলক্ষণগুলি দেখা দিতে পারে। গোলাপের ব্ল্যাক স্পট (c. o. *Diplocarpon rosae*) রোগেও আক্রান্ত পাতা অকালে ঝরে যাওয়ার সঙ্গে পাতায় ইথিলিন জমার সম্পর্ক আছে বলে মনে করা হয়। ইথিলিন উদ্বায়ী প্রকৃতির হওয়ায় সাধারণতঃ গাছে জমে না কিন্তু ফিউজেরিয়াম, ভার্টিসিলিয়াম, সিউডোমোনাস প্রভৃতি উইল্ট রোগ উৎপাদক জীবাণুর আক্রমণে যখন জাইলেমের ট্র্যাকীয়াগুলি বন্ধ হয়ে যায় এবং স্টোমাও বন্ধ থাকে তখন পাতার মধ্যে দিয়ে বেরোতে না পেরে ইথিলিন ভিতরে জমতে থাকে। এর ফলে গাছে উইল্ট রোগের উপরোক্ত লক্ষণগুলি ফুটে ওঠে। ভার্টিসিলিয়াম আক্রান্ত হপ ও তুলা এবং সিউডোমোনাস আক্রান্ত কলা গাছে বেশী মাত্রায় ইথিলিন জমতে দেখা গেছে। আক্রান্ত কলা গাছে অসময়ে ফল পেকে যাওয়ার জন্য ইথিলিনকে দায়ী করা হয়। ফাইজালিস ফ্লোরিডিয়ানা (Physalis floridiana) গাছে আলুর PVY ভাইরাসের আক্রমণ হলে পাতার এপিন্যাস্টি ও অসময়ে ঝরে পড়ার সঙ্গে সেখানে ইথিলিন জমে থাকার একটা সম্পর্ক রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

গাছে রোগসৃষ্টিতে হরমোনের সম্ভাব্য ভূমিকা নিয়ে সব থেকে বেশী গবেষণা হয়েছে '**ক্রাউন গল**' (crown gall) রোগের প্রসঙ্গে। রোগ উৎপাদক ব্যাকটিরিয়া অ্যাগ্রোব্যাকটিরিয়াম টিউমিফেসিয়েন্স *(Agrobacterium tumifaciens)* জমিতে থাকে এবং ক্ষতের মধ্য দিয়ে জমির উপরের দিকে বা সমতলে শিকড়ের উপরের অংশে (crown) প্রবেশ করে এবং সেখানে স্বনিয়ন্ত্রণবিহীন (non self-limiting) ও সততবর্দ্ধনশীল প্রকৃতির অর্বুদ বা 'টিউমার' (tumour) সৃষ্টি করে। এই টিউমার বাড়তে বাড়তে বেশ বড় আকার ধারণ করতে পারে। দ্বিবীজপত্রী ধরণের বাষট্টি পরিবারভুক্ত প্রায় দেড়শ গণের (genus) গাছে এই ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণে ক্রাউন গল হয় বলে জানা গেছে। সূর্যমুখী ও প্যারিস ডেইজী গাছে প্রাথমিক অর্বুদ (primary tumour) থেকে কিছুটা উপরে দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্বুদ (secondary tumour) হতে দেখা যায়। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই রোগটিকে মানুষ বা পশুর ক্যানসার রোগের সমতুল বলে ধরা হয়। টিউমারের একটি টুকরা কৃত্রিম খাদ্য মাধ্যমে রাখলে সেখানেই বাড়তে থাকে এবং অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করে ব্যাকটিরিয়ার মৃত্যু ঘটালেও এই বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। তাছাড়া টিউমারের একটি টুকরা কোন রোগ

সংবেদনশীল প্রজাতির গাছে ক্ষতের সংস্পর্শে রাখলে (grafting) সেখানে একটি নূতন টিউমারের সৃষ্টি হয়। এই সব বৈশিষ্ট্যের জন্যই ক্রাউন গল রোগের ক্ষেত্রে অর্বুদকে টিউমার বলা হয়। রোগের আক্রমণ হলেও ব্যাকটিরিয়া যে টিউমার কোষের মধ্যে প্রবেশ করে না এই তথ্য স্বীকৃত। অতএব এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে ক্যানসারের মত ক্রাউন গল রোগের ক্ষেত্রেও কোষের স্তরে কোন স্থায়ী পরিবর্তন সূচিত হয়। পরে এই পরিবর্তিত অবস্থাই চলতে থাকে, কারণ টিউমার কোষ আর কখনই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে না।

ক্রাউন গল রোগে টিউমার গঠনের জন্য প্রয়োজন (ক) রোগ সংবেদনশীল জাতির পোষক গাছ, (খ) অ্যাগ্রোব্যাকটিরিয়াম টিউমিফেসিয়েন্স-এর উগ্র রোগ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন জাতির কিছু জীবিত ব্যাকটিরিয়া কোষ ও (গ) গাছের দেহে একটি ক্ষত। এছাড়াও উপযোগী পরিবেশ বিশেষ করে তাপমাত্রাও প্রয়োজন কারণ ৩০° সেন্টিগ্রেডের উপরে ক্রাউন গল হয় না। টিউমার গঠনে ক্ষতের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নিম্নলিখিত কারণে: (১) ক্ষতের মাধ্যমেই অ্যাগ্রোব্যাকটিরিয়াম গাছের দেহে প্রবেশ করে, (২) ক্ষতরস (wound sap) ব্যাকটিরিয়ার বংশবৃদ্ধি ঘটিয়ে তার ইনোকুলাম পোটেনশিয়াল বাড়াতে সাহায্য করে, (৩) ক্ষতরস ক্ষতের জীবিত কোষগুলিকে ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণের জন্য সংবেদনশীল করে তোলে এবং (৪) ক্ষতসৃষ্টির ফলেই ব্যাকটিরিয়ার পক্ষে কোষের গায়ে বিশেষ জায়গায় যুক্ত হওয়া সম্ভব হয়।

টিউমার গঠনকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। প্রথম পর্যায়ে ক্ষতসংলগ্ন জীবিত কোষগুলি তাদের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপে পরিবর্তনের ফলে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত বা সংবেদনশীল **(conditioned)** হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যাকটিরিয়ার দেহজাত টিউমার উদ্দীপক যৌগের (tumour inducing principle – TIP) প্রভাবে সংবেদনশীল অবস্থায় থাকা কোষগুলি টিউমার কোষে স্থায়ীভাবে রূপান্তরিত হয় অর্থাৎ টিউমারের সূত্রপাত **(inception)** হয়। তৃতীয় পর্যায়ে টিউমার কোষগুলি ক্রমাগত ভাগ হতে থাকায় স্বনিয়ন্ত্রণবিহীন ধরণের টিউমারের সৃষ্টি হয় যা ক্রমাগত বেড়েই চলে **(autonomous proliferation)**। টিউমার গঠনের তিনটি পর্যায় নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হচ্ছে।

টিউমার সৃষ্টিতে ক্ষতের গুরুত্বের কথা আগেই বলা হয়েছে। ক্ষত ছোট আকারের হলে ছোট টিউমার হয়, বড় ক্ষত থেকে বড় টিউমার। বড় ক্ষত থেকে সংগৃহীত রস ছোট ক্ষতে আক্রমণের সময় দিলে সেখানেও বড় টিউমার

হয়। আবার দেখা যায় ব্যাকটিরিয়া প্রয়োগের আগে ক্ষতটি ভাল করে জল দিয়ে ধুয়ে দিলে সেখানে কোন টিউমার হয় না। কোথাও ক্ষতের সৃষ্টি হলে সেটিকে সারিয়ে ফেলার একটা সক্রিয় প্রচেষ্টা সব সময় গাছের দিক থেকে থাকে। এই উদ্দেশ্যে ক্ষতের জীবিত কোষগুলি বিশেষভাবে প্রস্তুত বা সংবেদনশীল হতে থাকে। সাধারণতঃ ক্ষত সৃষ্টির ২০—২৪ ঘণ্টা পর থেকে এই প্রস্তুতির শুরু হয় এবং ৬০ থেকে ৭৫ ঘণ্টা পরে চরমে ওঠে যখন কোষ বিভাজন ঘটতে শুরু করে এবং এই নূতন কোষের স্তর ক্ষত অঞ্চলটিকে ভবিষ্যৎ আক্রমণের হাত থেকে সুরক্ষিত করে তোলে। এর পরে ঐ কোষগুলি তাদের বিশেষ অবস্থা থেকে আগেকার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। ঘটনাচক্রে যদি এই বিশেষ প্রস্তুতির সময় ক্ষতে অ্যাগ্রোব্যাকটিরিয়ামের আক্রমণ ঘটে তবেই টিউমার সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দেয়। ক্ষতসৃষ্টির পর এই সব কোষের ৩২—৩৬ ঘণ্টা লাগে অ্যাগ্রোব্যাকটিরিয়ামের প্রতি যথেষ্ট সংবেদনশীল অবস্থায় আসতে যখন আক্রমণ হলে ছোট টিউমার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই সংবেদনশীলতা সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছায় ৬০ ঘণ্টার পরে যখন আক্রমণ হলে বেশ বড় টিউমার হবার সম্ভাবনা। এর কিছু পর থেকেই কোষের সংবেদনশীলতা ক্রমশঃ কমতে থাকে যখন আক্রমণ হলে বড় টিউমার হয় না আর ১২০ ঘণ্টার পরে আক্রমণ হলে টিউমার হয় না কারণ ক্ষতের জীবিত কোষগুলি তখন আর সংবেদনশীল অবস্থায় থাকে না।

ক্ষতের মধ্যে সংবেদনশীল কোষের গায়ে ব্যাকটিরিয়ার যুক্ত হওয়া টিউমার কোষ সৃষ্টির জন্য একান্ত প্রয়োজন (J.A. Lippincott and B.B. Lippincott, 1969)। কোষের ত্বকে একটিমাত্র জায়গায় ব্যাকটিরিয়া যুক্ত হতে পারে। এইভাবে পুরোপুরি যুক্ত হতে ১৫ মিনিট বা তার কিছু বেশী সময় লাগে। একটি বড় আকারের টিউমার সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট সংখ্যায় সংবেদনশীল অবস্থায় থাকা দেহকোষের সঙ্গে ব্যাকটিরিয়ার এইভাবে যুক্ত হতে ৬ ঘণ্টা মত লাগে। ব্যাকটিরিয়ার ত্বকে লাইপোপলিস্যাকারাইড (lipopolysaccharide = LPS) শ্রেণীর যে যৌগ থাকে বিশেষ করে তার শর্করা জাতীয় অংশের (polysaccharide fraction) সঙ্গে কোষের দেওয়ালের পেকটিন জাতীয় যৌগ যুক্ত হয় বলে ধারণা। একটি কোষের টিউমার কোষে সম্পূর্ণ রূপান্তরের জন্য ব্যাকটিরিয়ার সঙ্গে অন্ততঃ ৪—৬ ঘণ্টার মিথস্ক্রিয়া প্রয়োজন। ক্ষতের সংবেদনশীল অবস্থায় থাকা কোষের অর্দ্ধেকের রূপান্তরের জন্য ১৬ ঘণ্টা এবং ঐ রকম সব কোষের রূপান্তরের জন্য ৭২—৯৬ ঘণ্টা লাগে। ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণের শুরু থেকে বিভিন্ন সময়ের

ব্যবধানে অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করে তাকে মেরে ফেলে দেখা গেছে যে সংবেদনশীল কোষের সঙ্গে ব্যাকটিরিয়ার কতক্ষণ মিথষ্ক্রিয়া ঘটে তার উপর নির্ভর করে কোষটির কতটা রূপান্তর ঘটবে এবং ছোট বা বড় কি ধরণের টিউমার হবে। সাধারণ উদ্ভিদ কোষের চাষ (cell culture) করতে হলে খাদ্য মাধ্যমে বিশেষ কয়েকটি উপাদানের প্রয়োজন হয় যার মধ্যে রয়েছে হরমোন, ভিটামিন এবং নাইট্রোজেন-ঘটিত পেপটাইড (peptide) জাতীয় কিছু যৌগ। সংবেদনশীল কোষ ও ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে ৩২—৩৬ মিথষ্ক্রিয়ার ফলে যে ছোট টিউমার উৎপন্ন হয় তার স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য খাদ্য মাধ্যমে একটি ছাড়া সবকটিরই প্রয়োজন হয়, ৫০ ঘণ্টা মিথষ্ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন টিউমারের মাত্র তিনটি উপাদানের প্রয়োজন হয় কিন্তু ৬০ ঘণ্টা মিথষ্ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন টিউমারের জন্য বাইরে থেকে ঐ সব কোন উপাদান সরবরাহের প্রয়োজন হয় না। ব্রন (A. C. Braun, 1959) এর মতে সংবেদনশীল অবস্থায় থাকা কোষ ব্যাকটিরিয়ার সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে টিউমার কোষে পরিবর্তনের সময় পর্যায়ক্রমিকভাবে তার স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় এই উপাদানগুলি সংশ্লেষণের ক্ষমতা অর্জন করে।

টিউমার কোষের ভিতরে ব্যাকটিরিয়া নেই বা ব্যাকটিরিয়ার অনুপস্থিতিতে টিউমার কোষের সংস্পর্শে সাধারণ কোষের রূপান্তর ঘটছে এই অবস্থায় মনে হত যে ব্যাকটিরিয়ার থেকে ছোট কিছু অর্থাৎ তার কোন অংশ যেমন নিউক্লিয়িক অ্যাসিড এই পরিবর্তনের জন্য দায়ী। সন্দেহ হয় যে TIP ব্যাকটিরিয়ার নিজস্ব DNA বা অ্যাগ্রোব্যাকটিরিয়ামকে আক্রমণ করে যে ভাইরাস বা ফাজ (phage) PS—8 তার DNA। ব্যাকটিরিয়া বা ফাজের DNA প্রয়োগ করে গাছে টিউমার সৃষ্টির চেষ্টা অবশ্য সফল হয়নি।

বিভিন্ন তথ্য থেকে দেখা গেছে যে অ্যাগ্রোব্যাকটিরিয়ামের কোন জাতির রোগসৃষ্টির ক্ষমতা তার ওপাইন (opines) শ্রেণীর খাদ্য উপাদান ব্যবহারের ক্ষমতা ও অ্যাগ্রোব্যাকটিরিয়াম রেডিওব্যাকটার (race 48) দ্বারা উৎপন্ন টক্সিন 'ব্যাকটিরিওসিন' (Bacteriocin) এর প্রতি সংবেদনশীলতার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। এর কারণ খুঁজতে যেয়ে দেখা গেল যে ব্যাকটিরিয়ার কোষে আবরণী সংলগ্ন যে প্লাজমিড ডি এন এ (Plasmid DNA—Ti plasmid) আছে সেটিই উপরোক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এটি একটি বড় আকারের, দু-মুখ জোড়া আঙটির আকৃতির DNA যার মিউটেশনের ফলে বা অন্য কোন কারণে অবলুপ্তি বা পরিবর্তন ঘটলে ব্যাকটিরিয়া রোগসৃষ্টির ক্ষমতা ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি হারিয়ে ফেলে। ফলে এমন ধারণার সৃষ্টি হয়

যে Ti-প্লাজমিডই TIP বা প্রত্যক্ষভাবে TIP উৎপাদনের জন্য দায়ী। বিভিন্ন তথ্যের উপর ভিত্তি করে টিউমারের সৃষ্টি নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ায় ঘটে বলে মনে করা হয়। অ্যাগ্রোব্যাকটিরিয়ামের আক্রমণ হলে ক্ষতের মধ্যে বিশেষ সংবেদনশীল অবস্থায় রয়েছে এমন দেহকোষের ত্বকে বিশেষ জায়গায় ব্যাকটিরিয়া নিজেকে যুক্ত করে। তখন ব্যাকটিরিয়ার Ti-প্লাজমিডের প্রভাবে তারই DNA এর একটি অংশ (T segment = T-DNA) উদ্ভিদকোষে প্রবেশ করে ও সেখানকার নিউক্লিয়াসের DNA এর সঙ্গে যুক্ত হয়। এর ফলে কোষের স্তরে স্থায়ী জীনগত পরিবর্তন সূচিত হয়। ঐ কোষটি তখন অপরিমিত পরিমাণে হরমোন উৎপাদনের ফলে অবিরত বৃদ্ধির ক্ষমতা ও নোপালিন (Nopaline) বা অক্টোপিন (Octopine) ইত্যাদি ওপাইন শ্রেণীর যৌগ (যা ব্যাকটিরিয়া কার্বন, নাইট্রোজেন ও শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহার করে) উৎপাদন ক্ষমতা আহরণের মাধ্যমে টিউমার কোষে রূপান্তরিত হয়। ঐ প্লাজমিডের তিনটি সুচিহ্নিত অংশের মধ্যে (ক) T-DNA উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ন্ত্রণ করে, (খ) 'ভির' অঞ্চল (vir region) টিউমার সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায় নিয়ন্ত্রণ করে অর্থাৎ রোগসৃষ্টির ক্ষমতার জন্য দায়ী ও (গ) তৃতীয় অঞ্চল ব্যাকটিরিয়ার ওপাইন শ্রেণীর যৌগ ব্যবহারের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। যদিও টিউমার কোষে ঠিক T-DNA এর মত কোন DNA পাওয়া যায়নি কিন্তু সেখানে এমন প্রোটিন জাতীয় যৌগের (antigen) সন্ধান পাওয়া গেছে যা T-DNA এর প্রতিক্রিয়ায় উৎপন্ন অ্যান্টিসেরামের (antiserum) সঙ্গে T-DNA এর মতই ক্রিয়া করে। এর ফলে ব্যাকটিরিয়ার DNA যে TIP এই সন্দেহ আরও দৃঢ়তর হয়। কোষের সঙ্গে ব্যাকটিরিয়ার যুক্ত হবার ঘটনাটি ছাড়া টিউমার গঠনের বিভিন্ন পর্যায় নিয়ন্ত্রণকারী সব জীনই Ti-প্লাজমিডে রয়েছে বলে মনে করা হয়। বিভিন্ন ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে T-DNA এর বিভিন্ন অঞ্চল (locus) চিহ্নিত করা (mapping) সম্ভব হয়েছে। দেখা গেছে যে *tms* ও *tmr* অঞ্চল যথাক্রমে অক্সিন ও সাইটোকাইনিন উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে আর ওপাইন জাতীয় যৌগের উৎপাদন *tml* অঞ্চল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অ্যাগ্রোব্যাকটিরিয়ামের রোগসৃষ্টির ক্ষমতাসম্পন্ন বিভিন্ন জাতির Ti-প্লাজমিড সর্বাংশে এক রকম নয়। ঐ সব প্লাজমিডে T-DNA ও অন্যান্য অংশগুলির এমনকি *tms*, *tmr* প্রভৃতি অঞ্চলগুলির বিন্যাসেও অনেক তফাৎ দেখা যায় যার ফলে তাদের রোগ ও টিউমার সৃষ্টির ক্ষমতায় ভিন্নতার সৃষ্টি হয়।

টিউমারে অক্সিন ও সাইটোকাইনিনের পরিমাণ স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক

বেশী হতে দেখা যায়। যদিও অ্যাগ্রোব্যাকটিরিয়াম কৃত্রিম চাষের মাধ্যমে IAA বা সাইটোকাইনিন উৎপাদনে সক্ষম তবু টিউমার কোষে এই দুটি হরমোনের অপরিমিত মাত্রায় উৎপাদনে এর কোন অবদান আছে বলে মনে হয় না। কৃত্রিম মাধ্যমে এই দুটি হরমোন বাইরে থেকে দিলেও টিউমারের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় না কিন্তু সেখানে অক্সিন-বিরোধী কোন যৌগ দিলে টিউমারের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে এখন এটি স্বীকৃত যে ক্রাউন গল রোগে টিউমারের বিশেষ বৈশিষ্ট্যমূলক অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি টিউমার কোষে অপরিমিত মাত্রায় অক্সিন ও সাইটোকাইনিন উৎপাদনের ফলেই সম্ভব হয় এবং ব্যাকটিরিয়া থেকে পাওয়া T-DNA নিজের DNA তে অন্তর্ভুক্তির ফলেই টিউমার কোষ এই ক্ষমতা অর্জন করে। একই সঙ্গে ঐ কোষ টিউমারের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় অন্য কয়েকটি উপাদান উৎপাদনের ক্ষমতাও আয়ত্ত করে। কোষের স্তরে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশী মাত্রায় বিভাজন ও বৃদ্ধির এই অর্জিত ক্ষমতা স্থায়ী হয় এবং এর ফলেই অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োগে ব্যাকটিরিয়ার মৃত্যু ঘটলেও টিউমারের অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে।

গাছের সুষম বৃদ্ধি কোন একটি বিশেষ হরমোনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। কোষ বিভাজনের ফলে নূতন কোষের সৃষ্টি এবং কোষের বৃদ্ধি ও পূর্ণতাপ্রাপ্তি বিভিন্ন হরমোনের সামগ্রিক ক্রিয়ার ফলেই সম্ভব হয় বলে বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন। আগেকার আলোচনা থেকে দেখা গেছে যে বিভিন্ন রোগের আক্রমণের ফলে গাছে একাধিক হরমোনের মাত্রায় পরিবর্তন ঘটতে পারে। কোন রোগে গাছে একটি হরমোনের পরিমাণ স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেড়ে যায়, অন্য রোগে আবার বেশ কমেও যায়। স্বাভাবিকভাবেই গাছের দেহে এর প্রতিক্রিয়াও হয়। আগেই বলা হয়েছে যে কোষের স্তরে বিভাজন ও বৃদ্ধি ছাড়াও নানাবিধ শারীরবৃত্তীয় বিক্রিয়ার উপর হরমোনের প্রভাব রয়েছে। সুতরাং এক বা একাধিক হরমোনের বেশী মাত্রায় পরিবর্তন ঘটলে তার প্রভাবে বৃদ্ধিসঞ্জাত বিকৃতি ছাড়াও নানাবিধ রোগ লক্ষণের সৃষ্টি হতে পারে। তবে অল্প কয়েকটি রোগের কথা বাদ দিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে কোন একটি হরমোনের মাত্রায় বিশেষ পরিবর্তনের ফলেই রোগ লক্ষণের সৃষ্টি হয়েছে, একাধিক হরমোনও এর জন্য দায়ী হতে পারে।

প্রাসঙ্গিক পুস্তক ও গবেষণাপত্রাদি

Albersheim, P., T.M. Jones and P.D. English. 1969. Biochemistry of the cell wall in relation to infective processes. *Ann. Rev. Phytopathol.* 7 : 171-194.

Friend, J., and D.R.Threlfall (eds.). 1976. "Biochemical aspects of plant-parasite relationship". Academic Press, New York, 394 p.

Bateman, D.F. Plant cell wall hydrolysis by pathogens, 79-103.

Strobel, G.A. Toxins of plant pathogenic bacteria and fungi, 135-159.

Wood, R.K.S. Killing of protoplasts, 105-116.

Heitefuss, R., and P.B. Williams (eds.). 1976. "Physiological Plant Pathology". Springer-Verlag, Berlin, 890 p.

Bateman, D.F., and H.G. Basham. Degradation of plant cell walls and membranes by microbial enzymes, 316-355.

Lippincott, J.A., and B.B. Lippincott. Morphogenic determinants as exemplified by the crown gall disease, 350-388.

Pegg, G.F. Endogenous auxins in healthy and diseased plants, 560-581.

Rudolph, K. Non-specific toxins, 270-315.

Scheffer, R.P. Host-specific toxins in relation to pathogenesis and disease resistance, 247-269.

Horsfall, J.G., and E.B.Cowling (eds.). 1978. "Plant Disease : An Advanced Treatise. III. How Plants suffer from Disease". Academic Press, New York.

Merlo, D.J. Crown gall—a unique disease, 201-214.

Mount, M.S. Tissue is disintegrated, 278 297.

Hussain, A., and K. Janardhan. 1976. Role of toxin in plant diseases. In "Glimpses in Plant Research" (P.K.K.Nair, ed.). Vikas, New Delhi.

Kado, C. 1976. The tumour inducing substance of *Agrobacterium* tumifaciens, *Ann, Rev, Phytopathol,* **14** : 265-308.

Kalyansundaram, R., and R. Charudattan. 1966. Toxins and plant disease. *J. Sci. Ind. Res.* **25** : 63-73.

Pringle, R.B., and R.P.Scheffer. 1964. Host-specific plant toxins. *Ann. Rev. Phytopathol.* **2** : 133-156.

Sequeira, L. 1973. Hormone metabolism in diseased plant. *Ann. Rev. Plant Physiol.* **24** ; 353 380.

Van den Ende, G., and H. F. Linskens. 1974. Cutinolytic enzymes in relation to pathogenesis. *Ann. Rev. Phytopathol.* **12** : 247-258.

Yoder, Y.C. 1980. Toxins in pathogenesis. *Ann. Rev. Phytopathol.* **18** : 103-129.

১৪ গাছের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার উপর রোগের প্রভাব

গাছে ছত্রাক, ব্যাকটিরিয়া বা নিমাটোডের আক্রমণ হলে তাদের দেহনিঃসৃত বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগের প্রভাবে ও অন্যান্য কারণে গাছের শারীরবৃত্তীয় বিভিন্ন ক্রিয়ায় নানা ধরণের পরিবর্তন ঘটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সব পরিবর্তনের ফলেই গাছের দেহে রোগের বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দেয়। বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াগুলি অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এবং এগুলি সুসমঞ্জসভাবে চললে তবেই সুস্বাস্থ্য সম্ভব। কিন্তু রোগের আক্রমণে কোন একটি বিশেষ ক্রিয়ার উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়লে অন্যান্য অনেক ক্রিয়াও কিছুটা প্রভাবিত হয়। রোগের আক্রমণে যে সব শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে তাদের মধ্যে অন্যতম হল সালোকসংশ্লেষ, শ্বসন, নাইট্রোজেন যৌগের বিপাকীয় ক্রিয়া, পাতায় জল সরবরাহ ও প্রস্বেদন। এখানে এইসব ক্রিয়াগুলির উপর রোগের প্রভাব সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হচ্ছে।

সালোকসংশ্লেষ (Photosynthesis)

রোগ উৎপাদকের আক্রমণে কখনও প্রত্যক্ষভাবে কখনও বা পরোক্ষভাবে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া প্রভাবিত হতে পারে। অনেক রোগে ক্লোরোপ্লাস্ট নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে সালোকসংশ্লেষ ঠিকমত হতে পারে না। শুধু যে কার্বন ডাইঅক্সাইড স্থিতিকরণের (CO_2 fixation) জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইম ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে থাকে তাই নয়, লিপিড শ্রেণীর স্নেহ জাতীয় পদার্থ ও প্রোটিন সংশ্লেষের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইমও ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে থাকে। ঐচ্ছিকভাবে পরজীবী এমন অনেক রোগজীবাণুর দেহনিঃসৃত এনজাইম বা টক্সিনের ক্রিয়ার ফলে পাতা আংশিকভাবে বা পুরোটাই নষ্ট হয়ে যায়। এমনও প্রমাণ আছে যে আক্রান্ত অংশের সন্নিহিত অঞ্চলে, যেখানে কোষগুলি তখনও জীবিত, ক্লোরোপ্লাস্টের ক্ষতির দরুণ সালোকসংশ্লেষের হার যথেষ্ট কমে যায়। উইল্ট রোগে পাতা নেতিয়ে পড়ার আগেই সেখানে ক্লোরোফিলের পরিমাণ কমে যায় ও সালোকসংশ্লেষ ব্যাহত হতে থাকে। বাধ্যতামূলকভাবে পরজীবী ছত্রাকের আক্রমণে প্রাথমিক পর্যায়ে সালোকসংশ্লেষের হার বেড়ে গেলেও পরবর্তী পর্যায়ে, যখন স্পোর তৈরী হতে থাকে ও গাছের দেহে ক্ষতির মাত্রা বাড়তে থাকে, তখন হার অনেক কমে যায়। অনেক ভাইরাস রোগে

ক্লোরোফিল নষ্ট হয়ে যাবার ফলে পাতায় বিচ্ছিন্নভাবে অনেক জায়গায় বা পুরো পাতায় সবুজ রঙ থাকে না, ফলে সালোকসংশ্লেষের হার বেশ কমে যায়। রোগের শেষ পর্যায়ে এই হার স্বাভাবিকের তুলনায় শতকরা ৭৫ থেকে ৮০ ভাগ পর্যন্ত কম হতে দেখা গেছে। এর কারণ ক্লোরোপ্লাস্ট নষ্ট হয়ে যাওয়া বা 'ক্লোরোসিস' (chlorosis) মনে হতে পারে। ক্লোরোফিলের বিশেষ ক্ষতি হয় না এমন কিছু রোগেও সালোকসংশ্লেষের হার কমে যায় এরকম তথ্য রয়েছে। সাধারণতঃ ক্লোরোফাইলেজ (chlorophyllase) এনজাইমের ক্রিয়ার ফলে ক্লোরোফিল নষ্ট হয়ে যায় ও ক্লোরোপ্লাস্ট ভেঙ্গে যায়। রোগ হলে সালোকসংশ্লেষ বিভিন্ন পর্যায়ে কিভাবে প্রভাবিত হতে পারে সে সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করা হচ্ছে।

সালোকসংশ্লেষের কয়েকটি বিক্রিয়ার জন্য আলোর প্রয়োজন হয়। এর মধ্যে একটি হল 'হিল' বিক্রিয়া (Hill reaction) যেখানে জলের দুইটি অণু ভেঙ্গে যাওয়ায় অক্সিজেনের একটি অণু ও বিজারিত ট্রাইফসফোপিরিডিন নিউক্লিওটাইড (triphosphopyridine nucleotidc) এর দুটি অণু পাওয়া যায়।

$$2TPN + 2H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোপ্লাস্ট}]{\text{আলো}} 2TPNH.H + O_2$$
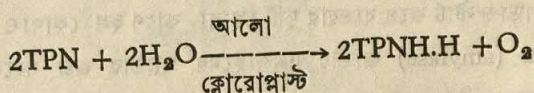
বিজারিত TPN পরবর্তী পর্যায়ে অন্ধকারে CO_2 স্থিতিকরণ বিক্রিয়ার সময় বিজারণের জন্য প্রয়োজনীয় ইলেকট্রন সরবরাহ করে থাকে। তুলায় ভার্টিসিলিয়াম অ্যালবো-এট্রাম ও বীটে ইয়েলোজ (yellows) এবং তামাকে মোজেইক (TMV) ভাইরাসের আক্রমণ হলে দেখা গেছে হিল বিক্রিয়া ঠিকমতন চলতে পারে না। পাতার যে অংশ হলদে হয়ে যায়নি সেখানেও কিছুটা প্রতিক্রিয়া হয়।

রোগের আক্রমণ হলে CO_2 স্থিতিকরণ কোথাও স্বাভাবিকের তুলনায় বেশী কোথাও বা কম হয়। এই বিক্রিয়ার মাধ্যমেই CO_2 থেকে শর্করা ও অন্যান্য জৈব যৌগের সৃষ্টি হয়। ওট গাছে প্যাথোটক্সিন ভিক্টোরিন ও ভুট্টা গাছে HC – toxin প্রয়োগ করে দেখা গেছে যে তার ফলে অন্ধকারে CO_2 স্থিতিকরণ বিক্রিয়া দ্রুততর হয়। ছত্রাক বা ভাইরাসের আক্রমণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিন্তু CO_2 স্থিতিকরণের হার কমে যায়। পোষক গাছ ও পরজীবীর মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই এই হার কমতে থাকে।

কলা গাছে সিউডোমোনাস উইল্ট রোগের আক্রমণ হলে সালোকসংশ্লেষের হার খুবই কমে যায়। বেকম্যান (C. H. Beckman) ও তাঁর সহকর্মীদের মতে জল সরবরাহে বাধার সৃষ্টি হলে স্টোমার রক্ষী কোষ (guard cell) দুটি স্ফীত অবস্থা হারিয়ে ফেলে যার ফলে স্টোমার ছিদ্র বন্ধ হয়ে যায়। তখন পরিবেশ থেকে পাতা CO_2 নিতে পারে না ফলে সালোকসংশ্লেষের হারও কমে যায়। দেখা গেছে পাতায় জল সরবরাহ আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারলেই সালোকসংশ্লেষ স্বাভাবিক ভাবে চলতে থাকে।

প্রধানতঃ পাতায় আক্রমণ হয় এমন রোগে সঞ্চিত স্টার্চের পরিমাণে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটতে দেখা গেছে। মরিচা রোগে আক্রান্ত গম ও বীন গাছে প্রথমদিকে স্টার্চ কম জমলেও পরের দিকে আক্রান্ত অঞ্চলের ধারের দিকে চারিপাশের সুস্থ অংশের তুলনায় অনেক বেশী স্টার্চ জমে। অনেক ভাইরাসজনিত রোগে, বিশেষতঃ মোজেইক রোগে, রোগগ্রস্ত গাছের পাতায় সুস্থ গাছের তুলনায় অনেক কম পরিমাণে স্টার্চ পাওয়া যায়। আবার আলুর লীফ রোল, যবের ইয়েলো ডোয়ার্ফ (yellow dwarf), বীটের কালি টপ প্রভৃতি ভাইরাসজনিত রোগে স্টার্চ পাতায় বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। বেশী উৎপাদন ছাড়াও স্টার্চ জমে যাওয়ার দুটি সম্ভাব্য কারণ হল কোথাও হয়ত স্টার্চ অ্যামাইলেজ (amylase) জাতীয় এনজাইমের স্বল্পতার জন্য সহজে শর্করায় ভাঙ্গেনা (আলুর লীফ রোল) আবার কোথাও বা ফ্লোয়েম নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পাতা থেকে স্টার্চ অন্যত্র অপসারিত না হওয়াতে সেখানে জমে যায় (ন্যাসপাতির ডিক্লাইন—pear decline)।

শ্বসন (Respiration)

শ্বসন জীবদেহের বেঁচে থাকার ও বিভিন্ন শারীরিক ক্রিয়াকলাপের জন্য অত্যাবশ্যক একটি শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় শক্তিসম্পদে সমৃদ্ধ শর্করা এনজাইমের নিয়ন্ত্রণে জারিত হয়ে জল ও CO_2 উৎপাদন করে এবং ঐ খাদ্যে সঞ্চিত শক্তি মুক্ত হওয়ার পর কোষের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াগুলি চালানোর জন্য ব্যয়িত হয়। শ্বসন ক্রিয়া সাধারণতঃ দুটি ধাপে সম্পূর্ণ হয়। প্রথম ধাপে ৬—কার্বন বিশিষ্ট গ্লুকোজ সাইটোপ্লাজমে থাকা বিভিন্ন এনজাইমের ক্রিয়ার ফলে এম্বডেন—মায়ারহফ—পার্ণাস বিক্রিয়া পথ (Embden—Meyerhoff—Parnas pathway = EMP pathway) অনুসারে ৩—কার্বন বিশিষ্ট পাইরুভিক অ্যাসিডে (pyruvic acid) পরিণত হয়। এই পর্যায়কে বলে **'গ্লাইকোলিসিস'**

(glycolysis) যার বিক্রিয়াগুলি অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতেও ঘটতে পারে। পরের
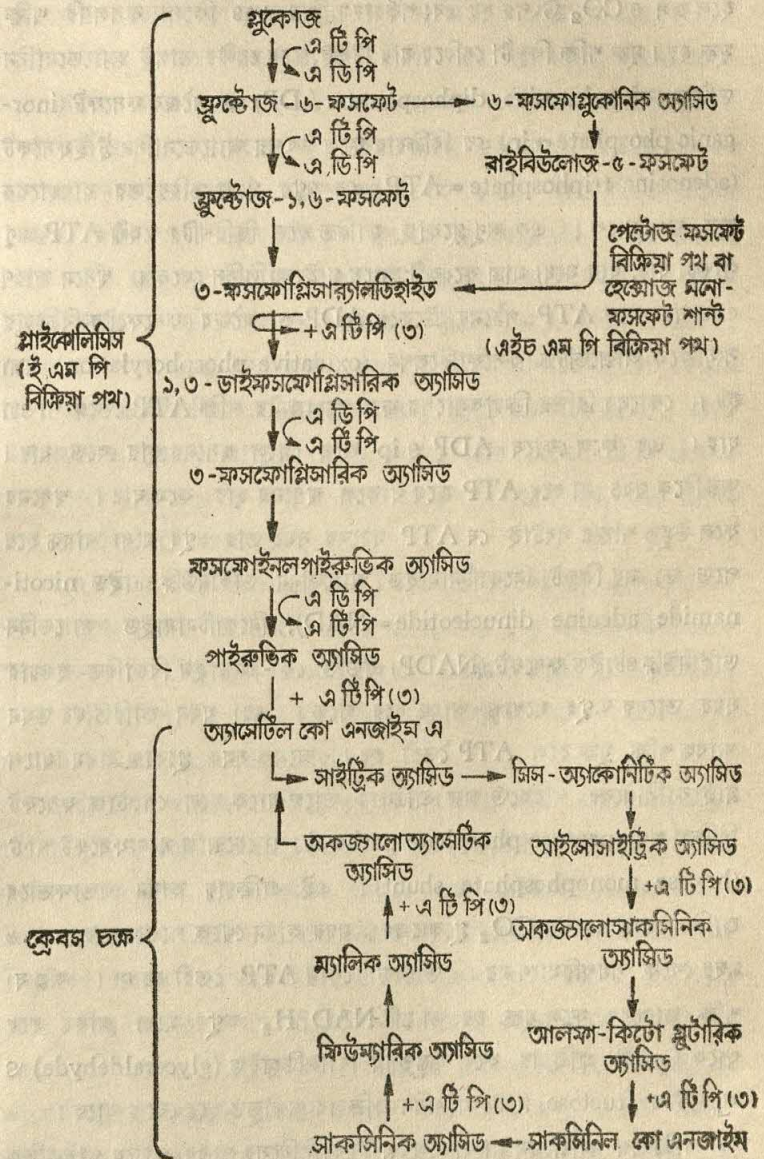
রেখাচিত্র ১৬ : শ্বসনের বিভিন্ন পর্যায়ে (গ্লাইকোলিসিস, হেক্সোজ মনোফসফেট শান্ট ও ক্রেবস চক্র) রাসায়নিক পরিবর্তনের সংক্ষিপ্তসার

ধাপে প্রধানতঃ মাইটোকনড্রিয়ার এনজাইমের সাহায্যে ক্রেবস চক্রের (kreb's

cycle) ধারাবাহিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে পাইরুভিক অ্যাসিড সম্পূর্ণভাবে জারিত হলে জল ও CO_2 উৎপন্ন হয় এবং শর্করায় সঞ্চিত ৬৭৪ কিলো ক্যালারি শক্তি মুক্ত হয়। মুক্ত শক্তি কিছুটা বেরিয়ে যায় ঠিকই, তবে বেশীর ভাগই অ্যাডেনোসিন ডাইফসফেট (adenosine diphosphate = ADP) ও অজৈব ফসফেট (inorganic phosphate = ip) এর বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন অ্যাডেনোসিন ট্রাইফসফেট (adenosine triphosphate = ATP) এর অণুর মধ্যে ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য জমা থাকে। এক অণু গ্লুকোজ জারিত হলে তিরিশটির বেশী ATP অণু পাওয়া যায়, যার মধ্যে মাত্র কয়েকটি আসে গ্লাইকোলিসিস থেকে। শ্বসনে জারণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে ATP গঠনের উদ্দেশে ADP ও অজৈব ফসফেটের বিক্রিয়ার সংযুক্তিকে অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশন (oxidative phosphorylation) বলা হয়। কোষের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ATP ভেঙ্গে পাওয়া যায়। এর ফলে কোষে ADP ও ip জমে গেলে শ্বসনের হার বেড়ে যায়। অন্যদিকে খরচ না হয়ে ATP জমে থাকলে শ্বসনের হার কমে যায়। শ্বসনের ফলে উদ্ভূত শক্তির সবটাই যে ATP গঠনের সময় তার অণুর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে তা নয় কিছুটা নিকোটিনামাইড অ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড (nicotinamide adenine dinucleotide = NAD), নিকোটিনামাইড অ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড ফসফেট (NADP) প্রভৃতি কো-এনজাইম বিজারিত হওয়ার সময় তাদের অণুর মধ্যেও আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এরা যখন জারিত হয় তখন আবদ্ধ শক্তি মুক্ত হলে ATP তৈরী হয়। অনেক সময় গ্লুকোজ প্রথম ধাপে গ্লাইকোলিসিসের পরিবর্তে অন্য প্রক্রিয়ায় ভাঙ্গে যাকে বলে পেণ্টোজ ফসফেট বিক্রিয়া পথ (pentose phosphate pathway) বা হেক্সোজ মনোফসফেট শাণ্ট (hexose monophosphate shunt)। এই প্রক্রিয়ায় কার্বন প্রত্যক্ষভাবে জারিত হয় এবং সমস্ত CO_2 গ্লুকোজের ১ নম্বর কার্বন থেকে পাওয়া যায়, ১ ও ৬ নম্বর থেকে সমপরিমাণে নয়। তাছাড়া কোন ATP তৈরী হয় না। অল্প যা শক্তি জারণের ফলে মুক্ত হয় তা দুটি $NADPH_2$ অণুর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত গ্লিসার‍্যালডিহাইড (glyceraldehyde) ও ফ্রুকটোজ (fructose) গ্লাইকোলিসিস প্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত হয়ে যেতে পারে।

পরিবেশে অক্সিজেন না থাকলে গ্লাইকোলিসিসের পরের পর্যায়ে পাইরুভিক অ্যাসিড আংশিকভাবে জারিত হয়। একে বলে অবাত শ্বসন (anaerobic respiration)। এর ফলে CO_2 ও ইথিল অ্যালকোহল (ethyl alcohol) উৎপন্ন হয় আর মাত্র ২৫ কিলো ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়।

কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে ছত্রাক, ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদির আক্রমণে গাছে শ্বসন ক্রিয়ার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। কতটা অক্সিজেন (O_2) দেহের ভিতরে প্রবেশ করে তার উপর ভিত্তি করে সাধারণতঃ শ্বসনের হার মাপা হয়। শ্বসনের হার শুধু যে রোগ হলে বাড়ে তাই নয়, আঘাত লাগলে বা রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োগেও বাড়ে। মরিচা ও ছাতাধরা রোগের আক্রমণ হলে রোগের লক্ষণ দেখা দেবার আগে থেকেই শ্বসনের হার বাড়তে থাকে। আক্রান্ত অঞ্চল সংলগ্ন কোষগুলিতেও শ্বসনের হার বেড়ে যায়। এই হার সব থেকে বেশী হয় যখন ছত্রাকের স্পোর উৎপন্ন হতে থাকে, তারপর ক্রমশঃ কমতে কমতে অনেক সময় স্বাভাবিকের নীচেও নেমে যায়। রোগের আক্রমণের ফলে গাছে শ্বসনের হার বেড়ে যাওয়ার ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগ উৎপাদকের নিজস্ব শ্বসনের কোন গুরুত্ব আছে বলে মনে হয় না। রোগ উৎপাদকের প্রভাবে গাছের কোষে শ্বসনের হার বেড়ে যায়। রোগের আক্রমণের ফলে শুধু যে শ্বসনের হার বেড়ে যায় তাই নয়, শ্বসন ক্রিয়ায় প্রকৃতিগত কিছু পরিবর্তনও ঘটে।

অ্যালেনের (P. J. Allen, 1953) মতে রোগের আক্রমণ হলে প্রধানত: দুটি কারণে শ্বসনের হার বেড়ে যেতে পারে, যথা (ক) জারণ প্রক্রিয়া থেকে ফসফোরিলেশনের বিযুক্তি (uncoupling of oxidative phosphorylation) ও (খ) বিভিন্ন বিপাকীয় ক্রিয়ার হার বৃদ্ধি ও নূতন যৌগের সংশ্লেষণ (increased metabolic and synthetic activity)।

মরিচা রোগে আক্রান্ত গম গাছে শ্বসনের হার বৃদ্ধির সঙ্গে অজৈব ফসফেটের পরিমাণ বৃদ্ধি ও acid labile ফসফেট (সম্ভবতঃ ATP) এর পরিমাণ কমার একটা সম্পর্ক দেখা যায়। কৃত্রিম উপায়ে ২,৪—ডাইনাইট্রোফেনল (2,4-dinitrophenol = DNP) প্রয়োগ করে জারণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে ফসফোরিলেশনের বিযুক্তীকরণ সম্ভব। এর ফলে ADP ও ip জমতে থাকে ও শ্বসনের হার বেড়ে যায়। কিন্তু রোগাক্রান্ত গম গাছে DNP প্রয়োগ করলে শ্বসনের হার বিশেষ বাড়ে না। এর থেকে ধারণা হয় যে রোগের আক্রমণের ফলে বিযুক্তীকরণ আগেই ঘটেছে, সেজন্যই DNP প্রয়োগ করে কোন ফল পাওয়া যায়নি। বীনে রাস্ট, ওটে হেলমিনথোস্পোরিয়াম ভিক্টোরিয়ী, চীনা বাদামে সার্কোস্পোরা পার্সোনাটা ইত্যাদি ছত্রাকের আক্রমণ হলে একই রকম ঘটতে দেখা গেছে, তবে কোথাও কোথাও অজৈব ফসফেটের তুলনায় জৈব ফসফেটের আনুপাতিক হার বেশ বেড়েছে এরকম তথ্যও জানা গেছে। কোথাও আবার DNP

প্রয়োগ করে আক্রান্ত গাছে শ্বসনের হার কিছুটা বাড়তেও দেখা গেছে ফলে ইদানীংকালে এরকম ধারণা গড়ে উঠছে যে জারণ প্রক্রিয়া থেকে ফসফো-রিলেশনের বিযুক্তীকরণ সব ক্ষেত্রে শ্বসনের হার বৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ না হতেও পারে।

পাকসিনিয়া কার্থামি *(P. carthami)* আক্রান্ত জাফরান গাছে হাইপোকটিল অঞ্চলের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শ্বসনের হার বাড়তে দেখা যায়। অনেক গাছেই রোগের আক্রমণের ফলে কোষের স্তরে নানা ধরণের বাড়তি কর্মতৎপরতা দেখা যায়। শর্করা, প্রোটিন, হরমোন ইত্যাদি বর্দ্ধিত হারে সংশ্লেষিত হতে থাকে, নূতন এনজাইম ও অন্যান্য রাসায়নিক যৌগ উৎপন্ন হয়, বর্দ্ধিত হারে কোষ বিভাজন ও বৃদ্ধি ঘটতে থাকে ও কোষে প্রোটোপ্লাজমের প্রবাহ দ্রুততর হয়। এ ছাড়াও নানা ধরণের কর্মতৎপরতার চিহ্ন কোষের স্তরে দেখা যায়। এই সব বাড়তি কাজের জন্য বাড়তি শক্তির সরবরাহ প্রয়োজন যা সাধারণতঃ ATPই সরবরাহ করে থাকে। ফলে শ্বসনের হার বৃদ্ধি অনিবার্য হয়ে পড়ে।

রোগের আক্রমণের ফলে শ্বসন গ্লাইকোলিসিসের পথে না হয়ে পেণ্টোজ ফসফেট বিক্রিয়া পথে (HMP pathway) হলে অনেক কম শক্তি পাওয়া যায়। একে হেক্সোজ মনোফসফেট বিকল্প পথও (Hexose monophosphate shunt) বলা হয়। তখন শক্তির প্রয়োজন মেটাতে শ্বসনের হার বৃদ্ধি আবশ্যক হয়ে পড়ে। গ্লাইকোলিসিস প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজের ১ ও ৬ নম্বর কার্বন থেকে জারণের ফলে সমান হারে CO_2 পাওয়া যায় আর পেণ্টোজ ফসফেট পথে শুধুমাত্র ১ নম্বর কার্বন (C_1) জারিত হওয়ায় (C_6/C_1) থেকে উদ্ভূত CO_2 র আনুপাতিক হার শূন্য না হলেও ১ এর বেশ কম—সাধারণতঃ ০.১ এর কাছাকাছি থাকে। মরিচা রোগে আক্রান্ত গম, বীন, সূর্যমুখী ও জাফরান গাছে, ছাতাধরা রোগে আক্রান্ত যব গাছে, রাইজোকটোনিয়া সোল্যানি আক্রান্ত বীন গাছে ও সিউডোমোনাস ট্যাবাসি আক্রান্ত তামাক গাছে C_6/C_1 এর CO_2র অনুপাত ১এর থেকে অনেক কম হতে দেখা গেছে। ভাইরাস রোগে যেখানে আক্রমণ স্থানীয়ভাবে (local lesion) হয়, সেখানে শ্বসন ক্রিয়া পেণ্টোজ ফসফেট বিক্রিয়া পথে চলে এরকম প্রমাণ পাওয়া গেছে। অ্যাগ্রো-ব্যাকটিরিয়াম আক্রান্ত বীট গাছে পেণ্টোজ ফসফেট বিক্রিয়া পথের জন্য প্রয়োজনীয় তিনটি এনজাইম ২—৩ গুণ বেশী পরিমাণে জমতে দেখা গেছে।

তবে রোগের আক্রমণ হলেই যে শ্বসন ক্রিয়া গ্লাইকোলিসিস ছেড়ে পেণ্টোজ

ফসফেট পথ ধরে চলে বা শুধুমাত্র রোগের আক্রমণের ক্ষেত্রেই এমন হয় তা নয়। আঘাত পেলে বা পরিবেশের পরিবর্তন হলেও এই রকম ঘটতে দেখা গেছে। বলা যায় যে অসুবিধাজনক অবস্থায় (stress condition) পড়লে গাছ স্বাভাবিক পথ ছেড়ে আংশিকভাবে বা পুরোপুরি পেণ্টোজ ফসফেট বিক্রিয়া পথে শ্বসন ক্রিয়া চালাতে পারে। তখন শ্বসনের হার বৃদ্ধি আবশ্যক হয়ে পড়ে।

সুস্থ অবস্থায় গাছে সবাত শ্বসনের পাশাপাশি অল্পমাত্রায় অবাত শ্বসনও চলতে পারে। তবে সাধারণতঃ অবাত শ্বসনকে দমিয়ে রাখা হয় যার ফলে শক্তির উৎস হিসাবে শ্বসন ক্রিয়ার কার্যকারিতা বাড়ে। একে বলা হয় **'পাস্ত্যর এফেক্ট'** (Pasteur effect)। রোগের আক্রমণ হলে গাছে পাস্ত্যর এফেক্টের কার্যকারিতা কমে যায় অর্থাৎ তখন সবাত শ্বসনের পাশাপাশি অবাত শ্বসন বর্দ্ধিত হারে চলতে থাকে। এর ফলে ATP কম তৈরী হয়। তখন প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহের জন্য রোগাক্রান্ত গাছে শ্বসন ক্রিয়ার হার বেড়ে যায়। রাস্ট ছত্রাক আক্রান্ত গম ও জাফরান, হেলিকোব্যাসিডিয়াম মোম্পা *(Helicobasidium mompa)* আক্রান্ত রাঙ্গা আলু ও অ্যাগ্রোব্যাকটিরিয়াম আক্রান্ত বীট গাছে পাস্ত্যর এফেক্ট অপসারিত হয় এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে।

শ্বসনের শেষ পর্যায়ে গ্লাইকোলিসিস ও ক্রেবস চক্রের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন বিজারিত কো-এনজাইম $NADH_2$, ফ্ল্যাভিন (flavine), সাইটোক্রোম-সি (cytochrome-C), সাইটোক্রোম অক্সিডেজ (cytochrome oxidase) প্রভৃতির সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে বিক্রিয়ার ফলে ইলেকট্রন স্থানান্তরের (electron transfer) এর মাধ্যমে জারিত হয়। এই পর্যায়ে $NADH_2$ জারিত হওয়ার সঙ্গে ATP সংশ্লেষ যুক্ত। শ্বসন ক্রিয়ার এই পর্যায়কে প্রান্তীয় জারণ (terminal oxidatlon) বলে। শ্বসনের ফলে উদ্ভূত শক্তির অধিকাংশ এই পর্যায়ে পাওয়া যায়। এখানে জারণের মূল দায়িত্ব সাইটোক্রোম অক্সিডেজের হলেও কোন কোন রোগে আক্রান্ত গাছে অন্য তিনটি প্রধান অক্সিডেজ এনজাইম যথা অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড অক্সিডেজ (ascorbic acid oxidase), পলিফেনল অক্সিডেজ (polyphenol oxidase) বা গ্লাইকলিক অ্যাসিড অক্সিডেজ (glycollic acid oxidase) এর কোন একটির পরিমাণ যথেষ্ট বেড়ে যেতে দেখা যায়। এর থেকে সন্দেহ হয় যে বিশেষ বিশেষ রোগের ক্ষেত্রে প্রান্তীয় জারণে সাইটোক্রোম অক্সিডেজ ছাড়া অন্য কোন অক্সিডেজেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকতে পারে।

রোগে আক্রান্ত হলে গাছে শ্বসনের হার বাড়ে ঠিকই তবে সব জাতির গাছে ঠিক একভাবে বাড়ে না। রোগ সংবেদনশীল জাতির গাছে আক্রমণ শুরু হবার

কিছু সময় পর থেকে শ্বসনের হার ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। যখন রোগ-লক্ষণ প্রকাশ হতে থাকে এবং ছত্রাকের ক্ষেত্রে স্পোর হতে শুরু করে তখন সর্বোচ্চ হারে শ্বসন চলতে দেখা যায়। তারপরে আক্রান্ত অংশ যতবেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে শ্বসনের হার তত কমে যায়। আর আক্রান্ত অংশ যদি ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে ওঠে তাহলে শ্বসনের হার ক্রমশঃ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছে আক্রমণের অল্প সময় পর থেকেই শ্বসনের হার দ্রুত বাড়তে থাকে, এক-দুদিনের মধ্যেই সাধারণতঃ সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছে যায় এবং তারপরই দ্রুত কমে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। গাছের প্রতিরোধ ক্ষমতার সঙ্গে অতি দ্রুত শ্বসনের হার বৃদ্ধির একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে এরকম ধারণা রয়েছে। রোগ প্রতিরোধের প্রয়োজনে গাছের দেহের আক্রান্ত অংশে, কোষের স্তরে, বিভিন্ন ধরণের পরিবর্তন অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ঘটে। নূতন প্রোটিন, এনজাইম ও ছত্রাক বা ভাইরাস বিরোধী যৌগ উৎপন্ন হয়, নূতন ভাজক কলারও সৃষ্টি হয়। এ সবের জন্যই শক্তির সরবরাহ প্রয়োজন। যেহেতু প্রতিরোধ সংক্রান্ত কার্যকলাপের ক্ষেত্রে দ্রুততার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি সেজন্য শক্তির উৎস হিসাবে শ্বসনের হার অতি দ্রুত বেড়ে যাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক মনে হয় না। শ্বসন ক্রিয়াকে দমিয়ে রাখতে পারে এরকম যৌগ প্রয়োগ করলে দেখা যায় যে আক্রান্ত রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছ তার প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে রোগ সংবেদনশীল হয়ে পড়ে এবং সেখানে রোগের লক্ষণ দেখা দিতে থাকে।

প্রোটিন ও নিউক্লিয়িক অ্যাসিড বিপাকীয় ক্রিয়া (Protein and nucleic acid metabolism)

যে সব রোগ উৎপাদক নিজেদের প্রোটিন সংশ্লেষ নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করে তাদের দ্বারা আক্রান্ত হলে গাছের প্রোটিন বিপাকীয় ক্রিয়া প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা থাকে। তবে রোগ উৎপাদকের বৃদ্ধির প্রয়োজন মেটাতে পোষক গাছের প্রোটিন বিপাকীয় ক্রিয়ার যতটা ব্যাঘাত ঘটার কথা সাধারণতঃ তার থেকে অনেক বেশী ব্যাঘাত ঘটতে দেখা যায়।

অনেক ভাইরাস আক্রান্ত গাছে নূতন প্রোটিনের পরিমাণ যে খুব বেশী হয় তা নয় যদিও যথেষ্ট সংখ্যায় ভাইরাস কণিকা তৈরী হয়। যা ঘটে তা হল প্রোটিন সংশ্লেষের ধারায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন।

অ্যাগ্রোব্যাকটিরিয়াম[১] দ্বারা আক্রান্ত গাছের টিউমারে স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশী প্রোটিন ও নিউক্লিয়িক অ্যাসিড পাওয়া যায়। আক্রান্ত

অংশের কোষগুলির দ্রুত বিভাজন ও অস্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন গাছই সরবরাহ করে যার ফলে আক্রান্ত গাছের চেহারায় নাইট্রোজেনের অভাবের লক্ষণ ফুটে ওটে। তামাক গাছের সিউডোমোনাস ট্যাবাসির আক্রমণে প্রোটিনের পরিমাণ কমে আর অ্যামাইনো অ্যাসিড জমে। বীন গাছে সিউডোমোনাস ফ্যাসিওলিকোলার আক্রমণ হলে প্রোটিনের মোট পরিমাণ বিশেষ কমে না কিন্তু মিথায়োনিন (methionine), অর্নিথিন (ornithine), ইত্যাদি কয়েকটি অ্যামাইনো অ্যাসিড খুব বেশী পরিমাণে জমতে দেখা যায়।

কিছু ছত্রাকজনিত রোগে প্রোটিনের পরিমাণ কমে যেমন সেপ্টোরিয়া এপিআই *(S. apii)* আক্রান্ত সেলেরি ও রাস্ট ছত্রাক আক্রান্ত ওট গাছে দেখা যায়। তবে শেষোক্ত ক্ষেত্রে অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরিমাণ বাড়তে দেখা গেছে। অন্যদিকে গমের মরিচা রোগে প্রোটিনের পরিমাণ ২ গুণ ও অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরিমাণ ৪ গুণ বাড়ে; কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিড ও অ্যামাইড (amide); যেমন—লিউসিন (leucine), অ্যাসপারাজিন (asparagine) ও হিস্টিডিন (histidine), পরিমাণে কমে অন্যদিকে অ্যাসপারটিক অ্যাসিড (aspartic acid), গ্লুটামিক অ্যাসিড (glutamic acid), গ্লুটামিন (glutamine) ইত্যাদির পরিমাণ বাড়ে। মরিচা ও ছাতাধরা রোগের আক্রমণে আক্রান্ত অংশে যে সবুজ দ্বীপের সৃষ্টি হতে দেখা গেছে সেখানে বর্দ্ধিত হারে প্রোটিন সংশ্লেষ হতে থাকে। আলু গাছে ফাইটফথোরা ইনফেস্ট্যানস *(P. infestans)* ও রাঙ্গা আলুতে সেরাটোসিস্টিস ও হেলিকোব্যাসিডিয়ামের আক্রমণ হলে আক্রান্ত অংশে ও সন্নিহিত অঞ্চলে বেশী পরিমাণে প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়। পরিমাণগত পরিবর্তন ছাড়াও আক্রান্ত গাছে প্রোটিনের প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। বাঁধাকপি গাছে ফিউজেরিয়াম অক্সিস্পোরাম, রাঙ্গা আলুতে সেরাটো-সিস্টিস *(Ceratocystis fimbriata)*, বীনে ইউরোমাইসেস ফ্যাসিওলি প্রভৃতি ছত্রাকের আক্রমণে নূতন ধরণের প্রোটিন তৈরী হয় বলে জানা যায়।

অনেক রোগেই আক্রান্ত গাছে নিউক্লিয়িক অ্যাসিডের স্তরে বেশ বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে বলে জানা গেছে। ভাইরাস আক্রান্ত গাছের কোষে ভাইরাসের RNA সংশ্লেষের জন্য প্রয়োজনীয় নিউক্লিওটাইড কোষের রাইবোজোম থেকেই পাওয়া যায়। নূতন ভাইরাস প্রোটিন তৈরী হওয়া ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন সাধারণতঃ দেখা যায় না। আক্রান্ত গাছে DNA এর পরিমাণের পরিবর্তন সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য কোন তথ্য নেই। অ্যাগ্রোব্যাক্টিরিয়ামের আক্রমণ হলে প্রায় ২ সপ্তাহ পরে টিউমারে DNA এর পরিমাণ বেশ বেড়ে যায়। এই

সময়ে টিউমারে বর্দ্ধিত হারে কোষ বিভাজন হয়। সম্ভবতঃ নূতন কোষ ও তার ক্রোমোজোমের জন্য DNA বর্দ্ধিত হারে সংশ্লেষিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে, ২৭ থেকে ৩৫ দিনের মধ্যে, RNA এর পরিমাণও কিছুটা বাড়ে। তামাক গাছে সিউডোমোনাস ট্যাবাসির আক্রমণে RNA এর পরিমাণ কিছুটা কমে। সন্দেহ হয় যে রাইবোনিউক্লিয়েজের কর্মতৎপরতা বেড়ে যাবার ফলেই এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়। রাস্ট বা পাউডারি মিলডিউ ছত্রাক আক্রান্ত গম গাছে RNA পরিমাণে বাড়ে। বাঁধাকপির শিকড় ফোলা রোগে সাধারণ কোষের তুলনায় প্লাজমোডিওফোরা আক্রান্ত স্ফীত কোষে নিউক্লিয়াসের আয়তন ৬ গুণ, নিউক্লিওলাসের আয়তন ৩০ গুণ ও DNA এর পরিমাণ ১৬ গুণ পর্যন্ত বেড়ে যেতে দেখা গেছে। ঐ রোগে মূলরোমের কোষে ছত্রাক প্রবেশের ২ ঘণ্টার মধ্যেই নিউক্লিওলাস আয়তনে বাড়তে শুরু করে, ২০ ঘণ্টায় ৬ গুণ বাড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে RNA এর পরিমাণও বাড়তে থাকে।

ফেনল বিপাকীয় ক্রিয়া (Phenol metabolism)

গাছের রোগ হলে আক্রান্ত অংশে প্রায়ই ফেনল জমতে দেখা যায়। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ায় ফেনল হাইড্রোজেন দাতা বা গ্রহীতার ভূমিকা পালন করে। কিছু ফেনল যেমন অক্সিনের কোষের বৃদ্ধি সংক্রান্ত কাজে বাধা দেয়, অন্য ফেনল আবার অক্সিনের কাজে সহায়তা করে। ফেনল শ্বসন ক্রিয়ায় ফসফোরিলেশন থেকে জারণকে বিযুক্ত করে ATP সংশ্লেষে বাধা দিয়ে শক্তির উপর নির্ভরশীল বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়ায় বাধার সৃষ্টি করে। ফেনল জারিত হওয়ার ফলে উৎপন্ন কুইনোন বিভিন্ন এনজাইম বিশেষ করে পেকটিক এনজাইমকে নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে। এর থেকে বোঝা যায় যে গাছে রোগের আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় ফেনলের পরিমাণ বেড়ে গেলে গাছের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ায় যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটতে পারে।

ফেনল তিনটি সম্ভাব্য বিক্রিয়া পথে (pathway) তৈরী হয়। এর মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল শিকিমিক অ্যাসিড বিক্রিয়া পথ (Shikimic acid pathway)। প্রাথমিক পর্যায়ে শ্বসনের গ্লাইকোলিসিস প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন ফসফোইনল পাইরুভেট (phosphoenol pyruvate) ও পেন্টোজ ফসফেট বিক্রিয়া পথে উৎপন্ন এরিথ্রোজ-৪-ফসফেট (erythrose-4-phosphate) এর মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে সাতটি কার্বনযুক্ত এক যৌগ উৎপন্ন হয় যার থেকে ধারাবাহিক বিক্রিয়ার ফলে শিকিমিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। শিকিমিক অ্যাসিডের সঙ্গে অ্যামাইন

যুক্ত হওয়ায় ফেনিলঅ্যালানিন (phenylalanine) অথবা টাইরোসিন (tyrosine) তৈরী হয়। এদের থেকে যথাক্রমে ফেনিলঅ্যালানিন অ্যামোনিয়া লায়েজ (phenylalanine ammonia lyase = PAL) ও টাইরোসিন অ্যামোনিয়া লায়েজ (tyrosine ammonia lyase) নামক এনজাইমের প্রভাবে বিভিন্ন রকম ফেনল উৎপন্ন হয়।

অনেক রোগেই আক্রান্ত গাছে ফেনলের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। সাধারণত রোগ সংবেদনশীল জাতির গাছের তুলনায় প্রতিরোধী জাতির গাছে ফেনল তাড়াতাড়ি উৎপন্ন হয় ও আক্রান্ত অংশে বেশী পরিমাণে জমে। এইভাবে দ্রুত ফেনল উৎপাদন ও বেশী পরিমাণে জমার সঙ্গে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার একটা সম্পর্ক আছে এমন ধারণাও রয়েছে। এ সম্বন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

শিকড় থেকে পাতায় জল সরবরাহ (Upward transport of water)

অনেক রোগ উৎপাদকই একাধিক উপায়ে কাণ্ডের মধ্য দিয়ে শিকড় থেকে পাতায় জল সরবরাহে বাধার সৃষ্টি করে। এদের মধ্যে ছত্রাক, ব্যাকটিরিয়া ও নিমাটোড রয়েছে। যে সব ছত্রাক উইল্ট রোগের সৃষ্টি করে তারা ট্র্যাকীয়াকে আক্রমণ করে ও তার ভিতরেই ছড়ায়। মূলতঃ দুটি কারণে এই রোগের সৃষ্টি হতে পারে বলে মনে করা হয়। প্রথমতঃ কাণ্ডের মধ্যে দিয়ে জলের প্রবাহে বাধার সৃষ্টি হলে পাতায় যথেষ্ট পরিমাণে জল পৌছায় না অথচ প্রস্বেদনের মাধ্যমে জল বেরিয়ে যায়। দ্বিতীয় সম্ভাব্য কারণ হল টক্সিনের প্রভাবে পাতার কোষে প্লাজমা আবরণীর ভেদ্যতায় এমন পরিবর্তন হতে পারে যার ফলে কোষ থেকে প্রচুর জল বেরিয়ে যায় যা সাধারণ সরবরাহ থেকে পূরণ করা সম্ভব হয় না। তখন জলের অভাবে পাতার কোষগুলি তাদের রসস্ফীত অবস্থা হারিয়ে ফেলে—পাতাটিও নেতিয়ে পড়ে।

উইল্ট রোগে কাণ্ডের মধ্যে দিয়ে জলের প্রবাহের গতি সুস্থ গাছের তুলনায় অনেক কম এর যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। এই ধরণের রোগে ট্র্যাকীয়াতে জলের প্রবাহে বাধা স্বাভাবিকের তুলনায় ৬০ গুণ বেড়ে যেতে দেখা গেছে। ফিউজেরিয়াম আক্রান্ত টম্যাটো গাছে জলের প্রবাহের গতি কমে স্বাভাবিকের এক শতাংশে দাঁড়িয়েছে এমন তথ্যও আছে। প্রধানতঃ দুটি কারণে এই বাধার সৃষ্টি হতে পারে—প্রত্যক্ষভাবে, রোগ উৎপাদকের ট্র্যাকীয়াতে বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়ার ফলে, বা অপ্রত্যক্ষভাবে, রোগ উৎপাদকের দ্বারা উৎপন্ন বা তার আক্রমণের ফলে উৎপন্ন রাসায়নিক যৌগ ট্র্যাকীয়ার মধ্যে জমে গেলে। এছাড়া

অন্য কিছু রোগেও জল সরবরাহ সীমিতভাবে বিঘ্নিত হতে দেখা গেছে। অ্যাগ্রোব্যাকটিরিয়াম, প্লাজমোডিওফোরা, মেলয়ডোগাইন প্রভৃতির আক্রমণে শিকড়ে গলের সৃষ্টি জলে জাইলেম সংলগ্ন প্যারেনকাইমার অস্বাভাবিক আয়তন বৃদ্ধি ঘটে। তার ফলে পাশে থেকে চাপ পড়ায় ট্র্যাকীয়ার (বিশেষ করে অপরিণত ট্র্যাকীয়ার যার দেওয়াল তখনও যথেষ্ট শক্ত হয়ে ওঠেনি) দেওয়াল ভিতরে ঢুকে যায় (vessel collapse)। এই অবস্থায় ট্র্যাকীয়ার পরিবহন ক্ষমতা খুব কমে যায়।

রোগ উৎপাদক ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়া তার নিজের উপস্থিতির দ্বারা ট্র্যাকীয়ার পরিবহন ক্ষমতায় কতটা বাধার সৃষ্টি করতে পারে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। একথা ঠিক যে আক্রান্ত গাছে বেশ কিছু ট্র্যাকীয়া ছত্রাকের হাইফা ও স্পোর বা ব্যাকটিরিয়া দ্বারা প্রায় ভর্তি হয়ে থাকে। টম্যাটোর ফিউজেরিয়াম উইল্ট রোগের ক্ষেত্রে ট্র্যাকীয়াতে ছত্রাকের উপস্থিতির দরুণ রোগসৃষ্টির সম্ভাবনা ওয়াগোনার ও ডাইমণ্ড (P. E. Waggoner and A. E. Dimond, 1954) বিস্তৃতভাবে পর্যালোচনা করেছেন। কৃত্রিম মডেল ব্যবহার করে তারা দেখিয়েছেন যে জলের চাপ অপরিবর্তিত থাকলে একটি ট্র্যাকীয়াতে ১০টি হাইফার উপস্থিতি জলের প্রবাহে স্বাভাবিকের তুলনায় ৬ গুণ বাধার সৃষ্টি করে অর্থাৎ আগের তুলনায় শতকরা ১৭ ভাগ মাত্র জল ট্র্যাকীয়ার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। শতকরা ৫০ ভাগ জায়গা হাইফা দিয়ে ভরে আছে এরকম একটি ট্র্যাকীয়ার মধ্য দিয়ে জলের প্রবাহ স্বাভাবিক রাখতে গেলে জলের চাপ বহুগুণ বাড়াতে হয়। পাতার বোঁটায়, যেখানে নালিকা বাণ্ডিলগুলির মধ্যে কাণ্ডের মত কোন যোগাযোগ (by pass) থাকে না, একই অবস্থায় প্রায় ৫০০ গুণ চাপ বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। ফিউজেরিয়াম ও ভার্টিসিলিয়াম দ্বারা গুরুতরভাবে আক্রান্ত গাছে শতকরা ৪০—৫০ ভাগ ট্র্যাকীয়াতে ছত্রাকের উপস্থিতি দেখা যায়। তবে মনে রাখতে হবে গাছের পরিবহণ ক্ষমতা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই বেশী। সমস্ত দিক পর্যালোচনা করে ডাইমণ্ড এই সিদ্ধান্তে আসেন যে ট্র্যাকীয়াতে ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়ার উপস্থিতি জলের প্রবাহে নিঃসন্দেহে যথেষ্ট বাধার সৃষ্টি করলেও এককভাবে পাতা নেতিয়ে পড়ার জন্য দায়ী নয়।

অনেক উইল্ট রোগে ট্র্যাকীয়া সংলগ্ন প্যারেনকাইমার আয়তন বৃদ্ধি হতে থাকলে সেটি মধ্যচ্ছদার কূপ পর্দা অঞ্চলে প্রসারিত হয়ে ট্র্যাকীয়ার গহ্বরে বেলুনের আকার নেয় যাকে বলে টাইলোজ (tylose)। ট্র্যাকীয়ার মধ্যে বেশী সংখ্যায় টাইলোজ হলে সেটি জল পরিবহণের পক্ষে অযোগ্য হয়ে পড়ে।

ফিউজেরিয়াম আক্রান্ত টম্যাটো ও তরমুজ, সেরাটোসিস্টিস আক্রান্ত ওক ও আরও কিছু উইল্ট রোগে রোগ সংবেদনশীল জাতির গাছে ট্র্যাকীয়ায় প্রচুর টাইলোজ হয়। এইসব ক্ষেত্রে মনে হয় যে টাইলোজ ট্র্যাকীয়ার মধ্য দিয়ে জল সরবরাহে নিশ্চিতভাবে কিছুটা বাধার সৃষ্টি করে।

সিউডোমোনাস সোল্যানেসীয়ারাম আক্রান্ত গাছে ব্যাকটিরিয়া দ্বারা উৎপন্ন একরকম হড়হড়ে পদার্থ বা স্লাইম (slime) ট্র্যাকীয়ার গহ্বর প্রায় বন্ধ করে দেয় এবং জল সরবরাহে বিশেষ বাধার সৃষ্টি করে। রাসায়নিক দিক থেকে স্লাইম হল জটিল ধরণের শর্করা। উগ্র জাতির সিউডোমোনাসকে দুর্বল জাতির তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে স্লাইম উৎপাদন করতে দেখা গেছে। সিউডোমোনাস উইল্ট রোগে স্লাইমের ভূমিকা সাধারণভাবে স্বীকৃত। স্লাইম ট্র্যাকীয়ার মধ্য দিয়ে প্রবহমান তরলের ঘনত্ব বাড়িয়ে প্রবাহের গতি ক্রমশঃ কমিয়ে আনে এবং শেষ পর্যায়ে ট্র্যাকীয়ার গহ্বর সম্পূর্ণভাবে স্লাইমে ভরে যায়।

অনেক উইল্ট রোগে ট্র্যাকীয়ার মধ্যে থকথকে, আঠালো 'জেল' (gel) ও 'গাম' (gum) জমতে দেখা যায়। প্রথমে জেল জমে। জেলের প্রধান উপাদান মাঝারি আকারের পেকটিক যৌগ। ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়া দ্বারা উৎপন্ন পেকটিক এনজাইম ট্র্যাকীয়ার দেওয়ালে কূপ পর্দা সংলগ্ন অঞ্চলে পেকটিক যৌগকে অসম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে বড় বড় টুকরায় পরিণত করে। এগুলি সাধারণতঃ ট্র্যাকীয়ার জলপ্রবাহের সঙ্গে মেশে এবং পরিমানে বেশী হলে জেল এর আকার নেয়। পরবর্তী পর্যায়ে ফেনল জারিত হলে কুইনোন থেকে যে রঞ্জক পদার্থ মেলানিন উৎপন্ন হয় তার সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে জেল বাদামী রঙের গামে পরিণত হয়। সাধারণভাবে উইল্ট রোগ সৃষ্টিতে জেল বা গামের কোন ভূমিকা আছে বলে মনে হয় না। তবে পেকটিক যৌগের ভাঙ্গা টুকরাগুলি দুটি ট্র্যাকীয়ার মাঝখানের দেওয়ালের (vessel end plate) ছিদ্রগুলি বন্ধ করে দেয় এরকম প্রমাণ রয়েছে। এর ফলেই ট্র্যাকীয়া আর জল সরবরাহ করতে পারে না। যখন অধিকাংশ ট্র্যাকীয়া বিশেষ করে বৃহত্তর ব্যাসবিশিষ্ট ট্র্যাকীয়াগুলি, যারা জল সরবরাহে মুখ্য ভূমিকা পালন করে, এইভাবে অকেজো হয়ে পড়ে তখন জলের অভাবে পাতা নেতিয়ে পড়ে। প্রথমে নীচের দিকের পাতাগুলি জলের অভাবে নেতিয়ে পড়ে। উপরের পাতাগুলি তখনও তাদের উচ্চতর শোষণ টানের ক্ষমতার (suction tension) জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রায় জল সংগ্রহ করতে পারে। পরে ক্রমশঃ উপরের পাতাগুলিও নেতিয়ে পড়ে।

প্রস্বেদন (Transpiration)

বিভিন্ন ধরণের রোগের আক্রমণের ফলে গাছে প্রস্বেদনের হারে পরিবর্তন ঘটতে দেখা গেছে। যে সব রোগে পাতায় ক্ষতের সৃষ্টি হয় সেখানে কিউটিকল ও এপিডার্মিস নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে প্রস্বেদনের হার অনেক বেড়ে যায়। প্রস্বেদনের ফলে স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশী জল যদি বেরিয়ে যায় তখন পাতার কোষগুলি তাদের স্বাভাবিক স্ফীত অবস্থা হারিয়ে ফেলে। এর ফলে পাতায় অস্বাভাবিক বেশী রকমের শোষণ টানের সৃষ্টি হলে নীচের দিকের কিছু ট্র্যাকীয়া দুমড়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সেই অবস্থায় জল সরবরাহে আরও বাধার সৃষ্টি হয়। যে সব ছত্রাক টক্সিন উৎপাদনে সক্ষম তাদের আক্রমণ হলে টক্সিনের প্রভাবে পাতার কোষে প্লাজমা আবরণীর ভেদ্যতা বেড়ে যাওয়ার ফলে প্রস্বেদনের হার বেড়ে যায় ও পাতা শুকিয়ে যায়। উইল্ট রোগের ক্ষেত্রেও এই ধরণের কিছু তথ্য রয়েছে যদিও কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই। কিছু ভাইরাস রোগে প্রস্বেদনের হার কমতে দেখা গেছে। বার্লির ইয়েলো ডোয়ার্ফ (yellow dwarf) রোগে শিকড় খুব ছোট হয়ে যাওয়ায় আর আলুর লীফ রোল রোগে পাতায় স্টোমা পুরোপুরি না খোলার দরুণ প্রস্বেদনেব হার কমে বলে মনে করা হয়।

পাতা থেকে বিভিন্ন অঙ্গে খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহ (Translocation of organic nutrients)

পাতায় তৈরী বিভিন্ন রকম খাদ্যবস্তু দ্রব অবস্থায় প্যারেনকাইমা কোষ থেকে প্লাজমোডেসমার মধ্য দিয়ে পার্শ্ববর্তী ফ্লোয়েমের সীভ নলে (sieve tube) প্রবেশ করে ও ফ্লোয়েমের ভিতর দিয়ে গাছের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয়। বিভিন্ন অংশে পৌছানর পর আবার প্লাজমোডেসমার মধ্য দিয়ে পরিবাহিত খাদ্যবস্তু ফ্লোয়েম থেকে দেহের সাধারণ কোষে প্রবেশ করে এবং প্রয়োজনানুসারে ব্যবহৃত হয় বা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত হয়। বিভিন্ন রোগে খাদ্যদ্রব্যের এই পরিবহণ ব্যবস্থা, যার উপর গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্য নির্ভর করে, নানাভাবে বিঘ্নিত হতে পারে।

মরিচা, ছাতাধরা প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত অংশে শর্করা জাতীয় ও অন্যান্য জৈব পদার্থ জমতে দেখা যায়। আক্রান্ত অংশে সালোকসংশ্লেষের হার কম। তা সত্ত্বেও স্টার্চ (starch) ও অন্যান্য খাদ্যবস্তু সেখানে স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে জমে। সেজন্য ধারণা হয় যে চারিপাশের অঞ্চল থেকে খাদ্যবস্তু আক্রান্ত অংশে এসে জমে।

ভাইরাসজনিত কিছু রোগে, যেমন লীফ কার্ল ও ইয়েলোজ ধরণের রোগ, বিভিন্ন গাছের পাতায় স্টার্চ জমতে দেখা যায়। সাধারণতঃ ভাইরাস আক্রমণের ফলে ফ্লোয়েম নষ্ট হয়ে গেলে স্টার্চ পাতা থেকে অন্যত্র পরিবাহিত হতে পারে না, সেজন্য সেখানেই জমে থাকে। আবার অন্য কিছু ভাইরাস রোগে স্টার্চকে গ্লুকোজে পরিণত করে যে এনজাইম সেই অ্যামাইলেজের নিষ্ক্রিয়তা বা স্বল্পতার জন্য স্টার্চ অপসারিত না হওয়ার ফলে পাতাতেই জমে থাকে।

প্রাসঙ্গিক পুস্তক ও গবেষণাপত্রাদি

Dimond, A. E. 1970. Biophysics and biochemistry of the vascular wilt syndrome. *Ann. Rev. Phytopathol.* **8**: 301 – 322.

Heitefuss, R., and P.H. Williams (eds.). 1976. "Physiological Plant Pathology". Springer-Verlag, Berlin.
Daly, M. The carbon balance of diseased plants : changes in respiration, photosynthesis and translocation, 450 – 479.
Uritani, I. Protein metabolism, 509 – 521.

Lakshminarayanan, K. 1955. Some biochemical aspects of vascular wlits. *Proc. Indian Acad. Sci.* Sect. B. **64**: 132 – 144.

Millerd, A., and K. J. Scott. 1962. Respiration in the diseased plant. *Ann. Rev. Plant Physiol.* **13**: 569 – 574.

Sadasivan, T. S. 1964. Respiration in plants under pathogenesis. *Indian Phytopathol.* **17** : 263 – 272.

Talboys, P. W. 1978. Dysfunction of the water system. In "Plant Disease : An Advanced Treatise" (J. G. Horsfall and E. B. Cowling, eds.). Vol. 3, 141—162. Academic Press. New York.

Uritani, I. 1971. Protein changes in diseased plants. *Ann. Rev. Phytopathol.* **9** : 211—234.

Wheeler, H., and P. Hanchey. 1968. Permeability phenomenon in plant diseases. *Ann. Rev. Microbiol.* **17** : 223 – 242.

১৫ গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা

প্রকৃতিতে যেমন বহু বিচিত্র ধরণের গাছ আছে তেমনি রোগ সৃষ্টির ক্ষমতা-সম্পন্ন অজস্র জীবাণু বা অন্য ধরণের রোগ উৎপাদকও পাশাপাশি রয়েছে। অধিকাংশ প্রজাতির গাছই তাদের জীবিতকালে বিভিন্ন ধরণের রোগ উৎপাদকের সংস্পর্শে আসে। তা সত্বেও তারা সাধারণতঃ সুস্থ জীবন যাপন করে, কখনও কখনও মাত্র রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং বলা যায় যে অন্য জীবের মত গাছের ক্ষেত্রেও সুস্বাস্থ্যই স্বাভাবিক ঘটনা, রোগ একটি ব্যতিক্রম মাত্র। যে কোন প্রজাতির গাছ গড়পড়তা প্রায় এক'শর মত রোগ উৎপাদকের দ্বারা আক্রান্ত হলেও মাত্র কয়েকটির আক্রমণে গুরুতর রোগের সৃষ্টি হয়। এর থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে গাছের সহজাত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাই তাকে অধিকাংশ রোগ উৎপাদকের আক্রমণ প্রতিহত করতে সাহায্য করে। যে সব রোগে গুরুতর ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে সেখানেও কিন্তু পোষক গাছের সব জাতি রোগের আক্রমণ হলে সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। সহজাত এই রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা অন্যান্য অনেক বৈশিষ্ট্যের মতই জীন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং উত্তরাধিকার সূত্রে এক জন্থ থেকে পরবর্তী জন্থতে স্থানান্তরিত হয়। একটি গাছকে তখনই রোগ সংবেদনশীল বলা হয় যখন তার সহজাত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কোন একটি রোগ উৎপাদকের আক্রমণ প্রতিহত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়, প্রতিরোধ ক্ষমতা পুরোপুরি কার্যকরী হয়ে উঠতে অনেক সময় লাগে অথবা রোগ উৎপাদক সক্রিয়ভাবে গাছের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বিপর্যস্ত করে ফেলে সফলভাবে আক্রমণ করতে পারে। পরিবেশের পরিবর্তন ঘটলে গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা পুরোপুরি কার্যকরী না হতেও পারে। বিভিন্ন রোগ উৎপাদকের বিরুদ্ধে একটি গাছের রোগ প্রতিরোধের পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে এবং আলাদা আলাদা জীন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এমনকি কোন বিশেষ রোগ উৎপাদকের আক্রমণ প্রতিহত করতে গাছ একাধিক পদ্ধতিও অবলম্বন করতে পারে। গাছের বিভিন্ন বয়সে এবং বিভিন্ন অঙ্গে আক্রমণের সম্ভাবনা থাকায় এমন হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

অনেক সময় গাছের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এমন কোন গঠনগত বা রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য থাকে যার ফলে রোগ উৎপাদকের গাছের দেহে প্রবেশের

সময় বা তার পরেও দেহের ভিতরে ছড়িয়ে পড়ার পথে বাধার সৃষ্টি হয়। এই ধরণের প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে প্রাক-আক্রমণ (pre-infectional) বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (passive or static defence) বলা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রোগ সংবেদনশীল ও রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছের দেহে রোগ উৎপাদক প্রায় একইভাবে প্রবেশ করে। রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছে আক্রমণের প্রতিক্রিয়া হিসাবে দ্রুত এক সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে ওঠে যার ফলে হয় রোগ উৎপাদকের গাছের দেহের ভিতরে ছড়ানোর পথে বাধার সৃষ্টি হয় বা রোগ উৎপাদক নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এই দ্বিতীয় ধরনের প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে আক্রমণোত্তর (post-infectional) বা সক্রিয় (active or dynamic defence) প্রতিরোধ বলা হয়। নিষ্ক্রিয় বা সক্রিয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুইই গঠনগত বা রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গাছে আগে থেকে তৈরী অবস্থায় কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা থাকে না (ready made defence), যা থাকে তা হল আক্রমণ হলে বিশেষ পদ্ধতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠার জীন নিয়ন্ত্রিত সুপ্ত প্রতিরোধ ক্ষমতা। বিভিন্ন রোগ উৎপাদকের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধের ধরণ একরকম না হতেও পারে। কোথাও কোথাও সক্রিয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা চালু হওয়ার ব্যাপারে রোগ উৎপাদকেরও বিশেষ কোন ভূমিকা থাকতে পারে বলে মনে করা হয়। রোগের আক্রমণের বিরুদ্ধে গাছের প্রতিরোধ নিম্নলিখিত যে কোন বা একাধিক উপায়ে ঘটতে পারে : (ক) গাছের দেহে প্রবেশের পথে রোগ উৎপাদককে বাধাদান, (খ) দেহের ভিতরে রোগ উৎপাদকের ছড়িয়ে পড়ার পথে বাধাদান, (গ) রোগ উৎপাদককে নিষ্ক্রিয় বা নষ্ট করে ফেলা ও (ঘ) দেহের ভিতরে রোগ উৎপাদকের উপস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়া।

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Static defence)

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ প্রথম আক্রমণের সময় বা তার পরবর্তী পর্যায়ে দেহের ভিতরে ঘটতে পারে। এর ফলে গাছ যে সম্পূর্ণভাবে রোগের আক্রমণ প্রতিরোধে সক্ষম হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা নয়। তবে আংশিকভাবে সফল হলেও আক্রমণের গতি নিশ্চিতভাবে কিছুটা প্রতিহত হয় ও আক্রমণের তীব্রতা কমে এবং এর ফলে গাছ তার অপেক্ষাকৃত কার্যকরী সক্রিয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা চালু করার জন্য কিছুটা সময় পায়। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ গাছের গঠনগত বৈশিষ্ট্য বা জীবরাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে।

ক। গাছের দেহের ভিতরে রোগজীবাণুর প্রবেশে বাধাদান

১। **গঠনগত প্রতিরোধ :** কোন রোগ উৎপাদককে গাছের দেহে প্রবেশ করতে হলে ত্বক ভেদ করতে হয় যদি না সেখানে কোন ছিদ্র বা ক্ষত থাকে। সুতরাং গাছের দিক থেকে রোগ প্রতিরোধের প্রথম প্রাচীর (first line of defence) হল তার ত্বক। ত্বকের বাইরের অংশ হল কিউটিকল যা প্রধানত: নিষ্ক্রিয় (inert) প্রকৃতির রাসায়নিক যৌগ কিউটিন দিয়ে তৈরী। এছাড়া কিউটিকলে কিছু মোম জাতীয় পদার্থও থাকে। মোম জাতীয় পদার্থের পরিমাণ বেশী হলে ত্বক খুব মসৃণ ও চকচকে হয় যার ফলে সেখানে জল দাঁড়াতে পারে না। এই অবস্থায় ব্যাকটিরিয়ার পক্ষে বা অধিকাংশ ছত্রাকের স্পোরের পক্ষে অঙ্কুরিত হয়ে দেহের মধ্যে প্রবেশ করা কঠিন। সাইডার (Cider) জাতির আপেলে স্ক্যাব রোগের ও ইউক্যালিপটাস গাছে ফিওসেপ্টোরিয়ার (*Phaeoseptoria eucalyptii*) আক্রমণের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ত্বকে মোম জাতীয় পদার্থের পরিমাণ বেশী হলে আক্রমণের তীব্রতা কম হয়।

যে সব রোগে ছত্রাক ত্বক ভেদ করে দেহের ভিতরে প্রবেশ করে সেখানে কোথাও কোথাও কিউটিকল কতটা পুরু ও শক্ত তার উপর ছত্রাকের আক্রমণের সফলতা নির্ভর করতে পারে। কিছু রোগের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে রোগ সংবেদনশীল জাতির তুলনায় রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছে কিউটিকল অপেক্ষাকৃত পুরু হয় ; যেমন—কফি-কোলেটোট্রাইকাম কফীয়ানাম (*C. coffeanum*), স্ট্রবেরি—স্ফিরোথেকা ম্যাকুলারিস (*S. macularis*) ও লেবু (lime)—গ্লিওস্পোরিয়াম লিমেট্টিকোলা (*G. limetticola*)। রাইজোকটোনিয়াজনিত কিছু রোগে দেখা যায় যে কেবলমাত্র ছোট চারায়, যেখানে কিউটিকল খুব পাতলা, আক্রমণ হয় কিন্তু চারা একটু বড় হলে, যখন কিউটিকল বেশ পুরু হয়ে যায়, আর আক্রমণ হয় না। তবে মার্টিন (J.T. Martin, 1964) মনে করেন যে কিউটিকল ছত্রাকের প্রবেশের পথে কোন বড় রকমের প্রতিবন্ধক নয়।

কিউটিকলের নীচে এপিডার্মিস কোষের বাইরের দেওয়াল কতটা পুরু ও সুদৃঢ় তার উপরও গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কিছুটা নির্ভর করতে পারে, যেমন বারবেরী গাছে পাকসিনিয়া গ্র্যামিনিস, তিসিতে মেলাম্পসোরা লিনি ও আলুতে পিথিয়াম ডিব্যারীয়ানামের আক্রমণের ক্ষেত্রে দেখা যায়। সবসময় দেওয়ালের আক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষমতা শুধু সেটি কতটা পুরু তার উপর নির্ভর করে না, লিগনিন, সুবেরিন ইত্যাদি জমলেও এই ক্ষমতা বাড়ে। এপিডার্মিস কোষের বাইরের দেওয়ালে সিলিসিক অ্যাসিড (sillicic acid) জমার সঙ্গে

বিভিন্ন জাতির ধান গাছে ঝলসা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার একটি সম্পর্ক দেখা যায়। যে সব অবস্থায় সিলিসিক অ্যাসিড বেশী জমে, যেমন জলে ডোবা অবস্থায় চারা লাগালে অথবা গাছে সিলিসিক অ্যাসিড প্রয়োগ করলে, ধান গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কিছুটা বাড়ে (H. Yoshii, 1941)।

অনেক গাছে কোন কারণে ত্বক নষ্ট হয়ে গেলে সেখানে একাধিক কোষের স্তরবিশিষ্ট পেরিডার্ম (periderm) গড়ে ওঠে। পেরিডার্মের কোষগুলির দেওয়ালে সুবেরিন জমার ফলে সেটি ভেদ করে ছত্রাকের সোজাসুজি প্রবেশের পথে নিঃসন্দেহে কিছুটা বাধার সৃষ্টি হয়। আলুর পাউডারি স্ক্যাব *(Spongospora subterranea)* রোগে দেখা গেছে পেরিডার্ম চওড়া হলে প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী হয়।

অনেক ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়া স্টোমার ছিদ্রের মধ্য দিয়ে গাছের দেহে প্রবেশ করে। কদাচিৎ দেখা যায় যে স্টোমার আকৃতি ও অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য ব্যাকটিরিয়ার গাছের দেহে প্রবেশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। গ্রেপফ্রুট (grapefruit) জাতির লেবুতে স্টোমার ছিদ্র বড় ও উপরটি চওড়া হওয়ায় সহজেই জলের সঙ্গে ব্যাকটিরিয়া *(Santhomonas citri)* ভিতরে ঢুকতে পারে কিন্তু ম্যাণ্ডারিন জাতির লেবুতে ছিদ্র ছোট ও উপরটি বেশ উঁচু হওয়ায় জল জমা কঠিন, সেজন্য ব্যাকটিরিয়া সহজে প্রবেশ করতে পারে না।

কিছু রোগ উৎপাদক ছত্রাক লেন্টিসেলের মধ্য দিয়ে গাছের দেহে প্রবেশ করে। আয়তনে ছোট লেন্টিসেলের তুলনায় বড় লেন্টিসেলের মধ্য দিয়ে আক্রমণ করা অনেক সহজ কারণ প্রথম ক্ষেত্রে ভিতরের 'কমপ্লিমেন্টারি' কোষগুলি (complementary cells) ঘনসন্নিবিষ্ট অবস্থায় থাকার ফলে ছত্রাক সহজে ভিতরে ঢুকতে পারে না। আপেলের স্ক্যাব ও সিউডোমোনাস প্যাপুলোসাম *(P. papulosum)* জনিত রোগে এবং প্লামের ব্রাউন রট রোগে এই রকম ঘটে। লেন্টিসেলের ভিতরে একটু নীচের দিকে যে কর্ক কোষের স্তর গড়ে ওঠে তাদের দেওয়ালে স্বাভাবিক নিয়মে সুবেরিন জমে যার ফলে ছত্রাকের পক্ষে কর্কের স্তর ভেদ করে দেহের গভীরে প্রবেশ করা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। যে সব জাতির আলুতে লেন্টিসেল অনেক দেরীতে পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ কর্ক কোষে খুব ধীরে ধীরে সুবেরিন জমতে থাকে তারা সাধারণতঃ স্ক্যাব রোগের আক্রমণে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২। জীবরাসায়নিক প্রতিরোধ: গাছের দেহমধ্যস্থ নানা রাসায়নিক যৌগ ত্বকের মধ্যে দিয়ে ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বেরিয়ে আসে ও ত্বকের উপরে

জমে। সবথেকে বেশী নিঃসরণ হয় শিকড় থেকে। দেহনিঃসৃত পদার্থের মধ্যে শর্করা, অ্যামাইনো অ্যাসিড, গ্লুকোসাইড, জৈব অ্যাসিড ইত্যাদি ছাড়া কখনও কখনও এমন ধরণের যৌগ থাকে যার বিশেষ কোন রোগ উৎপাদকের উপর ক্ষতিকর প্রভাব থাকতে পারে। এর প্রমাণ প্রথম পাওয়া যায় ওয়াকার (J. C. Walker) ও তার সহকর্মীদের কাজ থেকে। বেগুনী বা গোলাপী রঙের পেঁয়াজ সাধারণতঃ স্মাজ (smudge) রোগে আক্রান্ত হয় না। এই ধরণের পেঁয়াজের বাইরে পাতলা কাগজের মত আবরণ থাকে যার কোষগুলি মৃত। এই আবরণের উপর জল জমলে মৃত কোষ থেকে প্রোটোক্যাটেচুয়িক অ্যাসিড (protocatechuic acid) ও ক্যাটেকল (catechol) নামক ফেনল জাতীয় যৌগ বেরিয়ে এসে ত্বকের উপর জমে। এর ফলে সেখানে স্মাজ (smudge) রোগ উৎপাদক কোলেটোট্রাইকাম সারসিনানস *(C. circinans)* এর স্পোরের অঙ্কুরোদ্গম হতে পারে না। দেখা গেছে যে উপরের পাতলা আবরণীটি সরিয়ে দিলে স্পোর অঙ্কুরিত হয় ও স্বাভাবিক আক্রমণ ঘটে। সাদা পেঁয়াজে, যেখানে আবরণীটি পুরু ও কোষগুলি জীবিত, সেখানে এই ধরণের নিঃসরণ হয় না, ফলে পেঁয়াজ স্মাজ রোগে আক্রান্ত হয়। পেঁয়াজের অন্য একটি রোগ উৎপাদক ডিপ্লোডিয়া নাটালেনসিসের *(D. natalensis)* ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটে। প্রোটোক্যাটেচুয়িক অ্যাসিডে ক্ষতিগ্রস্ত হয়না এরকম ছত্রাক,যেমন অ্যাসপারজিলাস নাইজার *(A. niger)*, সহজেই গোলাপী/বেগুনী রঙের পেঁয়াজকে আক্রমণ করতে পারে। সার্কোস্পোরা লীফ স্পট প্রতিরোধী বীট গাছের পাতা থেকেও এমন কিছু ক্ষতিকারক যৌগ নিঃসৃত হয় যা সার্কোস্পোরা *(C. beticola)* স্পোরের অঙ্কুরোদ্গমে বাধা দেয়।

জমিবাহিত রোগের ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও শিকড় থেকে নিঃসৃত বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগের রোগ প্রতিরোধে কিছু অংশ থাকতে পারে এরকম একটা ধারণা আছে। তিসির ফিউজেরিয়াম উইল্ট রোগে টিমোনিন (M. G. Timonin, 1940) দাবী করেছিলেন যে রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছের শিকড় থেকে মাটিতে এত বেশী পরিমাণে হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড (hydrocyanic acid) নিঃসৃত হয় যা রোগ উৎপাদক ছত্রাকের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। রোগ সংবেদনশীল জাতির গাছের নিঃসরণে হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিডের পরিমাণ অনেক কম থাকে। মটরের ও কলার ফিউজেরিয়াম উইল্ট রোগের ক্ষেত্রে বাক্সটন (E. M. Buxton, 1957, 1962) দেখিয়েছেন যে রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছের শিকড়নিঃসৃত রস রোগ উৎপাদক ছত্রাকের স্পোরের অঙ্কুরোদ্গম

ব্যাহত করে। তাঁর মতে একে রোগ প্রতিরোধের প্রাথমিক পর্যায় বলে গণ্য করা যেতে পারে যার ফলে শিকড় সংলগ্ন অঞ্চলে ইনোকুলামের পরিমাণ সীমিত থাকে এবং আক্রমণের তীব্রতা অনেকটা কমে।

কিউটিকলে ছত্রাকের পক্ষে ক্ষতিকর কোন যৌগ থাকার জন্য সেখানে রাসায়নিক উপায়ে রোগ প্রতিরোধের সম্ভাবনা কোথাও কোথাও দেখা যায়। ছাতাধরা রোগ প্রতিরোধী জাতির আপেলের পাতায় কিউটিকলে এক রকম মোম জাতীয় পদার্থ থাকে যা রোগ উৎপাদক ছত্রাকের পক্ষে ক্ষতিকর। এই জাতের পাতা থেকে সংগৃহীত মোমের নির্যাস রোগ সংবেদনশীল জাতির গাছের পাতায় ছড়িয়ে দিলে সেখানে ত্বকের উপর ছত্রাকের *(Podosphaera leucotricha)* স্পোরের অঙ্কুরোদ্গম হয় না।

খ। গাছের দেহের ভিতরে রোগজীবাণুর প্রসারে বাধাদান :

সাধারণতঃ ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়া গাছের দেহে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়। তার পরে কিছু কিছু রোগের ক্ষেত্রে দেহের গঠনগত বা রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের জন্য তারা গাছের ভিতরে বিশেষ ছড়াতে পারে না এবং খাদ্যের অভাবে ক্রমশঃ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

১। গঠনগত প্রতিরোধ : গাছের দেহের যে সব কোষের দেওয়ালে লিগনিন জমে সেগুলির সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন রকমের কলা গাছকে শারীরিক শক্তি জোগায়। এপিডার্মিসের নীচে হাইপোডার্মিসের স্ক্লেরেনকাইমা কোষ ছাড়াও জাইলেম কলায় ট্র্যাকীয়া, ট্র্যাকাইড ও জাইলেম স্ক্লেরেনকাইমা থাকে যা গাছের এই ধরণের শক্তির মূল উৎস। ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়া স্ক্লেরেনকাইমা কোষের দেওয়াল ভেদ করতে পারে না। ছত্রাককে কদাচিৎ ট্র্যাকীয়া বা ট্র্যাকাইডের দেওয়াল ভেদ করতে দেখা যায়। সুতরাং এই ধরণের কোষের অবস্থানগত বৈশিষ্ট্যের জন্য দেহের ভিতরে ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়ার ছড়িয়ে পড়ার পথে বাধার সৃষ্টি হতে পারে। একে প্রতিরোধের প্রাচীর বলা যায়। গম গাছের পাতায় এপিডার্মিসের নীচে হাইপোডার্মিস স্তরে কিছুটা প্যারেনকাইমা ও কিছুটা স্ক্লেরেনকাইমা কোষ পর পর থাকে। লিটল ক্লাব (Little club) বা মার্কুইস (Marquis) জাতির গাছের তুলনায় হাইপোডার্মিসে স্ক্লেরেনকাইমার পরিমাণ প্যারেনকাইমা অপেক্ষা অনেক বেশী হওয়ায় সোনেম এমার (Sonem emmer) জাতির গম গাছ মরিচা (ব্ল্যাক বা ইয়েলো রাস্ট) রোগের আক্রমণে অনেক কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক সময়

শিরার উপস্থিতির জন্য ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়া চারিদিকে ছড়াতে পারে না। এর ফলে জালের ন্যায় শিরাবিন্যাসযুক্ত পাতায় রোগের আক্রমণের ফলে উদ্ভূত দাগ কোণযুক্ত হতে পারে যেমন দেখা যায় তুলার অ্যাঙ্গুলার লীফ স্পট বা কোণাচে দাগ রোগে। তণ্ডুল জাতীয় গাছে, যেখানে পাতায় শিরবিন্যাস সমান্তরাল ধরণের, অনেক সময় রোগ উৎপাদক ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়াকে দুটি শিরার মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে ছড়াতে দেখা যায়, পাশের দিকে নালিকা বাণ্ডিল ভেদ করে বা অতিক্রম করে তারা ছড়াতে পারে না। যবের লীফ স্ট্রাইপ (c. o. *Helminthosporium gramineum*) ও ধানের লীফ স্ট্রীক (c. o. *Xanthomonas oryzicola var. translucens*) ইত্যাদি রোগে এই ধরণের প্রতিরোধ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। সয়াবীন গাছের বয়স বাড়ার ফলে ফাইটফথোরার *(P. megasperma* var. *sojae)* বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে ওঠার সঙ্গে লিগনিনযুক্ত কলার পরিমাণের ক্রমবৃদ্ধির সম্পর্ক আছে বলে মনে করা হয়।

জাইলেম কলার বৈশিষ্ট্যের জন্য উইল্ট রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছে ট্র্যাকীয়ার মধ্যে দিয়ে ছত্রাকের ছড়িয়ে পড়ার পথে বাধার সৃষ্টি হতে পারে। এলম গাছে দেখা গেছে রোগসংবেদনশীল জাতির তুলনায় রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছের ট্র্যাকীয়ার দৈর্ঘ্য ও ব্যাস কম হওয়ার ফলে রোগ উৎপাদক সেরাটোসিস্টিস উলমির উপরদিকে অগ্রগতির পথে বাধার সৃষ্টি হয়। কোরাইনি-ব্যাকটিরিয়াম *(C. insidiosum)* জনিত আলফালফার উইল্ট রোগের ক্ষেত্রেও অনেকটা এই ধরণের তথ্য পাওয়া গেছে। দেখা গেছে যে রোগ সংবেদনশীল জাতির গাছের তুলনায় প্রতিরোধী জাতির গাছের শিকড় ও কাণ্ডে নালিকা বাণ্ডিলের সংখ্যা কম ও ট্র্যাকীয়াগুলির দৈর্ঘ্যে ছোট। শুধুমাত্র গঠনগত বা কলাসংস্থানগত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে যখন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে তখন তাকে প্রতিরোধের প্রাথমিক পর্যায় হিসেবে ধরা যেতে পারে; পূর্ণাঙ্গ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সাধারণতঃ কোষের স্তরে আক্রমণোত্তর কোন পরিবর্তনের উপর করে।

২। জীব রাসায়নিক প্রতিরোধ: গাছের দেহে প্রবেশের পর রোগ উৎপাদক এক অপরিচিত ও নূতন রাসায়নিক পরিবেশের সম্মুখীন হয়। গাছের দেহকোষে ফেনল, অ্যালকালয়েড, গ্লুকোসাইড প্রভৃতি বিভিন্ন যৌগ থাকে যা কোথাও বেশী পরিমাণে জমলে হয়ত রোগ উৎপাদকের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিস্তার ব্যাহত করে তাকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলতে পারে।

অনেকদিন থেকেই গাছের দেহে ফেনলের উপস্থিতির সঙ্গে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার একটা সম্পর্ক আছে এরকম ভাবা হয়েছে। অনেক রোগের ক্ষেত্রেই দাবী করা হয়েছে যে ফেনল ও তার জারণের ফলে উদ্ভূত কুইনোন (quinone) গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য দায়ী যদিও সেরকম নির্ভর-যোগ্য প্রমাণাদি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় নি। আলুর স্ক্যাব ও ভার্টিসিলিয়াম উইল্ট রোগে ফেনলের সঙ্গে রোগ প্রতিরোধের একটা সম্পর্ক দেখা যায়। রোগ প্রতিরোধী জাতির আলুতে ও গাছে রোগসংবেদনশীল জাতির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি পরিমাণে ক্লোরোজিনিক (chlorogenic acid) অ্যাসিড নামক এক রকম ফেনল থাকে যা রোগ উৎপাদকের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকর। দেখা গেছে ফিউরোকুমারিন (furocoumarin) শ্রেণীর ফেনল 'আইসোপিম্পিনেলীন' (Isopimpinellin) পাতায় যথেষ্ট পরিমাণে থাকার ফলে কিছু জাতির লেবু গাছে গ্লিওস্পোরিয়াম লিমেট্টিকোলার *(Gloeosporium limetticola)* আক্রমণ সফল হয় না। গাজরে আইসোকুমারিন (isocoumarin) ও গমে অক্সাজোলিনোন (oxazolinone) শ্রেণীর রাসায়নিক যৌগের সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলি ছত্রাকের পক্ষে ক্ষতিকর এবং মনে করা হয় যে রোগ প্রতিরোধে এই জাতীয় যৌগের বিশেষ ভূমিকা থাকতে পারে। গয়ম্যানো-মাইসেস গ্র্যামিনিস *(G. graminis)* গম যব, ইত্যাদির শিকড় আক্রমণ করে অত্যন্ত ক্ষতিকর 'টেক অল' (Take all) রোগের সৃষ্টি করে, কিন্তু ওট গাছকে আক্রমণ করে না। টার্ণার (E. M. Turner, 1952) দেখতে পান যে ওট চারার নির্যাসে 'অ্যাভেনাসিন' (Avenacin) নামক এক গ্লাইকোসাইড আছে যা গয়ম্যানোমাইসেসের পক্ষে ক্ষতিকর কিন্তু এই গাছের রোগ উৎপাদক উস্টিলাগো অ্যাভিনি *(U. avenae)* ও পাইরেনোফোরা অ্যাভিনির *(Pyrenophora avenae)* পক্ষে ক্ষতিকর নয়। ঐ ছত্রাকের একটি বিশেষ জাতি *(G. graminis* var. *avenae)* ওট গাছকে আক্রমণ করে রোগের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় কারণ সেটি অ্যাভেনাসিনেজ (avenacinase) নামক এমন এক এনজাইম উৎপাদন করে যা অ্যাভেনাসিনকে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর যৌগে পরিণত করতে পারে (E. M. C. Turner, 1961)।

ইদানীংকালে পাওয়া কিছু তথ্যের ভিত্তিতে মনে হয় গাছের রোগ প্রতিরোধে স্টেরলেরও একটা ভূমিকা থাকতে পারে। টম্যাটো গাছে স্টেরয়েড ধরণের গ্লাইকোঅ্যালকালয়েড 'টোম্যাটিন' (Tomatine) পাওয়া যায় যা এই গাছের রোগ উৎপাদক ছত্রাকের তুলনায় যারা টোম্যাটোর রোগ করে না তাদের পক্ষে

বেশী ক্ষতিকর। দেখা যে গেছে টম্যাটোর রোগ উৎপাদক সেপ্টোরিয়া লাইকোপার্সিকি *(S. lycopersici)* টোম্যাটিনকে ভেঙ্গে ফেলতে পারে কিন্তু সেপ্টোরিয়া গণের অন্য ছত্রাক তা পারে না।

বাধ্যতামূলকভাবে পরজীবী যে সব ছত্রাক তারা সাধারণতঃ একটি প্রজাতির এবং অনেক সময় তার কয়েকটি বিশেষ জাতির গাছেই সীমাবদ্ধ থাকে। এর থেকে এমন ধারণা হতে পারে যে এই শ্রেণীর পরজীবীদের স্বাভাবিক পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য এমন কোন বিশেষ খাদ্যবস্তুর প্রয়োজন যা তারা নিজেরা তৈরী করে নিতে পারে না। সেজন্য যে গাছের দেহকোষে ঐ জাতীয় খাদ্য থাকে কেবল তাকেই তারা সাফল্যের সঙ্গে আক্রমণ করতে পারে আর যে সব গাছে তা নেই তারা রোগে আক্রান্ত হয় না। অবশ্য এর স্বপক্ষে পরীক্ষামূলক তথ্য এখনও পাওয়া যায় নি। রোগ উৎপাদক ব্যাকটিরিয়া এরউইনিয়া ক্যারটোভোরা (Garber and Schaeffer, 1957) এবং ছত্রাক ভেঞ্চুরিয়া ইনইক্যুয়ালিস (Klein, Boone and Keitt, 1957) ও ফিউজোরিয়াম অক্সিস্পোরাম (Buxton, 1956) এর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে খাদ্যের প্রশ্নে স্বয়ম্ভর ও রোগ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি জাতির থেকে কৃত্রিম উপায়ে মিউটেশন করিয়ে এমন অনেক নূতন জাতির সৃষ্টি হতে পারে যারা একটি বিশেষ খাদ্যের ব্যাপারে স্বয়ম্ভরতা হারিয়ে ফেলেছে আর তার সঙ্গে তাদের রোগ উৎপাদন ক্ষমতাও। এই সব নূতন জাতির ব্যাকটিরিয়া বা ছত্রাককে ঐ বিশেষ খাদ্যবস্তুটি বাইরে থেকে সরবরাহ করলে দেখা গেছে অনেক সময় তারা তাদের হারানো রোগ উৎপাদন ক্ষমতা আবার ফিরে পায়। সব মিউট্যাণ্টের ক্ষেত্রে অবশ্য এরকম হয় না। ছত্রাক রোডোস্টিক্টা কুয়ের্সিনার *(Rhodosticta quercina)* মায়ো-ইনোসিটলের (myo-inositol) প্রয়োজন। ছত্রাক নিজে এই যৌগটি তৈরী করতে পারে না। প্লামের বিভিন্ন জাতির গাছের ছালে কতটা এই যৌগ থাকে তার উপর প্লামে রোডোস্টিক্টার আক্রমণের সফলতা নির্ভর করে।

শর্করা জাতীয় পদার্থের পরিমাণ কম বা বেশী থাকার সঙ্গে রোগ সংবেদনশীলতা বা প্রতিরোধ ক্ষমতার একটা সম্পর্ক আছে এরকমও ভাবা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে হর্সফল ও ডাইমণ্ড (J.G. Horsfall and A.E. Dimond, 1957) বিভিন্ন গাছের রোগ উৎপাদকদের দুটি শ্রেণীতে ভাগ করার কথা বলেন, যথা স্বল্প শর্করা রোগ উৎপাদক ও উচ্চ শর্করা রোগ উৎপাদক। প্রথম শ্রেণীতে আছে সেইসব রোগ ও রোগ উৎপাদক গাছে শর্করার পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম হলে যাদের প্রকোপ বেশী হয়, যেমন হেলমিনথো-

স্পোরিয়াম জনিত ধানের ব্রাউন স্পট, আলু ও টম্যাটোর অলটারনেরিয়াজনিত আর্লি ব্লাইট, সেরাটোস্টোমেলাজনিত ডাচ এলম ও ফিউজেরিয়ামজনিত বিভিন্ন শস্যের উইল্ট রোগ। বিভিন্ন শস্যের রাস্ট, স্মাট, মিলডিউ ইত্যাদি ছত্রাক থেকে যে রোগ হয় সেগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর। অতএব কোন কারণে পরিবেশের প্রভাবে শর্করার পরিমাণ কমে গেলে গাছ স্বল্প শর্করা জাতীয় রোগ উৎপাদকের প্রতি বেশী সংবেদনশীল হয়ে উঠবে। একই কারণে উচ্চ শর্করা জাতীয় রোগ উৎপাদকের প্রতি তার প্রতিরোধ ক্ষমতাও বেড়ে যাবে। কৃত্রিম উপায়ে গাছে শর্করার পরিমাণ বাড়ালে বা কমালে একই রকম প্রতিক্রিয়া আশা করা যেতে পারে। এর একটি চমৎকার উদাহরণ পাওয়া যায় যখন দেখা যায় যব গাছে বোরনের অভাবে শর্করা জমতে থাকলে তারা একদিকে যেমন এরিসাইফি গ্র্যামিনিসজনিত ছাতাধরা রোগের প্রতি বেশী সংবেদনশীল হয়ে ওঠে আবার অন্যদিকে তাদের হেলমিনথোস্পোরিয়াম স্যাটাইভামজনিত লীফ স্পট রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বেড়ে যায়। হরমোন জাতীয় যৌগ 2, 4—D (2,4 dichlorophenoxyacetic acid) প্রয়োগ করলে গাছে সাধারণতঃ শর্করার পরিমাণ কমে আর হরমোন বিরোধী ক্রিয়াসম্পন্ন যৌগ ম্যালিক হাইড্রাজাইড প্রয়োগে শর্করার পরিমাণ বাড়ে। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে 2,4-D ও ম্যালিক হাইড্রাজাইড প্রয়োগ করলে টম্যাটোর আর্লি ব্লাইট ও ফিউজেরিয়াম উইল্ট এবং যবের হেলমিনথোস্পোরিয়াম স্যাটাইভামজনিত লীফ স্পট রোগের প্রতি যথাক্রমে পোষক গাছের সংবেদনশীলতা এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। একই ব্যবস্থায় গম, যব ইত্যাদির মরিচা ও বীনের ছাতাধরা রোগের ক্ষেত্রে বিপরীত ঘটতে দেখা যায়।

মানুষ বা কোন প্রাণীর দেহে কোন নূতন প্রোটিন (foreign protein) বা অ্যান্টিজেন (antigen) ঢুকিয়ে দিলে তার প্রতিক্রিয়ায় সেখানে স্বাতন্ত্র্যযুক্ত অ্যান্টিবডি (specific antibody) তৈরী হয় যা সারা দেহে রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে দেহে রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। রোগের আক্রমণের ফলে গাছে অ্যান্টিজেন—অ্যান্টিবডি ধরণের প্রতিক্রিয়া হয় এরকম কোন প্রমাণ নেই ঠিকই তবে কিছু গবেষণা থেকে কোথাও কোথাও কিছুটা এই ধরণের একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে এরকম আভাস পাওয়া যায়। তিসির মরিচা রোগে ক্ষেত্রে চারটি বিভিন্ন জাতির গাছের সঙ্গে রোগ উৎপাদক ছত্রাক মেলাম্পসোরা লিনির চারটি জাতির প্রোটিনের তুলনা করলে কিছু নূতন তথ্য পাওয়া যায়। তিসির চারটি গাছই রোগ উৎপাদকের এক

বা একাধিক জাতির প্রতি সংবেনশীল এবং তাদের মধ্যে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী এক বা একাধিক জীনের পার্থক্য রয়েছে। পরীক্ষা থেকে দেখা যায় যে ছত্রাকের চারটি জাতির প্রত্যেকেরই এমন একটি করে বিশেষ অ্যান্টিজেন আছে যা কেবলমাত্র তিসির সেই সব জাতির গাছেই পাওয়া যায় যা ছত্রাকের ঐ জাতি দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে (Doubly et al., 1960)। এর থেকে অনুমান করা হয় যে কোন জাতির তিসি গাছে মরিচা রোগ উৎপাদকের বিশেষ অ্যান্টিজেনের অনুপস্থিতি ঐ বিশেষ ছত্রাকের প্রতি তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার কারণ হতে পারে। একই রকম তথ্য তুলার ভার্টিসিলিয়াম ও ফিউজেরিয়াম উইল্ট, তামাকের ক্রাউন গল, রাঙ্গা আলুর ব্ল্যাক রট (c. o. *Ceratocystis fimbriata*) ইত্যাদি আরও কিছু রোগের ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে। তুলার পাতায় কোণাচে দাগ রোগের (c. o. *Xanthomonas malvaceaum*) ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে রোগ উৎপাদকের মত অ্যান্টিজেন রোগ সংবেদনশীল ও রোগ প্রতিরোধী দুই জাতির গাছেই পাওয়া যায় তবে প্রথমোক্ত শ্রেণীর গাছে এই ধরণের অ্যান্টিজেনের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কিছুটা বেশি হয়। আলুর নাবি ধসা রোগের ক্ষেত্রে অবশ্য রোগ সংবেদনশীল ও রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছের মধ্যে এই দিক থেকে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। এই সব তথ্য পাওয়া সত্বেও গাছে রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি ধরণের প্রতিক্রিয়া ঘটে এরকম সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। তবে এমন হতে পারে যে একই অ্যান্টিজেন থাকার ফলে রোগ উৎপাদকের পক্ষে সংবেদনশীল জাতির গাছকে চিনে নেওয়া (recognition) সম্ভব হয়। যেখানে তা থাকে না সেখানে আক্রমণ সফল হয় না।

সক্রিয় প্রতিরোধ (Dynamic defence)

গাছে নানারকম নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা থাকা সত্বেও অনেক গাছেই বিভিন্ন ধরণের রোগ উৎপাদক ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়াকে প্রবেশ করতে দেখা যায় কিন্তু তাদের মধ্যে খুব অল্পই সফলভাবে আক্রমণ চালিয়ে গাছের দেহে রোগের সৃষ্টি করতে পারে। এর থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে সব গাছেরই নিজস্ব সক্রিয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা আছে যা আক্রমণের পরে চালু হয় এবং আক্রমণ পুরোপুরি বা আংশিকভাবে প্রতিহত করতে সমর্থ হয়। বিভিন্ন রোগ উৎপাদকের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য গাছ ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতির আশ্রয় নিতে পারে। কোন রোগের আক্রমণ কিভাবে প্রতিহত করা হবে এবং আক্রমণ

শুরু হবার পর কত তাড়াতাড়ি প্রতিরোধ ব্যবস্থা চালু হবে তা গাছের জীন নিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। সক্রিয় প্রতিরোধের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় যে আক্রমণের ফলে গাছের দেহে, আক্রান্ত অঞ্চলের কোষে, নানাবিধ জীবরাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে যার ফলে সেখানকার পরিবেশ আক্রমণকারী রোগ উৎপাদকের অবিরাম বৃদ্ধি, বিস্তার ও ক্ষতিকর কার্যকলাপের পক্ষে প্রতিকূল হয়ে পড়ে, তবে কিছু রোগের ক্ষেত্রে রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে কোন গঠনগত পরিবর্তনও দেখা দিতে পারে যা রোগ উৎপাদকের অগ্রগতিতে বাধা দেয়। রোগউৎপাদক সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ায় গাছের বিশেষ ক্ষতি করতে পারে না।

ক। গঠনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ

রোগ উৎপাদকের আক্রমণের ফলে আক্রান্ত অঞ্চলকে ঘিরে বা তার অগ্রবর্তী অংশের সামনে নূতন কলার সৃষ্টি হতে পারে এবং এমন কিছু পরিবর্তন ঘটতে পারে বা এমন কিছু পদার্থ জমতে পারে যার ফলে রোগ উৎপাদকের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। এছাড়া অনেকসময় আক্রান্ত কোষের স্তরেও নানারকম পরিবর্তন ঘটে যা রোগ উৎপাদকের অগ্রগতি বা কার্যকলাপের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

১। **কর্কের স্তর গঠন (Formation of cork layer):** প্রধানতঃ ছত্রাকের, কখনও কখনও ব্যাকটিরিয়া, নিমাটোড এমনকি ভাইরাসের আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত অঞ্চলের সামনে বা চারিদিকে নূতন কর্কের স্তর গড়ে উঠতে দেখা যায় (রেখাচিত্র ১৭ ক ও খ)। নূতন সৃষ্ট ভাজক কলা বা কর্ক ক্যাম্বিয়ামের কার্যকলাপের ফলে একটি বিশেষ কর্কের স্তর গড়ে ওঠে। এই স্তরের প্রতিটি কোষের দেওয়ালে প্রচুর পরিমাণে সুবেরিন জমে যার জন্য কোষের মৃত্যু ঘটলেও তার সুদৃঢ় দেওয়াল ভেদ করে ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়া প্রবেশ করতে পারেনা। তাছাড়া সুবেরিন জমার পর দেওয়ালের মধ্য দিয়ে জল বা দ্রব অবস্থায় অন্য কোন পদার্থের ব্যাপনও সম্ভব হয় না। সুতরাং আক্রান্ত অঞ্চলের চারিধারে বা আক্রমণের পথে কর্কের স্তর গড়ে উঠলে রোগ উৎপাদক তাকে অতিক্রম করতে পারে না, তার এনজাইম বা টক্সিনও ছড়াতে পারে না, এমনকি সুস্থ কোষগুলি থেকে কোন খাদ্যদ্রব্য এই স্তরের মধ্য দিয়ে আক্রান্ত অঞ্চলে পৌঁছায় না। এর ফলে ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়া ক্রমশঃ নিষ্ক্রিয় ও দুর্বল হয়ে পড়ে। আলুর স্ক্যাব ও রাইজোকটোনিয়া রট, তামাকের শিকড় পচা

(c. o. *Thielaviopsis basicola*), চেরীর লীফ স্পট (c. o. *Coccomyces hiemalis*), কলার ফিউজেরিয়াম উইল্ট ইত্যাদি রোগে এবং নিকোটিয়ানা গ্লুটিনোসাতে (*N. glutinosa*) টোব্যাকো মোজেইক ভাইরাসের আক্রমণের
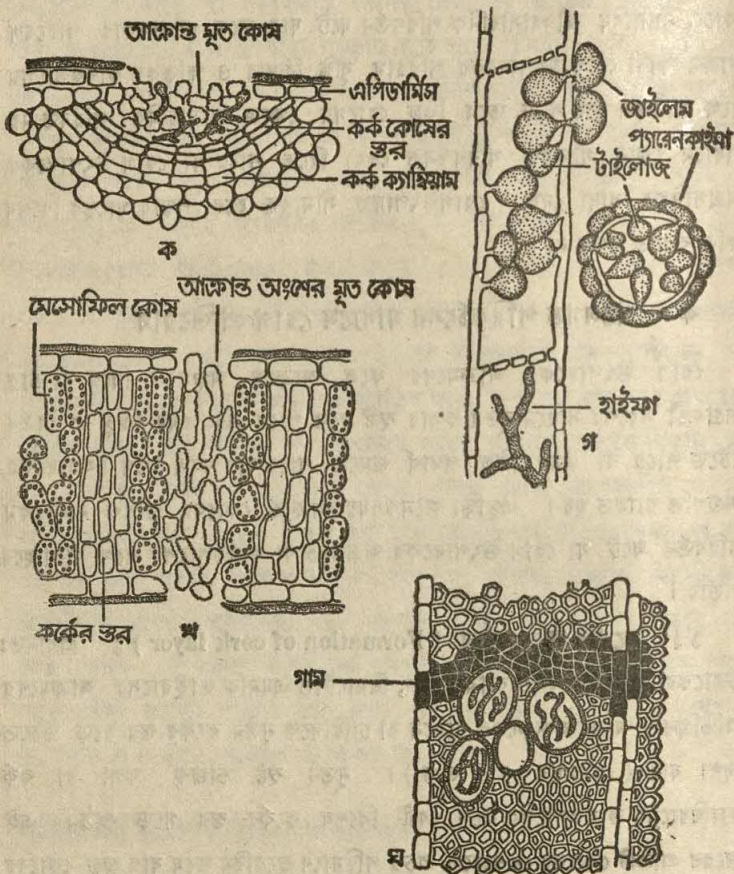
রেখাচিত্র ১৭ : আক্রমণোত্তর গঠনগত ও কোষগত পরিবর্তনের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ

(ক) কাণ্ডে আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় কর্ক কোষের স্তর গঠন

(খ) পাতায় আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় কর্ক কোষের স্তর গঠন

(গ) ট্র্যাকীয়াতে আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় টাইলোজ গঠন

(ঘ) আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত অঞ্চলের সম্মুখে বা চারিপাশের কোষে ও কোষের ফাঁকে ফাঁকে জমে থাকা গাম

ক্ষেত্রে রোগ প্রতিরোধে কর্কের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে এরকম প্রমাণ পাওয়া গেছে। আক্রমণের প্রতিক্রিয়া হিসাবে কত তাড়াতাড়ি কর্ক স্তর গঠিত হবে ও

পরিণত অবস্থা লাভ করবে তার উপরই রোগ প্রতিরোধের সাফল্য নির্ভর করে। এমনও হতে পারে যে কর্কের স্তর দুর্ভেদ্য হয়ে ওঠার আগেই আক্রমণকারী ছত্রাক তাকে ভেদ করে বেরিয়ে পড়ে। আলু, টম্যাটো, বাঁধাকপি, ইত্যাদি গাছে অলটারনেরিয়ার আক্রমণ হলে এমন ঘটে যার ফলে আক্রান্ত অঞ্চলে একাধিক বৃত্তাকার কর্কের স্তর গঠিত হয়।

২। **মোচন স্তর গঠন (Formation of abscission layer) :** কখনও দেখা যায় যে পাতার আক্রান্ত অঞ্চলকে ঘিরে প্রায় গোল করে মোচন স্তর (abscission layer) গড়ে ওঠে। আক্রান্ত অঞ্চল থেকে কিছুটা দূরে উপরের এপিডার্মিস থেকে নীচের এপিডার্মিস পর্যন্ত বিস্তৃত লম্বালম্বিভাবে একটি বা দুটি স্তরের কোষ আয়তনে বাড়ে এবং তাদের মধ্যের এজমালি দেওয়ালের অর্থাৎ মধ্যচ্ছদার পেকটিক যৌগ নষ্ট হয়ে যেতে থাকে যার ফলে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি স্তরের কোষগুলি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই বিচ্ছিন্নতা উপরের এপিডার্মিস থেকে নীচের এপিডার্মিস পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়লে মোচন স্তরের সৃষ্টি হয়। সংলগ্ন কিছু কোষ সহ আক্রান্ত অংশ তখন পাতার বাকী অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে খসে পড়ে। এর ফলে পাতায় গুলির আঘাতের মত গোল ছিদ্রের সৃষ্টি হয় যাকে বলে 'শট হোল' (shot hole)। এইভাবে রোগ উৎপাদককে নিজের দেহ থেকে সরিয়ে দিয়ে গাছ নিজের ক্ষতির পরিমাণ সীমিত রাখে। পুঁই এর সার্কোস্পোরাজনিত,পীচের ক্ল্যাস্টেরোস্পোরিয়াম*(C. carpophilum)* ও জ্যান্থো-মোনাস *(X. pruni)* জনিত রোগে এবং টক চেরী গাছের নেক্রোটিক রিং স্পট (necrotic ring spot) ভাইরাস রোগে এই ধরণের প্রতিরোধ ব্যবস্থা দেখা যায়।

৩। **টাইলোজ গঠন (Tylosis) :** গাছের জাইলেম কলায়, প্রধানতঃ ট্র্যাকীয়ায় সাধারণতঃ অস্বাভাবিক অবস্থার প্রতিক্রিয়া হিসাবে টাইলোজের (tylose) সৃষ্টি হয় (রেখাচিত্র—১৭গ)। হরমোনের প্রভাবে ট্র্যাকীয়া সংলগ্ন জাইলেম প্যারেনকাইমা কোষ যখন আয়তনে বাড়তে থাকে তখন অন্যদিকে জায়গা না পাওয়ায় তার মধ্যচ্ছদা দেওয়ালের দুর্বলতম অংশে—কূপ পর্দা (pit membrane) অঞ্চলে ফুলে উঠে ট্র্যাকীয়ার গহ্বরের মধ্যে বেলুনের আকার নেয়। একে বলে টাইলোজ। টাইলোজ গঠিত হলে ট্র্যাকীয়ার মধ্য দিয়ে জল পরিবহণে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। খুব বেশি সংখ্যায় টাইলোজ হলে সেই ট্র্যাকীয়া দিয়ে জল পরিবহন একেবারে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে রোগ সংবেদনশীল জাতির গাছে নয়—রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছে রোগের আক্রমণের পরে ট্র্যাকীয়াতে, ছত্রাকের গতিপথে উপরের দিকে,

অতি দ্রুত টাইলোজ গঠিত হতে থাকে। ওকের উইন্ট, রাঙ্গা আলুর ফিউজেরিয়াম উইন্ট, হপ ও টম্যাটোর ভার্টিসিলিয়াম উইন্ট ইত্যাদি রোগে এই রকম ঘটতে দেখা যায়। বেশী সংখ্যায় টাইলোজ গঠিত হলে ট্র্যাকীয়ার গহ্বর প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। তখন শুধু জলের সংবহন নয় ছত্রাকেরও উপর দিকে ছড়িয়ে পড়া বন্ধ হয়ে যায়। ছত্রাক টাইলোজের দেওয়াল ভেদ করে এগোতে পারে এরকম কোন তথ্য এখনও জানা নেই। এই সব তথ্যের উপর ভিত্তি করে এরকম একটা ধারণা হয়েছে যে আক্রমণোত্তর দ্রুত টাইলোজ গঠনের জন্য উইন্ট রোগের বিরুদ্ধে গাছে এক সফল প্রতিরোধ গড়ে উঠতে পারে। আবার অন্য রকম তথ্যও রয়েছে। ভার্টিসিলিয়াম উইন্ট প্রতিরোধী জাতির টম্যাটো গাছে অল্প মাত্রায় ম্যালিক হাইড্রাজাইড প্রয়োগ করলে দেখা যায় যে আক্রমণোত্তর টাইলোজ গঠন প্রায় বন্ধ হয়ে যায় যদিও তার রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে A. K. Sinha and R. K. S. Wood, 1967)। এর থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে দ্রুত টাইলোজ গঠন নিঃসন্দেহে রোগ প্রতিরোধে কোন মুখ্য ভূমিকা পালন করে না যদিও এর ফলে ছত্রাকের উপর দিকে ছড়ানো কিছুটা ব্যাহত হতে পারে।

৪। **গাম জমা (Gummosis) :** কোনও কোনও রোগে আক্রান্ত অঞ্চলের চারিপাশে, কোষ-মধ্যবর্তী অংশে (intercellular space) বা কোষের ভিতরে, এক রকমের আঠাল পদার্থ বা গাম (gum) জমতে থাকে (রেখাচিত্র ১৭ঘ)। অধিকাংশ সময় গামের সঙ্গে ফেনল জারিত হওয়ার ফলে উৎপন্ন কুইনোন ও রঞ্জক পদার্থ মেলানিন (melanin) যৌগ মিশে যাওয়ায় গামের রঙ হালকা, গাঢ় বা কালচে বাদামী দেখায়। রোগের আক্রমণ ছাড়াও নানা প্রতিকূল অবস্থায়, যেমন পোকার কামড়ে বা অন্য কোন কারণে ক্ষত হলে, সাধারণ প্রতিক্রিয়া হিসাবে গাম জমতে পারে। আপেলের 'সিলভার লীফ' (c.o. *Stereum purpureum*) ও ব্ল্যাক রট (c.o. *Physalospora cydoniae*), চেরীর ক্যাঙ্কার (c.o. *Valsa japonica*) ও নেক্রোটিক রিং স্পট ভাইরাস ইত্যাদি রোগে আক্রমণের পরে, বিশেষ করে রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছে, আক্রান্ত অংশের চারিপাশে অতি দ্রুত গাম জমতে থাকে। এর ফলে চারিদিক থেকে আটকে পড়া ছত্রাক গামের ব্যূহ ভেদ করে বেরোতে না পেরে খাদ্যের অভাবে ক্রমশঃ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এইভাবে গাম জমলে ভাইরাসের প্রসারও বাধা পায়। আক্রমণের পরে কত তাড়াতাড়ি গাম জমে তার উপর এই প্রতিরোধ ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে।

খ। আক্রান্ত কোষে পরিবর্তনের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ

কোন কোন ক্ষেত্রে রোগ প্রতিরোধের কাজ আক্রান্ত কোষের স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকে। কোষের এই প্রতিক্রিয়া দুভাবে ঘটতে পারে। প্রথমতঃ ছত্রাক শ্রেণীর রোগ উৎপাদক এপিডার্মিস কোষের দেওয়াল ভেদ করার চেষ্টা করলে সেখানে ইনফেকশন পেগের সামনে সুবেরিন, ক্যালোজ ইত্যাদি জমতে থাকে যার ফলে দেওয়াল বেশ শক্ত ও পুরু হয়ে ওঠে ও ছত্রাকের পক্ষে ঐ দেওয়াল ভেদ করে প্রবেশ সব সময় সম্ভব হয় না। তিসিতে ফিউজেরিয়াম অক্সিস্পোরাম, ওটে পাইরেনোফোরা অ্যাভিনি ও ভুট্টাতে হেলিকোব্যাসিডিয়াম মোম্পার আক্রমণ হলে এরকম দেখা যায়। আবার অনেক সময় ইনফেকশন পেগ যতই এই বাধা ভেদ করার চেষ্টা করে ততই তার সামনে দেওয়ালের ঐ উপাদানগুলি জমতে থাকে যার ফলে চারিধারে একটা আবরণীর মত গড়ে ওঠে (রেখাচিত্র ১৮ক)। গমের 'টেক অল' (c.o. *Gaumannomyces graminis*), আলু ও শশার ভার্টিসিলিয়াম উইল্ট ইত্যাদি রোগে এরকম ঘটে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ইনফেকশন পেগ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই বাধা ভেদ করে কোষের মধ্যে প্রবেশ করে (রেখাচিত্র—১৮খ)।

ছত্রাক কোষের মধ্যে প্রবেশ করলে সেখানে কখনও কখনও সক্রিয় প্রতিরোধ ঘটতে দেখা যায়। দুরকম ভাবে এটি হয়। প্রথম ক্ষেত্রে কোষের প্রতিক্রিয়ায় অতিসংবেদনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। আক্রান্ত কোষের নিউক্লিয়াস আক্রমণকারী হাইফার দিকে এগিয়ে যায় এবং শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যায়। প্রথমে হাইফার চারিপাশে পরে কোষের সর্বত্র সাইটোপ্লাজম দানাদার হয়ে যায় ও প্লাজমা আবরণীটি স্ফীত হয়ে ওঠে। প্রায় এই সময় হাইফার সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াসে পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত কোষটির মৃত্যু হয়, হাইফাটিও নষ্ট হয়ে যায় (রেখাচিত্র ১৮গ)। এই ধরণের প্রতিরোধ পদ্ধতি সাধারণতঃ বাধ্যতামুলকভাবে পরজীবী ছত্রাকের আক্রমণের ক্ষেত্রে দেখা যায়। এণ্ডোট্রফিক মাইকোরাইজার (endotrophic mycorrhiza) ক্ষেত্রে ছত্রাক যখন শিকড়ের কর্টেক্সের ভিতর দিকের কোষ আক্রমণ করে তখন আর একরকম প্রতিরোধ ঘটতে দেখা যায়। আক্রান্ত কোষটির সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস বাড়তে থাকে এবং সাইটোপ্লাজম ক্রমশঃ ঘন ও দানাদার হয়ে ওঠে। এই প্রতিক্রিয়ার ফলে কোষের মধ্যে প্রবিষ্ট হাইফাটি নষ্ট হয়ে যায় (রেখাচিত্র ১৮ঘ)। এখানে আক্রান্ত কোষটি নিজে না মরলেও হাইফাকে নষ্ট করে ফেলতে পারে, ফলে আক্রমণ প্রতিহত হয়।

গ. জীব রাসায়নিক ও অন্যান্য পরিবর্তনের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ

আক্রমণের ফলে গাছের আক্রান্ত ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের কোষে নানা ধরণের যে সব জীবরাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে তার ফলে অনেক সময় আক্রমণের গতি
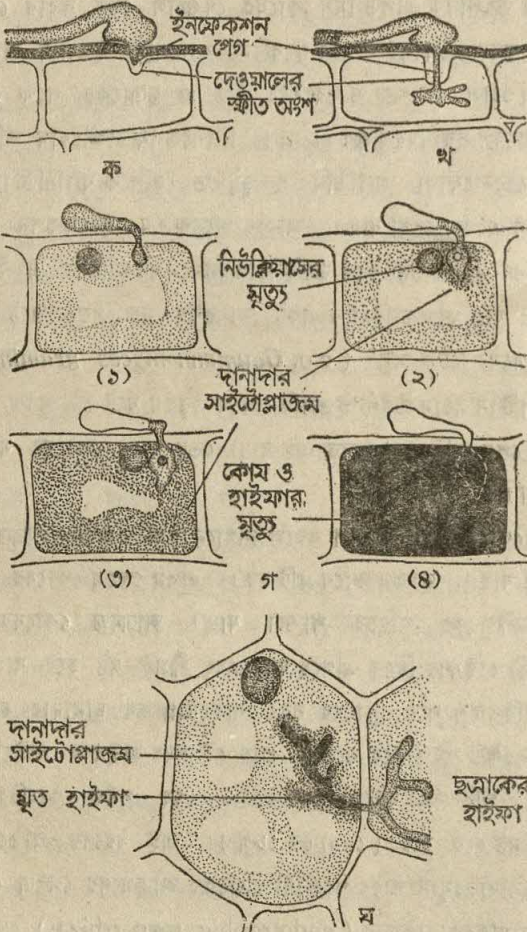
রেখাচিত্র ১৮ : কোষের স্তরে রোগ প্রতিরোধ

ক. ইনফেকশন পেগ এর সম্মুখে আবরণীর সৃষ্টি

খ. সম্মুখে আবরণী ভেদ করে ইনফেকশন পেগের কোষের ভিতরে প্রবেশ

গ. (১-৩) ছত্রাক কোষে প্রবেশের পর সাইটোপ্লাজমের স্তরে অতিসংবেদনশীল প্রতিক্রিয়ার ফলে কোষের ও হাইফার মৃত্যু

ঘ. প্রবেশের পর কোষের প্রতিক্রিয়ায় হাইফার মৃত্যু

ব্যাহত হয় এবং রোগ উৎপাদক নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। প্রধানতঃ এই রকম

পরিবর্তনের মাধ্যমেই অধিকাংশ গাছ রোগ উৎপাদকের আক্রমণ সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করে সুস্থ জীবন যাপনে সমর্থ হয়। এইভাবে রোগ প্রতিরোধের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি নিয়ে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে।

১। ফেনল ও সংশ্লিষ্ট যৌগের মাত্রায় পরিবর্তন

রোগ প্রতিরোধে ফেনলের যে বিশেষ ভূমিকা আছে এমন ধারণার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। অনেক ফেনলই বিভিন্ন জীবাণুর পক্ষে ক্ষতিকর। আরও দেখা গেছে যে জারিত হয়ে কুইনোনে রূপান্তরিত হলে ফেনল অনেক সময় আরও বেশী ক্ষতি করে। ফেনল জারণের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইম পলিফেনলেজ (polyphenolase) বা পলিফেনলঅক্সিডেজ (polyphenol-oxidase) গাছের কোষেই থাকে তবে সুস্থ কোষে অধিকাংশ সময় ফেনল ও তার এনজাইমের মধ্যে কিছুটা দূরত্ব থাকায় জারণের সম্ভাবনা কম থাকে। তাছাড়া কোষে ফেনল অনেক সময় গ্লুকোজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গ্লুকোসাইড অবস্থায় থাকে। সেখানে জারণের কোন সম্ভাবনা থাকে না। রোগ উৎপাদকের দ্বারা উৎপন্ন এনজাইম বা টক্সিনের প্রভাবে আক্রান্ত অঞ্চলে কোষের মৃত্যু ঘটলে তখন ফেনল ও তার এনজাইমের মধ্যে সংযোগ ঘটার ও ফেনল জারিত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। অনেক সময় রোগ উৎপাদকের নিজস্ব পলিফেনলঅক্সিডেজও ফেনল জারণে অংশ নেয়।

অনেক রোগের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে রোগের আক্রমণের ফলে ফেনল বেশী পরিমাণে তৈরী হতে থাকে। সেরাটোসিস্টিস ফিমব্রিয়াটার আক্রমণে গাজরে ক্লোরোজিনিক অ্যাসিড ও রাঙ্গা আলুতে ক্লোরোজিনিক এবং কেফীইক (Caffeic) অ্যাসিড আর ফাইটফথোরা ইনফেসট্যানসের আক্রমণে আলুতে স্কোপোলেটিন বেশী পরিমাণে জমে। এছাড়া বাঁধাকপিতে বট্রাইটিসের এবং টম্যাটোতে ভার্টিসিলিয়াম অ্যালবো-এট্রাম ও ফিউজেরিয়াম অক্সিস্পোরামের আক্রমণের ফলে আক্রান্ত অঞ্চলে ও তার চারিপাশে ফেনলের পরিমাণ বেশ বেড়ে যেতে দেখা গেছে। আক্রমণের আগের অবস্থায় যে রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছে ফেনলের পরিমাণ ক্ষতিকর মাত্রায় থাকে তা নয়, কিন্তু আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত অঞ্চলে ফেনল বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হতে থাকে যার ফলে শীঘ্রই ফেনলের পরিমাণ রোগ উৎপাদকের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায় ও তার বৃদ্ধি ও কার্যকলাপ ব্যাহত হয়। অনেক সময় আক্রান্ত রোগ সংবেদনশীল জাতির গাছে মোট ফেনলের পরিমাণ রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছের তুলনায় বেশী

হয় কিন্তু প্রথমোক্ত শ্রেণীর তুলনায় দ্বিতীয় শ্রেণীর গাছে আক্রান্ত অঞ্চলের প্রতি কোষে ফেনলের পরিমাণ অনেক বেশী থাকে যা রোগ উৎপাদকের পক্ষে ক্ষতিকর।

অনেক ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়া বিটা-গ্লুকোসাইডেজ (β—glucosidase) এনজাইম তৈরী করতে বা কোষে আবদ্ধ অবস্থায় থাকা এই এনজাইমকে মুক্ত করতে পারে। এই এনজাইম গ্লুকোসাইডকে ভেঙ্গে ফেনলকে মুক্ত করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে সেই ফেনল বা তার জারণের ফলে উদ্ভূত কুইনোন রোগ উৎপাদককে নিষ্ক্রিয় করে বা নষ্ট করে ফেলতে পারে। স্ক্যাব রোগ সংবেদনশীল ও প্রতিরোধী জাতির আপেল গাছে প্রায় সম পরিমাণ গ্লুকোসাইড, ফ্লোরিডজিন (phloridzin), থাকে যা রোগ উৎপাদক ভেঞ্চুরিয়া ইনইক্যুয়ালিস এর পক্ষে ক্ষতিকর নয়। রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছে ছত্রাক প্রবেশ করলে তার প্রতিক্রিয়ায় চারিপাশের কোষগুলি খুব তাড়াতাড়ি মরে যায় এবং ঐগুলি থেকে তখন বিটা-গ্লুকোসাইডেজ বেরিয়ে আসে যার ক্রিয়ার ফলে ফ্লোরিডজিন ভেঙ্গে ফেনল ফ্লোরেটিন (phloretin) ও গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়। অক্সিডেজের প্রভাবে ফ্লোরেটিন জারিত হয়ে কুইনোনে পরিবর্তিত হলে তার প্রভাবে আক্রমণকারী ছত্রাক নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। কিন্তু সংবেদশীল জাতির গাছে কোষের ঐভাবে মৃত্যু না ঘটার ফলে বিটা-গ্লুকোসাইডেজ মুক্ত হয় না এবং ছত্রাকের অগ্রগতিও ব্যাহত হয় না। ন্যাসপাতি গাছে যে গ্লাইকোসোইড আরবুটিন (arbutin) থাকে সেটিও একই ভাবে ফায়ার ব্লাইট রোগ উৎপাদক ব্যাকটিরিয়া এরউইনিয়া অ্যামিলোভোরার আক্রমণ প্রতিরোধে অংশ নেয় বলে মনে করা হয়। ধানের বাদামী দাগ রোগে পাতায় দাগ বেশী বড় হয় না, কিছুটা বাড়ার পরই থেমে যায়। দেখা গেছে যে রোগের আক্রমণে কিছু কোষের মৃত্যু ঘটলে রোগ-উৎপাদক ছত্রাক, হেলমিনথোস্পোরিয়াম ওরাইজি, দ্বারা উৎপন্ন বিটা-গ্লুকোসাইডেজের ক্রিয়ায় গ্লুকোসাইড ভেঙ্গে ফেনল বেরিয়ে আসে যা জারিত হয়ে প্রথমে কুইনোন ও পরে পলিমেরাইজেশনের (polymerization) ফলে বাদামী রঙের মেলানিনে পরিণত হয়। আক্রান্ত অঞ্চলের বাইরের দিকে এই ক্ষতিকারক যৌগ জমতে থাকায় দাগটি গাঢ় বাদামী বা কালচে বাদামী রঙ ধারণ করে আর ছত্রাকও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, ফলে আক্রমণ অল্প জায়গার মধ্যেই সীমিত থাকে।

অনেক সময় দেখা গেছে যে সুস্থ গাছের তুলনায় আক্রান্ত রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছে অক্সিডেজ জাতীয় এনজাইমের কর্মতৎপরতা অনেক বেড়ে যায় যা রোগ সংবেদনশীল জাতির গাছে হয় না। আলুতে ফাইটফথোরা ও বাঁধাকপিতে

ফিউজেরিয়ামের *(F. oxysporum* f. sp. *conglutinans)* আক্রমণ হলে পেরোক্সিডেজের পরিমাণ বেড়ে যায়। মটরশুটি ও কলাতে ফিউজেরিয়াম *(F. oxysporum)* এর আক্রমণ হলে পলিফেনলঅক্সিডেজের কর্মতৎপরতা বেড়ে যায়। ডীজ ও স্ট্যাহমান (D. C. Deese and M. A. Stahman, 1962) তাঁদের টম্যাটোর ভার্টিসিলিয়াম ও ফিউজেরিয়াম উইল্ট সংক্রান্ত গবেষণা থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করেছেন। রোগ সংবেদনশীল ও রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছের কাণ্ডের ছোট টুকরায় কৃত্রিম উপায়ে ছত্রাকের আক্রমণের সৃষ্টি করে তাঁরা আক্রান্ত অংশে ফেনল ও কুইনোনের পরিমাণ এবং একই সঙ্গে পলিফেনলঅক্সিডেজ ও পেকটিক এনজাইমের পরিমাণ নির্ধারণ করেন। দেখা গেছে যে রোগ সংবেদনশীল জাতির তুলনায় রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছে ফেনল ও কুইনোনের পরিমাণ বেশী, ফেনলঅক্সিডেজের কর্মতৎপরতা অনেক জোরালো কিন্তু পেকটিক এনজাইমের কর্মতৎপরতা বেশ কম। ডীজ ও স্ট্যাহমানের মতে রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছে ফেনল-অক্সিডেজের অতিরিক্ত কর্মতৎপরতার ফলে কুইনোন বেশী জমে গেলে শুধু যে ছত্রাকের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় তাই নয়, পেকটিক এনজাইমের কার্য ক্ষমতাও অনেক কমে যায়।

ফেনলের পরিমাণ ও ফেনলঅক্সিডেজের কর্মতৎপরতার সঙ্গে গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার একটা সম্পর্ক রয়েছে এরকম কথা প্রায়ই শোনা যায়। কুচ (J.Kuc, 1963) এর মতে গাছে যে বিভিন্ন ধরণের ফেনল জাতীয় যৌগ আছে তাদের মাধ্যমে শুধু সাধারণ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাই নয় হয়ত একটি বিশেষ রোগ উৎপাদকের প্রতি কোন পোষক গাছের প্রতিরোধ ক্ষমতারও ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু ক্রুইকশ্যাঙ্ক (I. A. M. Cruickshank, 1963) মনে করেন যে ফেনল বা সংশ্লিষ্ট কুইনোনের রোগ প্রতিরোধে কোন মুখ্য ভূমিকা নেই, ফেনল বা কুইনোন জমার ব্যাপারকে রোগ প্রতিরোধের সঙ্গে গৌণভাবে জড়িত একটি আনুষঙ্গিক ঘটনা বলে মনে করা যেতে পারে।

২। অতিসংবেদনশীলতা (Hypersensitivity)

বাধ্যতামূলকভাবে পরজীবী যেমন রাস্ট বা বিভিন্ন মিলডিউ ছত্রাকের আক্রমণ হলে রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছে সাধারণতঃ দেখা যায় যে আক্রান্ত অঞ্চলে কিছু কোষের দ্রুত মৃত্যু ঘটে ও আক্রমণের গতি রুদ্ধ হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী মার্শাল ওয়ার্ড (M. Ward, 1902) প্রথম এই ধরণের সম্ভাবনার কথা

উল্লেখ করেন। তিনি দেখতে পান যে ব্রোম গাছে *(Bromus* sp.*)* রাস্ট ছত্রাকের *(Puccinia rubigo-vera)* আক্রমণ হলে হাইফা গাছের দেহকোষে প্রবেশের পরে খুব দ্রুত চারিদিকের কিছু কোষের মৃত্যু ঘটে, ঐ অঞ্চল হালকা বাদামী রঙ ধারণ করে এবং সেখানে রোগের আক্রমণ প্রতিহত হয়। কিছুকাল পরে আমেরিকান বিজ্ঞানী স্ট্যাকম্যান (E. C. Stakman, 1915) তাঁর গমের ও পাকসিনিয়া গ্র্যামিনিসের বিভিন্ন জাতির মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া সংক্রান্ত গবেষণা থেকে দেখতে পান যে মিল নেই বা বেমানান পোষক-পরজীবী জুটিতে (incompatible host-parasite combination), যেখানে আক্রমণ সফল হয় না, এই রকম ঘটে। ছত্রাকের আক্রমণের বিরুদ্ধে রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছের এই ধরণের প্রতিক্রিয়াকে তিনি **অতিসংবেদনশীলতা** বা 'হাইপারসেনসিটিভিটি' (hypersensitivity) আখ্যা দেন। আক্রান্ত অঞ্চলে কোষের এইভাবে মৃত্যুর ফলে রোগ উৎপাদক অতি দ্রুত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং তার মৃত্যু ঘটে। মিল আছে এমন পোষক-পরজীবী জুটির (compatible combination) ক্ষেত্রে কিন্তু গাছের প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক সংবেদনশীলতার (normosensitivity) সীমা অতিক্রম করে না। আক্রান্ত গাছের **অতিসংবেদনশীল প্রতিক্রিয়ার** (hypersensitive reaction) মধ্যে আক্রমণোত্তর সেই সব পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত যা দ্রুত ঘটার ফলে আক্রান্ত অঞ্চলের কিছু কোষের অকালমৃত্যু ঘটে এবং রোগ উৎপাদক নিষ্ক্রিয় হয়ে সীমিত হয়ে পড়ে। প্রথমদিকে এই রকম ধারণা ছিল যে কেবলমাত্র বাধ্যতামূলকভাবে পরজীবীর আক্রমণের ক্ষেত্রেই গাছে এই প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং গাছের মৃত কোষ থেকে খাদ্য সংগ্রহে অক্ষম বলেই এদের মৃত্যু ঘটে। গম, ভুট্টা, বীন, তিসি প্রভৃতি গাছে রাস্ট ডাউনি ও পাউডারি মিলডিউ ছত্রাকের আক্রমণের ক্ষেত্রে এই রকম প্রতিক্রিয়ার খবর পাওয়া যায়। কোথাও মাত্র একটি এপিডার্মিস কোষ পাউডারি মিলডিউ ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হলে, অন্যত্র কোথাও তিন-চারটি কোথাও বা দশটি পর্যন্ত কোষ আক্রান্ত হলে তবেই গাছে অতিসংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া ঘটে। আক্রান্ত কোষটি সহ বা শুধুমাত্র সংলগ্ন কোষগুলির মৃত্যু ঘটে। কত দ্রুত কোষগুলির মৃত্যু হয় তার উপরই এই ধরণের প্রতিরোধের সাফল্য নির্ভর করে বলে অনেকের ধারণা।

পরবর্তীকালে দেখা যায় যে এই ধরণের প্রতিক্রিয়া শুধু বাধ্যতামূলকভাবে পরজীবী ছত্রাকের আক্রমণের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়—ভাইরাস, ব্যাকটিরিয়া এমনকি ঐচ্ছিকভাবে পরজীবী ছত্রাকের আক্রমণ হলেও প্রায় ঘটতে দেখা যায় (K.O. Muller, 1959)। ক্লিমেন্ট ও গুডম্যানের (Z. Klement and

R. N. Goodman, 1967) মতে ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণে মিল নেই এমন অধিকাংশ পোষক-পরজীবী জুটির ক্ষেত্রেই অতিসংবেদনশীলতার প্রকাশ ঘটে। দেখা গেছে যে ঐ ধরণের জুটিতে যেখানে মাত্র একটি ব্যাকটিরিয়া গাছের একটি কোষের মৃত্যু ঘটাতে পারে সেখানে মিল রয়েছে এমন জুটির ক্ষেত্রে ৫০—১০০ ব্যাকটিরিয়ার প্রয়োজন হয়। ভাইরাস রোগে যেখানে সীমিত ধরণের ক্ষতের সৃষ্টি হয় সেখানেও অতিসংবেদনশীলতার মাধ্যমেই গাছে রোগের আক্রমণ ছড়িয়ে পড়া ব্যাহত হয় বলে ধারণা।

ঐচ্ছিকভাবে পরজীবী ছত্রাকের আক্রমণের ফলে একই রকম প্রতিক্রিয়া হতে পারে। আলুর নাবি ধসা, আপেলের স্ক্যাব, বীনের অ্যানথ্র্যাকনোজ ইত্যাদি অনেক রোগের ক্ষেত্রেই অতিসংবেদনশীলতার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। যখন পোষক নয় এরকম কোন গাছ ছত্রাকের দ্বারা আক্রান্ত হয় তখনও প্রায় একই ঘটনা ঘটে। অতিসংবেদনশীলতার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ

(১) জীবাণু ও ভাইরাসের আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় গাছে অতিসংবেদনশীলতার প্রকাশ ঘটে।

(২) কেবলমাত্র রোগ উৎপাদক ও গাছের বেমানান জুটির ক্ষেত্রেই এই প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

(৩) রোগ সংবেদনশীল ও প্রতিরোধী জাতির গাছের মধ্যে আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় না।

(৪) রোগ সংবেদনশীল জাতির গাছে আক্রমণজনিত কোন ক্ষতি হবার আগেই প্রতিরোধী জাতির গাছে অতি সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া ঘটে এবং কোষের মৃত্যু হয়।

পরজীবী রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছের দেহে প্রবেশ করার পর দ্রুত পরিবর্তন ঘটে যার ফলে পরজীবীর বিস্তার ও কার্যকলাপ ভীষণভাবে ব্যাহত হয়, এমনকি তার মৃত্যুও ঘটে। রোগ সংবেদনশীল জাতির গাছে হয় এইসব পরিবর্তন ঘটে না বা ঘটলেও অত্যন্ত মন্থর গতিতে ঘটে যার ফলে সেখানে রোগ সৃষ্টির পথে বিশেষ কোন বাধার সৃষ্টি হয় না। দেখা গেছে যে অতিসংবেদনশীল প্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত ও তার চারিপাশের কোষগুলিতে শ্বসনের হার দ্রুত বাড়তে থাকে, সাধারণতঃ ১—২ দিনের মধ্যেই সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌছায় এবং তারপর দ্রুত কমে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। সংবেদনশীল জাতির গাছ আক্রান্ত হলে এমন হয় না। সেখানে শ্বসনের হার খুব ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং কোষগুলির মৃত্যু হলে কমে শূন্যে পৌঁছায় বা গাছ সুস্থ অবস্থায়

ফিরে এলে স্বাভাবিক স্তরে ফিরে আসে। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে কোষের প্লাজমা আবরণীর ভেদ্যতায়। অতিসংবেদনশীল প্রতিক্রিয়ার আবরণীর ভেদ্যতা বেড়ে যায় যার ফলে কোষ থেকে জল ও তার সঙ্গে ফেনল সহ তড়িদবিশ্লেষ্য ও নানাবিধ যৌগ কোষের বাইরে বেরিয়ে আসে। কোষ তার স্ফীত অবস্থা ও স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। সাধারণতঃ ১—২ দিনের মধ্যেই ভেদ্যতায় এই পরিবর্তন সম্পূর্ণ হয়। কোষ থেকে বেরিয়ে আসা ফেনল জারিত হওয়ায় প্রথমে কুইনোন ও পরে মেলানিন জমতে থাকে, ফলে ঐ অঞ্চলে বাদামী দাগের সৃষ্টি হয়। এ ছাড়াও অতিসংবেদনশীল প্রতিক্রিয়ার অঙ্গ হিসাবে কোষের ভিতরে আরও নানারকম পরিবর্তন ঘটে। আলুতে ফাইটফথোরার আক্রমণের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে হাইফা কোষে প্রবেশের ১০-৬০ মিনিটের মধ্যে সাইটোপ্লাজমের প্রবাহের গতি বৃদ্ধি পায়। মিল আছে এমন জুটির ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন ২—৩ ঘণ্টার আগে ঘটে না। নিউক্লিয়াস আয়তনে বাড়ে, দানাদার হয়ে পড়ে ও পরে নষ্ট হয়ে যায়, ফলে কোষের মৃত্যু ঘটে। অতিসংবেদনশীলতার সাফল্য নির্ভর করে আক্রমণোত্তর পরিবর্তনগুলি কত তাতাতাড়ি ঘটে তার উপর। এই পরিবর্তনগুলি সম্পূর্ণ হতে আলুর ওয়ার্ট রোগে মাত্র কয়েক ঘণ্টা ও নাবি ধসা রোগে ১৬—১৮ ঘণ্টা এবং গমের মরিচা রোগে কয়েকদিন লাগে। এর থেকে বোঝা যাবে যে আক্রমণের বিরুদ্ধে অতিসংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া সব গাছে সমান দ্রুততার সঙ্গে ঘটে না।

রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছে অতিসংবেদনশীল প্রতিক্রিয়ার কারণ বা ঘটনার পারম্পর্য সম্বন্ধে পরিস্কার কোন ধারণা এখনও গড়ে ওঠেনি। টোমিয়ামার (K. R. Tomyama, 1963) মতে আক্রান্ত কোষে এমনকি সংলগ্ন কোষ গুলিতেও বিপাকীয় কার্যকলাপ ও শ্বসনের হার সাময়িকভাবে খুব বেড়ে যাওয়ায় এবং সেখানে ফেনল ও সংশ্লিষ্ট নানাবিধ যৌগ জমার ফলে প্রথমে কোষগুলির মৃত্যু ঘটে ও পরে রোগ উৎপাদক নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ক্লিমেণ্ট ও গুডম্যান (১৯৬৭) মনে করেন যে ব্যাকটিরিয়াজনিত রোগের ক্ষেত্রে আক্রান্ত অঞ্চলের কোষের প্লাজমা আবরণীর প্রোটিনের s—s সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আবরণীটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও তার ভেদ্যতা বেড়ে যায় যার ফলে কোষ তার স্বাভাবিক স্ফীতাবস্থা হারায় এবং তার থেকে ফেনল, পলিফেনল অক্সিডেজ বেরিয়ে ও ফেনল জারিত হয়ে কুইনোন বা মেলানিন জমে। এই সব পরিবর্তনের ফলেই কোষের মৃত্যু ঘটে। তাঁরা দেখিয়েছেন যে ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণের ক্ষেত্রে আক্রমণের ৬ ঘণ্টা পর থেকেই আবরণীর ভেদ্যতায় পরিবর্তন শুরু হয় এবং ১৮ ঘণ্টার মধ্যে

সব পরিবর্তনই ঘটে যায়। এই সব মতবাদগুলির কোনটির স্বপক্ষেই যথেষ্ট প্রমাণ নেই। কোষের মৃত্যু আর ফেনল জারণের ফলে কুইনোন ইত্যাদি জমা কোনটি যে আগে ঘটে এবং তাদের মধ্যে সম্পর্কটা ঠিক কি তাও জানা নেই। তবে অতিসংবেদনশীল প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে শ্বসন ও বিপাকীয় ক্রিয়াগুলির হার বৃদ্ধির ব্যাপারটি যুক্ত। কোন যৌগের প্রয়োগে শ্বসনের গতি শ্লথ করে দিলে অতিসংবেদনশীলতার প্রকাশ ঘটেনা এবং গাছের প্রতিরোধ ক্ষমতাও ভেঙ্গে পড়ে।

প্রথম থেকেই অতিসংবেদনশীল প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে আক্রান্ত অংশে কোষের মৃত্যুর একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ধরে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এমনও দেখা গেছে যে কোষের মৃত্যু ব্যতিরেকেই রোগ উৎপাদক একটি বা অল্প কয়েকটি কোষের বাইরে ছড়াতে ব্যর্থ হয়েছে এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। এর ফলে প্রশ্ন উঠেছে যে অতিসংবেদনশীলতা রোগ প্রতিরোধের কারণ না রোগ প্রতিরোধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরবর্তী পর্যায়ের ঘটনা মাত্র? অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোষের মৃত্যু আর রোগ উৎপাদকের নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়া কোনটি সময়ের মাপকাঠিতে আগে ঘটে পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় না। কোথাও কোথাও কোষের মৃত্যুর আগেই রোগ উৎপাদক নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে এমন প্রমাণও রয়েছে। এই ধরণের আরও কিছু তথ্যের উপর ভিত্তি করে কিরাই (Z. Kiraly, 1980) এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে অতিসংবেদনশীলতা (= আক্রান্ত কোষের মৃত্যু) রোগ প্রতিরোধের ফলে উদ্ভূত পরবর্তী পর্যায়ের একটি ঘটনা মাত্র—রোগ প্রতিরোধের মুখ্য কারণ নয়। তবে কোষের মৃত্যুকে যদি অতিসংবেদনশীলতার একমাত্র প্রমাণ বা পরিচয় বলে মনে করা না হয় ও পদটি ব্যাপকতর অর্থে প্রয়োগ করা হয় তাহলে একে রোগ প্রতিরোধের অন্যতম সফল পদ্ধতি হিসাবে মেনে নিতে হয়। বিভিন্ন তথ্য প্রমাণাদি আলোচনা করে মনে হয় যে গাছে আক্রমণোত্তর যে সব পরিবর্তন দ্রুত ঘটার ফলে রোগ উৎপাদক খুব তাড়াতাড়ি এবং বিশেষ কোন ক্ষতি করার আগেই সীমিত ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে তাদের সব কিছুকেই অতিসংবেদনশীলতার প্রকাশ বলে গ্রহণ করা উচিত। তবে এটা ঠিকই যে একটি গাছ অন্য পদ্ধতিতেও রোগের আক্রমণের বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে।

৩। ফাইটোঅ্যালেক্সিন (Phytoalexin)

আক্রান্ত কোষের মৃত্যু দিয়ে সব সময় রোগ উৎপাদকের মৃত্যুর বা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ার ঘটনার ব্যাখ্যা করা যায় না। কোষের মৃত্যু না হলেও সফলভাবে রোগ প্রতিরোধ ঘটতে দেখা গেছে। এই সব তথ্য থেকে মনে হতে পারে যে

অনেক সময় আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় গাছের দেহকোষে বিষাক্ত ধরণের এমন কিছু যৌগ উৎপন্ন হয় যা রোগ উৎপাদকের পক্ষে ক্ষতিকর এবং রোগ প্রতিরোধে অংশ গ্রহণ করে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ফ্রান্সে অর্কিডের মাইকোরাইজা (mycorrhiza) সংক্রান্ত গবেষণা থেকে (N. Bernard, 1909, 1911 ; P. Nobecourt, 1927) দেখা যায় যে অর্কিডের শিকড়ে মাইকোরাইজা সৃষ্টিকারী ছত্রাক *(Rhizoctonia repens, R. hircini)* প্রবেশ করলেও কর্টেক্সের ভিতর দিকে পৌঁছানোর পর আর ছড়াতে পারে না, সেখানে আক্রান্ত কোষের প্রতিক্রিয়ার ফলে নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া অর্কিডের শিকড়ে একবার আক্রমণ ঘটলে সেখানে দ্বিতীয় আক্রমণের সম্ভাবনা কমে যায়। আরও দেখা যায় যে অর্কিডের শিকড়ে ছত্রাকের পক্ষে ক্ষতিকর কোন পদার্থ বিশেষ না থাকলেও আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় সেখানে ঐ রকম পদার্থ জমে। এর থেকে এরকম একটা সম্ভাবনা দেখা দেয় যে আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় অর্কিডের কোষে ক্ষতিকারক কোন যৌগের উৎপাদনের ফলেই ছত্রাক নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে।

চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে জার্মানীতে মুলার (K.O. Muller) ও তাঁর সহকর্মীরা আলুর লেট ব্লাইট রোগ সংক্রান্ত গবেষণায় দেখতে পান যে কাটা আলুতে ফাইটফথোরার রোগসৃষ্টির উগ্র ক্ষমতাসম্পন্ন জাতির জুস্পোর দিলে সেখানে আলু পচতে থাকে কিন্তু প্রথমে উগ্রতাবিহীন বা কম উগ্রতাসম্পন্ন জাতির জুস্পোর দিয়ে ২৪ ঘণ্টা পরে সেখানে উগ্র জাতির জুস্পোর দিলে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। এই অর্জিত প্রতিরোধ ক্ষমতা শুধু ফাইটফথোরা নয় আলুর অন্য রোগ উৎপাদক ছত্রাকের বিরুদ্ধেও সক্রিয়। এই রকম কিছু তথ্যের উপর ভিত্তি করে মুলার ও বোর্জার (K. O. Muller and H. Borger, 1940) তাঁদের ফাইটোঅ্যালেক্সিন (Phytoalexin concept) তত্ত্বের উপস্থাপনা করেন যার মূল বক্তব্যগুলি হল :

(ক) পরজীবী ছত্রাক গাছের কোষের সংস্পর্শে এলে সেখানে অতিসংবেদনশীল প্রতিক্রিয়ার ফলে ফাইটোঅ্যালেক্সিন নামে অভিহিত এক ধরণের ছত্রাকের পক্ষে ক্ষতিকর যৌগ (antifungal compound) উৎপন্ন হয় যা আক্রান্ত কোষগুলিতে ছত্রাককে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে তার বিস্তার রোধ করে।

(খ) এই ধরণের আক্রমণ বিরোধী প্রতিক্রিয়া কেবলমাত্র জীবিত কোষেই ঘটে এবং আক্রান্ত ও সংলগ্ন কোষগুলির মধ্যেই সীমিত থাকে।

(গ) ফাইটোঅ্যালেক্সিনের উৎপাদন আক্রান্ত অঞ্চলে কোষের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত হতে পারে।

(ঘ) ফাইটোঅ্যালেক্সিনের ক্ষতিকর প্রভাব কোন বিশেষ ছত্রাকে সীমাবদ্ধ নয়, তবে বিভিন্ন ছত্রাকের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

(ঙ) রোগ সংবেদনশীল ও রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছের প্রতিক্রিয়ার ধরণ মূলতঃ এক, তবে তাদের মধ্যে ফাইটোঅ্যালেক্সিন উৎপাদনের হারে পার্থক্য দেখা যায়।

ফাইটোঅ্যালেক্সিন বলতে এখানে আক্রান্ত গাছের কোষে উদ্ভূত ছত্রাক বিরোধী এমন এক শ্রেণীর যৌগকে ভাবা হয়েছে যার ছত্রাকের আক্রমণ নিবৃত্ত করার ক্ষমতা আছে, কোন বিশেষ শ্রেণীর রাসায়নিক পদার্থকে নয়। গ্রীক শব্দ phyton (=গাছ) ও alexin (=নিবৃত্তিকারী পদার্থ) এর সমন্বয়ে এই পদটির সৃষ্টি। আক্রান্ত গাছ থেকে বিশুদ্ধ ও রাসায়নিক গুণাগুণ নির্ণীত অবস্থায় পাওয়া প্রথম ফাইটোঅ্যালেক্সিন হল রাঙ্গা আলু থেকে পাওয়া আইপোমিয়ামেরোন (ipomeamerone) (Kubota and Matsuura, 1953)। পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন গাছে ছত্রাকের আক্রমণের ফলে ফাইটোঅ্যালেক্সিন উৎপন্ন হবার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রধানতঃ লেগুমিনোসি (Leguminosae) পরিবারের গাছ থেকে হলেও, সোল্যানেসি (Solanaceae), ম্যালভেসি (Malvaceae), কনভলভিউলেসি (Convolvulaceae), আম্বেলিফেরি (Umbelliferae), এমনকি একবীজপত্রী ধরণের আর্কিডেসি, গ্র্যামিনি ইত্যাদি পরিবারভুক্ত গাছ থেকেও ফাইটোঅ্যালেক্সিনের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই সব ফাইটোঅ্যালেক্সিন গাছে সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায় না বা সেখানে থাকলেও অতি অল্প পরিমাণে থাকতে পারে, কিন্তু আক্রমণের ফলে নূতন করে উৎপন্ন হতে থাকে। এগুলির মধ্যে ফেনল বা সংশ্লিষ্ট ধরণের যৌগও রয়েছে। লেগুমিনোসি পরিবারের গাছ থেকে পাওয়া ফাইটোঅ্যালেক্সিনগুলি প্রধানতঃ আইসোফ্ল্যাভনয়েড (isoflavonoid) শ্রেণীর যদিও সীম থেকে পাওয়া ওয়াইরোন (weyrone) ও ওয়াইরোন অ্যাসিড অ্যাসেটিলেনিক কিটো ফিউরানয়েড (acetylenic keto furanoid) শ্রেণীর যৌগ। সোল্যানেসি পরিবার থেকে পাওয়া ফাইটোঅ্যালেক্সিনগুলি টার্পিনয়েড (terpenoid) শ্রেণীর। এ ছাড়াও রাসায়নিক দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর কিছু ফাইটোঅ্যালেক্সিন পাওয়া গেছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য ফাইটোঅ্যালেক্সিনগুলির একটি তালিকা দেওয়া হল (সরণী-২)। এই তালিকা থেকে দেখা যাবে যে কোন গাছে একাধিক ফাইটোঅ্যালেক্সিনও আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় উৎপন্ন হতে পারে। আবার একই ফাইটোঅ্যালেক্সিন একাধিক গাছে উৎপন্ন হওয়ার নজীরও আছে।

সারণী—২

বিভিন্ন গাছ থেকে পাওয়া ফাইটোঅ্যালেক্সিনের তালিকা

গাছের পরিবার	গাছের নাম	ফাইটোঅ্যালেক্সিন
লেগুমিনোসি	মটরশুটি *(Pisum sativum)*	১. পিসাটিন (Pisatin)
		২. মাকিয়েইন (Maackiain)
	রেড ক্লোভার *(Trifolium pratense)*	১. মাকিয়েইন
		২. মেডিকার্পিন(Medicarpin)
	আলফালফা *(Medicago sativa)*	১. মেডিকার্পিন
		২. স্যাটাইভান (Sativan)
	ফ্রেঞ্চ বীন *(Phaseolus vulgaris)*	১. ফ্যাসীওলিন (Phaseollin)
		২. ফ্যাসীওলিডিন (Phasollidin)
		৩. ফ্যাসীওলিন আইসোফ্ল্যাভান (Phaseollin isoflavan)
		৪. কিভিটোন (Kievitone)
	সয়াবীন (*Glycine max)*	১. গ্লাইসিওলিন (Glyceollin)
	সীম *(Vicia faba)*	১. ওয়াইরোন (Wyerone)
		২. ওয়াইরোন অ্যাসিড (Wyerone Acid)
ম্যালভেসি	তুলা *(Gossypium barbadense)*	১. গসীপল (Gossypol)
		২. হেমীগসীপল (Hemigossypol)
		৩. ভার্গোসিন (Vergosin)
আম্বেলিফেরি	গাজর *(Daucus carota)*	১. আইসোকুমারিন (Isocoumarin)
সোল্যানেসি	আলু *(Solanum tuberosum)*	১. রিশিটিন (Rishitin)
		২. ফাইটুবেরিন (Phytuberin)
		৩. লুবিমিন (Lubimin)
	টম্যাটো *(Lycopersicum esculentum)*	১. রিশিটিন
	লঙ্কা *(Capsicum fruitescens)*	১. ক্যাপসিডিয়ল (Capsidiol)
কনভলভিউলেসি	রাঙ্গা আলু *(Ipomea batatas)*	১. আইপোমিয়ামেরোন (Ipomeamerone)
অর্কিডেসি	অর্কিড : *Orchis militaris, Loroglossum hircinum*	১. অর্চিনল (Orchinol)
		২. হির্সিনল (Hircinol)
গ্র্যামিনি	ধান *(Oryza sativa)*	১. মোমিল্যাকটোন এ (Momilactone A)
		২. মোমিল্যাকটোন বি' (Momilactone B)

আক্রান্ত ও তৎসংলগ্ন জীবিত কোষেই মাত্র ফাইটোঅ্যালেক্সিন উৎপন্ন হয় এবং বিশেষ ছড়ায় না। একটি ফাইটোঅ্যালেক্সিন কোন প্রজাতির গাছের বৈশিষ্ট্যের সূচক। কোন গাছে এই ধরণের একাধিক যৌগও উৎপন্ন হতে দেখা যায় এবং সেগুলি বিভিন্ন ছত্রাককে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। ফাইটো-অ্যালেক্সিন কত দ্রুত উৎপন্ন হয় তার উপর আক্রমণকারী ছত্রাকের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে বলে ধারণা। গাছে আক্রমণের ৬ ঘণ্টার মধ্যেই ফাইটোঅ্যালেক্সিন উৎপাদন শুরু হয়ে যেতে পারে। সাধারণতঃ ৬০ থেকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে উৎপাদন সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছায়। ছত্রাকের আক্রমণ ছাড়া স্পোরের বা অঙ্কুরিত স্পোরের নির্যাস (diffusate) প্রয়োগ করলে অথবা কদাচিৎ ব্যাকটিরিয়া বা ভাইরাসের আক্রমণের ফলেও গাছে ফাইটোঅ্যালেক্সিন উৎপন্ন হতে দেখা গেছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রজাতির গাছে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির রাসায়নিক যৌগ প্রয়োগ করেও কৃত্রিম উপায়ে ফাইটোঅ্যালেক্সিন উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে ভারী ধাতুর লবণ (heavy metal salts), অ্যামাইনো অ্যাসিড, অ্যান্টিবায়োটিক, বিপাকীয় ক্রিয়াকলাপে বাধা দেয় এমন (metabolic inhibitors) ও আরো অনেক যৌগ। এ ছাড়াও ছত্রাকের দেহ থেকে উদ্ভূত কোন বিশেষ যৌগ যেমন মনিলিকোলা ফ্রাকটিকোলা *(M. fructicola)* থেকে পাওয়া মনিলিকোলিন (monilicolin A) মটরশুটিতে, ভার্টিসিলিয়াম থেকে পাওয়া লিপোপ্রোটিন পলিস্যাকারাইড (lipoprotein polysaccharide) তুলাতে ও ফাইটফথোরার হাইফার দেওয়াল থেকে পাওয়া গ্লুকান (glucan) সয়াবীন ও আলু গাছে ফাইটোঅ্যালেক্সিন উৎপাদনে উদ্দীপনা যোগায় বলে জানা যায়। শোখাউ এবং হ্যাডউইগার (L. A. Schwochau and M. E. Hadwiger, 1969) এর মতে পিসাটিন ও ফ্যাসীওলিন উৎপাদনের সঙ্গে প্রোটিন সংশ্লেষের সম্পর্ক আছে এবং যেসব যৌগ ফাইটোঅ্যালেক্সিন উৎপাদনে উদ্দীপনা যোগায় তারা সকলেই DNA এর গঠনকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে।

বিভিন্ন পোষক গাছ ও পরজীবীর মিথস্ক্রিয়ার ফলে ভিন্ন ভিন্ন ফাইটো-অ্যালেক্সিনের উৎপাদন ও আক্রমণকারী ছত্রাকের উপর তা.দের ক্রিয়া সংক্রান্ত গবেষণা থেকে তিন ধরণের তথ্য পাওয়া যায় যেমন :

(ক) কোন একটি উগ্র জাতির ছত্রাকের দ্বারা আক্রান্ত হলে পোষকের ভিন্ন ভিন্ন জাতির (variety) গাছ বিভিন্ন পরিমাণে ফাইটোঅ্যালেক্সিন উৎপাদন করে। রোগ সংবেদনশীল জাতির গাছের তুলনায় প্রাতরোধী

জাতির গাছে ফাইটোঅ্যালেক্সিন দ্রুত হারে উৎপন্ন হয় ও সাধারণতঃ বেশী পরিমাণে জমে।

(খ) কোন একটি রোগ সংবেদনশীল জাতির গাছ ছত্রাকের বিভিন্ন জাতির দ্বারা আক্রান্ত হলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপন্ন ফাইটোঅ্যালেক্সিনের পরিমাণ এক হয় না। উগ্র জাতির তুলনায় কম উগ্র বা উগ্রতাবিহীন ছত্রাকের আক্রমণে সাধারণতঃ বেশী পরিমাণে ফাইটোঅ্যালেক্সিন উৎপন্ন হয়।

(গ) বিভিন্ন ছত্রাক বা রোগ উৎপাদক ছত্রাকের বিভিন্ন জাতি ফাইটো-অ্যালেক্সিনের প্রতি সমান সংবেদনশীল (sensitive) নয়। রোগ উৎপাদন করে না এমন ছত্রাকের তুলনায় যারা রোগ উৎপাদনে সক্ষম তাদের এবং উগ্রতাবিহীন বা কম উগ্র জাতির তুলনায় রোগ উৎপাদকের উগ্র জাতির ফাইটোঅ্যালেক্সিনের ক্ষতিকর প্রভাব সহ্য করার ক্ষমতা (tolerance) অনেক বেশী।

কোথাও কোথাও দেখা গেছে যে ছত্রাকের উগ্র ও কম উগ্র বা উগ্রতাবিহীন জাতির ফাইটোঅ্যালেক্সিন সহ্য করার ক্ষমতা প্রায় একই কিন্তু উগ্র জাতির ছত্রাকের ফাইটোঅ্যালেক্সিন নষ্ট করে ফেলার ক্ষমতা আছে যার ফলে আক্রান্ত অঞ্চলে সেটি বেশী পরিমাণে জমতে পায় না। ক্রুইকশ্যাঙ্কের (I. A. M. Cruickshank, 1963) মতে কোন গাছে ছত্রাকের আক্রমণ হলে যদি সেখানে দ্রুত ছত্রাকের পক্ষে ক্ষতিকর মাত্রায় (threshhold level) ফ্যাইটোঅ্যালেক্সিন জমে তখনই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে। যেখানে আক্রমণের ফলে ফাইটোঅ্যালেক্সিনের উৎপাদন কম হয়, বা উৎপাদন বেশী হওয়া সত্ত্বেও ছত্রাক তাকে নষ্ট করে ফেলে দেয় অথবা ছত্রাকের ফাইটোঅ্যালেক্সিন সহ্য করার ক্ষমতা খুব বেশী সেখানে গাছে রোগ সংবেদনশীলতার প্রকাশ ঘটে এবং রোগলক্ষণ দেখা দিতে থাকে। আক্রমণের ফলে কি ধরণের ফাইটোঅ্যালেক্সিন উৎপন্ন হবে তা নির্ভর করে গাছের জীনের উপর আর উৎপাদনের পরিমাণ এবং ছত্রাকের ফাইটোঅ্যালেক্সিনের প্রতি সহনশীলতা নিয়ন্ত্রিত হয় ছত্রাকের জীনের দ্বারা।

কোন কোন প্রজাতির গাছে একাধিক ফাইটোঅ্যালেক্সিন উৎপন্ন হয়, যেমন ফ্রেঞ্চবীন, তুলা, আলু ইত্যাদি। কুচ (J. Kuc, 1966) মনে করেন যে এর ফলেই হয়ত গাছের পক্ষে অনেক বেশী সংখ্যক পরজীবীর আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব হয়। দেখা গেছে যে বিভিন্ন ছত্রাকের আক্রমণের ফলে গাছে ৩ ৪টি ফাইটোঅ্যালেক্সিন উৎপন্ন হলেও বিশেষ কোন ছত্রাকের আক্রমণে সাধারণতঃ ঐ ধরণের একটি যৌগ অন্তগুলির তুলনায় বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হয়। মনে

হয় যে এই আক্রমণের ক্ষেত্রে ঐ ফাইটোঅ্যালেক্সিনটিই রোগ প্রতিরোধে প্রধান ভূমিকা নেয়। কিছু গাছের ক্ষেত্রে রোগ প্রতিরোধে ফাইটোঅ্যালেক্সিনের ভূমিকা মোটামুটিভাবে স্বীকৃত। মনে হয় গবেষণার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতে অধিক সংখ্যক গাছে এই ধরণের প্রমাণ পাওয়া যাবে। তবে সব পোষক-পরজীবীর ক্ষেত্রেই যে রোগ প্রতিরোধে ফাইটোঅ্যালেক্সিনের কিছু ভূমিকা থাকবে এমন চিন্তারও কোন কারণ নেই। ভ্যান ডার প্ল্যাঙ্ক (১৯৬৮) বা কিরাই (১৯৮০) অবশ্য মনে করেন যে ফাইটোঅ্যালেক্সিনের গাছের রোগ প্রতিরোধে কোন মুখ্য ভূমিকা নেই, এর উৎপাদন রোগ প্রতিরোধের ফলে উদ্ভূত পরবর্তী পর্যায়ের একটি ঘটনা মাত্র।

৪। রোগ সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় বাধাদানের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ

যে সব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রোগ উৎপাদক গাছের দেহে রোগের সৃষ্টি করে সেগুলিকে বাধাদান বা দমনের মাধ্যমে যে রোগ প্রতিরোধ সম্ভব হতে পারে এমন কিছু তথ্য জানা গেছে। ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়ার রোগসৃষ্টির প্রধান দুটি অস্ত্র হল এনজাইম ও টক্সিন। কিছু রোগের ক্ষেত্রে আক্রমণের ফলে রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছে এমন সব পরিবর্তন হতে পারে যার ফলে এনজাইম বা টক্সিন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এই ধরণের রোগ প্রতিরোধ পদ্ধতিকে 'নির্বিষকরণ' (detoxifiation) বলা হয়।

রোগ প্রতিরোধী জাতির বীন গাছে রাইজোকটোনিয়া সোল্যানির আক্রমণ হলে দ্রুত ক্যালসিয়াম জমতে থাকে যার ফলে ঐ অঞ্চলে কোষের দেওয়ালে পেকটিক যৌগ ক্যালসিয়াম পেকটেটে রূপান্তরিত হয়। ক্যালসিয়াম পেকটেটের পরিমাণ দেওয়ালে বেশী হয়ে যাওয়ায় পেকটিক এনজাইমের ক্রিয়ায় তার বিশেষ ক্ষতি হয় না, ফলে কোষের মৃত্যু ঘটে না এবং আক্রমণ প্রতিহত হয়। সাইডার (Cider) জাতির আপেলে স্ক্লেরোটিনিয়া ফ্রাকটিকোলার আক্রমণে বিশেষ ক্ষতি না হবার কারণ আক্রান্ত অঞ্চলের কোষে ফেনল জারিত হবার ফলে উৎপন্ন কুইনোন বেশী পরিমাণে জমে যার ফলে ছত্রাকের পলিগ্যালাকটুরোনেজ এনজাইম নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এ ছাড়া টম্যাটোর ফিউজেরিয়াম ও ভার্টি-সিলিয়াম উইল্ট, বীনের চকোলেট স্পট ও আরও কিছু রোগের ক্ষেত্রে এই ধরণের প্রমাণ রয়েছে।

গাছ সক্রিয়ভাবে রোগ উৎপাদকের সৃষ্ট টক্সিনকে নষ্ট করে রোগের আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম এমন প্রমাণ বিশেষ কিছু নেই। ওটের ভিক্টোরিয়া

ব্লাইট রোগের ক্ষেত্রে প্রথম দিকে এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছের কোষে ছত্রাকের *(Helminthosporium victoriae)* টক্সিনকে কোনভাবে আবদ্ধ করে বা রাসায়নিক উপায়ে পরিবর্তিত করে নিষ্ক্রিয় করে ফেলা হয় যার ফলে আক্রমণ নিষ্ফল হয়ে যায় (Romanko, 1959)। পরবর্তীকালে এই দাবী সমর্থিত হয় নি। ধানের ঝলসা রোগের ক্ষেত্রে কিছু রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছ সংবেদনশীল জাতির গাছের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে রোগ উৎপাদক পিরিকুলারিয়ার টক্সিন নিষ্ক্রিয় করে ফেলতে পারে এরকম প্রমাণ পাওয়া গেছে।

অর্জিত প্রতিরোধ ক্ষমতা (Acquired rcsistance)

মানুষ বা প্রাণীর ক্ষেত্রে অনেক রোগের সময় দেখা যায় যে একবার রোগের পর সুস্থ হয়ে উঠলে সেই রোগের আক্রমণ আর হয় না বা অন্ততঃ কিছুকাল হয় না। রোগ উৎপাদকের প্রোটিন বা 'অ্যান্টিজেন' (antigen) এর প্রতিক্রিয়ায় প্রাণীদেহে এক বিশেষ প্রতিরোধী প্রোটিন বা 'অ্যান্টিবডি' (antibody) তৈরী হয় যা বিশেষ ভাবে ঐ রোগ উৎপাদক ভাইরাস বা ব্যাকটিরিয়ার বিরুদ্ধেই সক্রিয়। অ্যান্টিবডি উৎপাদনের ফলেই প্রাণীদেহে সক্রিয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। গাছে এই ধরণের অর্জিত বা আহৃত প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকতে পারে কি না সেটি একটি বহু আলোচিত বিষয়। ফ্রান্সে প্রায় একই সময়ে ব্যুভেরি (J. Beauverie, 1901) ও রে (M. J. Ray, 1901) প্রথম দেখান যে গাছে রোগ উৎপাদকের দুর্বল বা কম উগ্র জাতি দিয়ে কৃত্রিমভাবে আক্রমণের সৃষ্টি করলে পরে ঐ গাছ উগ্র জাতির আক্রমণ সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করে। ক্রমশঃ আরও এই ধরণের প্রমাণ জমতে থাকে। এমনও দেখা যায় যে রোগ উৎপাদক ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়ার নির্যাস (extract) গাছে বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করলে অনেক সময় গাছ ঐ রোগের আক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষমতা অর্জন করে। পরবর্তীকালে অনেক তথ্য প্রমাণের উপর নির্ভর করে উদ্ভিদ-রোগবিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে কোন রোগ উৎপাদকের বিরুদ্ধে প্রাণীদেহের মত ব্যাপকভাবে ও দীর্ঘস্থায়ী রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে না উঠলেও গাছে রোগ উৎপাদকের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জিত হতে পারে। এমন প্রমাণ রয়েছে যে একটি গাছ অনেক সময় ছত্রাক, ব্যাকটিরিয়া বা ভাইরাসজনিত রোগের বিরুদ্ধে উচ্চতর প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করতে পারে যদি আগে একই রোগ উৎপাদক, সম্পর্কযুক্ত কম উগ্র বা উগ্রতাবিহীন জাতি অথবা অন্য পরজীবী

বা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। ব্যাকটিরিয়া বা ছত্রাকের নির্যাস প্রয়োগ করেও কোথাও কোথাও সুফল পাওয়া গেছে। প্রথম আক্রমণ কোন রোগ উৎপাদক ছত্রাক, ব্যাকটিরিয়া অথবা ভাইরাস দ্বারা হলেও অর্জিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অন্য শ্রেণীর রোগ উৎপাদকের বিরুদ্ধেও অনেকসময় কার্যকরী হয়। এমনও দেখা গেছে যে দুটি ছত্রাক, ব্যাকটিরিয়া বা ভাইরাস একই গাছে বা ভিন্ন ভিন্ন গাছে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে পারে। একে বলা হয় 'ক্রস প্রটেকশন' (cross protection)। টক চেরীতে (sour cherry) চারটি ভাইরাস ; ফ্রেঞ্চবীন, সীম ও অ্যান্টিরাইনামে রাস্ট ছত্রাক যথাক্রমে ইউরোমাইসেস ফ্যাসীওলি, ইউরোমাইসেস ফাবি ও পাকসিনিয়া অ্যান্টিরাইনি *(P. antrrhini)* ; এবং টম্যাটো, তরমুজ ও বাঁধাকপিতে ফিউজেরিয়াম অক্সিস্পোরামের তিনটি বিশেষ জাতি প্রাথমিক আক্রমণের ফলে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে পারে এমন দেখা গেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইভাবে অর্জিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশীদিন স্থায়ী হয় না। তবে ইউরোপে ওকের মিলডিউ, পূর্ব আফ্রিকায় কফির মরিচা ও বিভিন্ন গাছের ক্রাউন গল রোগে অনেকসময় দেখা গেছে যে গাছ একবার রোগে আক্রান্ত হলে পরে সাধারণতঃ রোগের আক্রমণ তীব্রভাবে ঘটে না।

ভাইরাসজনিত রোগের ক্ষেত্রেই অর্জিত প্রতিরোধ ক্ষমতার সাফল্যের নিদর্শন বেশি। অনেকসময় কোন ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত গাছ ঐ একই ভাইরাস বা সম্পর্কযুক্ত অন্য কোন ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে সেই আক্রমণ বিশেষ সফল হয় না, কিন্তু সম্পর্কহীন ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে গাছ তখন রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তামাক গাছে টোব্যাকো নেক্রোসিস ও টোব্যাকো স্ট্রীক (tobacco streak), টোম্যাটোতে রিং স্পট, বীটে কার্লি টপ (curly top) ও আরও কিছু ভাইরাস রোগের ক্ষেত্রে প্রাইস (W. C. Price, 1940) এই ধরণের অর্জিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রথম আক্রমণের ফলে অর্জিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সাধারণতঃ আক্রান্ত ও সংলগ্ন অঞ্চলের মধ্যেই সীমিত থাকে। কেবল কিছু ভাইরাসের ক্ষেত্রে অর্জিত প্রতিরোধ ক্ষমতা খানিকটা বিস্তৃতভাবে কার্যকরী হতে দেখা যায়। তামাক গাছের নীচের ৩-৪টি পাতা TMV দ্বারা আক্রান্ত হলে উপরের দিকে ১৬টি পর্যন্ত পাতায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জিত হতে দেখা যায়। ডায়াস্থাস, ক্যাপসিকাম *(Capsicum pendulum)*, গমফ্রেনা *(Gomphrena* sp.*)* ও ধুতুরা *(Datura* sp.*)* গাছেও ভাইরাস আক্রমণের ফলে কিছুটা বিস্তৃতভাবে

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জিত হয়। তামাকের পাতায় পেরোনোস্পোরার *(P. tabacina)* আক্রমণ হলে গাছে অর্জিত প্রতিরোধ ক্ষমতা উপরদিকে কিছুটা দূরত্ব পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে কাজ করতে দেখা গেছে। একমাত্র ভাইরাস আক্রমণের ক্ষেত্রেই গাছের এই ধরণের প্রতিরোধ ক্ষমতা মানুষ বা প্রাণীর দেহে যেমন ঘটে তার কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে। প্রাইস (১৯৪০) মনে করেন ভাইরাসের আক্রমণে কোষের স্তরেই প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জিত হয়। যেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই ভাইরাস সারা দেহে কোষ থেকে কোষে ছড়িয়ে পড়ে (systemic spread), সেজন্য সেখানে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কোন ভাইরাস রোগের ক্ষেত্রে যদি সেই ভাইরাসের এমন জাতি (strain) খুজে পাওয়া যায় যা সারাদেহে ছড়িয়ে পড়বে অথচ কোন রোগলক্ষণ সৃষ্টি হবে না বা হলেও খুব সামান্য হবে তাহলে তার মাধ্যমে হয়ত এই রোগের বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হতে পারে।

অর্জিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কিভাবে কাজ করে অর্থাৎ প্রথম আক্রমণ কিভাবে, প্রত্যক্ষ্য বা পরোক্ষভাবে, দ্বিতীয় আক্রমণের পথে বাধার সৃষ্টি করে সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা এখনও গড়ে ওঠেনি। তবে অনেকসময় প্রথম আক্রমণের ফলে ভাইরাসের ক্ষেত্রে কোন ভাইরাস প্রতিরোধী পদার্থ (antiviral factor = AVF)—যেমন ইনটারফেরন (Interferon), ছত্রাকের ক্ষেত্রে কোন ছত্রাক প্রতিরোধী পদার্থ যেমন ফাইটোঅ্যালেক্সিন ও ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রে কোন ব্যাকটিরিয়া প্রতিরোধী যৌগ (antibacterial compound) গাছের দেহে জমতে দেখা গেছে যাদের দ্বিতীয় আক্রমণ প্রতিরোধে বিশেষ কোন ভূমিকা থাকতে পারে বলে মনে হয়। গাছে যেহেতু রক্ত সংবহনতন্ত্রের মত কিছু নেই এবং AVN, ইনটারফেরন বা ফাইটোঅ্যালেক্সিন কোনটিরই দীর্ঘদিন অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকার সম্ভাবনা খুব কম সেক্ষেত্রে এদের উপর নির্ভর করে যে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তার স্বল্পস্থায়ী হবার সম্ভাবনাই বেশী, যদিও কোথাও কোথাও কিছুটা স্থায়িত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই প্রসঙ্গে মাট্টা (A. Matta, 1969) প্রশ্ন তুলেছেন যে প্রথম আক্রমণের ফলে অর্জিত ক্ষমতা কি গাছের কোষে উৎপন্ন ইনটারফেরন, AVF, ফাইটোঅ্যালেক্সিন ইত্যাদি কোন যৌগ জমার ফলে সেখানে সম্ভাব্য দ্বিতীয় আক্রমণের বিরুদ্ধে একটি তৈরী নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা মাত্র অথবা আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত অঞ্চলের কোষগুলি স্বভাববহির্ভূত কাজে এমনভাবে প্রভাবিত (conditioned) হয় যে

পরবর্তী আক্রমণের সময় তারা রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছের কোষের মতই সক্রিয়ভাবে রোগ প্রতিরোধ করে? পরবর্তীকালে বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে কুচ (J. Kuc, 1976) ও সিংহ (A. K. Sinha. 1976) দ্বিতীয় সম্ভাবনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

রোগ উৎপাদকের পক্ষে ক্ষতিকর নয় এমন বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক যৌগ প্রয়োগ করেও গাছে সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে রাসায়নিক যৌগের দ্রবণ দিয়ে গাছে স্প্রে করা হয়েছে, গাছের গোড়ার জমি ভিজিয়ে দেওয়া হয়েছে অথবা ঐ দ্রবণে বীজ ভিজিয়ে রেখে পরে জমিতে বোনা হয়েছে। যে সব রাসায়নিক যৌগ ব্যবহারে গাছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠতে দেখা গেছে তাদের মধ্যে রয়েছে ভারী ধাতুর বিশেষ করে তামা, ক্যাডমিয়াম, বোরন, দস্তা, লোহা ইত্যাদির লবণ, লিথিয়াম ঘটিত লবণ, অ্যামাইনো অ্যাসিড, হরমোন (plant growth hormone) ও নানা ধরণের জৈব পদার্থ। গম, যব ইত্যাদির মরিচা ও ছাতাধরা রোগের ক্ষেত্রে লিথিয়াম লবণ, শশার স্ক্যাব রোগে ফেনিলঅ্যালানিন, ডাচ এল্‌ম এবং ফিউজেরিয়াম ও ভার্টিসিলিয়ামজনিত উইল্ট রোগে হরমোন প্রয়োগ করে রোগ নিয়ন্ত্রণে বিশেষ সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে, তবে ল্যাবরেটরী-ভিত্তিক পরীক্ষায় সফল যৌগের মধ্যে অনেকগুলিই চাষের জমিতে রোগ নিয়ন্ত্রণে সমান সাফল্যের পরিচয় দেয়নি। এই ব্যাপারে আরও সুপরিকল্পিতভাবে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। শশায় ফেনিলঅ্যালানিন প্রয়োগে ফেনলের পরিমাণ বেড়ে যায় যা রোগ উৎপাদক ছত্রাকের পক্ষে ক্ষতিকর। উইল্ট রোগ প্রতিরোধের জন্য হরমোন ব্যবহার করলে দেখা যায় ট্র্যাকীয়ার দেওয়ালে পেকটিন জাতীয় পদার্থ ক্যালসিয়াম পেকটেটে রূপান্তরিত হবার সম্ভাবনা থাকে যা পেকটিক এনজাইমের ক্রিয়ায় সহজে ভাঙ্গে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিন্তু রাসায়নিক যৌগের প্রভাবে গাছে কেন বা কিভাবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। ইদানীংকালে, সিংহ ও তাঁর সহকর্মীদের ধানের ব্রাউন স্পট সংক্রান্ত গবেষণা থেকে কিছু নূতন তথ্য জানা গেছে (Sinha and Trivedi, 1980 ; Sinha and Hait, 1982 ; Giri and Sinha, 1984)। ধানে ফাইটোঅ্যালেক্সিনের অস্তিত্ব এবং বাদামী দাগ বা ব্রাউন স্পট রোগ প্রতিরোধে এর ভূমিকা মোটামুটিভাবে স্বীকৃত হওয়ায় সিংহ ও তাঁর সহকর্মীরা বিভিন্ন গাছে ফাইটোঅ্যালেক্সিন উৎপাদনে উদ্দীপনা যোগায় এমন রাসায়নিক যৌগ (phytoalexin inducers) প্রয়োগ

করে ধানের চারায় বাদামী দাগ রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালান এবং যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল এইভাবে ধান গাছকে কৃত্রিম উপায়ে ফাইটোঅ্যালেক্সিন উৎপাদনে উদ্দীপনা যুগিয়ে তার মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলা। এই ধরনের বিভিন্ন যৌগ নানা ভাবে প্রয়োগ করে পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে বীজ ঐ সব যৌগের তরল দ্রবণে ($10^{-6}-10^{-8}$M) ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে বুনলে সব থেকে সফল ও দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ ক্ষমতা ধানের চারায় গড়ে ওঠে। ফেরিক ক্লোরাইড, কপার ক্লোরাইড, নিকেল নাইট্রেট, সোডিয়াম সেলেনাইট, সিস্টিন (cysteine), সাইক্লোহেক্সি-মাইড (cycloheximide) ও আরও কিছু যৌগ এইভাবে ব্যবহার করে বিশেষ সুফল পাওয়া গেছে। এইভাবে তৈরী ২ সপ্তাহের চারা থেকে নির্যাস সংগ্রহ করে দেখা গেছে তাতে রোগ উৎপাদক হেলমিনথোস্পোরিয়াম ওরাইজির হাইফার বৃদ্ধি বিশেষভাবে ব্যাহত হয় কিন্তু ৩—৪ সপ্তাহের চারার নির্যাস হাইফার বৃদ্ধি ব্যাহত করে না, অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে তার ছত্রাকবিরোধী ক্ষমতা কমে যায়। অথচ এই বয়সে ঐ সব চারা আক্রান্ত হলে ২—৩ দিনের মধ্যেই তার নির্যাসে হাইফার অগ্রগতি ভীষণভাবে ব্যাহত করার মত ছত্রাকবিরোধী ক্ষমতা নূতন করে দেখা যায়। উপরোক্ত তথ্য থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে ফাইটো-অ্যালেক্সিন উৎপাদনে উদ্দীপনা যোগায় এমন যৌগ বীজে প্রয়োগের ফলে রোগ সংবেদনশীল জাতির চারাতে শুধু যে প্রাথমিক পর্যায়ে ফাইটোঅ্যালেক্সিন উৎপন্ন হয় তাই নয়, চারার কোষগুলিতে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার স্তরে এমন কিছু পরিবর্তন সূচিত হয় (conditioning) যার ফলে রোগের আক্রমণ হলে এগুলির প্রতিরোধী জাতির কোষের মত প্রতিক্রিয়া হয়, দ্রুত ফাইটোঅ্যালেক্সিন উৎপন্ন হতে থাকে ও ছত্রাকের পক্ষে ক্ষতিকারক মাত্রায় জমে। তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্জিত এই ফাইটোঅ্যালেক্সিন উৎপাদন ক্ষমতা সময়ের সঙ্গে কমে যায়। রোগ সংবেদনশীল জাতির চারায়, যেখানে এইভাবে রোগ প্রতিরোগ ক্ষমতা অর্জিত হয়েছে, আক্রমণের ফলে যেসব জীবরাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে সেগুলি রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছে ঐ অবস্থায় যে ধরণের পরিবর্তন ঘটে অনেকটা তারই মত। ধানের ঝলসা রোগের ক্ষেত্রেও ঐ ধরণের যৌগ ব্যবহার করে সুফল পাওয়া গেছে। এই সব তথ্য থেকে মনে হয় যে শস্যের, বিশেষ করে চারা অবস্থায়, রোগ নিয়ন্ত্রণে এই ধরণের যৌগের বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে, তবে নিঃসন্দেহে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন। ধানের খোলা পচা (sheath rot) রোগের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ৭ সপ্তাহের চারায় জিবারিলিন প্রয়োগ

করলে গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশ বেড়ে যায় ও আক্রান্ত অংশে বর্দ্ধিত পরিমাণে ফাইটোঅ্যালেক্সিন মোমিল্যাকটোন 'এ' জমে (A. Ghosal and R. P. Purkayastha, 1984)। এই তথ্য উপরের ধারণাকেই সমর্থন করে।

রোগ প্রতিরোধে জীনের প্রভাব (Genetics of host resistance)

অন্যান্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মতই গাছের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বা অক্ষমতা জীন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বিফেন (R. H. Biffen, 1905) প্রথম দেখান যে গম গাছের ইয়েলো রাস্ট রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা উত্তরাধিকার সূত্রে এক জন্ম থেকে পরবর্তী জন্মতে যায় এবং এটি মেণ্ডেলের বংশগতির সূত্র অনুসারেই ঘটে। প্রথম দিকে শুধুমাত্র জীন নিয়ন্ত্রিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতায় উপর ভিত্তি করেই পোষক গাছ ও পরজীবীর সম্পর্কের ব্যাখ্যা করা হত। পরবর্তীকালে জানা গেল যে জীবাণুর রোগ সৃষ্টির ক্ষমতা অথবা রোগ উৎপাদকের উগ্রতা বা তার অভাব একইভাবে জীন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। দেখা যায় যে রোগ উৎপাদকের একটি জাতি (race) গাছের একটি জাতিকে (variety) সাফল্যের সঙ্গে আক্রমণ করে অথচ অন্য একটি জাতির ক্ষেত্রে বিফল হয়। আবার দ্বিতীয় জাতির গাছে রোগ উৎপাদকের অন্য একটি জাতি হয়ত রোগ সৃষ্টিতে সফল হতে পারে। কোন গাছের সঙ্গে কোন পরজীবীর সংস্পর্শ ঘটলে গাছের প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ তার রোগ হবে কি না তা গাছ ও পরজীবীর উপরোক্ত দুই ধরনের জীনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। যতবারই তাদের মধ্যে সংস্পর্শ ঘটুক না কেন ফলাফল একই রকম হবে যদি না পরিবেশের বিশেষ করে তাপমাত্রায় কোন বড় পরিবর্তন হয়। পরজীবীর রোগসৃষ্টির ক্ষমতার মত গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও অনুরূপভাবে এক বা একাধিক জীন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

যখন কোন জাতির গাছে রোগ উৎপাদকের অধিকাংশ জাতির তুলনায় কিছু জাতির বিরুদ্ধে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশ উঁচু মানের হতে দেখা যায় তখন তাকে খাড়া **রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা** বা 'ভার্টিকাল রেজিস্ট্যান্স' (vertical resistance) বলা হয়। কিন্তু রোগ উৎপাদকের সকল জাতির প্রতি যদি কোন গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে এবং সেই ক্ষমতা কমবেশি মাঝারি মানের হয় তখন তাকে **সমান্তরাল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা** বা 'হরাইজন্টাল রেজিস্ট্যান্স' (horizontal resistance) বলে। গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একটি জীন (monogenic), কয়েকটি জীন (oligogenic) বা অনেকগুলি জীন (polygenic) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।

অনেকে প্রথম দু ধরণের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে **মুখ্য জীনজনিত প্রতিরোধ ক্ষমতা** (major gene resistance) ও শেষেরটিকে **গৌণ জীনজনিত প্রতিরোধ ক্ষমতা** (minor gene resistance) বা **মাঠের প্রতিরোধ ক্ষমতা** (field resistance) বলেন। তবে মাত্র কয়েকটি জীনের উপর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নির্ভর করলে সবকটিই যে মুখ্য জীন হবে বা অনেকগুলি জীনের উপর নির্ভর করলে সবকটিই যে গৌণ জীন হবে তাও সব সময় বলা যায় না।

খাড়া ও সমান্তরাল রোগ প্রতিরোধের তত্ত্ব গাণিতিক সূত্র থেকে পাওয়া। ভ্যান ডের প্ল্যাঙ্ক (J. E. Van der Plank, 1942) প্রস্তাবিত এই তত্ত্ব তাঁর দেওয়া রেখাচিত্র (১৯) থেকেই পরিষ্কার হবে। এখানে দেখা যায় যে আলুর একটি জাতি 'কেনেবেক' (Kenebec) এর ফাইটফথোরা ইনফেস্ট্যানসের আটটি জাতির (০ ; ২; ৩; ৪ ; ২, ৩ ; ২, ৪ ; ৩, ৪ ; ২, ৩, ৪)
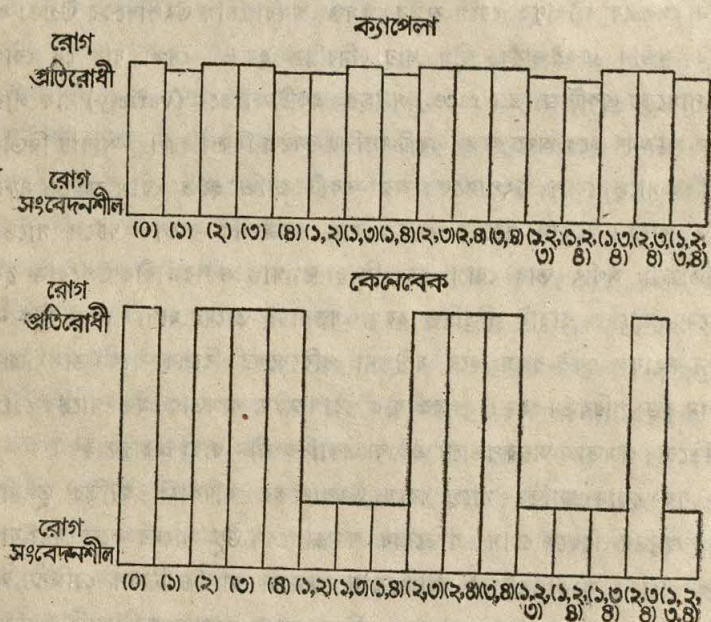
রেখাচিত্র ১৯ : আলুর দুটি জাতি 'ক্যাপেলা' ও 'কেনেবেক' এর ফাইটফথোরা ইনফেস্ট্যানসের ষোলটি জাতির বিরুদ্ধে খাড়া ও সমান্তরাল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা (ভ্যান ডের প্ল্যাঙ্ক অনুসারে)

বিরুদ্ধে উচ্চ প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে আর বাকী আটটি জাতির প্রতি রয়েছে অপেক্ষাকৃত নিম্ন মানের সমান্তরাল প্রতিরোধ ক্ষমতা। পক্ষান্তরে আলুর

অন্য একটি জাতি 'ক্যাপেলা'তে (Capella) রোগ উৎপাদকের ষোলটি জাতির বিরুদ্ধেই মাঝারি মানের, প্রায় সমস্তরের, প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে।

ভ্যান ডের প্ল্যাঙ্ক (১৯৬৮) মনে করেন গাছের যে জাতির খাড়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে তার কিছুটা সমান্তরাল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিশ্চয় থাকে। তাঁর মতে একটি বা অল্প কয়েকটি জীন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (monogenic or oligogenic) খাড়া প্রতিরোধ ক্ষমতা অতিসংবেদনশীলতা, ফাইটো-অ্যালেক্সিন উৎপাদন ইত্যাদি আক্রমণোত্তর চালু হয় এই রকম পদ্ধতির মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এবং রোগ উৎপাদককে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে আক্রমণ দ্রুত সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করে। অন্যদিকে সমান্তরাল প্রতিরোধ ক্ষমতা, যা অনেকগুলি জীনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, রোগ উৎপাদকের গাছের দেহে প্রবেশের পথে বা প্রবেশের পর দেহের মধ্যে বিস্তারের পথে বিভিন্ন পর্যায়ে এবং বিভিন্ন ভাবে ছোট ছোট বাধার সৃষ্টি করে আক্রমণের তীব্রতা কিছুটা কমায় মাত্র। পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে খাড়া প্রতিরোধ ক্ষমতা বিশেষ প্রভাবিত হয় না কিন্তু প্রতিরোধ নিয়ন্ত্রনকারী জীনের অনুপূরক রোগসৃষ্টির ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী জীন সম্পন্ন রোগ উৎপাদকের কোন জাতি যদি পরিব্যক্তির ফলে সেখানে সৃষ্টি হয় বা বাইরে থেকে এসে পড়ে তখন তার আক্রমণের বিরুদ্ধে গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সহজেই ভেঙ্গে পড়ে। সমান্তরাল প্রতিরোধ ক্ষমতার প্রকাশ আবহাওয়ার পরিবর্তনে কমবেশি প্রভাবিত হতে পারে ; কিন্তু পরিব্যক্তির ফলে বা বাইরে থেকে নতুন জাতির রোগ উৎপাদক হঠাৎ এসে পড়লে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারে ভেঙ্গে পড়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না, গাছের আগের তুলনায় কিছুটা বেশী ক্ষতি হতে পারে মাত্র। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এক বা একাধিক জীনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যাই হোক না কেন মেণ্ডেলের সূত্রানুসারেই এক জনু থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পরবর্তী জনুতে যায়। এই ধরণের জীনের সংখ্যা ও জীনগুলি এককভাবে না একত্রে এক জনু থেকে পরের জনুতে যায় তার উপর নির্ভর করে উত্তরাধিকারের পদ্ধতি কোথাও সরল কোথাও বা জটিল ধরণের হয়।

রাস্ট ছত্রাক মেলাম্পসোরা লিনির বিরুদ্ধে তিসির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত গবেষণা থেকে ফ্লর (H. H. Flor, 1956) এই সিদ্ধান্তে আসেন যে তিসি গাছের বিভিন্ন জাতির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্রোমোজোমের পাঁচটি বিভিন্ন অঞ্চলে (locus) একাধিক অ্যালেলোমর্ফের (muitiple allelomorph) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এর মধ্যে K অঞ্চলে ১টি, L অঞ্চলে ১১টি ও M অঞ্চলে ৬টি জীন স্বাধীনভাবে আর N অঞ্চলে ৩টি ও P অঞ্চলে ৪টি

জীন একই সাথে এক জন্তু থেকে পরবর্তী জন্তুতে স্থানান্তরিত হয়। তিসির বিভিন্ন জাত্তির (variety) সঙ্গে মেলাম্পসোরার বিভিন্ন জাতির (race) মিথষ্ক্রিয়া সংক্রান্ত গবেষণার উপর ভিত্তি করে ফ্লর তার "জীনের জন্য জীন" তত্ত্ব (gene-for-gene hypothesis) উপস্থাপিত করেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী কোন গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য একটি জীন দায়ী হলে ঐ গাছে রোগসৃষ্টির জন্য রোগ উৎপাদকের অনুপূরক (complementary) একটি জীন থাকতে হবে। ঐ অনুপূরক জীন না থাকলে আক্রমণ ব্যর্থ হবে। একইভাবে গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুটি বা তিনটি জীন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে রোগসৃষ্টির জন্য রোগ উৎপাদকেরও যথাক্রমে দুটি বা তিনটি অনুপূরক জীনের প্রয়োজন হবে। যদি L অঞ্চলে জীনের স্তরে পোষক গাছ-পরজীবী সম্পর্ক বিবেচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে সেখানে L হল গাছের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী প্রকট বা 'ডমিন্যান্ট' (dominant) জীন আর l হল প্রতিরোধ ক্ষমতাহীনতা বা অন্য অর্থে রোগ সংবেদনশীলতার জন্য দায়ী প্রচ্ছন্ন বা 'রিসেসিভ' (recessive) জীন। এই অঞ্চলে L জীনের বিরুদ্ধে মোলাম্পসোরার রোগসৃষ্টির ক্ষমতাসম্পন্ন অনুপূরক অথচ প্রচ্ছন্ন জীন হল aL আর রোগসৃষ্টির ক্ষমতাহীনতার (avirulence) জন্য দায়ী প্রকট জীন হল AL, অর্থাৎ এখানে রোগসৃষ্টির ক্ষমতার তুলনায় ক্ষমতাহীনতাই জীনের স্তরে প্রাধান্য পায়। ফ্লর এর বর্ণনামত যেখানে রোগপ্রতিরোধ ও রোগসৃষ্টির ক্ষমতা উভয়ই এক জোড়া জীনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সেখানে গাছ ও পরজীবীর অনুপূরক জীনের মধ্যে সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া কি কি হতে পারে নীচে দেওয়া হল।

L অঞ্চলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী গাছের জীন	L অঞ্চলে জীনের বিরুদ্ধে রোগসৃষ্টির ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী ছত্রাকের জীন	গাছের প্রতিক্রিয়া
LL	ALAL, ALaL	রোগ প্রতিরোধী
LL	aLaL	রোগ সংবেদনশীল
ll	ALAL, ALaL	রোগ সংবেদনশীল
ll	aLaL	রোগ সংবেদনশীল

দেখা যাচ্ছে যে গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী প্রকট L জীন যদি 'হোমোজাইগাস' (homozygous) অবস্থায় অর্থাৎ LL জোড়ায় থাকে আর অন্যদিকে ছত্রাকে রোগসৃষ্টির ক্ষমতাহীনতার জন্য দায়ী প্রকট A জীন হোমোজাইগাস (ALAL) বা হেটেরোজাইগাস (ALaL) অবস্থায় থাকে

কেবলমাত্র তখনই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার পূর্ণ প্রকাশ ঘটে অর্থাৎ ছত্রাকের আক্রমণ ব্যর্থ হয়। বাকী সব অবস্থায়, অর্থাৎ গাছে L জীন না থাকলে বা থাকলেও ছত্রাকের রোগসৃষ্টির ক্ষমতা নিয়ন্ত্রকারী a জীন হোমোজাইগাস(aL aL) অবস্থায় থাকলে গাছে রোগ সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে। দেখা গেছে যেখানে একাধিক মুখ্য জীন দ্বারা রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হয় সেখানেও একইভাবে রোগ প্রতিরোধ ও সংবেদনশীলতার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যদিও সেখানে জটিলতা অনেক বেশী।

তিসির মেলাম্পসোরাজনিত মরিচা রোগ ছাড়া গমের মরিচা ও ছাতাধরা, আলুর নাবি ধসা ও ওয়ার্ট, বাঁধাকপির ক্লাবরুট, আপেলের স্ক্যাব, ইত্যাদি আরও কিছু রোগের ক্ষেত্রে জীন এর জন্য জীন তত্ত্বের স্বপক্ষে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

গাছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী জীন সম্বন্ধে যেটুকু জানা গেছে তার তুলনায় রোগ উৎপাদকের রোগসৃষ্টির ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী জীন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অনেক কম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে রোগসৃষ্টির ক্ষমতা প্রচ্ছন্ন থাকে, অক্ষমতাই প্রাধান্য পায়। কোথাও রোগসৃষ্টির ক্ষমতা এক বা দু জোড়া জীনের উপর নির্ভর করে, যেমন গমের মরিচা রোগের ক্ষেত্রে দেখা যায়। ওটের ভুষা রোগে একটি জীন ও যবের ছাতাধরা রোগে রোগ-উৎপাদক ছত্রাকের ক্রোমোজোমের সাতটি বিভিন্ন অঞ্চলে (locus) থাকা সতেরটি জীন দ্বারা এই ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হয় বলে জানা গেছে।

আলুতে ফাইটফথোরা ইনফেসট্যান্স এর আক্রমণ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ-কারী চারটি মুখ্য জীন (R_1—R_4) আছে আগে এই রকম ধারণা ছিল। বিভিন্ন জাতির আলু গাছে এই ধরণের এক বা একাধিক জীন থাকতে পারে, এবং কি কি জীন আছে তার উপর নির্ভর করেই রোগ উৎপাদক ছত্রাকের যে সব জাতি সাফল্যের সঙ্গে আক্রমণ করে রোগসৃষ্টি করে তাদের চিহ্নিত করা হয়। ছত্রাকের যে জাতি R জীন বিহীন গাছকে আক্রমণ করে তাকে O জাতি বলা হয়। অনুরূপভাবে যারা R_1, R_1 R_2 ও R_1 R_2 R_3 R_4 জীনসম্পন্ন গাছকে আক্রমণ করে তাদের যথাক্রমে 1 ; 1, 2 ও 1, 2, 3, 4 জাতি বলা হয়। এরা সকলেই R জীনবিহীন গাছেও রোগসৃষ্টি করে। এইভাবে আলুর ষোলটি জাতির সন্ধান পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে আরও পাঁচটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী মুখ্য জীনের সন্ধান পাওয়া গেছে। এর ফলে আলুতে রোগসৃষ্টিকারী ছত্রাকের আরও অধিক সংখ্যক জাতিকে ভবিষ্যতে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে বলে মনে হয়।

প্রাসঙ্গিক পুস্তক ও গবেষণাপত্রাদি

Bell, A.A. 1982. Biochemical mechanism of disease resistance in plants, *Ann. Rev. Plant Physiol.* **32.** : 22 – 81.

Callow, J.A. 1977. Recognition, resistance and the role of plant lectins in host-parasite interactions, *Adv. Res.* **4** : 1 – 49.

Cruickshank, I.A.M., D. Biggs, and D.R. Perrin. 1971. Phytoalexin as determinants of disease reaction in plants. *J. Indian Bot. Soc.* **50** : 1 – 11.

Devay, J.E., and H.E. Adler. 1976. Antigens common to hosts and parasites. *Ann. Rev. Microbiol.* **30 :** 147 – 168.

Deverall, B.J. 1977. "Defence Mechanisms in Plants". Cambridge University Press, Cambridge. 110 p.

Ellingboe, A.H. 1981. Changing concepts in host-pathogen genetics. *Ann. Rev. Phytopathol.* **16** : 359 – 378.

Flor, H.H. 1971. Current status of the gene-for-gene concept. *Ann. Rev. Phytopathol.* **9 :** 275 – 296.

Friend, J., and D.R. Threlfall (eds.). 1976. "Biochemical aspects of plant-parasite relationship". Academic Press, London.

Overeem, J.C. Pre-existing antimicrobial substances in plants and their role in disease resistance, 195 – 206.

Royle, D.J. Structural features of resistance to plant diseases, 161 – 193.

Horsfall, J.G., and E.B. Cowling (eds.). 1980. "Plant Disease : An A dvanced Treatise". V. Academic Press, New York. 496 p.

Akai, S., and M. Fukutomi. Preformed internal physical defences, 139 – 160.

Beckman, C.H. Defences triggered by the invader : physical defences, 225 – 246.

Cruickshank, I.A.M. Defences triggered by the invader : chemical defences, 247 – 268.

Goodman, R.N. Defences triggered by previous invaders : bacteria, 305 – 318,

Hamilton, R.I. Defences triggered by previous invaders : viruses, 279 – 304.

Kiraly, Z. Defences triggered by the invader : hypersensitivity, 201 – 224.

Matta, A. Defences triggered by previous diverse invaders, 345 – 362.

Schlosser, W. Preformed internal chemical defences, 161 – 178.

Sequeira, L. Defences triggered by the invader : recognition and compatibility phenomenon, 179 – 200.

Horsfall, J. G. and A. E. Dimond. 1957. Interaction of tissue sugar, growth substance and disease susceptibility. *Z. Pflkrankh. Pflschutz.* **64** : 415 – 421,

Horsfall, J.G., and A. E. Dimond. 1959. "Plant Pathology : An Advanced Treatise". Vol. I. Academic Press, New York.

Akai, S. Histology of defence in plants, 39 – 41.

Allen, P.J. Physiolgy and biochemistry of defence, 435 – 467.

Muller, K.O. Hypersensitivity, 469 – 519.

Klement, Z., and R.N. Goodman. 1967. The hypersensitive reaction to infection by bacterial plant pathogens. *Ann. Rev. Phytopathol.* **5** : 17 – 44.

Kosuge, T. 1969. The role af phenolics on host response to infection. *Ann. Rev. Phytopathol.* **7** : 195 – 222.

Kuc, J.1972. Phytoalexins. *Ann. Rev. Phytopathol.* **10** : 207 – 232.

Kuc. J. 1976. Phytoalexins. In "Physiological Plant Pathology" (R. Heitefuss and P.H. Williams, eds.). p 632 – 652. Springer-Verlag, Berlin.

Martin, J.T. 1964. Role of cuticle in the defence against plant diseases. *Ann. Rev Phytopathol.* **2** : 81 – 100.

Matta, A. Microbial penetration and immunization of uncongenial plants. *Ann. Rev. Phytopathol.* **9** : 387—410.

Perrin, D. R., and I.A.M. Cruickshank, 1965. Studies on phytoalexin. VII. Chemical stimulation of pisatin

formation in *Pisum sativum* L. *Austral. J. Biol. Sci.* **18** : 105—811.

Purkayastha, R.P. Resistance of crop plants to fungal diseases. *Sci* & *Cult.* **37** : 319—328.

Van der Plank, J.E. 1984. "Disease resistance in plants" Academic Press, New York. 281 p.

West, C.A. 1981. Fungal elicitors of phytoalexin response in higher plants. *Naturewissenschaften.* **68** : 447—457.

Sinha, A.K. 1984. A new concept in plant disease control. *Sci & Cult.* **50** : 181—186.

Wood, R.K.S. (ed.) 1982. "Active defence mechanisms in Plants". Plenum Publishing Corporation, New York. 381 p.

Fulton, R.W. The protective effects of systemic virus infection, 231—245.

Kuc, J. Plant immunization—mechanisms and implications, 157—178.

১৬ রোগের আক্রমণ ও বিস্তারের উপর পরিবেশের প্রভাব

রোগ যে জীবাণুবাহিত এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার অনেক আগে থেকেই এমন ধারণা বলবৎ ছিল যে অধিকাংশ রোগের আবির্ভাব ও আক্রমণের তীব্রতা প্রতিকূল আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে। রোগের জীবাণুতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পরও দেখা গেল যে একই গাছ বা শস্যের চাষ বিভিন্ন অঞ্চলে করা হলেও সব জায়গায় সব রোগ হয় না বা হলেও সমান ক্ষতির কারণ হয় না। বহুবর্ষজীবী গাছের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তারা বছরের বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়। অধিকাংশ রোগের ক্ষেত্রে এটাও দেখা যায় যে সাধারণতঃ উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় এবং জমিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশী থাকলে রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এই ধরণের তথ্য থেকে এমন সিদ্ধান্তে আসা যায় যে অধিকাংশ রোগের সূত্রপাত পরজীবী থেকে হলেও তাদের আক্রমণের সূচনা, বিস্তার ও তীব্রতা পরিবেশের উপর অনেকটাই নির্ভর করে। আবহাওয়া যে শুধু পোষক গাছ ও রোগ উৎপাদক দুটিকেই আলাদা ভাবে প্রভাবিত করে তাই নয় গাছ-রোগ উৎপাদকের মিথস্ক্রিয়াকেও করে থাকে। আবহাওয়া যেমন গাছের সুষম বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে তেমনি রোগ উৎপাদকের উদ্বর্তন, ইনোকুলামের বৃদ্ধি ও বিস্তার, ছত্রাকের স্পোরের অঙ্কুরোদ্গম, গাছের উপর আক্রমণ ইত্যাদি রোগসৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায়কেও প্রভাবিত করতে সক্ষম। প্রতিকূল পরিবেশ বা অবহাওয়ার জন্য যেসব রোগ হয় সেগুলিকে বাদ দিলে পরজীবীজনিত রোগে পরিবেশের প্রভাবের কথা প্রেভোস্ট (B. Prevost, 1807) প্রথম উল্লেখ করলেও এই প্রসঙ্গে গবেষণার সূত্রপাত করেন বৃটিশ বৈজ্ঞানিক মার্শাল ওয়ার্ড। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তিনি ব্রোম (*Bromus* sp.) গাছের মরিচা রোগের উপর লবণঘটিত খাদ্য উপাদানের প্রভাবের কথা জানান। এর কিছুকাল পরে আমেরিকান বৈজ্ঞানিক জোনস (L. R. Jones, 1926) বাঁধাকপির ফিউজেরিয়াম উইল্ট রোগের উপর তাঁর গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে দেখান যে জমির তাপমাত্রা এই রোগের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ওয়ার্ড ও জোনসের গবেষণার ফলে উদ্ভিদ-রোগবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয় ও বিভিন্ন রোগের উপর গবেষণা শুরু হয়। রোগসৃষ্টিতে সহায়তা

করে পরিবেশের যে সব উপাদান তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে আবহাওয়াই সবথেকে বেশী পরিবর্তনশীল, এমনকি সতত: পরিবর্তনশীলও বলা যায়। আবহাওয়া গাছ ও পরজীবী দুটির উপরেই প্রভাব বিস্তার করে, কখনও কখনও বা একটির তুলনায় অন্যটিকে বেশী প্রভাবিত করে থাকে—যার ফলে রোগের তীব্রতায় তারতম্য ঘটা খুবই সম্ভব। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশী গুরুত্বপূর্ণ হল উষ্ণতা, আর্দ্রতা ও প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদানের সরবরাহ যার উপরে গাছের পুষ্টি নির্ভর করে। এ ছাড়া আলো, জমির অম্লতা বা ক্ষারতা ইত্যাদির বিশেষ কিছু রোগের ক্ষেত্রে গুরুত্ব রয়েছে বলে মনে হয়। আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদানগুলি রোগের ক্রমিক অগ্রগতির দুটি পর্যায়ে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে—প্রথমতঃ পরজীবীর গাছের দেহে প্রবেশের ঠিক আগে, দ্বিতীয়তঃ গাছের দেহে বা ফসলে পরজীবী ছড়িয়ে পড়ার সময়। রোগসৃষ্টিতে গাছের দেহ সংলগ্ন অঞ্চলের আবহাওয়া (microclimate)র গুরুত্ব আরও বেশী। এই আবহাওয়ার সঙ্গে সাধারণ আবহাওয়ার বেশ তফাৎ থাকতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই গাছের চারিপাশের আবহাওয়ার উপর রোগের অগ্রগতি নির্ভর করতে দেখা গেছে।

১। উষ্ণতা (Temperature)

অনেক ছত্রাকের স্পোর উষ্ণতার বিস্তৃত সীমারেখার মধ্যে (প্রায় শূন্যাঙ্কের উপর থেকে ৩০° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত) অঙ্কুরোদ্গমে সক্ষম তবে ১৫—২৫° সেঃ তাপমাত্রা অঙ্কুরোদ্গমের পক্ষে প্রশস্ত। অঙ্কুরোদ্গমের জন্য বিভিন্ন ছত্রাকের প্রয়োজন একরকম নয়। তাছাড়া যে তাপমাত্রা অঙ্কুরোদ্গমের পক্ষে অনুকূল তা জার্ম টিউবের বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল না হতেও পারে। কিছু ভূষা ও দুর্গন্ধযুক্ত ভূষা রোগে, যেখানে গাছ খুবই অল্প সময়ের জন্য সংবেদনশীল অবস্থায় থাকে, প্রতিকূল তাপমাত্রায় রোগের আক্রমণ ব্যাহত হয়। আলুর নাবি ধসা রোগের আক্রমণে উষ্ণতার গুরুত্ব অত্যধিক। কম তাপমাত্রায় (১২° সেঃ পর্যন্ত) ফাইটফথোরা ইনফেসট্যান্স জুস্পোর উৎপাদন করে, তাপমাত্রা বেশী হলে কনিডিয়াম উৎপন্ন হয়। জুস্পোরের অঙ্কুরোদ্গম সবথেকে বেশী হয় ১২°—১৫° সেঃ তাপমাত্রায়, কিন্তু কনিডিয়ামের অঙ্কুরোদ্গমের জন্য উচ্চতর তাপমাত্রা প্রয়োজন। সুতরাং এই রোগের ক্ষেত্রে আক্রমণের সূচনা ও রোগের বিস্তার তাপমাত্রার উপর অনেকটাই নির্ভর করে।

পোষক গাছ ও পরজীবী উভয়েরই বৃদ্ধি ও পরিণতি প্রাপ্তির জন্য আলাদা-

ভাবে নিম্নতম (minimum), সর্বাপেক্ষা অনুকূল (optimum) ও উচ্চতম (maximum) তাপমাত্রা আছে ; রোগের ক্ষেত্রেও অনুরূপ তিনটি তাপমাত্রা আছে। সাধারণতঃ রোগের প্রসার সবথেকে বেশী ঘটে সেই তাপমাত্রায় যা গাছের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল যে তাপমাত্রা তার থেকে বেশ নীচে বা উপরে কিন্তু পরজীবীর পক্ষে যা সর্বাপেক্ষা অনুকূল তার কাছাকাছি। যেখানে গাছ, পরজীবী ও রোগের জন্য নির্দিষ্ট এই তিনটি তাপমাত্রায় পার্থক্য খুব কম সেখানে পরজীবীর উপরই রোগের আক্রমণ ও প্রসারের সাফল্য নির্ভর করে। জিবারেলা জিয়ী (*Gibberella zeae*) গম ও ভুট্টা গাছে শিকড় পচা রোগের সৃষ্টি করে। এই ছত্রাকের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল তাপমাত্রা হল ২৫° সেঃ। গম শীতের আর ভুট্টা গরমকালের শস্য। গমে রোগের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল তাপমাত্রা হল ২৮° সেঃ আর ভুট্টার পক্ষে ১৬° সেঃ। বেশী উষ্ণতায় গম গাছ আর অল্প উষ্ণতায় ভুট্টা গাছ দুর্বল হয়ে পড়লে রোগের তীব্রতা সহজেই বৃদ্ধি পায় কারণ ছত্রাক তার পক্ষে অবস্থা প্রতিকূল হলেও তখন গাছের যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারে। অনুকূল তাপমাত্রার তুলনায় উষ্ণতা বেশ কিছুটা কম বা বেশী হলে রোগ নিরাময় হয় না, ইনকিউবেশন পিরিয়ড দীর্ঘায়িত হয় মাত্র। গমের মরিচা (ব্ল্যাক রাস্ট) রোগে ১০°, ১২°, ১৯°, ও ২৪° সে তাপমাত্রায় ইনকিউবেশন পিরিয়ড সমাপ্ত হতে যথাক্রমে ১৫, ১২, ৯ ও ৫দিন লাগে। কম উষ্ণতায় ইনকিউবেশন পিরিয়ড দীর্ঘায়িত হবার ফলে একটি রোগচক্র (disease cycle) সমাপ্ত হতে অনেক বেশী সময় লাগে। এই অবস্থায় মরশুমে স্বাভাবিক ৪-৫টি রোগচক্রের জায়গায় হয়ত দুটি রোগচক্র সমাপ্ত হবে। এর ফলে কম স্পোর উৎপন্ন হবে, অনেক কম সংখ্যায় গাছ রোগে আক্রান্ত হবে এবং যে কোন একটি গাছেও রোগের প্রসার সীমিত হবার সম্ভাবনা থাকবে।

যে সব রোগ কম তাপমাত্রায় মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাদের মধ্যে রয়েছে পীচের লীফ কার্ল (c.o. *Taphrina deformans*), আলুর নাবি ধসা ও পাউডারি স্ক্যাব (c.o. *Spongospora subterranea*), গম ও যবের মরিচা (ইয়েলো রাস্ট) ও টম্যাটোর ভার্টিসিলিয়াম উইল্ট। ধানের ঝলসা রোগ কম উষ্ণতায়, বিশেষ করে রাত্রির তাপমাত্রা কম হলে, মারাত্মক হয়ে দেখা দেয় বরাবর এই ধারণাই ছিল। কিন্তু ইদানীংকালে উচ্চ ফলনশীল জাতির ধান চাষের ক্ষেত্রে উষ্ণতর পারবেশেও এই রোগের জোরালো আক্রমণ ঘটতে দেখা যাচ্ছে। তামাকে TMV, আলুতে potato virus (PVX) ও পীচে yellows virus রোগের আক্রমণ অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা আবহাওয়াতেই বেশী হয়।

বিভিন্ন গাছের ফিউজেরিয়াম ও সিউডোমোনাস উইল্ট, স্ক্লেরোশিয়াম রল্‌ফসিআইজনিত রোগ ও ব্যাকটিরিয়াজনিত সফট রট উষ্ণতর আবহাওয়ায় বেশী ক্ষতির কারণ হয়। ফিউজেরিয়াম ও স্ক্লেরোশিয়ামজনিত রোগ সাধারণতঃ ২৫° সেঃ তাপমাত্রার উপরে দেখা যায়। সিউডোমোনাস উইল্টের জন্য আরো বেশী উষ্ণতা প্রয়োজন।

২। আর্দ্রতা (Moisture)

বাতাসের আর্দ্রতা, কুয়াশা, শিশির বা বৃষ্টি শুধুমাত্র রোগের বিস্তার ও ও তীব্রতাকেই নিয়ন্ত্রণ করে না, অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ রোগকে বিভিন্ন ভৌগলিক অঞ্চলে সীমিত করে রাখে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের যেসব অঞ্চলে বাতাসের আর্দ্রতা অপেক্ষাকৃত কম সেখানে বীনের অ্যানথ্রাকনোজ (c.o. *Collectotrichum lindemuthianum*), আঙ্গুরের ডাউনি মিলডিউ (c.o. *Plasmopara viticola*), আলুর নাবি ধসা বা বীনের ব্যাকটিরিয়াজনিত ব্লাইট (c.o. *Pseudomonas phaseolicola*) রোগ বড় একটা দেখা যায় না। গাছের মাটির উপরের অংশের ছত্রাক- ও ব্যাকটিরিয়াজনিত অধিকাংশ রোগ বাতাসে আর্দ্রতা বেশী থাকলেই বেশী ক্ষতি করে। একইভাবে জমির আর্দ্রতা অনেক জমিবাহিত রোগের সাফল্যও নিয়ন্ত্রণ করে। বাতাস বা জমির আর্দ্রতার উপর অনেকসময় কাণ্ডের বিশেষ করে পাতার রসাল অবস্থা নির্ভর করে। এই অবস্থায় অনেক পরজীবীর বিশেষ করে ব্যাকটিরিয়ার দেহের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া সহজ হয়। জলের বা আর্দ্রতার প্রভাব সব থেকে বেশী দেখা যায় ছত্রাকের স্পোরের অঙ্কুরোদ্গম এবং ব্যাকটিরিয়া ও ছত্রাকের গাছের দেহে প্রবেশের ক্ষেত্রে। একটি অঞ্চলে কোন রোগের উপস্থিতি ও আক্রমণের তীব্রতা বিশেষ মরশুমে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও দৈনিক হারের উপর নির্ভর করতে পারে। উদাহরণ : আলুর নাবি ধসা ও আপেলের স্ক্যাব রোগ। ত্বকের উপরে কতটা জল জমেছে তার থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হল ত্বকের উপরে প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা কতক্ষণ বজায় থাকে। বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা বেশী হলে বাষ্পীভবন কম হয়, ফলে ত্বকের ভিজে ভাবটা অনেক বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় যা ছত্রাকের আক্রমণের পক্ষে বিশেষ অনুকূল।

গাছের মাটির উপরের অংশকে আক্রমণ করে যেসব রোগ উৎপাদক তাদের মধ্যে অনেক ছত্রাক ও প্রায় সব ব্যাকটিরিয়ার গাছের দেহে প্রবেশের জন্য ত্বকের উপর জলের অন্ততঃ একটি পাতলা স্তরের প্রয়োজন হয়। এর ব্যতিক্রম

দেখা যায় কিছু পাউডারি মিলডিউ ছত্রাকের ক্ষেত্রে যথা এরিসাইফি গ্র্যামিনিস, এরিসাইফি পলিগোনাই (E. polygoni) ইত্যাদি। বেশ কম আপেক্ষিক আর্দ্রতায় (৫০—৭০%) এদের স্পোর অঙ্কুরিত হয় ও আক্রমণ সম্ভব হয়। দেখা গেছে যে এইসব ছত্রাকের স্পোরে যথেষ্ট জল সঞ্চিত থাকে। আবার পোডোস্ফিরা লিউকোট্রিকা *(Podosphaera leucotricha)* ও স্ফিরোথিকা হিউমিউলি *(Sphaerotheca humuli)* ইত্যাদি অন্য কিছু পাউডারি মিলডিউ ছত্রাকের আক্রমণের জন্য বেশী আর্দ্রতার প্রয়োজন হয়। যে সব ব্যাকটিরিয়া স্টোমার মাধ্যমে গাছের দেহে প্রবেশ করে তাদের জন্য ত্বকের উপর থেকে স্টোমার নীচের গহ্বর পর্যন্ত একটি অবিচ্ছিন্ন জলের স্তর প্রয়োজন। তাছাড়া ঐ গহ্বরে আপেক্ষিক আর্দ্রতা শতকরা ৯০ ভাগের বেশী না থাকলে ব্যাকটিরিয়ার পক্ষে সংখ্যাবৃদ্ধি সম্ভব হয় না। কিছু ব্যাকটিরিয়া আপেক্ষিক আর্দ্রতা শতকরা ১০০ ভাগের নীচে হলে বংশবৃদ্ধি করেনা।

জমিবাহিত অনেক রোগের ক্ষেত্রে আক্রমণের তীব্রতা জমির আর্দ্রতার উপর নির্ভর করে। জমি যখন সম্পৃক্ত অবস্থায় থাকে সাধারণতঃ তখনই সব থেকে বেশী ক্ষতি হয়। বিভিন্ন গাছের ফিউজেরিয়াম ও সিউডোমোনাস উইল্ট, বাঁধাকপির শিকড় ফোলা, মটরের শিকড় পচা (c.o. *Aphanomyces euteiches*) ও বিভিন্ন শস্যের চারা ধসা রোগে এইরকম ঘটতে দেখা যায়। এইসব রোগ উৎপাদক ছত্রাক ভিজে জমিতে বেশী স্পোর উৎপাদন করে। স্পোর ও ব্যাকটিরিয়া জলের মাধ্যমে জমিতে বেশ কিছুটা ছড়িয়ে পড়তে সক্ষম হয়। অনেক ছত্রাক' কিছু ব্যাকটিরিয়া ও অধিকাংশ নিমাটোড জমিতে মাঝারি আর্দ্রতায় রোগসৃষ্টিতে সফল হয়। অন্য কিছু রোগ অপেক্ষাকৃত কম আর্দ্রতায় তীব্র আকার ধারণ করে। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল আলুর স্ক্যাব, ও বিভিন্ন শস্যের রাইজোকটোনিয়া ব্যাটাটিকোলা এবং ফিউজেরিয়াম সোল্যানিজনিত রোগ।

বাহক পতঙ্গের উপর প্রভাবের মাধ্যমে আর্দ্রতা বা জল ভাইরাসজনিত রোগকেও কিছুটা প্রভাবিত করতে পারে। গাছের কোমল, বর্দ্ধনশীল অংশে ভাইরাসের সব থেকে দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। জলের সরবরাহ যথেষ্ট থাকলে তবেই এই ধরণের কোমল অংশগুলির সৃষ্টি সম্ভব। আবার কিছু ভাইরাস রোগ শুকনো মরশুমেই দেখা যায়। ভাইরাস প্রধানতঃ কীটপতঙ্গ বাহিত হলেও নিমাটোড বা ছত্রাক দ্বারাও বাহিত হতে দেখা গেছে। বাহক পতঙ্গের গতিবিধি বৃষ্টির দ্বারা বহুলাংশে ব্যাহত হতে পারে কিন্তু জমিতে জলের পরিমাণ বেশী হলে বাহক নিমাটোড বা ছত্রাকের জমিতে ছড়িয়ে পড়া সহজ হয়।

৩। আলো (Light)

সাধারণতঃ কোন প্রভাব না থাকলেও কিছু রোগের ক্ষেত্রে আলোর স্থিতি-কাল ও প্রখরতা রোগের প্রতি গাছের সংবেদনশীলতা কমিয়ে বা বাড়িয়ে রোগের অগ্রগতিকে প্রভাবিত করতে পারে।

আলোর প্রখরতা কম হলে তামাকের নেক্রোসিস (tobacco necrosis), টম্যাটোর বুশি স্টান্ট (tomato bushy stunt) প্রভৃতি কিছু ভাইরাস রোগের প্রকোপ বেশী হয়। অন্যদিকে বীটের কার্লি টপ, বিভিন্ন শস্যের মোজেইক ও ইয়েলজ (yellows) রোগ আলোর প্রখরতা বেশী হলে মারাত্মক আকার ধারণ করে।

আলোর তারতম্য কিছু ছত্রাক-ও ব্যাকটিরিয়াজনিত রোগকেও প্রভাবিত করে। প্রখর আলোয় স্পোরের অঙ্কুরোদ্গম, জার্ম টিউবের বৃদ্ধি ও স্পোর উৎপাদন ব্যাহত হয়। অধিকাংশ ব্যাকটিরিয়া ছত্রাকের তুলনায় আলোর তীব্রতা আরো কম সহ্য করতে পারে। আলো প্রখর হলে তাপমাত্রা বেড়ে যায়। মনে হয় বেশী আলোর থেকে উচ্চতর তাপমাত্রাই বেশী ক্ষতি করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিমিত আলোয় স্পোরের অঙ্কুরোদ্গম ভাল হয়।

৪। জমির অম্লতা বা ক্ষারতা (Soil reaction)

কিছু জমিবাহিত রোগের ক্ষেত্রে জমির অম্লতা বা ক্ষারতা, যা pH এর উপর নির্ভর করে, রোগের প্রকোপ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বাঁধাকপিতে ক্লাব রুট বা শিকড় ফোলা রোগের আক্রমণ মারাত্মক হয় যেখানে pH ৫.৭ বা কাছাকাছি থাকে। যদি pH বেশী হয় তাহলে আক্রমণের তীব্রতা কমে, আর pH ৭.৮ বা তার বেশী হলে রোগ উৎপাদক ছত্রাক প্লাজমোডিওফোরা ব্র্যাসিকি একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। আলুর স্ক্যাব রোগে বিপরীত ঘটে। যে জমিতে pH ৫.২ এর নীচে সেখানে এই রোগের প্রকোপ খুবই কম কিন্তু উচ্চতর pH এ ৮.০ পর্যন্ত রোগের জোরালো আক্রমণ হতে দেখা যায়। তবে মাঝে মাঝে ক্ষারতা বিশিষ্ট জমিতে ক্লাব রুট আর অম্লতা বিশিষ্ট জমিতে স্ক্যাব রোগের খবর পাওয়া গেছে যার থেকে মনে হয় এই দুটি রোগ উৎপাদকের যথাক্রমে ক্ষারতা সহনশীল ও অম্লতা সহনশীল জাতিও থাকতে পারে। তুলার শিকড় পচা (c.o. *Phymatotrichum omnivorum*), গমের টেক অল (c. o. *Gaumannomyces graminis*) ও বিভিন্ন গাছের ভার্টিসিলিয়াম উইল্ট রোগ সাধারণতঃ ক্ষারতাযুক্ত

জমিতেই বেশী হতে দেখা যায়। অন্যদিকে টম্যাটো ও তুলার ফিউজেরিয়াম উইল্ট, আলুর ওয়ার্ট ও পাউডারি স্ক্যাব (c.o. *Spongospora subterranea)* রোগের প্রকোপ অম্লতাযুক্ত জমিতেই বেশী হয়।

৫। গাছের পুষ্টিবিধান (Host nutrition)

কোন গাছের সুষম বৃদ্ধি ও বিভিন্ন অঙ্গের পূর্ণতা প্রাপ্তি সব থেকে বেশী নির্ভর করে পুষ্টির উপর। সুতরাং বিভিন্ন পুষ্টিবিধায়ক খাদ্য গাছের নিজস্ব সংবেদনশীলতা বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে রোগের আক্রমণকে প্রশমিত বা তীব্রতর করে তুলতে পারে এই সম্ভাবনা রয়েছে। সুষম খাদ্যের সরবরাহ বা তার অভাব গাছে রোগের আক্রমণকে প্রভাবিত করে ঠিকই তবে বিশেষ কোন পুষ্টিবিধায়ক খাদ্যেরও এই প্রসঙ্গে যথেষ্ট গুরুত্ব থাকতে পারে।

গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য নাইট্রোজেন অপরিহার্য কিন্তু জমিতে এর পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় বেশী হলে সাধাণতঃ গাছের অঙ্গজ বৃদ্ধি খুব বেশী হয়, কাণ্ড ও পাতা রসাল হয় এবং ফুল ফুটতে ও পরিণত অবস্থায় আসতে দেরী হয়। এই অবস্থায় গাছের সংবেদনশীল অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয় আর যে সব রোগ উৎপাদক গাছের কোমল অংশগুলিকে আক্রমণ করে তাদের সুবিধা হয়। দেখা গেছে যে জমিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশী হলে গমের মরিচা ও ছাতাধরা, ধানের ঝলসা (c. o. *Pyricularia oryzae*), তামাকের ওয়াইল্ড ফায়ার (c. o. *Pseudomonas tabaci*) আপেলের ফায়ার ব্লাইট (c. o. *Erwinia amylovora*), তামাকের মোজেইক প্রভৃতি রোগের প্রকোপ বেশী হয়। জমিতে নাইট্রোজেনের অভাব হলে গাছ স্বাভাবিকভাবে বাড়তে পারে না ও দুর্বল হয়ে পড়ে। যে সব রোগ উৎপাদক সাধারণতঃ দুর্বল গাছকে আক্রমণ করে এই অবস্থায় তাদের আক্রমণ অনেক তীব্র হয়ে ওঠে। এই ধরণের রোগের উদাহরণ হল টম্যাটোর ফিউজেরিয়াম উইল্ট, বিভিন্ন শস্যের সিউডো-মোনাস উইল্ট ও পিথিয়ামজনিত চারা ধসা, এবং ধানের বাদামী দাগ ও ব্যাকটিরিয়াজনিত পাতা ধসা (c. o. *Xanthomonas oryzae*)।

জমিতে পটাশিয়াম, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি পুষ্টির অন্যান্য উপাদান-গুলির পরিমাণের সঙ্গে কিছু রোগের প্রতি গাছের সংবেদনশীলতা বা প্রতিরোধ ক্ষমতার একটা সম্পর্ক দেখা গেছে। সাধারণতঃ জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে পটাশিয়াম থাকলে গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। গম, যব, ইত্যাদির মরিচা ও ছাতাধরা, তামাকের ওয়াইল্ড ফায়ার ইত্যাদি রোগের ক্ষেত্রে এই

রকম ঘটতে দেখা গেছে। জমিতে পটাশিয়াম কম থাকলে তুলার ফিউজেরিয়াম উইল্ট, ভুট্টার স্টক রট (stalk rot) ইত্যাদি কিছু রোগ ভীষণভাবে বেড়ে যায়। এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়—যেমন জমিতে পটাশিয়াম বেশী থাকলে টম্যাটোর ফিউজেরিয়াম উইল্ট বা লেবুর ফাইটফথোরাজনিত রোগের আক্রমণ তীব্রতর হয়, আর কম থাকলে বাঁধাকপির শিকড় ফোলা রোগের প্রকোপ কমে। দেখা গেছে জমিতে যথেষ্ট পরিমানে ক্যালসিয়াম থাকলে টম্যাটো ও অড়হরের ফিউজেরিয়াম উইল্ট ও বীনের রাইজোকটোনিয়াজনিত রটের উপশম হয়। জমিতে ফসফরাসের পরিমাণ রোগের গতিকে প্রভাবিত করলেও এ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা নেই।

গাছের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য অথচ অতি অল্প পরিমাণে প্রয়োজন যে সব মৌল উপাদান (micronutrients) তাদেরও রোগের উপর প্রভাব থাকা সম্ভব যদিও এ সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য জানা নেই। জমিতে বোরনের অভাব হলে যবে ছাতাধরা রোগের প্রকোপ বেশী হয়। জমিতে ম্যাঙ্গানিজের লবণ প্রয়োগ করে অড়হড়ের ফিউজেরিয়াম উইল্ট রোগ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে। জমিতে লাগানোর আগে ধানের বীজ বোরিক অ্যাসিড ও লোহা এবং তামার লবণের দ্রবণে ভিজিয়ে নিলে দেখা গেছে পরবর্তীকালে বাদামী দাগ ও ঝলসা রোগের প্রকোপ অনেক কম হয়।

৬। বাতাস (Wind)

রোগ সৃষ্টিতে বাতাসের ভূমিকা গৌণই বলা চলে। বাতাস জোরালো হলে গাছের ত্বকের উপর জলের স্তর তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। এর ফলে ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণের সম্ভাবনা কমে। ছত্রাকজনিত যে সব রোগ স্পোরের মাধ্যমে ছড়ায় তাদের প্রসারে বাতাসের ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রাকৃতিক উপায়ে একমাত্র বাতাসের মাধ্যমেই বহুদূর পর্যন্ত রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে। বৃষ্টির সঙ্গে জোর বাতাস বা ঝড় থাকলে জলের ফোঁটার সঙ্গে ব্যাকটিরিয়াও বেশ কিছুদূর ছড়াতে পারে। জোর বাতাসে ভাইরাসবাহক পতঙ্গ অনেক সময় স্বাভাবিকের তুলনায় কিছুটা বেশী ছড়ায়। এর ফলে রোগেরও প্রসার ঘটে।

এপিফাইটোটিক (Epiphytotics)

সাধারণতঃ 'এপিডেমিক' (epidemics) বলতে অল্প কিছু দিনের মধ্যে বেশ বড় এলাকা জুড়ে কোন রোগের তীব্র আক্রমণ বোঝায় যখন অধিকাংশ

মানুষের বা পশুর রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এপিডেমিক সাধারণতঃ প্রতি বছর ঘটেনা, কয়েক বছরের ব্যবধানে ঘটে, যদিও কোথাও কোথাও এর ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। গাছের রোগের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ এপিডেমিক এর পরিবর্তে 'এপিফাইটোটিক' (epiphytotics) শব্দটি ব্যবহার করা হয়। খুব সীমিতভাবে কোন অঞ্চলে রোগের প্রবল আক্রমণ হলে বা বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে অপেক্ষাকৃত মৃদু আক্রমণ হলে তাকে এপিফাইটোটিক বলা যায় না। এই শব্দটি দ্বারা গাছের রোগের মহামারীকে বোঝায়। দু' ধরণের অবস্থা থেকে এপিফাইটোটিকের সূচনা হতে পারে। প্রথমতঃ যে সব অঞ্চলে রোগ উৎপাদক প্রায় স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত সেখানে কোন বছর আবহাওয়া ও চাষের পরিবেশ যদি রোগ উৎপাদকের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হয়ে ওঠে তাহলে এপিফাইটোটিকের সম্ভাবনা থাকে। দ্বিতীয়তঃ আবহাওয়া ও চাষের পরিবেশ রোগের অনুকূল অথচ রোগ উৎপাদক স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত নয় এমন অঞ্চলে যদি বাইরে থেকে কোন উগ্র প্রকৃতির রোগ উৎপাদক এসে পড়ে বা উগ্র কোন জাতির হঠাৎ সৃষ্টি হয় তখনও এপিফাইটোটিকের সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য দ্বিতীয়টির তুলনায় প্রথম সম্ভাবনাটিই এপিফাইটোটিক সৃষ্টির পক্ষে প্রশস্ত বলে মনে হয়। ফসলে শতকরা কি হারে গাছগুলি রোগে আক্রান্ত হয়েছে (disease incidence) ও গাছে আক্রমণের তীব্রতার (disease severity) পরিসংখ্যানগত তথ্য থেকে এপিফাইটোটিক সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসতে হয়। গাছের রোগের এপিফাইটোটিক সংক্রান্ত যে বিজ্ঞান তাকে বলা হয় 'এপিফাইটোলজি' (epiphytology)। সাধারণতঃ চাষের এক মরশুম থেকে পরবর্তী মরশুমে রোগ উৎপাদক কিভাবে টিকে থাকে, প্রাথমিক পর্যায়ের ইনোকুলাম কিভাবে ছড়ায়, ইনোকুলামের উৎপাদন, বিস্তার ও আক্রমণের সূচনার উপর আবহাওয়ার প্রভাব ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা এর অন্তর্ভুক্ত। মারাত্মক ধরণের সংক্রামক রোগের আক্রমণের পূর্বাভাস জ্ঞাপন (disease forecasting) ও রোগ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপরোক্ত বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহের বিশেষ প্রয়োজন হয়। এপিফাইটোটিকের গতিপ্রকৃতি গাছ, রোগ উৎপাদক ও আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে।

যে সব রোগ অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে ও মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাদের ক্ষেত্রে এপিফাইটোটিক অবস্থা চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। অন্য অনেক রোগে এপিফাইটোটিক অবস্থা খুব ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে এবং প্রথমদিকে ক্ষতির ব্যাপারটা খুব স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না।

তবে কোন সময় আক্রান্ত গাছের হার আনুপাতিকভাবে খুব বেশী না হলে, অর্থাৎ প্রায় অধিকাংশ গাছ আক্রান্ত না হলে, এপিফাইটোটিক হয়েছে বলা হয় না। গয়ম্যানের (E. Gaumann, 1950) দেওয়া সংজ্ঞা অনুসারে প্রথম ক্ষেত্রে এপিফাইটোটিক **'এক্সপ্লোসিভ'** (explosive) ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে **'টারডাইভ'** (tardive) প্রকৃতির। অনেক সময় কোন রোগ একটি মহাদেশের বিরাট অঞ্চল জুড়ে মহামারী রূপে দেখা দেয়। তখন সেই এপিফাইটোটিককে **'প্যাণ্ডেমিক'** (pandemic) বলা হয়। সাধারণ মরশুমী শস্যের ক্ষেত্রে এপিফাইটোটিক চাষের মরশুমেই দেখা দেয়। কিন্তু বহুবর্ষজীবী গাছের ক্ষেত্রে অনেক সময় এপিফাইটোটিক এর অবস্থা ধীরে ধীরে কয়েক বছর ধরে গড়ে উঠতে থাকে যতক্ষণ না প্রায় সব গাছই আক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং রোগের প্রকোপ সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছায়। যে সব রোগ উৎপাদক গাছের দেহের ভিতরে বিস্তৃতভাবে ছড়ায় অথচ গাছ থেকে গাছে খুবই ধীরে ধীরে ছড়ায় সাধারণতঃ তাদের আক্রমণের ফলেই এই ধরণের (tardive) এপিফাইটোটিক হয়। কোকোর সোলেন শ্যূট (swollen shoot), ওকের উইল্ট ও লেবুর ট্রাইস্টেজা এই জাতীয় রোগ।

যে সব রোগ উৎপাদক গাছের দেহের ভিতরে বিশেষ ছড়ায় না অথচ দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে বা ছত্রাকের ক্ষেত্রে অজস্র স্পোর উৎপাদন করে তাদের আক্রমণের ফলেই দ্রুতগতিসম্পন্ন (explosive) এপিফাইটোটিক ঘটতে দেখা যায়। মরশুমী গাছের ক্ষেত্রেই সাধারণতঃ রোগের আক্রমণ অতি দ্রুত বেড়ে সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছায় এবং তার কিছুদিন পর থেকেই পরিবেশ প্রতিকূল হওয়ায় এপিফাইটোটিকের তীব্রতা কমে আসতে থাকে। এই ধরণের এপিফাইটোটিক প্রধানতঃ আবহাওয়ার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।

কিছু রোগ উৎপাদক গাছের একাধিক অঙ্গকে আক্রমণ করে। ধাপে ধাপে এই আক্রমণ হয়। আপেলের স্ক্যাব ও তুলার পাতায় কোণাচে দাগ বা 'অ্যাঙ্গুলার লীফ স্পট' *(c. o. Xanthomonas malvacearum)* এই ধরণের রোগের ভাল উদাহরণ। আপেলে বসন্তের শুরুতে প্রথম পাতায় ভেঞ্চুরিয়া ইনইক্যুয়ালিস এর আক্রমণ হয় এবং গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত রোগের প্রকোপ বাড়তে থাকে। পাতায় উৎপন্ন কনিডিয়াম থেকে ফলের উপর আক্রমণ শুরু হয় এবং শরৎকাল পর্যন্ত এই আক্রমণ চলতে থাকে। তৃতীয় পর্যায়ে গুদামে মজুত করে রাখার সময় রোগগ্রস্ত ফল থেকে নীরোগ ফলে আক্রমণ হয়। তুলায় জ্যান্থোমোনাস ম্যালভেসীয়ারাম এর আক্রমণ হলে প্রথমে বীজপত্রে ও পাতায় কোণাচে দাগ (angular leaf

spot), পরে কাণ্ডে 'ব্ল্যাক আর্ম' (black arm) ও শেষ ধাপে ফলে 'বোল রট' (boll rot) হয়। প্রতিটি ধাপে উৎপন্ন ইনোকুলাম থেকে পরবর্তী ধাপে আক্রমণের সূচনা হয়, কিছুদিন ধরে রোগের আক্রমণ চলতে থাকে ও অবস্থা অনুকূল হলে এপিফাইটোটিকের সৃষ্টি হয়।

যদি কোন রোগ সংবেদনশীল জাতির পোষক গাছ তার সব থেকে সংবেদনশীল অবস্থায় রোগ উৎপাদকের উচ্চ রোগসৃষ্টির ক্ষমতাসম্পন্ন জাতির অপর্যাপ্ত ইনোকুলামের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং আবহাওয়া ও পরিবেশ রোগের আক্রমণ ও প্রসারের পক্ষে অনুকূল থাকে, তখন এপিফাইটোটিকের সম্ভাবনা থাকে। এই অবস্থাগুলি বা ঘটনাগুলি যদি একই সঙ্গে ঘটে তবেই অবস্থা এপিফাইটোটিকের অনুকূলে যায়। গাছ ও রোগ উৎপাদকের উপর আলাদা আলাদা ভাবে ও একত্রে দুটির উপর আবহাওয়ার প্রভাব এখানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অবস্থা কিছুটা জটিল হয়ে ওঠে যদি রোগটি কীট-পতঙ্গ দ্বারা বাহিত হয়। এর থেকে বোঝা যায় যে কোন রোগের এপিফাইটোটিক পর্যায়ের আক্রমণ অনেকগুলি ঘটনার উপর নির্ভর করে। ভ্যান ডার প্ল্যাঙ্ক (J. E. Van der Plank, 1960, 1963, 1967) এই জটিলতার বিশ্লেষণ করেছেন। এপিফাইটোটিকের বিভিন্ন উপাদানগুলি নিয়ে এখানে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে।

(ক) রোগ উৎপাদকের উগ্রতা : চাষের পরিবেশে, রোগউৎপাদকের রোগসৃষ্টির উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অর্থাৎ উগ্র জাতির উপস্থিতি এপিফাইটোটিকের জন্য অবশ্য প্রয়োজন। যে সব রোগ উৎপাদকের ইনকিউবেশন পিরিয়ড ছোট অর্থাৎ আক্রমণের অতি অল্পদিনের মধ্যেই স্পোর উৎপাদন শুরু হয় ও অনেকদিন ধরে চলতে থাকে তাদেরই সফল হবার সম্ভাবনা বেশী। গাছের সংবেদনশীল অবস্থায় ও আবহাওয়া যখন অনুকূল তখন প্রচুর স্পোর উৎপন্ন হওয়া ও সেগুলি চারিদিকে ভালভাবে ছড়িয়ে পড়া প্রয়োজন যাতে গাছের প্রতিটি পাতা ও অন্যান্য অঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ইনোকুলাম এসে পড়ে। তাছাড়া যে সব রোগ উৎপাদকের ইনোকুলাম এর আক্রমণ ক্ষমতা (inoculum potential) বেশী অর্থাৎ যারা কম পরিমাণ ইনোকুলাম দিয়েই সফলভাবে আক্রমণ করতে সক্ষম তাদের ক্ষেত্রে এপিফাইটোটিকের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল।

(খ পোষক গাছের রোগ সংবেদনশীলতা : রোগ সংবেদনশীল জাতির গাছের চাষ হলে তবেই এপিফাইটোটিকের প্রশ্ন ওঠে। তাছাড়া যখন প্রচুর পরিমানে ইনোকুলাম উৎপন্ন হবে তখন গাছ যদি রোগসংবেদনশীল অবস্থায় থাকে তবেই জোরালো আক্রমণ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে। যেখানে

গাছ বয়সের সঙ্গে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে সেখানে এপিফাইটোটিকের সম্ভাবনা অনেকটা কমে যায়। সারের কমবেশি প্রয়োগের উপর অনেক গাছের রোগ সংবেদনশীলতার মাত্রা ও স্থায়িত্ব কিছুটা নির্ভর করে যার ফলে এপিফাই-টোটিকের সম্ভাবনা কমতে বা বাড়তে পারে।

(গ) বিস্তৃতভাবে গাছের রোগ সংবেদনশীল জাতির চাষ: বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বছরের পর বছর কোন শস্যের রোগ সংবেদনশীল জাতির চাষ হলে অবস্থা এপিফাইটোটিকের পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল হয়ে পড়ে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এই কারণেই ওটের ভিক্টোরিয়া ব্লাইট (c. o. *Helminthosporium victoriae)* ও ভুট্টার সাউদার্ণ ব্লাইট (c. o. *H. maydis)* রোগে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী এপিফাইটোটিক ঘটেছিল। তাছাড়া শস্যের নিবিড় চাষ হলেও পরিবেশ এপিফাইটোটিকের পক্ষে অপেক্ষাকৃত অনুকূল হয়ে দাঁড়ায়।

অনেক সময় স্বাভাবিক সময়ের আগে, স্বাভাবিক সময়ে ও দেরীতে পাকে শস্যের এইরকম বিভিন্ন জাতির চাষ পর পর করা হয়ে থাকে। কোন অঞ্চলে পর্যায়ক্রমে এই ধরণের বিভিন্ন জাতির চাষ করা হলে এবং সেগুলি সবই যদি রোগ সংবেদনশীল প্রকৃতির হয় তাহলে সেখানে খুব বেশী পরিমাণে ইনোকুলাম উৎপন্ন হবার সম্ভাবনা থাকে যার ফলে এপিফাইটোটিকের সম্ভাবনাও যথেষ্ট বেড়ে যায়।

(ঘ) অনুকূল পরিবেশ: আবহাওয়া এমন হতে হবে যা রোগ-উৎপাদকের দিক থেকে আক্রমণের পর পর সব কটি ধাপের পক্ষেই অর্থাৎ বংশবৃদ্ধি বা স্পোর উৎপাদন, স্পোরের বিযুক্ত হওয়া ও ছড়িয়ে পড়া, গাছের ত্বকের উপর স্পোরের অঙ্কুরোদ্গম ও আক্রমণের পক্ষে অনুকূল। রোগ যদি কোন কীট-পতঙ্গের মাধ্যমে ছড়ায় তাহলে আবহাওয়া বাহক পোকার বংশবৃদ্ধি ও বিস্তারের পক্ষেও অনুকূল হতে হবে। এছাড়া আবহাওয়া অবস্থাবিশেষে গাছের রোগ সংবেদনশীলতা বাড়িয়েও রোগের তীব্র আক্রমণ সম্ভব করে তুলতে পারে।

এপিফাইটোটিকের গতিপ্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় যে শুরুতে আক্রান্ত গাছের সংখ্যা ও আক্রান্ত গাছে রোগের তীব্রতা দুইই বাড়তে থাকে। জমিতে প্রথম আক্রমণের জায়গাকে কেন্দ্র করে রোগ চারিপাশে ছড়াতে থাকে আর পর্যায়ক্রমে আক্রান্ত গাছে ইনোকুলামের পরিমাণ জ্যামিতিক হারে বাড়তে থাকে। এর ফলে ইনোকুলাম শুধু যে বিপুল পরিমাণে উৎপন্ন হয় তাই নয়, প্রতিটি গাছের উপর যে পরিমাণ ইনোকুলাম গিয়ে পড়ে তা সফল আক্রমণের

জন্য প্রয়োজনীয় নিম্নতম মাত্রা অর্থাৎ threshhold value থেকে অনেক বেশী। সেই সময়, যখন শতকরা ১০০ ভাগ গাছই আক্রান্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে, এপিফাইটোটিক সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌছায়। সব গাছে রোগের আক্রমণের তীব্রতা অবশ্য এক রকম হয় না। কিছুদিন এই অবস্থায় চলার পর এপিফাইটোটিকের প্রকোপ ক্রমশঃ কমতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত মৃদু আকার ধারণ করে। এপিফাইটোটিকের সময় রোগ সংবেদনশীল জাতির গাছগুলি রোগের আক্রমণে প্রায় ধ্বংস হয়ে যায় আর উচ্চ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতির গাছগুলি বেঁচে থাকে। এরা আক্রান্ত হলেও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না এবং সেখানে ইনোকুলামের উৎপাদনও খুব কম হয়। এই অবস্থায় ইনোকুলামের উৎস ক্রমশঃ শুকিয়ে যেতে থাকে, রোগের অগ্রগতি ব্যাহত হয় এবং এপিফাইটোটিকের গতি মন্থর হয়ে আসে। রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছে আক্রমণ করলেও আক্রান্ত গাছে রোগ উৎপাদকের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ সম্ভব হয়না, তার প্রাণশক্তিও কিছুটা কমে আসে আর ইনোকুলামের উৎপাদন ক্রমশঃ খুবই সীমিত হয়ে পড়ে। এর ফলে রোগের আক্রমণ স্তিমিত হতে হতে থেমে যায়। এইভাবে এপিফাইটোটিক প্রথমে উর্দ্ধমুখী গতিতে ক্রমোন্নতির ফলে সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছায় ও পরে আবার ক্রমাবনতির ফলে মৃদু হতে হতে মিলিয়ে যায়।

রোগের আক্রমণের পূর্বাভাস জ্ঞাপন (Disease forecasting)

ফসলে রোগের আক্রমণ সব বছর সমান হয় না কারণ ইনোকুলামের পরিমান, বাহক পতঙ্গের সংখ্যা ও কর্মতৎপরতা, আবহাওয়া ইত্যাদি এক রকম থাকে না। রোগের মারাত্মক আক্রমণ হলে তবেই কার্যকরী রোগ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয়, অন্যথায় নয়। এর থেকে বোঝা যায় যে রোগের মারাত্মক আক্রমণের পূর্বাভাস জ্ঞাপনের নির্ভরযোগ্য কোন ব্যবস্থা থাকলে চাষীর পক্ষে যেমন প্রয়োজনভিত্তিক উপযুক্ত রোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সময়মত গ্রহণ করে বিরাট ক্ষতির হাত থেকে বাঁচা সম্ভব হয় তেমনি শুধুমাত্র অহেতুক বিপদাশঙ্কায় রোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনর্থক খরচের ঝুঁকি নিতে হয় না। রোগের এপিফাইটোটিকের পূর্বাভাস জ্ঞাপনের ব্যবস্থা থাকলে তখন কি ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে কতটা ক্ষতি এড়ানো যাবে বা আদৌ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে কোন লাভ আছে কি না এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনেক সহজ ও বিজ্ঞানসম্মত হয়।

মিলার ও ওব্রায়েনের (P. R. Miller and M. J. O'Brien. 1957)

মতে রোগের মারাত্মক আক্রমণের পূর্বাভাস জ্ঞাপন বলতে বোঝায় চাষীকে জানানো যে চাষের পরিবেশ কোন একটি ক্ষতিকর রোগের জোরালো আক্রমণের পক্ষে বিশেষ অনুকুল হয়ে পড়েছে এবং উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আর্থিক লাভের সম্ভাবনা আছে।

বহুকাল থেকেই রোগের মারাত্মক আক্রমণের সম্ভাবনা সম্পর্কে অগ্রিম ধারণা গড়ে তোলার চেষ্টা চলেছে। আগেকার দিনে বিভিন্ন বছরে পরিবেশ বা আবহাওয়া ভেদে রোগের প্রকোপ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করেই আক্রমণের সম্ভাবনা সম্বন্ধে ধারণা করা হত। দেখা গেছে যে অল্প উষ্ণ ও অপেক্ষাকৃত বেশী আর্দ্র আবহাওয়ায় আলুর নাবি ধসা রোগের এপিফাইটোটিক হয়। শুকনো ও অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণ আবহাওয়া কিছু ছাতাধরা রোগের পক্ষে বিশেষ অনুকুল। আলুর নাবি ধসা ও আপেলের স্ক্যাব রোগের আক্রমণ সম্বন্ধে অগ্রিম হুঁশিয়ারি জানানোর প্রথা বেশ অনেকদিন থেকে চালু থাকলেও, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালেই পরিমাপযোগ্য তথ্যের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রোগের আক্রমণের পূর্বাভাস জ্ঞাপন সংক্রান্ত ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

কৃষির দিক থেকে দেখলে রোগের আক্রমণের পূর্বাভাস জ্ঞাপনের সার্থকতা নির্ভর করবে কার্যকরী হুঁশিয়ারি ব্যবস্থা গ্রহণের উপর যাতে চাষীর পক্ষে সময়মত উপযুক্ত রোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হয়। সবক্ষেত্রে অবশ্য বেশী সময় পাওয়া যায় না। তখন রোগের পূর্বাভাস রেডিও, টেলিভিসন, টেলিফোন বা অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে চাষী বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে যথাসত্বর পৌছে দেবার ব্যবস্থা করতে হয়। রোগের আক্রমণের পূর্বাভাস জ্ঞাপন অবশ্যই নির্ভরযোগ্য হওয়া প্রয়োজন যদিও শতকরা একশ ভাগ নির্ভরযোগ্যতা কোন অবস্থাতেই আশা করা যায় না। রোগের পূর্বাভাস জ্ঞাপন ও হুশিয়ারি ব্যবস্থা গ্রহণ যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য। সুতরাং একমাত্র (ক) অর্থকরী শস্য ও খাদ্য শস্যের, অর্থাৎ যাদের বাজারদর বেশ উঁচু একমাত্র তাদের, বিশেষ ক্ষতিকর রোগের ক্ষেত্রে ও (খ) যে রোগের জন্য পরিমিত ব্যয়সাপেক্ষ ও কার্যকরী রোগ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি জানা আছে সেখানেই এই সব ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রশ্ন ওঠে।

রোগ উৎপাদকের জীবনচক্র (life cycle), প্রতিকূল পরিবেশে ও দুটি ফসলের মধ্যবর্তী সময়ে সে কিভাবে বেঁচে থাকে, প্রাথমিক আক্রমণের সূচনা কিভাবে হয়, রোগ কিভাবে গাছ থেকে গাছে ছড়ায় এবং পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান, বিশেষ করে উষ্ণতা ও আর্দ্রতা, কিভাবে উপরের ঘটনাগুলিকে

প্রভাবিত করে এই সব তথ্যের উপর নির্ভর করেই রোগের মারাত্মক আক্রমণের পূর্বাভাস জ্ঞাপন সম্ভব হয়। এপিফাইটোটিক সংক্রান্ত জ্ঞান এই ব্যাপারে বিশেষ সহায়ক। কিভাবে রোগের আক্রমণের পূর্বাভাস জ্ঞাপনের কাজে এগোতে হয় এই সম্বন্ধে ওয়াইলে (G. A. Weille, 1965) কিছু আলোকপাত করেছেন। প্রথমে গবেষণাগারের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদান কিভাবে রোগ উৎপাদকের টিকে থাকা, সক্রিয় হয়ে ওঠা, বংশবৃদ্ধি বা স্পোর উৎপাদন করা ও আক্রমণের সূচনা করার উপর প্রভাব বিস্তার করে সে সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এর পরে চাষের সময়ে রোগের আক্রমণের সঙ্গে জড়িত দিনের বিশেষ বিশেষ সময়ে আবহাওয়া, বিশেষ করে উষ্ণতা ও আর্দ্রতা, যেরকম থাকে কৃত্রিম উপায়ে ঠিক সেইরকম অবস্থার সৃষ্টি করে রোগের আক্রমণ সংক্রান্ত উপরোক্ত ঘটনাগুলির উপর তার প্রভাব খতিয়ে দেখতে হবে। এই সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে একটি আবহাওয়া সংক্রান্ত 'মডেল' (meteorological model) তৈরী হবে যেটিকে চাষের জমির পরিবেশে প্রয়োগ করে সেখানে রোগের উপর আবহাওয়ার প্রভাব কি রকম তা নিরূপণ করতে হবে। এই ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে রোগের এপিফাইটোটিকের পক্ষে অনুকূল আবহাওয়ার বিশেষ বিশেষ অবস্থাগুলি (synoptic model situations) স্থির করে নেওয়া সম্ভব হবে। পরবর্তীকালে চাষের সময়কার আবহাওয়া এই সব মডেলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে যদি মনে হয় যে পরিবেশ রোগের মারাত্মক আক্রমণের বা এপিফাইটোটিকের সূচনার ইঙ্গিত দিচ্ছে তখন পূর্বাভাস জ্ঞাপনের ও হুঁশিয়ারির ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যাপারটি অবশ্যই যথেষ্ট জটিল এবং সিদ্ধান্তে আসার আগে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। রোগের পূর্বাভাস জ্ঞাপনের জন্য সাধারণতঃ নিম্নলিখিত তথ্যগুলির উপর নির্ভর করা হয়।

(ক) দুটি ফসলের মধ্যবর্তী সময়ের আবহাওয়া

রোগ উৎপাদকের সাফল্য বহুলাংশে দুটি ফসলের মধ্যবর্তী সময়ের আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে। ঐ সময় আবহাওয়া যদি রোগ উৎপাদকের টিকে থাকার পক্ষে অনুকূল না হয় তাহলে চাষের মরশুমের শুরুতে ইনোকুলামের পরিমাণ যথেষ্ট কমে যায় যার ফলে চাষের সময় আবহাওয়া অনুকূল হলেও রোগের প্রকোপ কখনই বেশী হয় না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলে শীতকালে ঠাণ্ডা খুব বেশী থাকলে তামাকের ব্লু মোল্ড (c.o. *Peronospora*

tabacina) রোগের আক্রমণ জোরালো হয় না কারণ খুব কম তাপমাত্রায় ছত্রাক বাঁচে না। ভুট্টার ব্যাকটিরিয়াজনিত উইল্ট (c.o. *Xanthomonas stewartii)* রোগের ক্ষেত্রেও একই রকম ঘটে। এই ব্যাকটিরিয়া বাহক ফ্লি বীটলের (flea beetle) দেহের মধ্যেই শীতের সময়টা টিকে থাকে। শীতকালে ঠাণ্ডা খুব বেশী হলে বীটল বাঁচে না, ফলে ব্যাকটিরিয়াও নষ্ট হয়ে যায়। এই কারণে শীতকালে তাপমাত্রা কত নীচে নেমেছে তার থেকে মরশুমের শুরুতে কি পরিমাণ বীটল বেঁচে আছে এবং প্রাথমিক ইনোকুলাবের পরিমাণ কতটা হতে পারে সে সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়। বীটের কার্লি টপ রোগের বাহক পতঙ্গও বেশী ঠাণ্ডায় টি'কতে পারে না। উপরের তিনটি রোগের ক্ষেত্রে প্রখর শীতে ইনোকুলামের পরিমাণ যথেষ্ট কমে যায় বলে সেই বছর রোগের জোরালো আক্রমণের সম্ভাবনা সাধারণতঃ থাকে না

(খ) চাষের সময়কার আবহাওয়া

চাষের সময়কার আবহাওয়া, বিশেষ করে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার পরিমাণ, রোগের আক্রমণ ও প্রসারের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় আবহাওয়া দেখেই এপিফাইটোটিকের সম্ভাবনার আভাস পাওয়া যায়। তবে বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে অনুকূল উষ্ণতা ও আর্দ্রতার মাত্রা এক রকম নয়। পর পর বেশ কয়েক বছর চাষের সময়কার আবহাওয়া ও রোগের প্রকোপ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালালে তবেই এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠা সম্ভব। আলুর মারাত্মক নাবি ধসা রোগের প্রসঙ্গে আক্রমণের পূর্বাভাস জ্ঞাপন হল্যাণ্ডে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে প্রথম শুরু হয়। চারটি বিশেষ অবস্থার উপর নির্ভর করে এটি করা হত, যথা (১) রাত্রের তাপমাত্রা অন্ততঃ চার ঘণ্টা শিশিরপাতের জন্য প্রয়োজনীয় তাপমাত্রার (dewpoint) নীচে থাকবে, (২) দিনের তাপমাত্রা ন্যূনপক্ষে ১০°সেঃ হবে, (৩) গড় মেঘলা ভাব অন্ততঃ ০·৮ থাকবে আর (৪) পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় অন্ততঃ গড়ে ০.১ মিমি. বৃষ্টিপাত হবে। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে দেখা গেল মাত্র দুটি অবস্থা, যথা—(১) ন্যূনপক্ষে ১০° সেঃ তাপমাত্রা ও (২) শতকরা ৭৫ ভাগ বা বেশী আপেক্ষিক আর্দ্রতার উপর ভিত্তি করেই এই রোগের আক্রমণের নির্ভরযোগ্য পূর্বাভাস জ্ঞাপন সম্ভব। আয়ার্ল্যাণ্ডে এই প্রসঙ্গে ঐ দুটি অবস্থা ছাড়াও পাতার উপরিতলে অন্ততঃ ৪ ঘণ্টার জন্য একটি পাতলা জলের স্তরের উপস্থিতি প্রয়োজন বলে মনে করা হয়। আঙ্গুরের ডাউনি মিলডিউ (c.o. *Plasmopara viticola*) রোগের মারাত্মক আক্রমণের

পূর্বাভাস নিরূপণ ও সেই প্রসঙ্গে হুশিয়ারি জানানোর ব্যবস্থা ইউরোপে ৫০ বছরের আগে থেকে চালু রয়েছে। আবহাওয়া উস্পোরের অঙ্কুরোদ্গম ও গাছে আক্রমণের অনুকূল হলেই হুশিয়ারি জানানো হয়। ফ্রান্সে আঙ্গুর বাগানের পরিবেশে সক্রিয় উস্পোরের প্রচুর সংখ্যায় উপস্থিতি, ১১° সেঃ এর উপরে তাপমাত্রা এবং জমি পর পর বেশ কয়েকদিন ভিজে থাকবে এমন পরিমাণে বৃষ্টিপাত হলেই রোগের প্রথম আক্রমণের সম্ভাবনা সম্বন্ধে চাষীকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। রোগের ছড়িয়ে পড়া ১১—২০° সেঃ তাপমাত্রায় ৬ ঘণ্টা বা ততোধিক সময়ের জন্য পাতা একটানা ভিজে থাকার উপর নির্ভর করে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকদিন ধরে দৈনিক অন্ততঃ ১০ ঘণ্টা আপেক্ষিক আর্দ্রতা শতকরা ৯৫ ভাগ ও তাপমাত্রা ২১° সেঃ এর উপরে থাকলে চীনা বাদামের টিক্কা রোগের (c.o. ***Mycosphaerella berkeleyii*** ও ***M. arachidicola***) জোরালো আক্রমণের সম্ভাবনা সম্পর্কে হুশিয়ারি জানানো হয়। শ্রীলঙ্কায় চা গাছের সব থেকে কচি দুটি পাতা ও কুঁড়িতে আক্রমণের ধরণ ও সূর্যালোকের পরিমাণ দেখে ব্লিস্টার ব্লাইট (c.o. ***Exobasidium vexans***) রোগের ২-৩ সপ্তাহ পরে সম্ভাব্য জোরালো আক্রমণের পূর্বাভাস জ্ঞাপন সম্ভব হয়েছে।

(গ) ছোট গাছে রোগের পরিমাণ

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহামা অঞ্চলে দেখা গেছে যে শীতের শেষে বসন্তের শুরুতে গমের (spring wheat) ছোট চারায় ইনোকুলাম কতটা থাকে তার উপরই পরবর্তী ২-৩ মাসে ব্রাউন রাস্ট (c.o. ***Puccinia recondita***) রোগের আক্রমণের তীব্রতা নির্ভর করে। মার্চের শেষে যদি দেখা যায় প্রতি হাজার পাশকাঠিতে (tiller) ২-৩ হাজার রাস্টের সোরাস (sorus) রয়েছে তাহলে সেটাকে স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হয় যার থেকে শতকরা ৫ ভাগ পর্যন্ত ক্ষতি হতে পারে। তবে ঐ সময় ইনোকুলামের পরিমাণ যদি তুলনায় যথেষ্ট বেশী হয় এবং পরবর্তীকালে আবহাওয়া বিশেষ করে তাপমাত্রা অনুকূল (১০° সেঃ এর উপরে) থাকে, তাহলে ইনোকুলামের দ্রুত বৃদ্ধির ফলে রোগের মারাত্মক আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

(ঘ) জমি, বাতাস, বীজ ইত্যাদিতে ইনোকুলামের পরিমাণ

জমিতে, বীজে বা গাছের অন্যান্য রোপণযোগ্য অংশে কি পরিমাণ প্রাথমিক

ইনোকুলাম আছে তার থেকে অনেক সময় রোগের আক্রমণের সম্ভাবনার একটা আভাস পাওয়া যায়। আপেল ও ন্যাসপাতির স্ক্যাব রোগে (c.o. *Venturia inaequalis* এবং *V. pirina*) মাটিতে পড়ে থাকা রোগাক্রান্ত পাতায় যে সব পেরিথীসিয়াম থাকে তার ভিতরে উৎপন্ন অ্যাসকোস্পোরই প্রাথমিক ইনোকুলামের কাজ করে। মরশুমের শুরুতে আপেল ও ন্যাসপাতির বাগানে কি পরিমাণে রোগাক্রান্ত পাতা পড়ে আছে তার একটা সমীক্ষা করলে প্রাথমিক ইনোকুলামের পরিমাণ সম্বন্ধে একটা ধারণা হতে পারে। প্রাকৃতিক পরিবেশে যখন স্ক্যাব রোগাক্রান্ত পাতার পেরিথীসিয়াম থেকে অ্যাসকোস্পোর ছড়াতে শুরু করে, ঐ পাতা গবেষণাগারে এনে রাখলে দেখা গেছে সেটি এক সপ্তাহ আগে শুরু হয়। এর ফলে প্রাথমিক আক্রমণের জন্য কি পরিমাণ অ্যাসকোস্পোর পাওয়া যেতে পারে সেটা যেমন বোঝা যায় তেমনি হুশিয়ারি জানানোর জন্য প্রায় এক সপ্তাহ সময় পাওয়া যায়। প্রীস (T. F. Preece, 1961) মনে করেন ইংল্যাণ্ডে এপ্রিলে কি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয় তার উপরই আপেলে স্ক্যাব রোগের প্রকোপ নির্ভর করে। ফ্রান্সে ন্যাসপাতির গাছগুলি যখন পূর্ণ প্রস্ফুটিত অবস্থায় থাকে তখন প্রবহমান বাতাসে প্রতি ঘণ্টায় ১০০০—১৫০০ অ্যাসকোস্পোর পাওয়া গেলে স্ক্যাব রোগের আক্রমণের পূর্বাভাস জানানো হয়। কিছু তণ্ডুল জাতীয় শস্যের আর্গট (ergot) রোগের ক্ষেত্রে আগের বছরের আক্রমণের ফলে জমিতে কি পরিমাণ স্ক্লেরোশিয়াম রয়ে গেছে তার থেকে প্রাথমিক ইনোকুলামের পরিমাণ ও রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়।

জমিবাহিত রোগের ক্ষেত্রে আগের বছরের আক্রমণের ফলে যে প্রাথমিক ইনোকুলাম জমিতে থেকে গেছে অনেক সময় তার পরিমাণ থেকে রোগের আক্রমণের সম্ভাব্য তীব্রতা কতটা হতে পারে তার একটা আভাস পাওয়া যায়। যেসব রোগের প্রাথমিক ইনোকুলাম অপেক্ষাকৃত বড় আকারের, যেমন—স্ক্লেরোশিয়াম বা মাইক্রোস্ক্লেরোশিয়াম, সেখানে জমির বিভিন্ন অংশ থেকে মাটির নমুনা সংগ্রহ করে গবেষণাগারে নিয়ে এসে তাতে কি পরিমাণ প্রাথমিক ইনোকুলাম রয়েছে পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া হয়। স্ক্লেরোশিয়াম, রাইজোকটোনিয়া ও ভার্টিসিলিয়াম অ্যালবো-এট্রামজনিত রোগের ক্ষেত্রে এইভাবে সম্ভাব্য আক্রমণের আভাস পাওয়ার চেষ্টা করা হয়।

বেশ কিছু রোগ মূলতঃ বীজবাহিত। জমিতে বোনার জন্য ব্যবহৃত বীজের মধ্যে শতকরা কত ভাগ রোগে আক্রান্ত (infected) তা নির্দ্ধারণ

করে নিলে তার থেকে ফসলে রোগের আক্রমণের মোটামুটি নির্ভরযোগ্য পূর্বাভাস পাওয়া যায়। যে জমি থেকে এই বীজ সংগ্রহ করা হয়েছে সেখানে আগের বছরের ফসলে রোগের আক্রমণের তীব্রতা কতখানি ছিল তার থেকে বীজে ইনোকুলামের সম্ভাব্য পরিমাণ সম্পর্কে একটা ধারণা করা যেতে পারে।

জাপানে ধানের ঝলসা রোগের আক্রমণের পূর্বাভাস নিরূপণ নিয়ে প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে কাজ চলছে। ছত্রাক (*Pyricularia oryzae*) কি ভাবে শীতের ঠাণ্ডায় টিকে থাকে, কনিডিয়াম উৎপাদনের উপর আবহাওয়ার প্রভাব, ধানের ক্ষেতে কখন কি পরিমাণে কনিডিয়াম দেখা যায় এইসব তথ্যের উপর ভিত্তি করে এই রোগের আক্রমণের পূর্বাভাস জ্ঞাপনের চেষ্টা করা হয়। অনেক সময় খুব অল্প আয়তনের জমিতে কিছুটা আগে পাকে এবং উচ্চ মাত্রায় রোগ সংবেদনশীল এমন জাতির ধানের চাষ করা হয়। যেহেতু রোগের আক্রমণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই চাষ, সেজন্য একে prediction field বলা হয়। এই জমিতে রোগের প্রকোপ খুব বেশী হলে তখন রোগের পূর্বাভাস জ্ঞাপন করা হয়। ভারতে ঝলসা রোগের উপর এই ধরণের কাজ কিছু হয়েছে। কটকে কেন্দ্রীয় ধান্য গবেষণা কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিকরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে ভোরের দিকে ন্যূনপক্ষে ২০°—২৪° সেঃ তাপমাত্রা ও ৯০ শতাংশের উপর আপেক্ষিক আর্দ্রতা এই রোগের প্রবল আক্রমণের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। যদি এই অবস্থা পরপর কয়েকদিন চলতে থাকে, তখন হুশিয়ারি জানানো যেতে পারে।

প্রাসঙ্গিক পুস্তক ও গবেষণা পত্রাদি

Bourke, P.M.A. 1970. Use of weather information in the prediction of plant disease epiphytotics. *Ann. Rev. Phytopathol.* **8** : 345—370.

Colhoun, J. 1973. Effects of environmental factors in plant disease. *Ann. Rev. Phytopathol.* **11** : 343—364.

Horsfall, J.G., and E.B. Cowling (eds.). 1978. "Plant Disease : An Advanced Treatise." Vol.2 Academic Press, New York.

Rotem, J. Climate and weather influences on epidemics, 317—337.

Shrum, D. Forecasting of epidemics, 222—238.

Krausse, R.A., and L.B. Massie. 1975. Predictive systems : modern approaches to disease control. *Ann. Rev. Phytopathol.* **13** : 31—47.

Waggoner, P.E. 1960. Forecasting epidemics. In. "Plant Pathology : An Advanced Treatise." Vol. 3, 291—312, Academic Press, New York.

১৭ ফসলে রোগের ও রোগজনিত ক্ষতির পরিমাপ

রোগের আক্রমণের সঠিক মূল্যায়ন ও রোগজনিত ক্ষতির সঙ্গে তার সম্পর্ক নিরূপণ উদ্ভিদ-রোগবিজ্ঞানের কঠিন সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম। ক্ষতির সম্ভাব্য পরিমাণ সম্বন্ধে জানার প্রয়োজন এই যে একমাত্র এর উপর নির্ভর করেই ব্যয়বহুল রোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আর্থিক দিক থেকে গ্রহণীয় কি না এই সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। রোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যদি আর্থিক দিক থেকে লাভজনক না হয় তাহলে তার প্রয়োজন কতটুকু ?

ল্যাবরেটরী (laboratory) বা পরীক্ষাগারে যত নিখুঁতভাবে রোগের পরিমাপ সম্ভব চাষের জমিতে কখনই তা সম্ভব নয়। চেস্টার (K. S. Chester, 1950) মনে করেন শতকরা দশ ভাগ এদিক ওদিক হওয়া খুবই সম্ভব। গ্রীন হাউসে ও পরীক্ষাগারে সুপরিকল্পিতভাবে পরীক্ষা চালালে হয়ত কোন রোগের ক্ষেত্রে নিভরযোগ্য পরিমাপ পদ্ধতি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। যেখানে রোগের আক্রমণ হলে গাছটি মরে যায় সেখানে অবশ্য পরিমাপের অসুবিধা কম। ক্ষতির মূল্যায়ন সঠিকভাবে করতে হলে শুধু কতটা ফসল নষ্ট হল এবং তার দাম কত তার হিসাব করলেই চলবে না, রোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্যয় ও ঐ ফসলের উপর নির্ভরশীল বিভিন্ন ব্যবসায় কাঁচামালের অভাবে যে ক্ষতি হয় তাও ধরতে হবে।

রোগের আক্রমণ হলে পুরো গাছটাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে বা এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে ফলন বিশেষ হয় না। অনেক রোগে পাতার খুব বেশী ক্ষতি হয়, ফলে ফলন অনেক কমে যায়। ধান ও গমের কিছু রোগের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শিষের ঠিক নীচের পাতা (flag leaf) কতটা আক্রান্ত হয় তার সঙ্গে ক্ষতির পরিমাণের একটি নিকট সম্বন্ধ রয়েছে। অনেক রোগে দানা বা ফলটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কখনও বা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে অনেক সময় বাইরে থেকে দেখে গাছের ক্ষতি খুব বেশী মনে না হলেও ফলের বা বীজের বাজার দর তুলনায় অনেক বেশী কমে যেতে দেখা যায়। যে সব রোগে শিকড়ে আক্রমণ হয় সেখানে অনেক সময় রোগগ্রস্ত গাছের চেহারা দেখে তেমন ক্ষতিগ্রস্ত মনে হয় না। বেশ কিছু ভাইরাস রোগের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটে। এর থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে সব রোগের ক্ষেত্রে আক্রমণের তীব্রতা বা রোগের পরিমাপ থেকে রোগজনিত ক্ষতির সঠিক পরিমাপ সম্ভব নয়। বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে রোগের

আক্রমণের তীব্রতা ও রোগজনিত ক্ষতির মধ্যে সম্বন্ধ এক রকম নয়। তাছাড়া আরও কিছু সমস্যা রয়েছে। রোগের আক্রমণের ফলে শুধু যে ফলন কমে যায় তাই নয়, মানেরও যথেষ্ট অবনতি ঘটতে পারে। মানের অবনতি বলতে বোঝায় ফল বা বীজের আকারে ছোট হয়ে যাওয়া, রঙের বা স্বাদের পরিবর্তন ও গায়ে নানা রকম দাগ। ফলের বিশেষ করে আপেল, আঙুর, আম, লেবু, কলা ইত্যাদির ক্ষেত্রে এরকম হলে বাজার দর ভীষণ কমে যায় ও ক্ষতির পরিমাণ সেই অনুপাতে বাড়ে।

রোগের সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য দুটি : (১) কি অনুপাতে গাছ বা গাছের বিভিন্ন অঙ্গ আক্রান্ত হয়েছে তার অর্থাৎ আক্রমণের তীব্রতার পরিমাপ ও (২) ঐ সূত্র ধরে ফসলের ক্ষতির পরিমাপ। চেস্টার (K. S. Chester, 1950) ও লার্জ (E. C. Large, 1966) রোগের পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। পরিমাপের পদ্ধতি এমন হতে হবে যা বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন মরশুমে, ও বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে এবং বিষয়নির্ভর (subjective) না হয়ে বস্তুনির্ভর বা তথ্যনির্ভর (objective) হবে। শুধু ফলন কমে যাওয়া নয়, ফসলের মানের অবনতিও বিচার করে দেখতে হবে। তবে অধিকাংশ রোগের ক্ষেত্রেই এমন পরিমাপ পদ্ধতি খুঁজে পাওয়া কঠিন যা উপরোক্ত শর্তাবলী পুরোপুরি অনুসরণ করে। সাধারণতঃ প্রাথমিক পর্যায়ে রোগের পরিমাপ ও পরবর্তী পর্যায়ে তার উপর নির্ভর করে রোগজনিত ক্ষতির পরিমাপ করা হয়ে থাকে। দেখা গেছে যে ছোট জমিতে নিবিড়ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে নির্ণয় করা পরিমাপ বড় জমির ভিত্তিতে নির্ণয় করা পরিমাপের তুলনায় অনেক নিখুঁত ও বেশী নির্ভরযোগ্য হয়।

ফসলের রোগ পরিমাপ (Disease appraisal)

রোগ পরিমাপ করতে গেলে শতকরা কি হারে গাছ রোগে আক্রান্ত হয়েছে এবং আক্রমণের তীব্রতা কতটা দুইই খতিয়ে দেখতে হয়। যেখানে আক্রান্ত গাছের শতকরা হার খুবই কম অথচ আক্রান্ত গাছে রোগের প্রকোপ খুব বেশী তার তুলনায় আক্রান্ত গাছের শতকরা হার বেশ বেশী অথচ আক্রমণের তীব্রতা কম সেরকম ক্ষেত্রেই বেশী ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে।

চারা ধসা, শিকড় পচা ইত্যাদি রোগে দেখা যায় যে সব আক্রান্ত গাছেই রোগের প্রকোপ প্রায় এক রকম। অধিকাংশ ভাইরাস রোগে বা যে সব রোগে আক্রমণের ফলে গাছের বিশেষ অঙ্গ বা অংশ নষ্ট হয়ে যায় যেমন ভূষা বা আরগট (ergot) রোগ, সেখানে শতকরা কত ভাগ গাছ বা গাছের শিষ, ফল বা বীজ

আক্রান্ত হয়েছে সেই তথ্য থেকে রোগের পরিমাপ করা সম্ভব। এই সব রোগের শতকরা হার নির্ণয় সহজ ও এর থেকে রোগের সঠিক পরিমাপও সম্ভব। কিন্তু সব গাছে রোগের প্রকোপ মোটামুটি সমান না হলে সেখানে শতকরা কত ভাগ গাছ আক্রান্ত সেই তথ্য থেকে রোগের সঠিক পরিমাপ একেবারেই অসম্ভব। যেখানে রোগের আক্রমণ প্রধানতঃ পাতাতেই হয়, সেখানে শতকরা কতটি গাছ, কতটি পাতা এবং পাতার কতটা অংশ আক্রান্ত তার হিসাব থেকে ফসলের রোগের একটা পরিমাপ সম্ভব হতে পারে। তবে কেবলমাত্র ছোট প্লটেই এই ধরণের পরিমাপ নিখুঁতভাবে করা যায়, বড় জমিতে নয়—যদি না সেখানে ঐ সব তথ্য সংগ্রহের জন্য সন্তোষজনক কোন পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব হয়। যদি একই ফসলের বিভিন্ন গাছে রোগের প্রকোপের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ থাকতে দেখা যায় সেখানে আক্রমণের তীব্রতা অনুযায়ী চোখে ধরা পড়ে এরকম বিভিন্ন শ্রেণীতে গাছগুলিকে ফেলা হয়, যথা শতকরা ০—৩, ৩—৬, ৬—১২, ১২—২৫, ২৫—৫০, ৫০—৭৫, ৭৫—৮৭, ৮৭—৯৪ ও ৯৪—১০০ ভাগ, এবং বিভিন্ন শ্রেণীকে পর পর ১—৯ সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা হয় (J. G. Horsfall and R. W. Barratt, 1945)। যেখানে পাতায় অনেক ছোট ছোট দাগ থাকে যেগুলি জুড়েও যেতে পারে, যেমন গমের মরিচা বা ধানের ঝলসা রোগে দেখা যায়, সেখানে বর্ণনামূলক মান (descriptive scale) বা তুলনামূলক স্থায়ী চিত্র পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এর কিছু উদাহরণ এখানে দেওয়া হল।

বর্ণনামূলক মান নানা ধরণের হতে পারে। কোথাও সংখ্যার দ্বারা, যেমন ০—৫ বা ০—৭, অথবা শতকরা হারের দ্বারা রোগের পরিমাপ করা হয়ে থাকে। আলুর নাবি ধসা রোগ পরিমাপের জন্য British Mycological Society অনুমোদিত মানটি হল এইরকম :

০—জমিতে কোন রোগ নেই

০·১% —ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে অল্প কিছু গাছ আক্রান্ত, ১০·৮ মি ব্যাসার্ধযুক্ত জমিতে একটি বা দুটি দাগ

১%—কিছু গাছ আক্রান্ত, প্রতিটি আক্রান্ত গাছে অনধিক দশটি দাগ

৫%—বেশ কিছু গাছ আক্রান্ত, প্রতিটি আক্রান্ত গাছে প্রায় পঞ্চাশটি দাগ

২৫%—প্রায় প্রতিটি গাছ আক্রান্ত, প্রতি গাছে পঞ্চাশটির অধিক দাগ

৫০%—প্রতিটি গাছ আক্রান্ত এবং পাতার অর্ধাংশ বিনষ্ট

৭৫%—প্রতিটি গাছ আক্রান্ত এবং পাতার তিন-চতুর্থাংশ বিনষ্ট

৯৫%—প্রতিটি গাছের একটি দুটি বাদে সব পাতা আক্রান্ত ও বিনষ্ট

১০০%—প্রতিটি গাছের সব পাতা আক্রান্ত ও বিনষ্ট

উইল্ট রোগের ক্ষেত্রে অনেকসময় ০-৪ মান ব্যবহার করা হয়।

০—গাছে কোন রোগলক্ষণ দেখা যায় না

১—নীচের দিকের পাতার অগ্রভাগে ঢলে পড়ার লক্ষণ

২—নীচের দিকের বেশ কিছু পাতায় ঢলে পড়ার লক্ষণ

৩—অধিকাংশ পাতা ঢলে পড়েছে

৪—সব পাতা ঢলে পড়েছে এবং শুকিয়ে গেছে বা ঝরে পড়েছে।

রোগের প্রকোপের মাত্রা (disease intensity or disease severity) অনেক ক্ষেত্রে প্রামাণ্য তুলনা চিত্রের (standard area diagram) সঙ্গে মিলিয়ে বের করা যেতে পারে। যেখানে পাতায় বা ফলে দাগ হয়, যথা—গমের মরিচা, আলুর স্ক্যাব, আপেলের স্ক্যাব, ধানের ঝলসা ইত্যাদি রোগের ক্ষেত্রে, এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকে। এই ধরণের পরিমাপ পদ্ধতির প্রথম প্রয়োগ দেখা যায় অস্ট্রেলিয়ায় গমের মরিচা (ব্রাউন রাস্ট) রোগের প্রকোপের মাত্রা নির্দ্ধারণ করার সময়। তখন পাতায় দেখা রোগলক্ষণকে শতকরা ১—৫০ ভাগ আক্রান্ত অংশ হিসাবে পাঁচটি শ্রেণীতে (grade) ভাগ করা হয়েছিল। পরে একই রোগ পরিমাপের জন্য ১—৭৫% আক্রান্ত অংশকে ছ'টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। পরবর্তীকালে আলুর স্ক্যাব, গমের ইয়েলো রাস্ট (c. o. *Puccinia striiformis*), গম বা যবের ছাতাধরা, ধানের বাদামী দাগ, ঝলসা ও ব্যাকটিরিয়াজনিত পাতা ধসা ইত্যাদি অনেক রোগের ক্ষেত্রে স্থায়ী মান নির্দেশক চিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে সাফল্যের সঙ্গে রোগ পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে (রেখাচিত্র ২০ ক-গ)। এই সব ক্ষেত্রে রোগের প্রকোপের নিম্নতম মাত্রা, যেখানে শতকরা একভাগেরও কম অংশ আক্রান্ত, থেকে সর্বোচ্চ মাত্রাকে চার বা পাঁচটি পরিমাপের শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। ধানের রোগের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা কেন্দ্রের (International Rice Research Institute) নির্দ্ধারিত নিম্নলিখিত মান অনুযায়ী বাদামী দাগ, ঝলসা, ব্যাকটিরিয়াজনিত পাতা ধসা ও লীফ স্ট্রীক ইত্যাদি রোগের ক্ষেত্রে ১—৯ মানদণ্ডে রোগের পরিমাপ করা হয়। তবে যেহেতু চোখে দেখার মাধ্যমে নয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা খুবই কঠিন সেজন্য প্রয়োগের সুবিধার কথা ভেবে রোগাক্রান্ত পাতাগুলিকে সাধারণতঃ পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

১—পাতার ১% অংশের কম আক্রান্ত

৩—পাতার ১—৫% অংশ আক্রান্ত

৫—পাতার ৫—২৫% অংশ আক্রান্ত

৭—পাতার ২৫—৫০% অংশ আক্রান্ত

৯—পাতার ৫০% বা ততোধিক অংশ আক্রান্ত
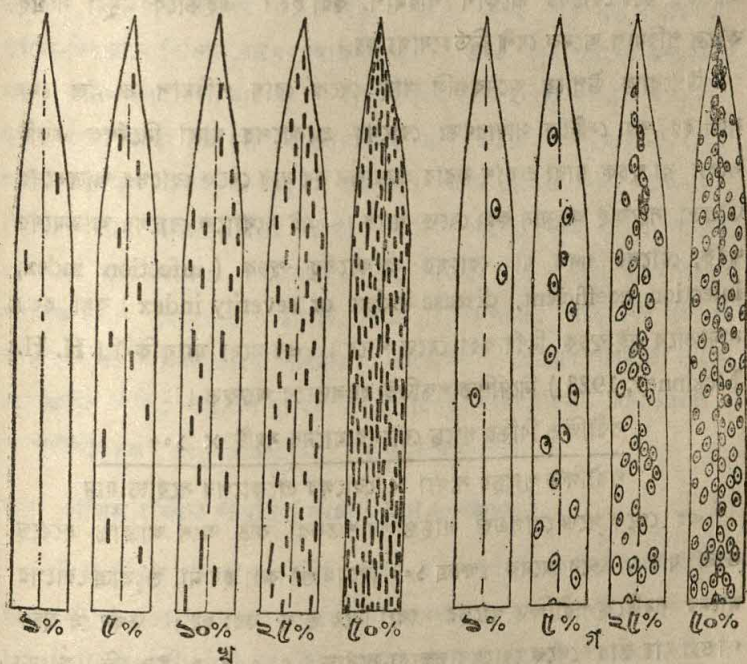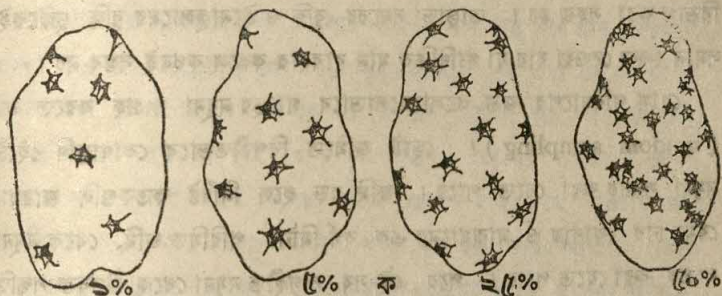
রেখাচিত্র ২০ রোগের প্রকোপের মাত্রা নির্ণয়ে প্রামাণ্য তুলনা চিত্রের ব্যবহার : (ক) আলুতে স্ক্যাব, (খ) গমে ইয়েলো রাস্ট ও (গ) ধানে ঝলসা রোগের আক্রমণজনিত ক্ষতির পরিমাপ।

রোগ পরিমাপের ক্ষেত্রে গাণিতিক মানের তুলনায় সংবর্গমানীয় বা

'লগারিথমিক' মান (logarithmic scale) কে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। সময় গাণিতিক হারে বাড়লেও রোগ উৎপাদকের সংখ্যা বা ইনোকুলামের পরিমাণ জ্যামিতিক হারে বাড়ে। পাতায় দাগের সংখ্যা ১ থেকে ১০ হতে যত সময় লাগে ১০ থেকে ১০০ হতেও তত সময় লাগে এবং দুটি ক্ষেত্রের বৃদ্ধিই সমান গুরুত্বপূর্ণ। লগারিথমিক মান ব্যবহার করলে রোগের প্রকোপ অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ করা সহজ হয়। তাছাড়া সময়ের বৃদ্ধি ও ইনোকুলামের বৃদ্ধি দুটিকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া যায় যা গাণিতিক মান ব্যবহার করলে কখনই সম্ভব নয়।

রোগ পরিমাপের জন্য এলোমেলোভাবে গাছের নমুনা সংগ্রহ করতে হয় (random sampling)। ছোট জমিতে বিপরীতভাবে কোণাকুনি হেঁটে নমুনা সংগ্রহ করা যেতে পারে। জমি বড় হলে নির্দিষ্ট কতকগুলি জায়গা, যেমন চার কোণায় ও মাঝখানের এক বর্গ মিটার পরিমিত জমি, থেকে নমুনা সংগ্রহ করা যেতে পারে। পরে এই সব সংগৃহীত নমুনা থেকে উপযুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে রোগের প্রকোপ পরিমাপ করা হয়। এইভাবে নমুনা সংগ্রহ করলে পরিমাপ অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য হয়।

উপরোক্ত উপায়ে অনেকগুলি গাছ থেকে রোগ পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের পর সেটিকে সাধারণতঃ রোগের প্রকোপের মাত্রা নির্দেশক একটি সংখ্যা বা সূচক দ্বারা প্রকাশ করার প্রয়োজন হয় যার থেকে রোগের আক্রমণের তীব্রতা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। এই সংখ্যাকে রোগের আক্রমণের সূচক, রোগের গুণক বা রোগের প্রকোপের সূচক (infection index, infection coefficient, disease index or severity index) বলা হয়। নানাভাবে এই সূচক নির্ণয় করা যেতে পারে। এর মধ্যে ম্যাককিনী (H. H. Mckinney, 1923) নির্দেশিত পদ্ধতিই বহুলভাবে অনুসৃত।

$$\frac{\text{পরীক্ষিত বিভিন্ন গাছে রোগের মানের সমষ্টি} \times ১০০}{\text{পরীক্ষিত গাছের সংখ্যা} \times \text{রোগের প্রকোপের সর্বোচ্চ মান}}$$

এর থেকে গড়ে রোগগ্রস্ত গাছগুলির শতকরা কত অংশ আক্রান্ত হয়েছে জানা যায়। তবে অনেক ক্ষেত্রে ১০০ দিয়ে গুণ করা হয় না, শুধুমাত্র রোগের মানের সমষ্টিকে পরীক্ষিত গাছের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা হয়। তখন যে সূচক পাওয়া যায় তার থেকে রোগের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ (৪, ৫, ৭, ৯, ইত্যাদি) মানের পরিপ্রেক্ষিতে রোগের প্রকোপ কতটা তা জানা যায়।

কিছু রোগের ক্ষেত্রে শতকরা কতভাগ গাছ আক্রান্ত তার সঙ্গে গাছের রোগগ্রস্ত অঙ্গের (পাতা, ফল, ইত্যাদি) কতভাগ আক্রান্ত তার একটা প্রত্যক্ষ

সম্পর্ক থাকতে দেখা গেছে। সুতরাং প্রথম তথ্যটি থেকেই রোগের প্রকোপ সম্বন্ধে একটা ধারণা করা সম্ভব হয়। শিকড়ে আক্রমণ হয় এমন রোগের ক্ষেত্রে এই ধরণের সম্পর্ক প্রায়ই দেখা যায়। এই সব ক্ষেত্রে গাছ মাটি থেকে না তুলেই আক্রমণের তীব্রতা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ সম্ভব।

রোগজনিত ক্ষতির পরিমাপ (Assessment of loss)

কোন রোগের আক্রমণে ফসল তোলার আগেই যদি গাছ মরে যায়, সেক্ষেত্রে শতকরা কত ভাগ গাছের রোগের ফলে মৃত্যু হয়েছে সেই তথ্য থেকে ক্ষতির পরিমাপ করা যেতে পারে। যে সব রোগে গাছ নিস্ফলা হয়ে যায় সেখানেও আক্রান্ত গাছের শতকরা হার থেকে একইভাবে রোগের পরিমাপ সম্ভব। এর মধ্যে অবশ্য রোগের ফলে উৎপন্ন শস্যের গুণগত মান কমে যাওয়ার জন্য যে ক্ষতি তা আসে না। রোগ না হলে ফলন কত হত তার আন্দাজ করাও সহজ নয়। তাছাড়া সব সময় যে একটিমাত্র রোগের জন্যই ফসলের ক্ষতি হয় তাও নয়, একাধিক রোগের জন্যও হতে পারে। একই সঙ্গে নয়, সাধারণতঃ পর্যায়ক্রমিকভাবে বিভিন্ন রোগের আক্রমণ হয়। তখন কোন রোগের জন্য ঠিক কতটা ক্ষতি হল বোঝা যায় না। কারণ বিভিন্ন রোগ থেকে আলাদা আলাদা-ভাবে যে ক্ষতি হয় তা যোগ করলে কখনই মোট ক্ষতির হদিশ মেলে না, মোট ক্ষতির পরিমাণ সাধারণতঃ কিছুটা কম হয়। এমন রোগও আছে যা ফসলের বিভিন্ন পর্যায়ে গাছের বিভিন্ন অংশকে আক্রমণ করে, যেমন তুলার পাতায় কোণাচে দাগ রোগ। এই রোগে চারা, পাতা, কাণ্ড ও ফল বিভিন্ন সময়ে আক্রান্ত হয়। এই ধরণের রোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে আক্রমণের জন্য যে ক্ষতি হয় তা আলাদাভাবে পরিমাপের প্রয়োজন। রোগের পরিমাপ থেকে রোগজনিত ক্ষতির পরিমাপ বা মূল্যায়ন সাধারণতঃ পরিসাংখিক (statistical) বা পরীক্ষামূলক (experimental) পদ্ধতিতে করা হয়।

ক। পরিসাংখ্যিক পদ্ধতি (Statistical methods)

এই পদ্ধতিতে সাধারণতঃ বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগৃহীত রোগের আনুপাতিক হার, রোগের প্রকোপ ও ফলনের পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্যের পরিসাংখ্যিক বিশ্লেষণ (statistical analysis) করা হয়। প্রচুর তথ্য থাকলে এই পদ্ধতিতে রোগ-জনিত ক্ষতির একটা নির্ভরযোগ্য পরিমাপ সম্ভব বলে মনে করা হয়, কারণ সেক্ষেত্রে ভুলের সম্ভাবনা অনেক কম থাকে। তবে সবসময় যে একথা খাটে তা নয়। সেজন্য পরিসংখ্যানগত পদ্ধতিতে যে পরিমাপে পৌঁছানো যায় কিছুটা

সতর্কতার সঙ্গে তার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সুপরিকল্পিত মাঠের পরীক্ষার মাধ্যমে ফসলের রোগজনিত ক্ষতির যে পরিমাপ সম্ভব, পরিসংখ্যানগত পদ্ধতির মাধ্যমে পাওয়া পরিমাপ কদাচিৎ ততটা নির্ভরযোগ্য হয়। এই পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

১। **মাঠের সমীক্ষা (Field survey) :** পর পর বেশ কয়েক বছর ধরে চাষীর জমিতে সমীক্ষা করা হয়। কোন জাতির ফসলে এবং গাছের কোন অবস্থায় রোগের আক্রমণ কি রকম হয়, সার এবং জলসেচের সঙ্গে রোগের আক্রমণের কি সম্পর্ক, রোগের আক্রমণের তীব্রতা ও ফলনের পরিমাণ ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। আবহাওয়া, সার, জলসেচ প্রভৃতি চাষের বিভিন্ন অবস্থার কথা মনে রেখে রোগের প্রকোপের সঙ্গে ফলনের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে রোগজনিত ক্ষতির পরিমাপ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যেতে পারে। যেখানে একটি রোগের জন্যই বিভিন্ন বছরে ফলনের তারতম্য হয় সেখানে এই ধরণের পরিমাপ বেশ উপযোগী। বিভিন্ন বছরে বিভিন্ন জায়গার নির্দিষ্ট জমিগুলি (plots) থেকেই তথ্য সংগ্রহ করতে হয়, প্রতি বছরে ভিন্ন ভিন্ন জমি থেকে নয়। সাধারণতঃ জমির ধারের দিকের গাছগুলি বাদ দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ঠিকমত তথ্য সংগ্রহের জন্য উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ কর্মীর প্রয়োজন। তা না হলে এই সমীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা কমে যায়।

২। **প্রশ্নমালার ব্যবহার (Use of questionnaire) :** একই উদ্দেশ্য নিয়ে অনেক দেশেই রোগের আক্রমণ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য বিশেষভাবে তৈরী প্রশ্নমালা (questionnaire) বিভিন্ন অঞ্চলের অভিজ্ঞ চাষী ও কৃষি সংক্রান্ত কর্মীদের কাছে পাঠানো হয়। এতে তাঁদের কাছ থেকে স্থানীয় ভাবে বিশেষ বিশেষ রোগ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য ; যেমন—কবে রোগের লক্ষণ প্রথম দেখা গেল, রোগের আনুপাতিক হার, আক্রমণের তীব্রতা, আবহাওয়া, বিভিন্ন জাতির গাছে রোগের তারতম্য, সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণ ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। যদি পুরো ব্যাপারটা সুসংগঠিত হয় ও চাষী এবং কৃষি-কর্মীদের কাছ থেকে নির্ভরযোগ্য উত্তর পাওয়া যায়, তাহলে সেই তথ্যের পরিসাংখ্যিক বিশ্লেষণ করলে রোগজনিত ক্ষতির পরিমাপ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যেতে পারে। প্রশ্নমালা রচনা করার সময় খেয়াল রাখতে হবে সেগুলি যেন সহজবোধ্য হয়। এইভাবে প্রশ্নমালার উত্তরের মাধ্যমে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বহু জায়গা থেকে অত্যন্ত অল্প খরচে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যায়। তবে প্রাপ্ত উত্তরগুলি বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে পরীক্ষা করে নিতে

হবে। প্রয়োজনে, পরিমাপ পদ্ধতি আরও নিখুঁত করার উদ্দেশ্যে, এইভাবে সংগৃহীত তথ্যের সঙ্গে বিশেষভাবে ট্রেনিং প্রাপ্ত কর্মীদের দ্বারা কিছু জায়গা থেকে সংগৃহীত অনুরূপ তথ্য একইসঙ্গে পরিসাংখ্যিক বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

খ। পরীক্ষামূলক পদ্ধতি (Experimental methods)

রোগজনিত ফসলের ক্ষতির পরিমাপের বিভিন্ন পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে (১) নীরোগ ও রোগাক্রান্ত গাছের মধ্যে, (২) রোগ সংবেদনশীল ও রোগ প্রতিরোধী জাতির রোগাক্রান্ত গাছের মধ্যে, (৩) রোগাক্রান্ত ও রোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে নীরোগ অবস্থায় রাখা গাছের মধ্যে এবং (৪) নীরোগ ও রোগাক্রান্ত গাছের অনুরূপ কৃত্রিম উপায়ে ক্ষতিগ্রস্ত গাছের মধ্যে ফলনের তুলনা করা হয়। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই পরীক্ষাগুলি সুপরিকল্পিত হওয়া দরকার যাতে পরীক্ষালব্ধ তথ্যগুলির পরিসাংখ্যিক বিশ্লেষণ সম্ভব হয়। তাছাড়া নির্ভরযোগ্য পরিমাপ পদ্ধতি খুঁজে পেতে হলে বেশ কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন অঞ্চলে এই ধরণের পরীক্ষা চালানোর প্রয়োজন।

১। নীরোগ ও রোগাক্রান্ত গাছের মধ্যে তুলনা : নানাভাবে এই পদ্ধতির ব্যবহার হয়। রোগাক্রান্ত বীজ বা গাছের বপনযোগ্য অন্যান্য অংশ ব্যবহার করে, জীবাণুদ্বারা সম্পৃক্ত জমিতে গাছ লাগিয়ে বা কৃত্রিম উপায়ে ইনোকুলাম ছড়িয়ে দিয়ে গাছে রোগের সৃষ্টি করা হয়। জমিবাহিত রোগের ক্ষেত্রে ছোট জমি জীবাণু দ্বারা সম্পৃক্ত করে তোলা হয় (sick plot)। এই জমিতে সংবেদনশীল জাতির গাছ লাগালে রোগের আক্রমণ হবেই। গ্রীন-হাউসে বা জমিতে এই ধরণের পরীক্ষা করা যায়। গ্রীনহাউসের সুবিধা হল নিয়ন্ত্রিত অবস্থার মধ্যে পরীক্ষা চালানো যায় এবং রোগ উৎপাদকের জানা কোন একটি জাতি ব্যবহার করে রোগের সৃষ্টি করানো যায় যা জমিতে পরীক্ষা চালালে কখনই সম্ভব নয়। তবে গ্রীনহাউসে কখনই জমিতে স্বাভাবিক চাষের অবস্থা কৃত্রিম উপায়ে পুরোপুরি সৃষ্টি করা যায় না। স্বাভাবিকতার কারণে, সম্ভব হলে জমিতে পরীক্ষা চালানোই উচিত। রোগ হয় না এমন জাতির গাছ মাঝখানের প্লটে লাগালে কৃত্রিম উপায়ে আক্রান্ত গাছ থেকে নীরোগ গাছে রোগ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা কিছুটা কমে। একই জাতির গাছ বিভিন্ন জায়গায় চাষ করা হয়েছে অথচ এক জায়গায় রোগ হয়েছে অন্যত্র হয়নি। এদের মধ্যেও তুলনা সম্ভব, যদি না অবশ্য চাষের অবস্থার দিক থেকে বড় রকমের কোন তফাৎ থাকে।

২। রোগ সংবেদনশীল ও রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছের মধ্যে তুলনা : রোগের আক্রমণ হয়েছে এরকম অঞ্চলে রোগ সংবেদনশীল ও রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছের ফলনের মধ্যে তুলনা করলে রোগজনিত ক্ষতির সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়। যদি নীরোগ অবস্থায় এই তুটি জাতির ফলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তফাৎ থাকে তাহলে ফলনের ভিত্তিতে নির্দ্ধারিত পরিমাপ সেই আনুপাতিক হারে পরিবর্তন করে নিতে হয়। সব থেকে ভাল হয় যদি সংবেদনশীল ও প্রতিরোধী জাতি তুটি জীন সংস্থানের দিক থেকে একই ধরণের (isogenic lines) হয় এবং তাদের ফলন এক রকমের হয়। সেক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাপ সহজ হয়। তবে ঐ ধরণের নিকট সম্পর্কযুক্ত তুটি জাতি সবসময় পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে নীরোগ গাছে প্রায় এক ধরণের ফলন পাওয়া যায় এই রকম তুটি রোগ সংবেদনশীল ও রোগ প্রতিরোধী জাতির গাছ নিয়ে পরীক্ষা চালানো হয়।

৩। রোগাক্রান্ত ও রোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে নীরোগ গাছের মধ্যে তুলনা : এই পদ্ধতিতে রোগ সংবেদনশীল জাতির চাষ করা হয় কিন্তু কিছু প্লটে রোগনিয়ন্ত্রণকারী রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে গাছে রোগ হতে দেওয়া হয় না। রোগাক্রান্ত ও কৃত্রিম উপায়ে নীরোগ অবস্থায় রাখা গাছের ফলনের উপর ভিত্তি করে রোগজনিত ক্ষতির পরিমাপ করা হয়। রোগ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত যৌগের পরিমাণ ও স্প্রে'র সংখ্যা কমিয়ে বিভিন্ন প্লটে রোগের প্রকোপ বিভিন্ন মাত্রায় কমানো যেতে পারে। এর থেকে নীরোগ গাছের তুলনায় গাছে রোগের প্রকোপ কিরকম হলে কতটা ক্ষতি হয় সে সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়। তবে রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সব ফাঞ্জিসাইড, অ্যান্টিবায়োটিক ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় তারা অনেকসময় গাছের বৃদ্ধি ও ফলনকেও কিছুটা প্রভাবিত করে। নীরোগ গাছে ফাঞ্জিসাইড প্রয়োগ করে যে সব গাছে কিছু প্রয়োগ করা হয়নি তাদের সঙ্গে ফলনের কোন তারতম্য হয় কিনা দেখে নিতে হয়। যেখানে তারতম্য হয় সেখানে ক্ষতির পরিমাপের সময় ঐ তথ্যটিকে বিবেচনা করতে হয়।

৪। নীরোগ ও রোগাক্রান্ত গাছের অনুরূপ কৃত্রিম উপায়ে ক্ষতিগ্রস্ত গাছের মধ্যে তুলনা : রোগে আক্রান্ত হলে গাছের যেমন ক্ষতি হয় কৃত্রিম উপায়ে গাছকে সেইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে তাদের সঙ্গে নীরোগ গাছের ফলনের তুলনা করলে রোগের কারণে ফসলের কি রকম ক্ষতি হতে পারে সে সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা হয়। পাতার রোগের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে

যেখানে পাতা আগে ঝরে যায় সেখানে পাতা ছিঁড়ে নিয়ে বা যেখানে পাতায় দাগ হয় সেখানে দাগের মত আকৃতির টুকরো টুকরো গোলাকার অংশ (leaf disc) পাতা থেকে বাদ দিয়ে, অনেকটা রোগের মত ক্ষতি কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। এই পদ্ধতিতে ক্ষতির যে পরিমাপ পাওয়া যায় তা সঠিক কখনই হয় না, রোগ হলে যে ক্ষতি হয় তার থেকে কিছুটা কম হয়। এর কারণ রোগের আক্রমণে পাতার যে অংশ একেবার নষ্ট হয়ে যায় তা ছাড়াও সংলগ্ন বেশ কিছুটা অংশে আক্রমণের প্রভাবে শারীরবৃত্তীয় বিক্রিয়াসমূহে নানা ধরণের পরিবর্তন হয় যার প্রভাব ফলনের উপরও পড়ে।

রোগের প্রকোপের সঙ্গে রোগজনিত ক্ষতির পরিমাণের সম্পর্ক খুঁজে বের করার জন্য যে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার হয়ে থাকে তাদের মধ্যে যেগুলি উল্লেখ-যোগ্য সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা হল। এই সম্পর্ক সাধারণতঃ সারণী (table) বা সঙ্কেত (formula) এর মাধ্যমে দেখানো হয়। এই সম্পর্ক সংক্রান্ত তথ্য যদি গাণিতিক মডেলের (mathematical model) মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় তাহলেই রোগজনিত ক্ষতির নিখুঁত মূল্যায়নের সম্ভাবনা থাকে। গমের ব্ল্যাক ও ইয়েলো রাস্ট, আলুর নাবি ধসা প্রভৃতি কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ রোগের ক্ষেত্রে একাধিক মডেলের পরিকল্পনা করা হয়েছে। কোনটিই অবশ্য নিখুঁত নয়। রোগজনিত ক্ষতির সঠিক মূল্যায়নের জন্য নূতন মডেল উদ্ভাবনের চেষ্টা চলেছে। তাছাড়া রোগসৃষ্টিতে গাছ, রোগ উৎপাদক ও পরিবেশের জটিল সম্পর্কের গ্রন্থিমোচনের এবং রোগের প্রকোপ ও রোগজনিত ক্ষতির সম্পর্ক নিরূপণের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি কম্পিউটারের সাহায্যে বিশ্লেষণেরও চেষ্টা চলেছে। মনে করা হয় এর ফলে শুধু যে রোগজনিত ক্ষতির যথাযথ মূল্যায়ন সম্ভব হবে তাই নয়, বিশেষ বিশেষ রোগের ক্ষেত্রে মারাত্মক আক্রমণের পূর্বাভাস জ্ঞাপনও অনেক সহজ হবে।

প্রাসঙ্গিক গবেষণাপত্রাদি

Horsfall, J. G., and E.B. Cowling. 1978. Pathometry : The measurement of plant diseases. In "Plant Disease : An Advanced Treatise" (J. G. Horsfall, and E. B. Cowling, eds.). Vol. 2, 118—136. Academic Press, New York.

James, W.C. 1974. Assessment of plant diseases and losses. *Ann. Rev. Phytopathol.* **12** : 27—48.

১৮ গাছের রোগ নিয়ন্ত্রণ

কৃষির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল নীরোগ গাছের চাষ। পরিবেশে অজস্র রোগসৃষ্টির ক্ষমতাসম্পন্ন জীবাণু রয়েছে, সুতরাং চাষ করলে ফসলে রোগের সম্ভাবনা থাকবেই। উদ্ভিদ-রোগবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য হল গাছে রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা ও আক্রমণের তীব্রতা যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণ করে তার মাধ্যমে ফলন বাড়ানো। আধুনিক কৃষিতে নিবিড় চাষের ফলে, ফসলে রোগের আক্রমণ ঘটলে প্রায়শঃ রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশের সৃষ্টি হতে দেখা যায়। সেই অবস্থায় চাষকে অর্থকরী করতে গেলে কার্যকর রোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ অবশ্যই প্রয়োজন।

পরজীবীজনিত বা প্রতিকূল পরিবেশজনিত উভয় শ্রেণীর রোগের ক্ষেত্রেই ফসলকে সুস্থ রাখার জন্য রোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে। এর জন্য রোগের কারণ সঠিকভাবে নির্ণয়ের গুরুত্ব খুব বেশী। পরজীবীজনিত রোগে আক্রান্ত অংশে অনেকসময় পরজীবীর বিভিন্ন অংশ দেখতে পাওয়া যায়, ফলে রোগনির্ণয় অনেকটা সহজ হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় শ্রেণীর রোগে সেই সুবিধা থাকে না, তবে রোগনির্ণয় সম্ভব হলে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ সাধারণতঃ কঠিন নয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফলপ্রসূ হতে দেখা যায়। এই অধ্যায়ে রোগ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আলোচনা পরজীবীজনিত রোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

গাছের রোগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কখনও কখনও রোগগ্রস্ত গাছকে রোগমুক্ত করে তোলার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয় ঠিকই তাহলেও প্রধানতঃ রোগ নিবারণের দিকেই লক্ষ্য বেশী থাকে। খুব কম সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রেই এমন ব্যবস্থা জানা আছে যা গ্রহণ করলে রোগগ্রস্ত গাছকে সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত করা সম্ভব হয়। মানুষ বা প্রাণীর ক্ষেত্রে রোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা মূলতঃ ব্যক্তিকেন্দ্রিক, যদিও রোগ মহামারীরূপে দেখা দেবার সম্ভাবনা থাকলে প্রতিষেধক হিসেবে তখন সমষ্টিভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। গাছের ক্ষেত্রে রোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রধানতঃ সমষ্টিভিত্তিক যেখানে বহু গাছকে একই ব্যবস্থার অধীনে আনা হয়। বড় গাছের অথবা বাগানের ফুল বা অন্য কোন পছন্দসই গাছের রোগের ক্ষেত্রে অবশ্য অনেক সময় একটির জন্যও রোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তবে চাষের ক্ষেত্রে রোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আর্থিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য হওয়া প্রয়োজন। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যা খরচ হয় ও এর ফলে ফলন যা

বাড়বে বলে মনে হয় তার দামের আনুপাতিক হিসাব (cost-benefit ratio) অনুকূল না হলে ঐ ব্যবস্থা গ্রহণের কোন সার্থকতা থাকে না। তাছাড়া নির্দেশিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এমন হতে হবে যা সহজে প্রয়োগ করা যায়, নিরাপদ ও নিশ্চিতভাবে রোগের প্রসার ও আক্রমণের তীব্রতা একটি গ্রহণযোগ্য স্তরে নামিয়ে আনতে সক্ষম হবে।

ফসলের রোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদির মূল লক্ষ্যগুলি হল প্রাথমিকভাবে পরিবেশে ইনোকুলামের পরিমাণ কমিয়ে আনা, গাছ থেকে গাছে ইনোকুলামের ছড়িয়ে পড়া সীমিত করা, গাছের সঙ্গে ইনোকুলামের সংযোগস্থাপনে বাধাদান ও গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উন্নতিসাধন। পোষক গাছ ও পরজীবীর প্রকৃতি ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর নির্ভর করবে কোন রোগে কোন লক্ষ্যটির উপর বেশী জোর দেওয়া হবে। আলোচনার সুবিধার জন্য এখানে গাছের রোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সমূহকে মূলতঃ চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা—

(ক) চাষের পদ্ধতিগত ব্যবস্থার মাধ্যমে রোগ নিয়ন্ত্রণ (cultural control),

(খ) আইনগত ব্যবস্থার মাধ্যমে রোগ নিয়ন্ত্রণ (regulatory measures),

(গ) রাসায়নিক উপায়ে রোগ নিয়ন্ত্রণ (chemical control) এবং

(ঘ) রোগ প্রতিরোধী জাতির নির্বাচন ও সৃষ্টির মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উন্নতিসাধন (inprovement of host resistance through selection and breeding of resistant varieties)।

এই ধরণের শ্রেণীবিভাগ স্টিভেন্স (R. B. Stevens, 1960) এর "রোগের পিরামিড তত্ত্বে"র (concept of disease pyramid) সঙ্গে মানিয়ে যায়। এই তত্ত্ব অনুসারে রোগের সৃষ্টি ও তীব্রতা চারটি উপাদানের উপর নির্ভর করে, যথা (১) পোষক গাছের রোগ সংবেদনশীলতা, (২) পরজীবীর রোগসৃষ্টির ক্ষমতা, (৩) অনুকূল পরিবেশ ও (৪) উপযোগী সময়। এর যে কোন একটি উপাদানের হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটলে রোগের তীব্রতা কম হবে বলে মনে করা হয়। উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উন্নতিসাধন পোষক গাছের, আইনগত ও রাসায়নিক ব্যবস্থা রোগ উৎপাদকের ও চাষের পদ্ধতিগত পরিবর্তন পরিবেশ ও সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে নেওয়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। বিভিন্ন রোগ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে করা হচ্ছে।

চাষের পদ্ধতিগত ব্যবস্থার মাধ্যমে রোগ নিয়ন্ত্রণ (Cultural control)

চাষের পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত যাতে ফলন ভাল হয়। কিন্তু নানাবিধ

কারণের জন্য ফলন আশানুরূপ না হতেও পারে। রোগের আক্রমণ ঐরকম একটি কারণ। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে সাধারণভাবে অনুসৃত চাষের পদ্ধতির প্রয়োজন অনুসারে কিছু পরিবর্তন ঘটালে অনেক সময় রোগজনিত ক্ষতির সম্ভাবনা বেশ অনেকটা কমে যায়। এই ধরণের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হল পরিবেশে ইনোকুলামের পরিমাণ কমিয়ে রোগ উৎপাদকের আক্রমণ ক্ষমতা কমানো, আক্রমণ এড়িয়ে যাওয়া বা গাছের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিয়ে সাধারণভাবে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলা। এই রকম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় খরচের পরিমাণ খুবই কম, এমনকি অনেক সময় কিছুই লাগে না। যে সব পরিস্থিতিতে অন্যান্য ব্যবস্থা আর্থিক কারণে গ্রহণযোগ্য নয় বা নানা কারণে সম্ভব নয়, সেখানে এই সব ব্যবস্থার বিশেষ উপযোগিতা রয়েছে। রোগ উৎপাদকের জীবন চক্র (life cycle) ও দুটি ফসলের মধ্যবর্তী সময়ে বা প্রতিকূল পরিবেশে সে কিভাবে টিকে থাকে সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকলে তবেই এইভাবে রোগ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা যায়। নীরোগ বীজের ব্যবহার, চাষের প্রথায় রদলবদল, স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা অনুসরণ, অন্যান্য জীবাণুর মাধ্যমে রোগ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি এই ধরণের ব্যবস্থার অন্তর্গত।

ক। নীরোগ বীজের ব্যবহার (Use of disease-free seed and propagating material)

ইনোকুলাম বীজের মধ্যে বা গায়ে লেগে থাকে এমন রোগের ক্ষেত্রে কেবল জীবাণুমুক্ত অর্থাৎ নীরোগ বীজ চাষের জন্য ব্যবহার করা উচিত। সেক্ষেত্রে প্রশংসাপত্র আছে এমন বীজ (certified seed) ব্যবহার করতে হবে। বীজ ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হবার বা তার গায়ে ছত্রাকের স্পোর বহন করার সম্ভাবনা থাকলে সেক্ষেত্রে ছত্রাকনাশক বা 'ফাঞ্জিসাইড' (fungicide) অথবা ব্যাকটিরিয়ানাশক 'অ্যান্টিবায়োটিক' (antibiotic) প্রয়োগ করে বীজ শোধন করে নিতে হয়। বীজ হিসাবে ব্যবহৃত হয় গাছের এই রকম বিভিন্ন অংশ যেমন আলু, আদা, পেঁয়াজ ও লিলি, গ্ল্যাডিওলাস প্রভৃতি বিভিন্ন ফুল গাছের কন্দ (bulb) ইত্যাদি একই কারণে জীবাণুমুক্ত অবস্থায় লাগানো উচিত। এগুলিকেও ফাঞ্জিসাইড ইত্যাদি প্রয়োগ করে অনেক সময় শোধন করে নেওয়া হয়। তা না হলে চারা অবস্থা থেকেই গাছটি রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। গম ও যবের বিভিন্ন ধরণের ভূষা, গম ও সরিষার ব্লাইট (c. o. *Alternaria spp.*), মটরের ব্লাইট (c. o. *Ascochyta pisi*) চীনা বাদামের টিক্কা, পাটের ডাঁটা পচা, বাঁধাকপির কালো শিরা ইত্যাদি রোগের

ক্ষেত্রে নীরোগ বীজের ব্যবহার একটি অপরিহার্য ব্যবস্থা। ফাঙ্গিসাইড বা অ্যান্টি-বায়োটিক ছাড়াও অনেক সময় উত্তাপ প্রয়োগ করে বীজ বা গাছের অনুরূপ অংশ জীবাণুমুক্ত করে নেওয়া হয়। যে মাত্রায় উত্তাপ প্রয়োগ করা হয় তা এমন হতে হবে যাতে জীবাণু বা ভাইরাস নষ্ট হয়ে যায় অথচ অঙ্কুরের কোন ক্ষতি হয় না। সাধারণতঃ নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় জলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভিজিয়ে রেখে বীজ শোধন করে নেওয়া হয়। বহুকাল পর্যন্ত গমের মারাত্মক আলগা ভুষা রোগের এই ছিল একমাত্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। এ ক্ষেত্রে বীজ প্রথমে ঠাণ্ডা জলে ৪—৫ ঘণ্টা ভিজিয়ে পরে ৫৪° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রাখা গরম জলে ১০ মিনিট রেখে বীজ শোধন করে নেওয়া হয়। অধিকাংশ রোগের ক্ষেত্রে বীজ ৫০°—৫৪° সেঃ তাপমাত্রায় জলে ১০—৩০ মিনিট রেখে জীবাণুমুক্ত করে নেওয়া যায়। আখের লাল ধসা ও মাইকোপ্লাজমাজনিত গ্র্যাসি শুট (grassy shoot) রোগের ক্ষেত্রে চাষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত আখের টুকরোগুলিকে (sett) ৫২° সেঃ তাপ-মাত্রায় গরম জলে আধঘণ্টা ডুবিয়ে রেখে রোগমুক্ত করে নেওয়া হয়। কিছু ভাইরাস রোগেও ৩৫°—৪৫° সেঃ তাপমাত্রায় কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টা রেখে বীজ, সুপ্ত মুকুল সহ কাটিং বা গাছের অন্যান্য অংশ রোগমুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। নার্সিসাস (Narcissus) ও আইরিস (Iris) এর কন্দ ৪৩°—৪৪° সেঃ তাপমাত্রায় রাখা জলে ৩ ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখলে ভিতরে নিমাটোড থাকলে মরে যায়। চন্দ্রমল্লিকা ও স্ট্রবেরীর নিমাটোডজনিত রোগেও একইভাবে ২০—৩০ মিনিটে কাটিংকে নিমাটোডমুক্ত করে নেওয়া সম্ভব। কোথাও কোথাও একই উদ্দেশ্যে গরম জলের পরিবর্তে গরম হাওয়া সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। আখের লাল ধসা, গ্র্যাসি শুট, রেটুন স্টান্টিং (ratoon stunting) ইত্যাদি রোগে আখের টুকরাগুলি ৫৪° সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ত হাওয়ায় ৮ ঘণ্টা রেখে দিলে সেগুলি রোগমুক্ত হয়। অনেক সময় ভাইরাস আক্রান্ত ছোট চারা বা কাটিং গ্রীনহাউসে বা 'গ্রোথ চেম্বারে' (growth chamber) নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় (৩৫°—৪০° সেঃ) গরম হাওয়ায় নির্দিষ্ট সময়ের (১—৮ সপ্তাহ) জন্য রেখে সেগুলিকে ভাইরাসমুক্ত করে নেওয়া সম্ভব হয়েছে।

বীজ সেই সব অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করতে হবে যেখানে রোগের প্রকোপ খুব কম। এই ধরণের বীজ উৎপাদনের জন্য অনেক সময় আবহাওয়া শুকনো এমন অঞ্চলে চাষ করা হয়। বীনের অ্যানথ্র্যাকনোজ (anthracnose) ও হ্যালো ব্লাইট (halo blight), মটরের ব্লাইট, বাঁধাকপির কালো শিরা ইত্যাদি রোগের নিয়ন্ত্রণে এই ব্যবস্থা বিশেষ সফল হয়েছে। নীরোগ বীজ উৎপাদনের

জন্য অনেকসময় বিশেষ রোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণেরও প্রয়োজন হয়। সব বীজবাহিত রোগে যে জীবাণু দীর্ঘদিন বীজের মধ্যে বেঁচে থাকে তাও নয়। ধানের ব্যাকটিরিয়াজনিত পাতা ধসা রোগে জীবাণু বীজের মধ্যে ৬ মাসের বেশী বাঁচে না। সুতরাং ঐ সময়টা কাটিয়ে বীজ জমিতে বুনলে তার থেকে রোগের কোন সম্ভাবনা থাকে না। তুলার অ্যানথ্র্যাকনোজ (c.o. *Colletotrichum gossypii)* ও সেলেরির লীফ স্পট (c.o. *Septoria apii)* রোগেও দেখা গেছে যে বীজ কিছুদিন রেখে দিলে নিজে থেকেই জীবাণুমুক্ত হয়ে পড়ে।

বিশেষ বিশেষ রোগের ক্ষেত্রে **'টিস্যু কালচার'** (tissue culture) এর সাহায্যে রোগ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে। যেসব ফল বা ফুলের গাছ প্রধানতঃ কাটিং এর মাধ্যমে চাষ করা হয় তাদের রোগ নিয়ন্ত্রণে এই পদ্ধতিতে সাফল্যের সম্ভাবনা থাকে। ভাইরাস রোগে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এরকম ফলের গাছে, যেমন আপেল, চেরী, প্লাম, প্রুন ইত্যাদিতে, ভাইরাস যথেষ্ট ছড়িয়ে পড়লেও কাণ্ডের শীর্ষদেশ (meristem tip) পর্য্যন্ত পৌছায় না। সুতরাং ঐ অংশ নিয়ে টিস্যু কালচার (meristem culture) করলে তার থেকে নীরোগ চারা বা কাটিং পাওয়া যায়। ইউরোপের অনেক দেশে এইভাবে ভাইরাসমুক্ত চারা তৈরী করে ফল চাষের রোগ নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

খ। চাষের প্রথায় রদবদল (Change in agricultural practices)

অনেক সময় দেখা গেছে যে চাষের সাধারণতঃ অনুসৃত পদ্ধতিগুলির কিছু রদবদল করলে জমির পরিবেশে পরিবর্তন ঘটে এবং তার ফলে আক্রমণের সম্ভাবনা বা রোগের প্রকোপ কমে। এই ধরণের কিছু কিছু পরিবর্তন যা ফসলের রোগজনিত ক্ষতির পরিমাণ সীমিত করতে সাহায্য করে এখানে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হচ্ছে।

১। বীজ বোনার সময়ের পরিবর্তনঃ সাধারণতঃ ফসল যে ৪-৫ মাস জমিতে থাকে তার পুরো সময়টাই রোগের আক্রমণের পক্ষে অনুকূল থাকে না। সফল আক্রমণের জন্য পোষক গাছের সংবেদনশীল অবস্থা ও অনুকূল আবহাওয়ার প্রয়োজন হয়। যদি বীজ বপনের সময় কিছুটা এগিয়ে বা পিছিয়ে দেওয়া যায় তাহলে গাছের সব থেকে সংবেদনশীল অবস্থার সময় আবহাওয়া আক্রমণের পক্ষে অনুকূল না হতেও পারে। তখন রোগের প্রকোপ অনেকটা কমে। কোন কোন রোগে ফসল তাড়াতাড়ি বা দেরীতে পাকে এমন জাতির চাষ করে রোগের আক্রমণ অনেকটা এড়ানো (disease escape) সম্ভব হয়েছে।

দেখা গেছে যে বীজ তাড়াতাড়ি লাগালে গমের মরিচা (ব্ল্যাক রাস্ট) ও চীনা বাদামের টিক্কা রোগ অনেক কম হয়। আবার বীজ দেরীতে লাগালে গমের দুর্গন্ধযুক্ত ভুষা রোগের আক্রমণ কম হয়। বীজ বৃষ্টির ঠিক পরেই না লাগালে ছোলার শিকড় পচা রোগের প্রকোপ কম হয়। অবশ্য এই ধরণের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সীমিত ভাবে ব্যবহার হয় কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বীজ বোনার দিন খুব বেশী এদিক ওদিক করা যায় না।

২। **জমির অবস্থা বুঝে চাষ :** জমির প্রকৃতিভেদে রোগের প্রকোপ কমবেশি হতে পারে। জমির তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, অম্লতা বা ক্ষারতা অনুকূল হলে অনেক সময় রোগের প্রকোপ খুবই বেড়ে যায়। জমির তাপমাত্রা বেশী হলে বাঁধাকপি, তিসি, টম্যাটো ইত্যাদির ফিউজেরিয়াম উইল্ট বেড়ে যায় আর কম হলে টম্যাটোর ভার্টিসিলিয়াম উইল্ট, তামাকের শিকড় পচা (c.o. *Thielaviopsis basicola*) প্রভৃতি রোগের প্রকোপ বাড়ে। জমির আর্দ্রতা যথেষ্ট বেশী হলে বাঁধাকপির শিকড় ফোলা এবং পিথিয়াম, ফাইটফথোরা ও অ্যাফানোমাইসেসজনিত বিভিন্ন শস্যের রোগ থেকে খুব ক্ষতি হয়। অন্যদিকে কম আর্দ্রতায় আলুতে স্ক্যাব ও বিভিন্ন শস্যে রাইজোকটোনিয়া ব্যাটাটিকোলাজনিত রোগের আক্রমণ জোরালো হয়। জমির অম্লতা বেশী হলে আলুর পাউডারি স্ক্যাব, বাঁধাকপির শিকড় ফোলা ও ফিউজেরিয়ামজনিত বিভিন্ন শস্যের রোগ থেকে বেশী ক্ষতি হয় আর ক্ষারতার জন্য আলুর স্ক্যাব ও বিভিন্ন শস্যের সিউডোমোনাসজনিত উইল্ট রোগের প্রকোপ বাড়ে। সুতরাং যে সব ক্ষেত্রে জমির অবস্থার সঙ্গে রোগের হ্রাসবৃদ্ধির সম্বন্ধ সুনির্দিষ্টভাবে জানা আছে সেখানে প্রয়োজন বুঝে জমির অবস্থা যাতে রোগের অনুকূলে না থাকে সেজন্য কিছু ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

৩। **প্রয়োজনভিত্তিক সারের প্রয়োগ :** ভাল ফসল পেতে হলে জমিতে উপযুক্ত মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হয়। অথচ অনেক সময় দেখা যায় যে সুষম সার প্রয়োগে ফসল ভাল হলেও কিছু কিছু রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা বেশ বেড়ে যায়। সাধারণতঃ দেখা গেছে যে নাইট্রোজেন সার বেশী দিলে রোগের প্রকোপ বেশী হয় আর পটাশের প্রয়োগ ফসলের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। জমিতে নাইট্রোজেন সারের পরিমাণ বেশী হলে ধানের ঝলসা ও খোলা পচা রোগ খুব বেড়ে যায়। এই সব রোগের ক্ষেত্রে পুরো নাইট্রোজেন সার জমি তৈরীর সময় একবারে না দিয়ে প্রথমে কিছুটা ও বাকীটা পরে ভাগে ভাগে দিলে (split application of fertilizer) ফলন ভালই হয় অথচ রোগের আক্রমণ জোরালো হয় না।

৪। **বীজ বপনের গভীরতা :** চারাতে আক্রমণ হয় এই রকম কিছু রোগের ক্ষেত্রে বীজ জমিতে একটু গভীরভাবে লাগালে (deep sowing) জমির উপরের স্তরে থাকা ছত্রাক থেকে চারায় আক্রমণের সম্ভাবনা কিছুটা কমে যায়। উদাহরণ ফিউজেরিয়াম সোল্যানি ও রাইজোকটোনিয়াজনিত বিভিন্ন শস্যের রোগ। বীজ এইভাবে লাগালে অঙ্কুরিত হবার অব্যবহিত পরেই ছত্রাক আক্রমণের সুযোগ পায় না, চারার প্রতিরোধ ক্ষমতাও কিছুটা বাড়ে—ফলে আক্রমণের সম্ভাবনা নিঃসন্দেহে কমে। অন্যদিকে যে সব রোগে চারা বেরোনর আগেই পচে যায় (pre-emergence damping off) সেখানে বীজ অল্প গভীরতায় লাগালে চারা অনেক সময় রোগ উৎপাদকের সম্ভাব্য আক্রমণ এড়িয়ে যেতে পারে।

৫। **চাষের ঘনত্ব :** ভাল ফলন পেতে হলে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক চারা লাগাতে হয় বা সেই হিসাবে বীজ বুনতে হয়। এর ফলে গাছগুলি অনেক সময় বেশ ঘেঁসাঘেসি হয়ে বাড়ে, তখন পরিবেশ সাধারণতঃ রোগ উৎপাদকের পক্ষে অনুকূল হয়ে পড়ে এবং রোগের প্রকোপ বেশী হয়। এই রকম কিছু রোগের ক্ষেত্রে চারার মধ্যে ব্যবধান কিছুটা বাড়িয়ে রোগের বিস্তার ও প্রকোপ উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব হয়েছে। উদাহরণ ধানের খোলা পচা ও 'হোয়াইট মোল্ড' (white mould) এবং বাঁধাকপির কালো শিরা রোগ।

৬। **পর্যায়ক্রমিক চাষ :** সাধারণতঃ জমিতে একই শস্যের চাষ একটানা বছরের পর বছর করা হয়ে থাকে (monoculture)। জমিবাহিত রোগের ক্ষেত্রে একনাগাড়ে চাষ হলে সেই জমিতে ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়া জাতীয় জীবাণু বা নিমাটোডের ইনোকুলামের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। ফলে রোগের প্রকোপও বাড়তে বাড়তে একসময় এমন স্তরে পৌঁছায় যখন চাষ থেকে লাভের বিশেষ সম্ভাবনা থাকে না। জমিবাহিত যে সব রোগ উৎপাদক পোষক গাছ ব্যতিরেকে জমিতে বেশীদিন সক্রিয়ভাবে টিকে থাকতে পারে না, তাদের ক্ষেত্রে প্রতি বছর একই শস্যের চাষের পরিবর্তে অন্য শস্যের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে চাষের (crop rotation) ব্যবস্থা করলে রোগ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য হয়। স্বাভাবিক ফসলের পরিবর্তে যদি এমন কোন ফসল লাগানো যায় যা ঐ রোগ উৎপাদকের দ্বারা আক্রান্ত হয় না তবে পোষক গাছের অভাবে জমিতে রোগ উৎপাদকের ইনোকুলাম কমতে থাকে এবং কয়েক বছর পরে খুবই কমে যায়। তুলা, অড়হর, মটর, ছোলা, তিসি ইত্যাদির ফিউজেরিয়াম উইল্ট ; আলুর স্ক্যাব ; বিভিন্ন শস্যের নিমাটোডজনিত রুট নট ইত্যাদি রোগ এইভাবে অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করা

সম্ভব হয়েছে। পোষক গাছ ছাড়া রোগ উৎপাদক জমিতে যতদিন টিকে থাকতে পারে তার থেকে বেশীদিন অন্য ফসলের চাষ করতে হয়। ছত্রাকের তুলনায় ব্যাকটিরিয়া বা নিমাটোড কমদিন টিকে থাকে। সফল রোগ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশে ফিউজেরিয়াম উইল্টের জন্য ৬—৭ বছর, আলুর স্ক্যাব ও ভার্টিসিলিয়াম উইল্টের জন্য ৪—৬ বছর এবং বাঁধাকপির কালো শিরা ও গমের 'টেক অল' (take all) রোগের জন্য ৩—৪ বছর ধরে অন্য শস্যের চাষ করতে হয়। নিমাটোডজনিত গম ও যবের 'মলিয়া' (molya) রোগ (c. o. *Heterodera major*) পর পর ৩—৪ বছর জমিতে অন্য শস্য লাগালে খুব কমে যায়। এই ধরণের ব্যবস্থায় জমি পুরোপুরি জীবাণুমুক্ত হয়না ঠিকই তবে ইনোকুলামের পরিমাণ নিঃসন্দেহে বেশ অনেকটাই কমে।

৭। **শস্য পর্যায়ের পরিবর্তন :** অনেক জমিতেই আজকাল বছরে পরপর দুটি বা তিনটি শস্যের চাষ করা হয়। এমন হতে পারে যে কোন জমিতে পরপর এমন দুটি শস্যের চাষ করা হয় যারা একই রোগ উৎপাদকের দ্বারা আক্রান্ত হয়। পাট ও আলু রাইজোকটোনিয়া ব্যাটাটিকোলা দ্বারা আক্রান্ত হয়। সুতরাং পর পর পাট ও আলুর চাষ না করে পাটের বদলে ধান বা আলুর বদলে গম বা অন্য শস্যের চাষ করা হলে পাট বা আলু উভয় শস্যেরই ঐ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা কিছুটা কমে।

গ। স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা অনুসরণ (Field sanitation)

রোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে সহজতম হলেও এটি অধিকাংশ সময় অনুসৃত হয় না। এই ধরণের ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হল পরিবেশে ইনোকুলামের পরিমাণ কমিয়ে বিপদসীমার নীচে নিয়ে আসা যাতে রোগের জোরালো আক্রমণের সম্ভাবনা না থাকে। এই ব্যবস্থায় অনুসৃত বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি হল জমিতে থেকে যাওয়া গাছের রোগগ্রস্ত অংশগুলিকে সরিয়ে নষ্ট করে ফেলা, রোগগ্রস্ত গাছের আক্রান্ত অংশগুলিকে নষ্ট করে ফেলা, রোগগ্রস্ত গাছের অপসারণ ও ধ্বংসসাধন এবং অন্যান্য উপায়ে জমি জীবাণুমুক্ত করার প্রচেষ্টা। এক কথায় বলা যায় বিভিন্ন স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা অনুসরণের মূল লক্ষ্য হল পরিচ্ছন্ন চাষের (clean cultivation) ব্যবস্থা করা।

১। **জমিতে থেকে যাওয়া রোগগ্রস্ত গাছের আবর্জনা অপসারণ ও ধ্বংসসাধন :** ফসল কাটার পর মাটিতে থেকে যাওয়া রোগগ্রস্ত গাছের শিকড় বা গোড়ার অংশ বা চাষের সময় গাছের যে সব আক্রান্ত অংশ জমিতে

খসে পড়ে তার মধ্যে ছত্রাক, ব্যাকটিরিয়া প্রভৃতি রোগজীবাণু ও নিমাটোড থেকে যায় এবং বেশ কিছুদিন সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে। পরের বছর ঐ জমিতে একই ফসলের চাষ করলে আগের বছরের চাষের ঐ সব আবর্জনা (crop residue = crop debris) থেকেই নূতন ফসলে আক্রমণের সূচনা হতে পারে। যে সব রোগে এই ধরণের আবর্জনা প্রাথমিক ইনোকুলামের অন্যতম উৎস সেখানে চাষের জন্য জমি তৈরীর আগে এগুলিকে জমি থেকে তুলে সরিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলতে বা পুড়িয়ে ফেলতে হয়। গম, যব, মটর ইত্যাদির ছাতাধরা ; মটরের ডাউনি মিলডিউ ; ভুট্টার ডাউনি মিলডিউ ও ভুষা ; আখের লাল পচা ; পানের গোড়া পচা ; পাটের ডাঁটা পচা ; চীনা বাদামের কলার (collar) রট, শিকড় পচা, ডাঁটা পচা ও টিক্কা ; আলুর নাবি ধসা ও আরও কিছু রোগে এই ব্যবস্থা অনুসরণ করে রোগের তীব্রতা বেশ কমানো সম্ভব হয়েছে। জোরালো আক্রমণ হলে গাছের তলায় রোগাক্রান্ত প্রচুর পাতা পড়ে থাকে যা কুড়িয়ে সরিয়ে ফেলা বেশ কঠিন ও সময়সাধ্য কাজ। সেজন্য অনেক সময় জলে ফাঞ্জিসাইড গুলে (৪০০ লিটার জলে ২৫ গ্রাম ফেনিলমারকিউরিক ক্লোরাইড) জমিতে পড়ে থাকা পাতার উপর স্প্রে করে ছিটিয়ে দিয়ে ইনোকুলাম নষ্ট করে ফেলা হয়। ছোট জমিতে পরিচ্ছন্ন চাষ কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। তবে যেখানে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এই ব্যবস্থা নিতে হয় সেখানে উপরের মত রাসায়নিক পদ্ধতির বা যান্ত্রিক পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। যান্ত্রিক উপায়ে লাঙ্গলের সাহায্যে মাটি গভীরভাবে কেটে (deep ploughing) উল্টে দিলে (soil inversion) আবর্জনাগুলি অনেকটা নীচে চলে যাওয়ার ফলে নূতন ফসলের বিশেষ ক্ষতি করতে পারে না। চীনা বাদামের গোড়া পচা (c. o. *(S. rolfsii)*, তুলার শিকড় পচা (c. o. *P. omnivorum)*, পুদিনার (mint) ভার্টিসিলিয়াম উইল্ট প্রভৃতি রোগে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করে বেশ সুফল পাওয়া গেছে।

২। রোগগ্রস্ত গাছের আক্রান্ত অংশের ধ্বংসসাধন : অনেক সময় দেখা গেছে যে রোগগ্রস্ত গাছের আক্রান্ত বা রোগলক্ষণযুক্ত অংশ কেটে বা ছিঁড়ে সরিয়ে ফেললে রোগের বিস্তার ও প্রকোপ অনেকটা কমে। লেবুর ক্যাঙ্কার, ডাচ এল্‌ম ও আপেলের ফায়ার ব্লাইট রোগে এই ব্যবস্থা অনুসরণ করে রোগের প্রকোপ কিছুটা কমানো সম্ভব হয়েছে। আপেলের ক্যাঙ্কার (c. o. *Nectria galligena*) ও পীচ, অ্যাপ্রিকট ইত্যাদির ব্রাউন রট (c. o. *Sclerotinia sclerotiorum*) রোগের বিরুদ্ধেও এই ধরণের ব্যবস্থা অবলম্বন করা

হয়ে থাকে। এছাড়া গমের আলগা ভূষা ও আখের হুইপ স্মাট (ভূষা) রোগের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে রোগগ্রস্ত শিষটি বেরোনর সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়ে সরিয়ে বা নষ্ট করে ফেললে রোগের ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়।

৩। **রোগগ্রস্ত গাছের অপসারণ ও ধ্বংসসাধন :** যে সব রোগে রোগগ্রস্ত গাছ ইনোকুলামের প্রধান উৎস সেখানে ঐ সব গাছ জমি থেকে তুলে সরিয়ে ফেললে রোগের আক্রমণ ও প্রসার কম হবে এটাই স্বাভাবিক। তবে এই ব্যবস্থায় খুব সীমিত ক্ষেত্রেই বিশেষ সাফল্য লাভ করা গেছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ক্যাঙ্কার রোগ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রায় ৩০ লক্ষ রোগগ্রস্ত লেবু গাছ তুলে ফেলা হয়েছিল।

অনেক ভাইরাসজনিত রোগের ক্ষেত্রে আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে, যখন রোগ খুব অল্প গাছে দেখা গেছে, গাছ তুলে (rogueing) পুঁতে বা পুড়িয়ে ফেলাই রোগ নিয়ন্ত্রণের সহজতম ও বাস্তবসম্মত পন্থা। ফিউজেরিয়াম, ভার্টিসিলিয়াম ও সিউডোমোনাস উইল্ট রোগগ্রস্ত গাছকে তুলে সরিয়ে ফেললে আপাতদৃষ্টিতে কোন সাফল্যের ইঙ্গিত পাওয়া না গেলেও জমিতে ইনোকুলামের পরিমাণ নিশ্চিতভাবে কিছুটা কমে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে একসময় গমের মরিচা রোগ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশে বিকল্প পোষক গাছ বারবেরীর নির্মূলকরণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন বোঝা গেল যে রোগ উৎপাদক ছত্রাক বারবেরী ছাড়াও অন্যত্র ভালভাবেই টিকে থাকতে পারে তার পর থেকে এর গুরুত্ব অনেকটাই কমে গেছে। রোগ উৎপাদক অনেক সময় বুনো গাছ বা আগাছাকে আক্রমণ করে যেগুলি তখন স্বাভাবিক ফসলের জন্য ইনোকুলামের উৎস হিসাবে কাজ করে। ধানের ঝলসা ও বাদামী দাগ রোগ উৎপাদক ছত্রাক দুটি বিভিন্ন প্রজাতির ঘাসকে আক্রমণ করে বেঁচে থাকতে পারে। ঢেঁড়সের ইয়েলো ভেইন রোগের ভাইরাস বুনো গাছ হিবিস্কাস টেট্রাফাইলাসকে (*Hibiscus tetraphyllus*) আক্রমণ করে বলে জানা গেছে। এই সব রোগের ক্ষেত্রে রোগাক্রান্ত বুনো গাছ বা আগাছার অপসারণ ও ধ্বংসসাধন রোগ নিয়ন্ত্রণের একটি ব্যবস্থা হিসাবে স্বীকৃত।

৪। **জমি জলে ডুবিয়ে রাখা :** কিছু ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়া আছে যারা জমিতে আর্দ্রতার পরিমাণ খুব বেশী হলে বা জল জমলে বেশীদিন টিকে থাকতে পারে না। এই ধরণের রোগ জীবাণুর পরিমাণ কোন জমিতে খুব বেশী হয়ে যাওয়ায় চাষ যদি অর্থকরী না হতে পারে তখন জমি কিছুদিন জলে ডুবিয়ে রেখে (flooding) দিলে সেখানে ইনোকুলামের পরিমাণ খুব কমে যায়। এর ফলে

পরবর্তী ফসলে রোগের প্রকোপ বেশ কম হবার সম্ভাবনা থাকে। হণ্ডুরাসে কলার পানামা উইল্ট রোগে আক্রান্ত জমি ০.৬—১.৫ মি জলের তলায় ৪—৬ মাস রেখে দিয়ে জমিতে ইনোকুলামের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব হয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সেলেরির পিঙ্ক রট (c.o. *Sclerotinia sclerotiorum)*, জাভাতে তামাকের ব্ল্যাক শ্যাঙ্ক (c.o. *Phytophthora nicotianae var. parasitica)* ও মিশরে তুলার পাতায় কোনাচে দাগ (c.o. *Xanthomonas malvacearum)* রোগে জমি জলে ডুবিয়ে রেখে সাফল্যের সঙ্গে রোগ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে।

৫। জমি রোগজীবাণু মুক্তকরণ: চাষের জমি হল অধিকাংশ রোগ উৎপাদকের শেষ আশ্রয়স্থল। সেখান থেকেই তারা আবার নূতন ফসলে আক্রমণের সূচনা করে। অনেক সময় জমিতে পিথিয়াম, ফিউজেরিয়াম, রাই-জোকটোনিয়া, স্ক্লেরোশিয়াম ইত্যাদি রোগজীবাণুর পরিমাণ এত বেড়ে যায় যে অনন্যোপায় হয়ে জমি জীবাণুমুক্ত করার বা নির্বীজকরণের (sterilization) কথা ভাবতে হয়। তবে এই ব্যবস্থা বড় জমিতে নেওয়া কঠিন, কারণ এটি শুধু ব্যয়সাধ্যই নয় শ্রমসাধ্যও বটে। উত্তাপ বা রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে সাধারণতঃ জমি জীবাণুমুক্ত করা হয়।

উত্তাপ প্রয়োগ করে জমি জীবাণুমুক্ত করার প্রচলন বহুকাল থেকে। উষ্ণমণ্ডলে জমি চাষ করে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপে উন্মুক্ত অবস্থায় রেখে দিলে জমি আংশিকভাবে জীবাণুমুক্ত হয়। জমির উপরে শুকনো খড় বা আবর্জনা জড় করে পোড়ালেও একই ফল পাওয়া যায়। অনেক ধনী দেশে মাটির মধ্যে রাখা ছিদ্রযুক্ত নল (pipe) দিয়ে বাষ্প প্রয়োগ করে জমি জীবাণুমুক্ত করা হয়। প্রায় ৯৭° সেঃ তাপমাত্রা জমিতে এক ঘণ্টা বজায় রাখলে অধিকাংশ রোগজীবাণু ও নিমাটোড মরে যায়। বীজতলার জমি এইভাবে জীবাণুমুক্ত করে নেওয়া যায় তবে বড় জমিতে এই ব্যবস্থা নিতে গেলে প্রচুর খরচ হবে। উন্নত দেশগুলিতে বৈদ্যুতিক উপায়ে উত্তাপের সৃষ্টি করে জমি রোগজীবাণুমুক্ত করা হয়।

রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে জমি জীবাণুমুক্ত করার পদ্ধতি কঠিন নয় যদি জমিটি অনাবাদী অবস্থায় থাকে এবং ব্যবহৃত রাসায়নিক যৌগটি উদ্বায়ী প্রকৃতির হয়। যেহেতু এই যৌগগুলি গাছের ক্ষতি করে সেজন্য প্রয়োগের পরে জমি কিছুদিন ফেলে রেখে তবে বীজ বা চারা লাগাতে হয়। একই উদ্দেশ্যে বীজতলার জমি ফাঙ্গিসাইড জলে গুলে ভিজিয়ে দেওয়া হয়। কখনও

বা ফাঙ্গিসাইড গোলা জল দিয়ে গাছের গোড়া ভিজিয়ে দেওয়া হয়। কদাচিৎ জমি তৈরীর সময় গুড়া ফাঙ্গিসাইড মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবার নজীরও আছে। পরবর্তী পর্যায়ে এই প্রসঙ্গে কিছুটা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হবে।

(ঘ) অন্য জীবাণুর মাধ্যমে রোগ নিয়ন্ত্রণ (Biological control)

শস্যের ক্ষতি করে এমন কিছু কীটশত্রুর দমনে অন্য কীট বা জীবাণু ব্যবহার করে সুফল পাওয়া গেছে। তবে গাছের রোগের ক্ষেত্রে এইভাবে রোগ নিয়ন্ত্রণের সফল নজীর খুব বেশী নেই। জমিতে রোগ উৎপাদনে সক্ষম ছত্রাক, ব্যাকটিরিয়া ও নিমাটোড় ছাড়াও ঐরকম অন্য অনেক জীবাণু থাকে যারা রোগ উৎপাদকের ক্ষতি করতে, তাকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলতে, এমনকি পুরোপুরি নষ্টও করে ফেলতে পারে। মূলতঃ এই ধরণের বিরোধিতাকরী বা শত্রুভাবাপন্ন *(antagonistic)* জীবাণুর সংখ্যা পরিবেশে বাড়িয়ে রোগজীবাণু দমনের মাধ্যমে রোগ নিয়ন্ত্রণের (biological control) চেষ্টা করা হয়েছে। স্যানফোর্ড (G.B. Sanford, 1926) প্রথম দেখান যে জমিতে সবুজ সার (green manure) প্রয়োগ করে আলুর স্ক্যাব রোগের প্রকোপ বেশ কমানো যায়। তাঁর মতে সবুজ সার প্রয়োগের ফলে জমিতে অনেক জীবাণুর বংশবৃদ্ধি ঘটে ও কর্মতৎপরতা বাড়ে। তখন তাদের প্রভাবে স্ক্যাব রোগ উৎপাদক স্ট্রেপ্টোমাইসেস স্ক্যাবিজ দুর্বল বা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে ও তার আক্রমণ ব্যর্থ হয়। পরবর্তীকালে ট্রাই-কোডার্মা ভিরিডি *(Trichoderma viride)* নামক একটি ছত্রাক, যেটি অন্য ছত্রাককে নষ্ট করে ফেলতে পারে ও অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় যৌগ উৎপাদনে সক্ষম, এবং আরো কিছু নানা ধরণের বিশেষ করে অ্যাকটিনোমাইসিটিস শ্রেণীর জীবাণু নিয়ে এই প্রসঙ্গে অনেক গবেষণা হয়েছে। এইসব গবেষণার ফলে অন্য জীবাণুর মাধ্যমে রোগ নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। কোন রোগ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশে রোগ উৎপাদকের বিরোধী কোন জীবাণু জমিতে বাইরে থেকে প্রয়োগ করে দেখা গেছে বিশেষ কোন লাভ হয় না। বাইরে থেকে ঢুকিয়ে দেওয়া জীবাণু অধিকাংশ ক্ষেত্রে জমির স্বাভাবিক বাসিন্দা জীবাণুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে না পেরে অল্পদিনের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু জমিতে যদি সবুজ সার, খড় বা গাছের শুকনো অংশ, খোল (oil cake) বা কাঠের গুঁড়া মাটির সঙ্গে ভাল ভাবে মিশিয়ে দেওয়া যায় তাহলে ঐগুলি জমিতে থাকা বিভিন্ন জীবাণুর ক্রিয়ার ফলে পচে নষ্ট হয়ে গেলে তার থেকে যে অনেক রকম খাদ্যবস্তু বেরিয়ে আসে

সেগুলি জমির আভ্যন্তরীণ পরিবেশকে বদলে দেয়। তখন ঐসব খাদ্যবস্তুর প্রভাবে জমির স্বাভাবিক বাসিন্দাদের মধ্যে কিছু জীবাণু, যেমন ট্রাইকোডারমা ভিরিডি, ট্রাইকোডারমা লিগনোরাম (*T. lignorum*), স্ট্রেপ্টোমাইসেস, পেনিসিলিয়াম, ব্যাসিলাস সাবটাইলিস (*B. subtilis*), ব্যাসিলাস মাইকয়ডেস (*B. mycoides*) ও আরও অনেকে দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে বেশ সক্রিয় হয়ে ওঠে। রোগ উৎপাদক জীবাণু এদের পরজীবিতার ফলে, এদের দেহনিঃসৃত অ্যান্টিবায়োটিকের প্রভাবে বা এদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যর্থ হয়ে ক্রমশঃ দুর্বল হতে হতে জমি থেকে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। তুলার ও গমের শিকড় পচা, তুলার ও অড়হরের ফিউজেরিয়াম উইল্ট, তুলার ভার্টিসিলিয়াম উইল্ট, আলু, বীন ও লেটুসের রাইজোকটোনিয়াজনিত রোগ, ঢেঁড়স, টম্যাটো ইত্যাদির মেলয়ডোগাইনজনিত রুট নট প্রভৃতি বিভিন্ন রোগের প্রকোপ এই ধরণের ব্যবস্থায় কিছুটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা সম্ভব হয়েছে। নিমের খোল ও কাঠের গুঁড়া জমিতে প্রয়োগ করে কিছু নিমাটোডজনিত রোগে ভাল ফল পাওয়া গেছে।

কোথাও কোথাও বীজে বা ছোট চারায় রোগ উৎপাদকের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন জীবাণু প্রয়োগ করে সফল রোগ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে। জমিতে লাগানোর আগে বীজে বা ছোট চারার শিকড়ে অ্যাগ্রোব্যাকটিরিয়াম রেডিওব্যাকটার (*A. radiobacter*) প্রয়োগ করে বিভিন্ন ফল গাছের ক্রাউন গল রোগ নিয়ন্ত্রণ করা গেছে। দেখা গেছে যে পাইন গাছের কাটা জায়গায় পেনিওফোরা জাইগ্যানটিয়ার (*Peniophora gigantea*) স্পোর প্রয়োগ করলে সেখানে পরে ফোমিস অ্যানোসাসের আক্রমণ সফল হয় না।

গবেষণামূলক তথ্য থেকে দেখা যায় যে অনেক সময় পোষক গাছে প্রথমে রোগ উৎপাদকের কম উগ্রতাসম্পন্ন বা উগ্রতাবিহীন জাতি প্রয়োগ করলে পরে তার অতি উগ্রতাসম্পন্ন জাতির আক্রমণ আংশিকভাবে, কখনও বা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। কোথাও কোথাও রোগ উৎপাদকের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন এমন বা একই গণের অন্য প্রজাতি প্রথমে ব্যবহার করে এমনকি ছত্রাকের স্পোর, হাইফা বা ব্যাকটিরিয়ার নির্যাস প্রথমে প্রয়োগ করেও রোগ নিয়ন্ত্রণে পরীক্ষামূলকভাবে কিছুটা সাফল্য লাভ করা গেছে। পঞ্চদশ অধ্যায়ে এই সম্পর্কে কিছুটা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

রোগ নিয়ন্ত্রণের আইনগত ব্যবস্থা (Regulatory measures)

রোগ নিয়ন্ত্রণের একটি অন্যতম পদ্ধতি হল রোগ উৎপাদককে পোষক

গাছের কাছে আসতে না দেওয়া (exclusion)। আবহাওয়া ও অন্য নানাবিধ কারণের জন্য সব রোগ সব দেশে দেখা যায় না কিন্তু কোনভাবে রোগজীবাণু ঐরকম কোন দেশে এসে পড়লে কয়েক বছরের মধ্যে ঐ রোগ বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এই ভাবেই ইউরোপে আঙুরের ডাউনি মিলডিউ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে চেস্টনাট ব্লাইট, লেবুর ক্যাঙ্কার ও ডাচ এল্‌ম প্রভৃতি রোগের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল ও পরে এপিডেমিক অবস্থায় রোগ দেখা দেয়। একবার কোন রোগজীবাণু একটি দেশে ঢুকে পড়লে পরে তার বিস্তার রোধ করা প্রায় অসম্ভব বলা যেতে পারে। সেজন্য রোগজীবাণু যাতে অন্যদেশ থেকে বীজ ও চারার মাধ্যমে দেশে প্রবেশ না করতে পারে তার জন্য অধিকাংশ দেশই আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। শুধু বীজ, বীজের মত ব্যবহৃত অন্যান্য অংশ বা চারাই নয়, আমদানী করা ফল, সবজী, খাদ্যশস্য, তন্তু ইত্যাদির মাধ্যমেও রোগজীবাণু এক দেশ থেকে অন্যদেশে প্রবেশ করে থাকে। পোষক গাছের সঙ্গে জীবাণুর সঙ্গরোধের জন্য যে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাকে ক্যোয়ার‍্যানটাইন সংক্রান্ত আইন (quarantine regulations) বলা হয়। দেশে হয় না এরকম কোন মারাত্মক রোগের জীবাণু যাতে অন্য দেশ থেকে এসে না পড়ে সেটাই এই ধরণের আইনের মূল লক্ষ্য। এর ফলে কোন কোন শস্য-বীজের বিদেশ থেকে দেশে প্রবেশ যেমন নিয়ন্ত্রিত হতে পারে—এমন্‌কি বন্ধও থাকতে পারে, তেমনি দেশের মধ্যে রোগের প্রকোপ খুব বেশী এমন অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ঐ সবের গতিবিধিও একইভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে প্রথম রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রণয়ন হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল গমের মরিচা রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য বিকল্প পোষক গাছ বারবেরীকে নষ্ট করে ফেলা। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ১৯১২ ও ভারতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে এই ধরণের আইন প্রথম প্রণয়ণ করা হয়। ভারতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে Destructive Insects and Pest Act পাশ হবার পর বহুবার সংশোধিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও এই আইনকে এখনও ত্রুটিমুক্ত ও প্রয়োজনমাফিক বলা যায় না। এই আইন পাশ হবার পরেও বিদেশ থেকে ভারতে আলুর ওয়ার্ট ও গোল্ডেন নিমাটোড (c. o. *Heterodera rostochiensis*), কলার বান্চি টপ (bunchy top), ধানের ঝলসা ও ব্যাকটিরিয়াজনিত পাতা ধসা, গমের ফ্ল্যাগ স্মাট (c. o. *Urocystis tritici)* ইত্যাদি অনেক রোগ এসেছে এবং বর্তমানে দেশের কোন কোন অঞ্চলে গুরুতর আকার ধারণ করে প্রচুর ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আলুর ওয়ার্ট রোগ দার্জিলিঙ ও গোল্ডেন নিমাটোড

রোগ নীলগিরি উপত্যকা অঞ্চলে এমন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে (endemic) যে ঐ দুটি অঞ্চল থেকে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে আইন করে আলুর রপ্তানী বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। একে বলে আভ্যন্তরীণ সঙ্গরোধ ব্যবস্থা (internal quarantine)। ভারতে কলার দুটি ভাইরাসজনিত রোগের ক্ষেত্রেও এই ধরণের আইনগত নিষেধাজ্ঞা (embargo) রয়েছে। বাঞ্চি টপ রোগ কেরল, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে এবং মোজেইক রোগ গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ঐ সব রাজ্য থেকে অন্যান্য রাজ্যে ফল ছাড়া কলা গাছ বা তার কোন অংশ চালান দেওয়া বা নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ।

ক্যোয়ার‍্যানটাইন ব্যবস্থা সফল হবে যদি জলপথে, বিমানপথে ও স্থলপথে দেশের প্রবেশদ্বারগুলিতে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ যথেষ্টসংখ্যক ইনস্পেক্টর থাকেন যাঁরা বিদেশ থেকে আসা বীজ ও অন্যান্য শস্যজাত দ্রব্যাদি পরীক্ষা করে দেখবেন সেগুলি নীরোগ কিনা। তবে এই ব্যবস্থা যে পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য তাও বলা যায় না। বাস্তবক্ষেত্রে বীজ ইত্যাদিকে অনেক সময় যথাযথভাবে পরীক্ষা করে দেখাও সম্ভব হয় না। বীজ যে জীবাণু বহন করছে সব সময় সহজে বোঝা যায় না। অনেক দেশেই রোগাক্রান্ত বীজ বা রোপন-যোগ্য গাছের অন্যান্য অংশ বিক্রয়, বিশেষ করে বিদেশে রপ্তানী সীমিত রাখার জন্য আইনগত ব্যবস্থা আছে। ফসল জমিতে থাকার সময় থেকেই তার উপর নজর রাখা হয় এবং যেখানে রোগের আক্রমণ হয়নি বা হলেও নির্দ্ধারিত নিম্নতম মাত্রার নীচে থাকে কেবলমাত্র সেখান থেকেই চাষের প্রয়োজনে বীজ ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়। সার্টিফিকেট প্রাপ্ত এই সব বীজই (certified seeds and planting materials) অন্যত্র রপ্তানী করা হয়। বীজ সেই সব দেশ থেকেই আমদানী করা উচিত যেখানে বিশেষ বিশেষ রোগের প্রকোপ খুব কম এবং ফসলের স্বাস্থ্যনীতি সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলি (phytosanitary practices) অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য।

তা সত্ত্বেও বীজ জীবাণুমুক্ত কি না সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার জন্য দেশের প্রবেশপথে আবার একবার পরীক্ষার প্রয়োজন আছে। আমদানী করা বীজ ইত্যাদির পরীক্ষার জন্য যথোপযুক্ত ক্যোয়ার‍্যানটাইন ব্যবস্থা চালু রাখা বিশেষ প্রয়োজন। তবে ক্যোয়ার‍্যানটাইন ব্যবস্থার প্রয়োগ পদ্ধতি সবদেশে এক মানের নয়। এইভাবে যে একদেশ থেকে অন্যদেশে রোগের প্রসার একেবারে বন্ধ করা গেছে তা বলা যায় না। তবে এই ব্যবস্থার ফলে যে অনেক মারাত্মক রোগের পৃথিবী জুড়ে ব্যাপক প্রসার বন্ধ হয়েছে একথা মানতেই হয়। এই

ধরণের ব্যবস্থার ফলেই ভারতে ভুট্টার উইল্ট (c.o. *Xanthomonas stewartii)* ও তামাকের 'ব্লু মোল্ড' (c. o. *Peronospora tabacina)* এর মত মারাত্মক রোগের অনুপ্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি।

ভারতে কেন্দ্রীয় সংস্থা Directorate of Plant Quarantine ক্যোয়ার‍্যানটাইন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন। অধিকাংশ রাজ্যেরও এই ধরণের নিয়ন্ত্রণমূলক আইন রয়েছে। জলপথে ও আকাশপথে ভারতের প্রবেশদ্বারে যথাক্রমে আটটি ও ছয়টি ক্যোয়ার‍্যানটাইন স্টেশন আছে। এর মধ্যে কলিকাতা বন্দরে একটি ও দমদম বিমান বন্দরে একটি রয়েছে। এ ছাড়া স্থলপথে প্রবেশদ্বারে পাকিস্তান সীমান্তে হুসেনিওয়ালা, নেপাল সীমান্তে দার্জিলিঙ জেলার সুকিয়াপোখরী ও বাঙলাদেশ সীমান্তে চব্বিশ পরগণার বনগাঁ ও নদীয়ার গেদেতেও এই ধরণের স্টেশন আছে।

রোগজীবাণু যেহেতু ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক সীমারেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ নয় সেজন্য রোগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া একান্ত প্রয়োজন। বর্তমান কালে পৃথিবী জুড়ে যাতায়াতের ও মাল চলাচলের সুবিধা ও আন্তঃরাষ্ট্র ব্যবসা বাণিজ্যের বিপুল প্রসারের পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরণের পারস্পরিক বোঝাপড়ার গুরুত্ব আরও বেড়েছে। জাতিপুঞ্জের (United Nations Organization) খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (Food & Agriculture Organization) উদ্যোগী হয়ে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে একটি International Plant Protection Convention এর আয়োজন করেন এবং এখানে কতগুলি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যাতে পঞ্চাশটি দেশের প্রতিনিধিরা স্বাক্ষর করেন। অন্যান্য অনেক সিদ্ধান্তের সঙ্গে এতে ঠিক হয় যে —

(১) প্রতিটি দেশে গাছের রোগ, পোকা ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠিত হবে।

(২) আন্তর্জাতিক স্তরে খাদ্য ও কৃষি সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ রোগ সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট দেশগুলি থেকে সংগ্রহ করে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে।

(৩) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রোগের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক স্তরে বোঝাপড়ার মাধ্যমে রোগ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে গবেষণা ও অন্যান্য ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হবে।

এছাড়া বীজ ও গাছের রোপনযোগ্য অন্যান্য অংশকে সুস্বাস্থ্যের অভিজ্ঞানপত্র (phytosanitary certificate) দেবার আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত পদ্ধতিও স্থিরীকৃত হয়।

রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োগে রোগ নিয়ন্ত্রণ (Chemical control)

গাছের রোগের ক্ষেত্রে সবথেকে বেশী ব্যবহৃত পদ্ধতি হল রোগ উৎপাদকের পক্ষে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োগে রোগ নিয়ন্ত্রণ। কি ধরণের রোগ উৎপাদকের পক্ষে ক্ষতিকর সেই হিসাবে এদের ছত্রাকনাশক / ছত্রাকবারক বা 'ফাঞ্জিসাইড' (fungicide), ব্যাকটিরিয়ানাশক বা 'ব্যাকটিরিসাইড' (bactericide) ও নিমাটোডনাশক বা 'নিমাটিসাইড' (nematicide) বলা হয়। সপুষ্পক গাছের পক্ষে যা ক্ষতিকর তাকে বলা হয় 'হার্বিসাইড' (herbicide)। কীটনাশক ঔষধের (insecticide) সঙ্গে একত্রে এদের সকলকে 'পেস্টিসাইড' (pesticide) বলা হয়ে থাকে। আর 'অ্যান্টিবায়োটিক' (antibiotic) বলতে বোঝায় সেইসব রাসায়নিক যৌগকে যা কোন জীবাণুর দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং অন্য অনেক জীবাণুর পক্ষে ক্ষতিকর। এখানে আলোচনা মূলতঃ ফাঞ্জিসাইডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হচ্ছে।

বেশীর ভাগ ফাঞ্জিসাইডকে গাছের পাতায় বা মাটির উপরের অংশে প্রয়োগ করা হয়। কিছু অবশ্য জমিশোধন, বীজশোধন বা ক্ষতচিকিৎসার জন্যও ব্যবহার করা হয়। কখনও বা গাছ থেকে তোলার পর ফলকে ফাঞ্জিসাইডের দ্রবণে ডোবানো হয়। এমন কিছু ফাঞ্জিসাইড আছে যেগুলি একাধিক পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। ক্রিয়ার দিক থেকে দেখলে ফাঞ্জিসাইডগুলিকে মূলতঃ তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীতে রয়েছে সেইসব ফাঞ্জিসাইড যেগুলি রোগ প্রতিরোধের (prophylaxis) উদ্দেশ্যে গাছে রোগের আক্রমণের আগেই বা শুরুতে প্রয়োগ করা হয়। এগুলি গাছের ত্বকের উপর কোন ছত্রাক থাকলে বা পরবর্তী পর্যায়ে ছত্রাকের স্পোর ত্বকের উপর এসে পড়লে তাকে নষ্ট করে দেয়। এদের প্রতিরক্ষামূলক ফাঞ্জিসাইড (protectant fungicide) বলা হয়। যেহেতু এগুলির সংস্পর্শে এলে ছত্রাক নষ্ট হয়ে যায় সেজন্য এদের contact action fungicideও বলা হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীতে রয়েছে সেইসব যৌগ যেগুলি গাছের দেহে সুপ্ত বা সক্রিয় অবস্থায় থাকা রোগ উৎপাদককে ধ্বংস করে। এদের বলা হয় ধ্বংসকারী / বিতাড়ক বা 'এরাডিক্যান্ট' ফাঞ্জিসাইড (eradicant fungicide)। এ ছাড়াও কিছু যৌগ আছে যেগুলি রোগগ্রস্ত গাছের দেহে ছড়িয়ে পড়া জীবাণুকে ধ্বংস করে রোগ নিরাময় সম্ভব করে তোলে। তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত যারা তাদের বলা হয় রোগ নিরাময়কারী বা 'থেরাপিউট্যান্ট' ফাঞ্জিসাইড (therapeutant fungicide)। সাধারণভাবে এই ধরণের রাসায়নিক পদার্থকে 'কেমোথেরাপিউট্যান্ট' (chemotherapeutant) বলা হয়। অধিকাংশ

ফাঙ্গিসাইড স্থানীয়ভাবে সক্রিয় (local action fungicide)। ইদানীংকালে এমন কিছু ফাঙ্গিসাইডের সন্ধান পাওয়া গেছে যেগুলি গাছের দেহে প্রবেশ করে সেখানে ছড়িয়ে পড়ে এবং আক্রান্ত অংশে দেহের ভিতরে থাকা রোগজীবাণুকে বা পরবর্তী কিছুদিনের মধ্যে দেহের ভিতরে প্রবেশ করেছে এমন রোগজীবাণুকে বিনষ্ট করে ফেলতে পারে। এরা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। এদের বলা হয় 'সিস্টেমিক' ফাঙ্গিসাইড (systemic fungicide)।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত অধিকাংশ ফাঙ্গিসাইডই ছিল অজৈব প্রকৃতির। পরবর্তীকালে কিছু জৈব যৌগের মধ্যে ছত্রাকনাশের ক্ষমতা দেখতে পাওয়া যায়। পরে ব্যাপক গবেষণার ফলে অনেক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জৈব প্রকৃতির ফাঙ্গিসাইড আবিষ্কৃত হওয়ায় গাছের রোগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিপুল সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। রোগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সব ফাঙ্গিসাইড যে সমান উপযোগী তা নয়। একটি ভাল ফাঙ্গিসাইডের বিশেষ কিছু গুণ থাকা প্রয়োজন যেমন (১) অল্প মাত্রায় ব্যবহৃত হলে ছত্রাকনাশের ক্ষমতা থাকতে হবে, (২) গাছ, প্রাণী বা মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর হবে না, (৩) স্থিতিশীল হবে এবং (৪) সহজে প্রয়োগ করা যাবে অনেক ফাঙ্গিসাইডই ছত্রাক ছাড়া গাছ বা প্রাণীরও ক্ষতি করতে পারে। সেক্ষেত্রে এটিকে এমন মাত্রায় ব্যবহার করতে হয় যা ছত্রাককে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করে ফেলতে পারে অথচ গাছের কোন ক্ষতি করে না। গাছে প্রয়োগের পর ত্বকের উপর জমে থাকা ফাঙ্গিসাইড আবহাওয়ার প্রভাবে শুধু যে তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে তাই নয় এটি অপসৃত হয়ে যেতেও পারে। অনেকসময় অন্যান্য যৌগ মিশিয়ে ফাঙ্গিসাইডের গাছের ত্বকে ভাল ভাবে ছড়িয়ে পড়ার ও সেখানে লেগে থাকার ক্ষমতার ও স্থায়িত্বের উন্নতিসাধন সম্ভব হয়। এদের যথাক্রমে 'স্প্রেডার' (spreader) ও 'স্টিকার' (sticker) বলা হয়।

বাজারে ফাঙ্গিসাইড বিভিন্ন অবস্থায় পাওয়া যায়। অধিকাংশ ফাঙ্গিসাইড জলে ভেজে এমন গুঁড়া (wettable powder) অবস্থায় পাওয়া যায়। এগুলি জলে দ্রব হয় না কিন্তু কণিকাগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র আয়তনের হওয়ায় জলের মধ্যে বেশ ভালভাবে ছড়িয়ে থাকে। তাছাড়া এই উদ্দেশ্যে বেনটোনাইট (bentonite), ক্যাওলিনাইট (kaolinite) ইত্যাদি ফাঙ্গিসাইডের সঙ্গে মেশানো হয়। এই ধরণের ফাঙ্গিসাইড প্রধানতঃ গাছে স্প্রে করার জন্যই ব্যবহার হয়। কিছু ফাঙ্গিসাইড শুকনো গুঁড়া (dust) হিসেবে গাছে ছিটিয়ে ব্যবহার করা হয়। এতে ফাঙ্গসাইডের পরিমাণ থাকে অনধিক দশ শতাংশ আর বাকীটা থাকে

বিভিন্ন ধরণের যৌগ যাদের কাজ হল ফাঙ্গিসাইডের কণিকাগুলিকে (অনধিক 30 µm) ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করা। অল্প কিছু ফাঙ্গিসাইড দানাদার অবস্থায় (granular form) পাওয়া যায়। এগুলিকে সাধারণতঃ দুই সারি গাছের মাঝখানের জমিতে মিশিয়ে দিয়ে সেচ দিতে হয়। এ ছাড়াও কিছু ফাঙ্গিসাইড জলে দ্রব অবস্থায় (solution) বা অন্য কোন দ্রাবকের (solvent) সঙ্গে জলে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। কদাচিৎ ফাঙ্গিসাইড কোন দ্রাবকের ঘন দ্রবণে এমন অবস্থায় থাকে (emulsifiable concentrate) যা জলের সঙ্গে মিশলে দুগ্ধবৎ নির্যাসে পরিণত হয়।

ফাঙ্গিসাইডের প্রয়োগ পদ্ধতি

বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুসারে প্রাথমিক ইনোকুলামের উৎস কি, রোগ কিভাবে ছড়ায়, গাছের কোন অংশ আক্রান্ত হয় ইত্যাদির উপর নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে ফাঙ্গিসাইড প্রয়োগ করা হয়।

১। গাছের গায়ে ছিটিয়ে প্রয়োগ (Spraying and dusting)

গাছের রোগ নিয়ন্ত্রণে সবথেকে বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি হল গাছের পাতায় জলের সঙ্গে মিশ্রিত ফাঙ্গিসাইড তরল অবস্থায় যন্ত্রের সাহায্যে স্প্রে করে ছিটিয়ে দেওয়া (spraying)। সাধারণতঃ জলে ভেজে এমন গুঁড়া ফাঙ্গিসাইড স্প্রে'র জন্য ব্যবহার করা হয়। তরল অবস্থায় যেসব ফাঙ্গিসাইড পাওয়া যায় সেগুলিও জলের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় এই ভাবে ব্যবহার করা যায়। স্প্রে করার ফলে পাতার উপর ফাঙ্গিসাইডের একটা আস্তরণ জমে যার উপর কোন ছত্রাকের স্পোর এসে পড়লে অঙ্কুরিত হবার আগে বা অব্যবহিত পরে সেটি নষ্ট হয়ে যায়। অধিকাংশ ফাঙ্গিসাইড ত্বকের উপরে কাজ করলেও কিছু ফিনাইল-পারদঘটিত যৌগ গাছের মধ্যে অল্পমাত্রায় প্রবেশ করে এবং সেখানে গাছ আগে থেকেই আক্রান্ত হয়ে থাকলে সেই রোগজীবাণুকে নষ্ট করে বা নিষ্ক্রিয় করে ফেলতে পারে। ইদানীংকালে সিস্টেমিক ফাঙ্গিসাইড স্প্রে'র জন্য বিস্তৃতভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে খুব উচ্চ মূল্যের হওয়ায় যেখানে লাভের সম্ভাবনা যথেষ্ট একমাত্র সেখানেই এদের ব্যবহার সম্ভব। এগুলি গাছের দেহের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আক্রান্ত অংশে ছত্রাককে ধ্বংস করে গাছকে রোগমুক্ত করে অর্থাৎ রোগ নিরাময় করে। জলের দ্রবণে ব্যবহৃত ফাঙ্গিসাইড সাধারণতঃ পাতার গায়ে ধরতে চায় না, প্রথমে ছোট ছোট ফোঁটায় ছড়িয়ে থাকে এবং পরে পাতার নড়াচড়ার ফলে ছোট ফোঁটাগুলি

একত্র হয়ে বড় ফোঁটায় পরিণত হলে পাতা থেকে ঝরে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এই অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে ফাঙ্গিসাইডের দ্রবণের সঙ্গে এমন এমন রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে দেওয়া হয় যা পাতার গা ভিজিয়ে দিতে (wetting agent), ফাঙ্গিসাইডের কণিকাগুলিকে জলের মাধ্যমে ছড়িয়ে থাকতে (spreader) বা গাছের গায়ে লেগে থাকতে (sticker) সাহায্য করে। এইগুলির সহযোগে ব্যবহৃত হলে ফাঙ্গিসাইডের কার্যকারিতা অনেক বেড়ে যায় এবং কিছুদিন পর্যন্ত গাছের ত্বকের উপর একটি জীবাণু প্রতিরোধক স্তর সক্রিয় অবস্থায় থাকে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে স্প্রে'র বদলে ফাঙ্গিসাইড গুঁড়া অবস্থায় পাউডারের মত ছড়িয়ে দেওয়া হয় যাকে বলে 'ডাস্টিং' (dusting)। গুঁড়া ছিটিয়ে সাধারণতঃ স্প্রে'র মতন ভাল ফল পাওয়া যায় না, তবে সীমিতভাবে জমিতে, বাগানে বা যেখানে কাঁচের ঘরে (glasshouse) চাষ করা হয় সেখানে এই প্রয়োগ পদ্ধতি কিছুটা কার্যকরী হতে পারে। যেখানে হাওয়া নেই আর শিশিরে, কুয়াশার ফলে বা বৃষ্টিতে পাতার গা ভিজে আছে সেখানে এইভাবে ফাঙ্গিসাইড প্রয়োগ করা যায়। এই পদ্ধতিতে ব্যবহারের জন্য অন্য গুঁড়ার সঙ্গে ফাঙ্গিসাইড মিশিয়ে নেওয়া হয়। তারপর সেই মিশ্রণ হস্ত বা শক্তিচালিত 'ডাস্টার' (duster) যন্ত্রের সাহায্যে গাছের উপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়। স্প্রে'র তুলনায় ডাস্টিং এর সুবিধা হল যে এতে জল লাগে না, তরলের তুলনায় গুঁড়া নিয়ে কাজ করা সুবিধাজনক এবং এর যন্ত্রপাতি অপেক্ষাকৃত হালকা আর তার ব্যবহারও অনেক সহজ। স্প্রে বা ডাস্টিং উভয় ক্ষেত্রেই হস্ত চালিত বা শক্তি চালিত যন্ত্রের (sprayer, duster) সাহায্যে ফাঙ্গিসাইড গাছে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। বড় জমিতে এজন্য শক্তিচালিত যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। যেখানে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ফাঙ্গিসাইড প্রয়োগ করতে হয় সেখানে অনেক দেশে এই উদ্দেশ্যে ছোট এরোপ্লেনও ব্যবহার করা হয়ে থাকে (aerial spraying)।

ফাঙ্গিসাইড প্রয়োজনমত জলে গুলে স্প্রে করা হয়। কদাচিৎ খনিজ তৈলের মাধ্যমেও ব্যবহার করা হয়। স্প্রে করার সময় লক্ষ্য থাকে যেন ফাঙ্গিসাইড গাছের সমস্ত অংশের উপর সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে। যখন বেশী পরিমাণে ফাঙ্গিসাইড গোলা জল ব্যবহার করা হয় তখন এই উদ্দেশ্য অবশ্যই সিদ্ধ হয়। তবে এইভাবে স্প্রে করলে মোট পরিমাণের কম করেও ৫০ শতাংশ, কখনও বা ৯০ শতাংশ পর্যন্ত নীচে ঝরে পড়ে। যখন স্প্রে'র জন্য কম পরিমাণ জল ব্যবহার করা হয়, এমনভাবে স্প্রে করতে হয় যাতে ফাঙ্গিসাইড খুব ছোট ছোট জলের ফোঁটার মাধ্যমে গাছের উপরে গিয়ে পড়ে। এর ফলে ঝরে পড়ে নষ্ট

হবার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। কদাচিৎ আরও অল্প মাত্রায় স্প্রে করার প্রয়োজন হতে পারে। তখন মাধ্যম হিসাবে জলের বদলে খনিজ তৈলের ব্যবহার হয়। এই ব্যবস্থায় প্রায় কুয়াশার মত অতি সূক্ষ্ম তৈলকণার মাধ্যমে ফাঞ্জিসাইড গাছের উপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ক্ষেতের ফসলের তুলনায় বড় গাছে স্প্রে করতে হলে জলের পরিমাণ বেশী লাগে। নীচে বিভিন্ন অবস্থায় প্রতি হেক্টার জমিতে স্প্রে করার জন্য কি পরিমাণ (লিটার) জল লাগে তার একটা আনুমানিক হিসাব দেওয়া হল।

	ক্ষেতের ফসল	বড় গাছ
বেশী পরিমাণে স্প্রে (High volume spray)	৭০০—৭৫০	১২০০ বা তার বেশী
অল্প পরিমাণে স্প্রে (Low volume spray)	৬০—২৫০	২৫০-৬০০
অতি অল্প পরিমাণে স্প্রে (Ultra low volume spray)	৬০ এর কম	২৫০ এর কম

বৃষ্টি বা শিশিরের জলের সঙ্গে ধুয়ে ফাঞ্জিসাইড কিছুটা অপসারিত হয়ে নষ্ট হয়ে যায় ঠিকই তবে এর ফলে কিছুটা নূতন জায়গায়, বিশেষ করে স্প্রে করার পর যেসব নূতন কচি পাতা বেরিয়েছে সেগুলিতে, ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাও থাকে। গাছের দ্রুত বর্দ্ধনশীল অবস্থায় ঘন ঘন স্প্রে করার প্রয়োজন হতে পারে কারণ এক সপ্তাহের মধ্যেই অনেক নূতন কচি পাতা দেখা যায় যেগুলিতে ফাঞ্জিসাইড পড়েনি এবং যে অংশে রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া যেখানে রোগের পক্ষে অনুকূল সেই অবস্থায় সাধারণ ফাঞ্জিসাইড ৭—১৪ দিন অন্তর স্প্রে করতে হয়। সাধারণতঃ সফল রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য ৩—৪ বার স্প্রে করার প্রয়োজন হয়। বৃষ্টিতে ফাঞ্জিসাইড গাছের ত্বক থেকে ধুয়ে গেলে আরও ঘন ঘন স্প্রে করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। সিস্টেমিক ফাঞ্জিসাইডের ক্ষেত্রে ২১ দিন অন্তর স্প্রে করলেই হয়।

স্প্রে করার জন্য কি ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহার হবে তার নির্বাচন প্রয়োজন-মাফিক হতে হবে অর্থাৎ কি পরিমাণ তরল পদার্থ স্প্রে করা হবে, কতদূর থেকে স্প্রে করা হবে এবং চাষের জায়গাটি বা ফলের বাগিচার ভূসংস্থানের উপর নির্ভর করে সেটি স্থির করতে হবে। জলের সরবরাহ সীমিত হলে বাধ্য হয়ে অল্প বা অতি অল্প মাত্রায় স্প্রের ব্যবস্থা করতে হয়। জলের (বা অন্য তরল মাধ্যমের) ফোঁটার আয়তন ও গতিবেগ (ভর × বেগ), যার উপর গাছের ত্বকে স্থাপিত ফাঞ্জিসাইডের পরিমাণ ও আবৃত অংশের পরিধি (coverage) নির্ভর করে, স্প্রে করার যন্ত্রপাতির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। স্প্রে করার প্রক্রিয়াকে দুটি পর্যায়ে ভাগ

করা যায়, যথা জলকে খুব ছোট ছোট ফোঁটায় পরিণত করা (atomization) ও সেগুলিকে গাছের উপরে ছিটিয়ে দেওয়া। স্প্রেয়ারের মুখ-নল বা 'নোজল' (nozzle), ঘূর্ণ্যমান চাকতি ইত্যাদির সহযোগে প্রথম পর্যায় সম্পন্ন হয়। নোজলে একটি ঘূর্ণ্যমান কক্ষ ও একটি ছিদ্র থাকে। ঘূর্ণ্যমান কক্ষে জল গেলে সেখানে প্রবল বেগে ঘুরতে ঘুরতে ঐ ছিদ্র দিয়ে জলকণার আকারে ফোয়ারার মত হয়ে বেরিয়ে যায়। জলকণার আয়তন জলের গতিবেগ ও প্রযুক্ত চাপের উপর নির্ভর করে। স্প্রেয়ারে একটি পাম্প (pump) থাকে যা জলকে নোজলের মধ্যে ঠেলে পাঠায়। ন্যাপস্যাক (knapsac type) জাতীয় স্প্রেয়ারে পাম্পটি হাত দিয়ে চালাতে হয় সেজন্য সীমিতভাবে চাপ সৃষ্টি হতে পারে মাত্র। শক্তিচালিত স্প্রেয়ারে (power sprayer) যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চ চাপের সৃষ্টি করা যায়। এর ফলে জলকে সূক্ষ্ম জলকণায় পরিণত করে অনেকদূর পর্যন্ত ছিটানো সম্ভব হয়। যেখানে অতি অল্প পরিমাণে স্প্রে করার প্রয়োজন সেখানে 'মিষ্ট ব্লোয়ার' (mist blower) ও বিশেষ ধরণের নোজল ব্যবহার করে জলকে কুয়াশার মত অতি সূক্ষ্ম জলকণায় পরিণত করা হয়। গুঁড়া ফাঙ্গিসাইড ছিটানোর জন্য ডাস্টার ব্যবহার করা হয়। এই উদ্দেশ্যে ডাস্টার থেকে উচ্চ চাপে বাতাস ছেড়ে দেওয়া হয় যা ফাঙ্গিসাইডের গুঁড়া বহন করে নিয়ে যায়। ন্যাপস্যাক ডাস্টারে সীমিত চাপের সৃষ্টি হয়, কিন্তু শক্তিচালিত ডাস্টারে অতি উচ্চ চাপের সৃষ্টি হওয়ার ফলে ফাঙ্গিসাইড অনেকদূর পর্যন্ত ছিটিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়।

স্প্রে'র জন্য ব্যবহৃত অধিকাংশ ফাঙ্গিসাইডই অনেক রোগ উৎপাদক ছত্রাককে নষ্ট করতে পারে। অল্প কিছু আছে যেগুলি কেবলমাত্র বিশেষ ছত্রাক বা বিশেষ শ্রেণীভুক্ত ছত্রাকের বিরুদ্ধে সক্রিয়। স্প্রে'র জন্য ব্যবহৃত কিছু ফাঙ্গিসাইড বীজ-শোধনের জন্য এমনকি জমি জীবাণুমুক্ত করার জন্যও অনেক সময় ব্যবহৃত হয়।

২। বীজশোধন (Seed treatment)

অনেক রোগজীবাণু বীজের গায়ে বা ভিতরে থেকে যায়। জমিতে ঐ বীজ বোনা হলে, অঙ্কুরিত হবার আগেই রোগজীবাণু তাকে নষ্ট করে ফেলতে পারে বা অঙ্কুরোদ্গমের পরে ছোট চারাটিকে আক্রমণ করে তাকে রোগগ্রস্ত করে এমনকি মেরে ফেলতেও পারে। গাছের অন্যান্য রোপণযোগ্য অংশের ক্ষেত্রেও এ কথা সমভাবে প্রযোজ্য। তাছাড়া নীরোগ বীজও জমিতে বোনার পরে সেখানকার বিভিন্ন জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে বা অঙ্কুরোদ্গমের পর চারাও আক্রান্ত হতে পারে। ফাঙ্গিসাইড বা অ্যান্টিবায়োটিকের সাহায্যে বীজ

শোধন করে জমিতে বুনলে অঙ্কুরোদ্গম ভাল হয়—নীরোগ চারাও পাওয়া যায়। বীজশোধনের জন্য ফাঙ্গিসাইড এমন মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে যাতে রোগজীবাণু নষ্ট হলেও বীজের অঙ্কুরোদ্গমে কোন ক্ষতি হবে না। তাছাড়া ফাঙ্গিসাইড যাতে বীজ মাটিতে দেবার পর খুব তাড়াতাড়ি অপসৃত হয়ে না যায় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। তাহলে ফাঙ্গিসাইড বীজের চারিধারে মাটিতে ছড়িয়ে যেয়ে সেখানে একটি নিরাপদ জীবাণুমুক্ত অঞ্চলের সৃষ্টি করবে। এর ফলে ছোট চারায় প্রথম কিছুদিনের জন্য অন্ততঃ আক্রমণের সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে। বীজশোধনের এটি একটি বাড়তি সুফল। যেখানে রোগজীবাণু বীজের মধ্যে থাকে সেখানে সাধারণ ফাঙ্গিসাইড ব্যবহার করে কোন লাভ হয় না, সিস্টেমিক ফাঙ্গিসাইড ব্যবহার করতে হয়। সাধারণতঃ শুকনো অবস্থায় বীজের সঙ্গে ফাঙ্গিসাইডের গুঁড়া মিশিয়ে (dry seed dressing) বা ভিজেভাবে অর্থাৎ জলে ফাঙ্গিসাইড তরল বা ঘন করে গুলে তাতে বীজ ডুবিয়ে রেখে (wet seed dressing) শোধন করে নেওয়া হয়। আজকাল বীজশোধন পরিচ্ছন্ন চাষের একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ। এর ফলে বীজ নষ্ট না হবার ও নীরোগ চারার সম্ভাবনা নিঃসন্দেহে বাড়ে।

শুকনোভাবে বীজশোধনে সাধারণতঃ একটি মুখ বন্ধ পাত্রে বীজের সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণ গুঁড়া ফাঙ্গিসাইড নিয়ে খুব ভাল করে ঝাঁকিয়ে মিশিয়ে নিতে হয়। এর জন্য হ্যাণ্ডেল লাগানো ড্রাম পাওয়া যায় যার মধ্যে বীজ ও ফাঙ্গিসাইড একত্রে নিয়ে হ্যাণ্ডেলের সাহায্যে ড্রামটিকে ঘোরালে বীজের সঙ্গে ফাঙ্গিসাইড খুব ভালভাবে মিশে যায়। শুকনোভাবে বীজ শোধন করে নিলে সেই বীজ এক সপ্তাহের আগে লাগানো যায় না। তবে এই বীজ বেশ কিছুদিন রেখেও দেওয়া যায়। এইভাবে বীজশোধনের জন্য প্রতি কিলোতে ২ থেকে ৫ গ্রাম পর্যন্ত ফাঙ্গিসাইড লাগে, সিস্টেমিক ফাঙ্গিসাইড লাগে ১—২ গ্রাম। সিস্টেমিক ফাঙ্গিসাইড ব্যবহারের বাড়তি সুবিধা হল যে এটি ছোট চারার মধ্যে প্রবেশ করে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে যার ফলে চারাটি বেশ কিছুদিন অন্ততঃ সুরক্ষিত অবস্থায় থাকে। যাতে ফাঙ্গিসাইড সহজে বীজের গা থেকে অপসৃত না হয়ে যায় সেজন্য বীজশোধনের সময় বাড়তি এমন কিছু যৌগ, যেমন সেলুলোজ অ্যাসিটেট (cellulose acetate), মেথিল সেলোসোভ (methyl cellosove) বা বেনটোনাইট (bentonite), দেওয়া হয় যা ফাঙ্গিসাইডকে বীজের গায়ে লেগে থাকতে সাহায্য করে। একে বলে 'পেলেটাইজেশন' (pelletization)। এর ফলে ফাঙ্গিসাইডের ক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী হয়।

ভিজেভাবে বীজশোধনে প্রতি লিটার জলে ২—১০ গ্রাম পরিমাণ ফাঙ্গিসাইড গুলে তাতে বীজ ৩০ মিনিট থেকে ২ ঘণ্টা সময় ডুবিয়ে রেখে তারপর তুলে শুকিয়ে নিতে হয়। সিস্টেমিক ফাঙ্গিসাইডের ক্ষেত্রে পরিমাণ কম লাগে, সময়ও অনেক ক্ষেত্রে কম লাগে। বীজের মত ব্যবহার হয় গাছের যে সব অংশ তাদেরও এই ভাবে জীবাণুমুক্ত করে নেওয়া যায়, তবে সময় বেশী লাগে। সিস্টেমিক ফাঙ্গিসাইড ব্যবহারের ফলেই এটি সম্ভব হচ্ছে। কোন কোন সময় একই পরিমাণ ফাঙ্গিসাইড অল্প জলে খুব ঘন করে গুলে যে 'স্লারী' (slurry) তৈরী হয় তাই দিয়ে বীজ শোধন করা হয়। এই ভাবে শোধন করা বীজ শুকিয়ে নিয়ে বেশ কিছুদিন রেখে দেওয়া যায়।

বীজ শোধনের জন্য বিভিন্ন রকম ফাঙ্গিসাইড ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এদের মধ্যে আছে পারদঘটিত অ্যাগ্রোসান জি-এন (Agrosan GN), সেরেসান (Ceresan) ও অ্যারেটান-৬ (Aretan-6); গন্ধকঘটিত থায়োকার্বামেট শ্রেণীর থাইরাম (Thiram), ডাইথেন এম-৪৫ (Dithane M-45), ডাইথেন জেড-৭৮ (Dithane Z-78) ইত্যাদি এবং ক্যাপটান (Captan), বুসান (Busan) ও আরো কিছু জৈব যৌগ। পারদঘটিত ফাঙ্গিসাইডগুলি বেশ কার্যকরী হলেও বিষাক্ত প্রকৃতির কথা ভেবে অনেক দেশে বীজশোধনের জন্য এদের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সিস্টেমিক ফাঙ্গিসাইড ব্যবহারের ফলে বীজশোধনের কার্যকারিতা ইদানীংকালে অনেক বেড়ে গেছে। বীজবাহিত যে সব রোগ আগে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হত না সেগুলি বর্তমানে সিস্টেমিক ফাঙ্গিসাইডের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে।

৩। জমিশোধন (Soil treatment)

বিভিন্ন ধরণের ফাঙ্গিসাইড ও বিষাক্ত যৌগ প্রয়োগ করে জমিকে রোগ-জীবাণু ও নিমাটোড থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করা হয়। এইভাবে সব সময় জমি যে পুরোপুরি জীবাণুমুক্ত হয় সে বিষয়ে কিছুটা সন্দেহ থেকেই যায় কারণ ফাঙ্গিসাইড ইত্যাদি খুব বেশী পরিমাণে ব্যবহার না করলে সেগুলি মাটির ফাঁকে ফাঁকে যে জীবাণু রয়েছে তাদের সংস্পর্শে আসতে পারে না।

জমি জীবাণুমুক্ত করার জন্য যে সব রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে তাদের মধ্যে কিছু উদ্বায়ী (volatile) ধরণের, অন্যরা অনুদ্বায়ী (non-volatile)। প্রথম শ্রেণীভুক্ত যারা তাদের বলা হয় 'ফিউমিগ্যান্ট' (fumigant)। এর মধ্যে রয়েছে ফর্মালিন (formalin = 40% formaldehyde); ক্লোরো-

পিক্রিন (chloropicrin), মেথিল ব্রোমাইড (methyl bromide), ইথিলিন ডাইব্রোমাইড (ethylene dibromide), ভেপাম (Vapam), জিনোফস (Zinophos), নিমাগন (Nemagon) ইত্যাদি। উদ্বায়ী প্রকৃতির হওয়ায় এগুলি জমি জীবাণুমুক্ত করার পক্ষে বিশেষ উপযোগী কারণ এরা মাটির ফাঁকে ফাঁকে অনায়াসে ঢুকে পড়ে। বীজ লাগানোর এক-দু সপ্তাহ আগে জমির উপরের ৪-৬ ইঞ্চি এই ধরণের যৌগ প্রয়োগ করে ভিজিয়ে দিতে হয়। তাহলে বীজ বোনার সময় জমিতে কিছু অবশিষ্ট থাকে না, থাকলে অঙ্কুরোদ্গম ব্যাহত হতে পারে। নিমাগন ও জিনোফস বাদ দিলে বাকীগুলি বেশী রকম উদ্বায়ী প্রকৃতির, সেজন্য তাদের প্রয়োগের পর জমি এক-দু সপ্তাহ পলিথিন বা অন্য কিছুর আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। বীজ লাগানো হয় বেশ কিছুদিন পরে। সাধারণতঃ ইনজেক্টর গান ব্যবহার করে এগুলি প্রয়োগ করা হয়, তবে জমি বেশ বড় হলে ট্র্যাক্টরের সঙ্গে লাগানো যন্ত্র ব্যবহার করতে হয়। উপরে যে সব ফিউমিগ্যান্টের নাম করা হল সবগুলিই নিমাটোড নাশক ; জিনোফস ও ইথিলিন ডাইব্রোমাইড বাদে বাকীগুলি ছত্রাকনাশকও বটে। কম উদ্বায়ী প্রকৃতির জিনোফস ও নিমাগন ফসল থাকা অবস্থাতেও জমিতে প্রয়োগ করা যায়।

কিছু অনুদ্বায়ী প্রকৃতির ফাঞ্জিসাইড জমিশোধনের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এদের মধ্যে ব্র্যাসিকল (Brassicol), ক্যাপটান, থাইরাম ইত্যাদি বেশী ব্যবহৃত হয়। রাইজোকটোনিয়া বা স্ক্লেরোশিয়ামজনিত রোগের আক্রমণ বেশী হলে ব্র্যাসিকল (75% wettable powder) জলে গুলে জমি ভিজিয়ে দিতে হয়। যেখানে এই ধরণের রোগ থেকে যথেষ্ট ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে কখনও বা জমি তৈরীর সময় মাটির সঙ্গে শুকনো ব্র্যাসিকল (20%) গুঁড়া মিশিয়ে দেওয়া হয়। পিথিয়ামজনিত ড্যাম্পিং অফ রোগের ক্ষেত্রে বীজতলা ক্যাপটান বা থাইরাম জলে গুলে ভিজিয়ে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। তুলা গাছের সারির মাঝখানে সিস্টেমিক ফাঞ্জিসাইড বেনলেট (Benlate) জমিতে মিশিয়ে দিয়ে সেচ দিলে ভার্টিসিলিয়াম উইল্ট রোগের উপশম হতে দেখা গেছে।

ফাঞ্জিসাইড, নিমাটিসাইড ইত্যাদি প্রয়োগ করে জমিকে জীবাণু বা নিমাটোডমুক্ত করা সম্ভব হলেও এটি নিঃসন্দেহে অতি ব্যয়বহুল ব্যবস্থা যা গ্রীনহাউসে নেওয়া সম্ভব হলেও বড় জমিতে সাধারণতঃ সম্ভব হয় না। তবে সেখানে বছরের পর বছর রোগের প্রকোপ বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে চাষ অর্থকরী হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে, সেখানে ঐ ফসলের চাষ করতে হলে এই ধরণের ব্যবস্থা হয়ত গ্রহণ না করে কোন উপায় থাকে না।

৪। গাছের ক্ষত চিকিৎসা (Treatment of tree wounds)

বড় গাছের আক্রান্ত অঙ্গ সারিয়ে তোলার জন্য তার কিছুটা নীচে থেকে যখন কেটে ফেলা হয় তখন সেই জায়গাটা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। উন্মুক্ত অংশটি যাতে ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়ার গাছের দেহে প্রবেশের পথ না হয়ে দাঁড়ায় সেজন্য কিছু ব্যবস্থা নিতে হয়। প্রথমে ৯০% অ্যালকোহল, ০·১% মারকিউরিক ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণ বা ০·৫—১% সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইটের (sodium hypochlorite) জলীয় দ্রবণে তুলা ভিজিয়ে তাই দিয়ে কাটা অংশটি মুছে দেওয়া হয়। পরে বোর্দো রঙ (Bordeaux paint), সেরানো রঙ (Cerano paint), জীবাণুনাশক ফেনিলমারকিউরিক নাইট্রেট (০·২৫%) অথবা ফেনল (৬%) দেওয়া ল্যানোলিন (Lanolin), রোজিন ও গামের মিশ্রণ (১০:২:২) দিয়ে ঐ জায়গা ও তার সংলগ্ন কিছুটা অংশ রঙ করে দেওয়া হয়। অপেক্ষাকৃত ছোট গাছে, যেমন আপেল, লেবু, গোলাপ ইত্যাদির ক্ষেত্রেও, রোগাক্রান্ত অংশ অপসারণের পর একইভাবে ক্ষত চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

৫। সংগৃহীত ফল ও সবজীর রোগ নিয়ন্ত্রণ (Control of post-harvest diseases)

গাছ থেকে তোলার পরে ফল ও সবজীতে প্রধানতঃ ছত্রাক কখনও বা ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণে প্রচুর ক্ষতি হয়ে থাকে। বিশেষ করে দূরদেশে চালান যাবার পথে ফলের প্রচুর ক্ষতি হয় যদি না সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সব থেকে বেশী ক্ষতি হয় পেনিসিলিয়াম ও রাইজোপাসের আক্রমণের ফলে। এ ছাড়া বট্রাইটিস, অ্যাসপারজিলাস, ফাইটফথোরা এবং আরউইনিয়াও যথেষ্ট ক্ষতি করে বলে জানা যায়। সাধারণতঃ গাছ থেকে তোলার সময় ফল বা সবজীর ত্বকে যে ছোটখাট ক্ষতের সৃষ্টি হয় তার মধ্যে দিয়ে জীবাণু প্রবেশ করে দ্রুত সেটিকে পচিয়ে ফেলে দেয়। ফল বা সবজী সংগ্রহের পরই ফাঙ্গিসাইড ইত্যাদি প্রয়োগ করলে এই ধরণের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না।

ফল তোলার পর জীবাণুনাশক উদ্বায়ী কোন পদার্থ দিয়ে ফিউমিগেট করে নিতে পারলে ভাল হয়। কিন্তু এতে ফলের স্বাভাবিক রঙ নষ্ট হবার ও অন্যান্য কিছু অবাঞ্ছিত পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকে বলে এই পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য নয়। দেখা গেছে যে ফাঙ্গিসাইড গোলা জলে কয়েক মিনিট ডুবিয়ে রেখে পরে শুকিয়ে নিলে ফল বা সবজী রোগের হাত থেকে রক্ষা পায়। কমলালেবুর পেনিসিলিয়াম-জনিত রটের জন্য এক সময় বোরেট (borate) এই ভাবে ব্যবহার হত।

আজকাল অন্যান্য ছত্রাকনাশক, যেমন—সোডিয়াম অর্থো-ফেনিল ফিনেট (sodium O-phenyl phenate), বাইফেনিল (biphenyl) ও ডাইক্লোরান (Dichloran), লেবু ও অন্যান্য ফলের রোগে ব্যবহার করা হচ্ছে। পীচ, আপেল, অ্যাপ্রিকট, আঙ্গুর, কলা ইত্যাদির জন্য বট্রান (Botran) ও ক্যাপটান ব্যবহার করা হয়। সিস্টেমিক ফাঙ্গিসাইড আবিষ্কারের ফলে ফলের রোগ নিয়ন্ত্রণ অনেক সহজ হয়েছে। বেনোমিল (benomyl), থায়াবেণ্ডাজোল (thiabendazole) শ্রেণীর সিস্টেমিক ফাঙ্গিসাইড এই কাজে বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে। বেনোমিল, থায়াবেণ্ডাজোল বা অর্থো-ফেনিল ফিনেট মেশানো এক ধরণের ইমালসন (emulsion) বা মোম সহযোগে তৈরী তরল পদার্থ আজকাল অনেক দেশে ফলের রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। এ ছাড়াও দেখা গেছে যে কমলালেবু বাইফেনিলে ভিজিয়ে শুকিয়ে নেওয়া কাগজে মুড়ে রাখলে (wrapping) আর ছত্রাকের আক্রমণ হয় না। রাইজোপাস-জনিত রটের জন্য বিভিন্ন ফলে এইভাবে বট্রান ব্যবহার করা হয়।

অর্থনৈতিক কারণে ফলে বা সবজীতে এইভাবে ফাঙ্গিসাইডের প্রয়োগ অনেক সময় খুবই প্রয়োজন সন্দেহ নেই। তবে মানুষের দেহে এই ধরণের যৌগের তাৎক্ষণিক না হলেও দীর্ঘকাল ব্যবহারের ফলে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা আছে কিনা সে বিষয়ে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন আছে।

রোগনিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগ

যেহেতু গাছের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ রোগ ছত্রাকের আক্রমণ থেকেই হয় সেজন্য স্বাভাবিকভাবেই ফাঙ্গিসাইড নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে এবং বহু বিভিন্ন ধরণের যৌগ পাওয়া গেছে যাদের এই সব রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করা হয়। প্রথমে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিরক্ষামূলক ছত্রাকনাশক সম্বন্ধে এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হচ্ছে।

ক। প্রতিরক্ষামূলক ফাঙ্গিসাইড

১। তামাঘটিত ফাঙ্গিসাইড (Copper fungicides)

তুঁতে বা কপার সালফেট (copper sulphate) অনেকদিন থেকেই রোগ-নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার হচ্ছে। প্রেভোস্ট (১৮০৭) প্রথম গমের দুর্গন্ধযুক্ত ভুষা রোগের নিয়ন্ত্রণে কপার সালফেটের আংশিক সাফল্যের প্রমাণ দেন। কপার সালফেট (৪.৫ কিলো) আর্দ্র ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড (৪.৫ কিলো) ও

জলের (৪৫০ লিটার) সংমিশ্রণে তৈরী 'বোর্দো মিক্সচার' (Bordeaux mixture) রোগনিয়ন্ত্রণে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত প্রথম ফাঞ্জিসাইড। যদিও এর আবিষ্কার ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তবু দীর্ঘকাল বোর্দো মিক্সচারই ছিল পৃথিবীর সর্বাধিক ব্যবহৃত ফাঞ্জিসাইড। এর প্রথম ব্যবহার আঙ্গুরের ডাউনি মিলডিউ রোগের নিয়ন্ত্রণে হলেও পরবর্তী কালে অন্যান্য শস্যের ডাউনি মিলডিউ, লেবুর ক্যাঙ্কার, আপেলের ফায়ার ব্লাইট, আলুর নাবি ধসা প্রভৃতি অনেক রোগের নিয়ন্ত্রণে এটি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষ বিশেষ রোগের ক্ষেত্রে প্রয়োজন মেটাতে অনেক সময় কপার সালফেট ও ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডের আনুপাতিক পরিমাণের কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে। বোর্দো মিক্সচার ব্যবহারে অনেক গাছের পাতার ক্ষতি হয় বিশেষ করে আবহাওয়া যদি মেঘলা ও অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা থাকে। ব্যবহারের আগে কাঠের বা মাটির পাত্রে বোর্দো মিক্সচার টাটকা তৈরী করে নিতে হয়। তৈরী অবস্থায় রেখে দিলে এর কার্যকারিতা কমে যায়।

বোর্দো মিক্সচার ছাড়াও তামাঘটিত লবণের সঙ্গে অন্যান্য অজৈব লবণের মিশ্রণ ঘটিয়ে আরও কিছু ফাঞ্জিসাইড তৈরী হয়েছে। কপার সালফেট ও সোডিয়াম কার্বোনেটের মিশ্রণে তৈরী 'বার্গাণ্ডি মিক্সচার' (Burgundy mixture) আর কপার সালফেট ও অ্যামোনিয়াম কার্বোনেটের মিশ্রণে তৈরী 'চেসাণ্ট কম্পাউণ্ড' (Cheshunt compound) এক সময় অল্প কিছু রোগের নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার হত, কিন্তু এগুলি বর্তমানে পরিত্যক্ত। এক লিটার ল্যানোলিন বা তিসির তেলের মাধ্যমে ৮০০ গ্রাম কপার কার্বোনেট ও ৮০০ গ্রাম রেড লীডের সংমিশ্রণে যে আঠাল লেই (paste) তৈরী হয় তাকে 'চৌবাটিয়া পেস্ট' (Chaubattia paste) বলে। উত্তর প্রদেশের আলমোড়া জেলার চৌবাটিয়াতে সরকারী ফল গবেষণা কেন্দ্রে উদ্ভাবিত (U. B. Singh, 1943) এই পেস্ট আপেল, ন্যাসপাতি, অ্যাপ্রিকট ইত্যাদি বিভিন্ন ফল গাছের ডালপালা ছেঁটে ফেলার পর কাটা জায়গায় লাগিয়ে অনেক রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে।

ইদানীংকালে বেশ কিছু তামাঘটিত অজৈব ফাঞ্জিসাইড বিভিন্ন ধরণের রোগের নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার হচ্ছে। এদের মধ্যে রয়েছে কপার অক্সাইড জাতীয় পেরেনক্স (Perenox), আর কপার অক্সিক্লোরাইড জাতীয় ব্লাইটক্স—৫০ (Blitox—50), ফাইটোলান (Fytolan), কিউপ্রামার (Cupramar), ব্লু-কপার—৫০ (Blue copper—50) ইত্যাদি। পেরেনক্স বীজশোধনের জন্য

ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্যগুলি ফাইকোমাইসিটিস, অ্যাসকোমাইসিটিস ও ফাঙ্গাই ইমপারফেকটি শ্রেণীর বিভিন্ন রোগ উৎপাদকের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ দশমিক ০'২—০.৫ শতাংশ মাত্রায় স্প্রে হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন শস্যের ডাউনি মিলডিউ, কফির মরিচা, সরিষার হোয়াইট রাস্ট, লেবুর ক্যাঙ্কার, আলুর নাবি ধসা ইত্যাদি অনেক রোগে এদের পাতায় স্প্রে করে ও পিথিয়াম-জনিত ড্যাম্পিং অফ রোগে এদের দিয়ে জমি ভিজিয়ে দিয়ে রোগ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে।

২। পারদঘটিত জৈব ফাঙ্গিসাইড (Organomercurial fungicides)

অনেক আগে পারদের দুটি অজৈব লবণ, মারকিউরিক ক্লোরাইড (mercuric chloride) ও মারকিউরাস ক্লোরাইড (mercurous chloride) বীজশোধনের জন্য ব্যবহার হত। একই উদ্দেশ্যে পরবর্তী কালে পারদের বিভিন্ন জৈব যৌগের ব্যবহার হতে দেখা যায়। পারদের পরিমাণ তুলনামূলক-ভাবে অনেক কম হওয়ায় এগুলি অজৈব যৌগের তুলনায় কম বিষাক্ত, অতএব কম ক্ষতিকর। প্রধানতঃ বীজশোধনের জন্যই এদের ব্যবহার করা হয়। এই ধরণের যৌগের রাসায়নিক সঙ্কেত হল R-Hg-X, যেখানে R হল একটি হাইড্রোকার্বন আর X একটি অ্যাসিড র‍্যাডিকাল বা মূলক যা অজৈব বা জৈব যে কোন রকমের হতে পারে। বাজারে বিভিন্ন নামে এই শ্রেণীর অনেকগুলি ফাঙ্গিসাইড পাওয়া যায় যার মধ্যে আমাদের দেশে ব্যবহৃত হয় অ্যাগ্রোসান জি এন (Agrosan GN = ethylmercury chloride and phenyl-mercury acetate 50 : 50), সেরেসান ড্রাই (Ceresan dry = phenyl-mercury acetate) ও অ্যারেটান (Aretan), অ্যাগালল (Agallol) বা সেরেসান ওয়েট (Ceresan wet = methoxyethyl mercury chloride)। পারদের পরিমাণ যেগুলি শুকনো বীজশোধনে ব্যবহৃত হয় সেগুলিতে ১ শতাংশ আর ভিজে বীজশোধনের জন্য ব্যবহৃত অন্য গুলিতে ২'৫—৬ শতাংশ। বীজের গায়ে রোগজীবাণু লেগে থাকে এমন কিছু রোগ যেমন গমের দুর্গন্ধযুক্ত ভুষা, যবের বদ্ধ ভুষা, ওটের আলগা ও বদ্ধ ভুষা, পাটের ডাঁটা পচা, ধানের বাদামী দাগ ইত্যাদি ও বিভিন্ন সবজীর চারা ধসা রোগের ক্ষেত্রে বীজশোধনের জন্য এই সব ফাঙ্গিসাইড বিস্তৃতভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পারদঘটিত যৌগ স্তন্যপায়ী প্রাণীর পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হওয়ায় অনেক দেশে বীজশোধনের জন্য এদের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

৩। গন্ধকঘটিত ফাঞ্জিসাইড (Sulphur fungicides)

গাছের রোগ, বিশেষ করে ছাতাধরা রোগের নিয়ন্ত্রণে গন্ধকের ব্যবহার বহুদিন থেকেই জানা। গন্ধক গুঁড়া অবস্থায় জলে গুলে ছিটানোর জন্য, এমনকি ফিউমিগেশনের জন্যও ব্যবহার করা যায়। কণিকার আয়তনের উপর ছত্রাকনাশক হিসাবে গন্ধকের কার্যকারিতা নির্ভর করে; আয়তন ছোট হলে ক্ষমতা বেশী হয়। ডাস্টিং এর প্রয়োজনে ব্যবহৃত কণিকার আয়তন ৪৭-৭৪ মাইক্রণের (১ মাইক্রণ = ০'০০১ মি মি) মধ্যে হয় ; স্প্রে'র জন্য ব্যবহার হয় অনেক ছোট আয়তনের কণিকা (২-৬ মাইক্রণ)। সাধারণতঃ কেওলিন (Kaolin) বা ঐ ধরণের কোন রাসায়নিক পদার্থ অতি অল্প পরিমাণে মিশিয়ে গন্ধকের ক্ষুদ্র কণিকাগুলিকে একত্রিত হওয়া থেকে নিবৃত্ত করা হয়। বিভিন্ন শস্যের ছাতাধরা রোগে গন্ধকের মিহি গুঁড়া গাছে ছিটিয়ে (প্রতি হেক্টরে ২০—২৫ কিলো) বা জলে ভেজে (wettable sulphur) এমন গুঁড়া জলে মিশিয়ে স্প্রে করে সম্পূর্ণভাবে রোগ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে। এছাড়া রবারের টার্গেট লীফ স্পট (target leaf spot), গোলাপের ব্ল্যাক স্পট, জোয়ারের গ্রেন স্মাট (grain smut) প্রভৃতি রোগেও গন্ধকের ব্যবহার জানা আছে। তবে গন্ধকের ব্যবহারে অনেক গাছের পাতা জ্বলে যায়।

গন্ধক ও পাথুরে চুণ জলে মিশিয়ে (৭ কিলো : ৯ কিলো : ২৫০ লিটার) ফুটিয়ে নিলে যে লাইম সালফার (lime sulphur) পাওয়া যায় সেটি আঙ্গুর, পীচ ও আরও অনেক গাছের ছাতাধরা, পীচের লীফ কার্ল ও ব্রাউন রট, আপেলের স্ক্যাব প্রভৃতি রোগ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার হয়। লাইম সালফারের প্রধান উপাদান হল ক্যালসিয়াম পলিসালফাইড (calcium polysulphide)। গাছের ত্বকে স্থাপিত হবার পর এটি গন্ধকের মৌল কণায় পরিণত হয় যা ছত্রাকনাশক। লাইম সালফার ব্যবহারে গাছের বেশ ক্ষতি হয়, বিশেষ করে কচি পাতার। সেজন্য এর ব্যবহার আজকাল খুবই সীমিত।

থায়োকার্বামেট শ্রেণীর ফাঞ্জিসাইড (Thiocarbamate fungicides): তামা, পারদ ও গন্ধকঘটিত ফাঞ্জিসাইডগুলি অনেক ক্ষেত্রে রোগ নিয়ন্ত্রণে সফল হলেও এদের ব্যবহারগত কিছু অসুবিধার জন্য অনেকদিন থেকেই সক্রিয় অথচ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ফাঞ্জিসাইডের সন্ধান চলছিল। ত্রিশের দশকে প্রথম উদ্ভাবিত হলেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে বিস্তৃতভাবে গবেষণার ফলে অনেক গন্ধকঘটিত থায়োকার্বামেট শ্রেণীর ফাঞ্জিসাইড পাওয়া গেল যেগুলি নিরাপদ, বহুমুখী ক্রিয়াসম্পন্ন এবং বর্তমানকালে সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত।

থায়োকার্বামিক অ্যাসিডে অক্সিজেনের দুটি অণু গন্ধকের অণুর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হলে ডাইথায়োকার্বামিক অ্যাসিড (dithiocarbamic acid) পাওয়া যায় যাকে অবলম্বন করে নানা ধরণের ফাঞ্জিসাইডের সৃষ্টি হয়েছে। এই ধরণের কয়েকটি ফাঞ্জিসাইড সম্বন্ধে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

$$\begin{array}{c} H \quad S \\ | \quad \| \\ N-C-SH \\ | \\ H \end{array}$$
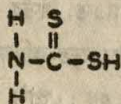
ডাইথায়োকার্বামিক অ্যাসিড

থাইরাম (Thiram) : যে ডাইথায়োকার্বামিক অ্যাসিডের দুটি হাইড্রোজেন মেথিল (CH_3) মূলক (radical) দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে এমন দুটি অণুর সংযুক্তিতে উৎপন্ন টেট্রামেথিল থায়ুরাম ডাইসালফাইড (tetramethylthiuram disulphide) থাইরাম নামে পরিচিত। থাইরাম প্রধানত: বীজ শোধনের জন্য শুকনো ভাবে বা স্লারী পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়। ধান, গম, মটর, সরিষা, টম্যাটো, বীট ইত্যাদি গাছের বিভিন্ন রোগ নিয়ন্ত্রণে বীজ শোধনের জন্য থাইরাম ব্যবহার করা হয়ে থাকে। জমি তৈরীর সময় মাটিতে থাইরাম মিশিয়ে দিলে তামাকের অ্যানথ্র্যাকনোজ *(c. o. Colletotorichum tabacum)* ও ডাঁটা পচা *(c. o. Sclerotinia sclerotiorum)*, পেঁয়াজের স্মাট ও নেক রট *(Botrytis sp.)*, ধনের স্টেম গল *(c. o. Protomyces macrosporus)* ও বিভিন্ন শস্যের চারা ধসা রোগ নিয়ন্ত্রিত হয়। কদাচিৎ স্প্রে হিসাবে থাইরামের ব্যবহারের নজীরও রয়েছে।

$$\begin{array}{c} \quad\quad S \quad\quad\quad\quad S \\ CH_3 \diagdown \quad \| \quad\quad\quad\quad \| \quad \diagup CH_3 \\ N-C-S-S-C-N \\ CH_3 \diagup \quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad \diagdown CH_3 \end{array}$$

থাইরাম
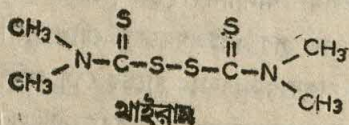
জাইরাম (Ziram) : মেথিল মূলক প্রতিস্থাপিত ডাইথায়োকার্বামেটের দুটি অণুর সঙ্গে দস্তার একটি পরমাণুর সংযুক্তিতে জিঙ্ক ডাইমেথিলডাইথায়োকার্বামেট (zinc dimethyldithiocarbamate) উৎপন্ন হয় যা জাইরাম নামে পরিচিত। ভারতে এটি কুমান (Cuman) নামে বিক্রি হয়। সবজী, ফুল ও ফল গাছের অনেক রোগেই কুমান পাতায় স্প্রে হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি আলু ও টম্যাটোর জলদি ধসা, বীনের অ্যানথ্র্যাকনোজ ও মরিচা *(c. o. Uromyces fabae)*, তামাক ও কুমড়ো জাতীয় গাছের

অ্যানথ্র্যাকনোজ (c. o. *Colletotrichum* spp) ইত্যাদি রোগের নিয়ন্ত্রণে বিশেষভাবে কার্যকরী।

ফারবাম (Ferbam) : মেথিল মূলক প্রতিস্থাপিত ডাইথায়োকার্বামেটের তিনটি অণুর সঙ্গে লোহার একটি পরমাণুর সংযুক্তিতে উৎপন্ন ফেরিক ডাইমেথিল ডাইথায়োকার্বামেট ফারবাম নামে পরিচিত। এটি বট্রাইটিস ও রাইজোক-টোনিয়াজনিত রোগ, লেবুর অ্যানথ্র্যাকনোজ, লঙ্কার ডাউনি মিলডিউ, টম্যাটোর জলদি ধসা, প্রভৃতি কিছু রোগের নিয়ন্ত্রণে স্প্রে হিসাবে ব্যবহার হয়ে থাকে। এ ছাড়া দস্তা ও লোহার অভাবজনিত রোগেও স্প্রে হিসাবে যথাক্রমে জাইরাম ফারবাম ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ইথিলিন বিসডাইথায়োকার্বামেট (Ethylenebisdithiocarbamates): যখন সংযুক্ত দুটি ডাইথায়োকার্বামিক অ্যাসিডের অণু আবার অন্যদিকে কার্বন পরমাণুর মাধ্যমে যুক্ত হয়ে রিং এর আকৃতি নেয় তখন তাকে বিসডাইথায়ো-কার্বামিক অ্যাসিড বলে। এদের দস্তাঘটিত লবণকে জিঙ্ক ইথিলিনবিসডাই-থায়োকার্বামেট (zinc ethylenebisdithiocarbamate) বা জিনেব (zineb), ম্যাঙ্গানিজঘটিত লবণকে ম্যাঙ্গানিজ ইথিলিনবিসডাইথায়োকার্বামেট বা মানেব (maneb) আর সোডিয়াম লবণকে সোডিয়াম ইথিলিনবিসডাইথায়োকার্বমেট বা নেবাম (nabam) বলে। এগুলি যথাক্রমে লোনাকল (Lonacol) বা
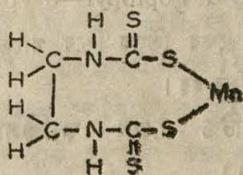
ম্যানেব

ডাইথেন জেড-৭৮ (Dithane Z-78), ডাইথেন এম-২২ (Dithane M-22) এবং ডাইথেন ডি-১৪ (Dithane D-14) বা পারজেট (Parzate) নামে বাজারে বিক্রি হয়। এগুলি প্রধানত: স্প্রে হিসাবে ব্যবহার হয়। পাতায় আক্রমণ করে এই ধরণের রোগের নিয়ন্ত্রণে এদের ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। জিনেব বিভিন্ন সবজীর ডাউনি মিলডিউ, আলু ও টম্যাটোর জলদি ও নাবি ধসা, আপেলের ফায়ার ব্লাইট ও মরিচা ইত্যাদি রোগের নিয়ন্ত্রণে বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ডাইথায়োকার্বামেটের সঙ্গে বিভিন্ন যৌগের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে কিছু বেশ

কার্যকরী ফাঙ্গিসাইড পাওয়া গেছে। এই রকম একটি ফাঙ্গিসাইড হল ডাইথেন এম-৪৫ (Dithane M-45 = 78% Maneb + 2% Zn ion)। এটি পাতার ক্ষতি করে এরকম বহু রোগের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সাফলের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

৪। টিনঘটিত জৈব ফাঙ্গিসাইড (Organotin fungicides)

টিনঘটিত কিছু জৈব প্রকৃতির ফাঙ্গিসাইড আছে, যথা ব্রেস্টান (Brestan = triphenyl tin acetate), ব্রেস্টানল (Brestanol = triphenyl tin chloride) ও ডিউটার (Duter = triphenyl tin hydroxide)। এইসব ফাঙ্গিসাইড গাছের দেহের ভিতরে প্রবেশ করে ফলে এদের কার্যকারিতা কিছুটা বাড়ে। এগুলি আলুর নাবি ধসা, চীনা বাদামের টিক্কা, বীনের অ্যানথ্র্যাকনোজ, বীটের লীফ স্পট (c. o. *Cercospora beticola*) ইত্যাদি রোগের নিয়ন্ত্রণে বিশেষ কার্যকরী, তবে পাতার ক্ষতি করে এই কারণে এদের ব্যবহার কিছুটা সীমিত।

৫। ফসফরাসঘটিত জৈব ফাঙ্গিসাইড (Organaphosphorus fungicides)

ইদানীংকালে ধানের ঝলসা রোগের নিয়ন্ত্রণে দুটি ফসফরাসঘটিত জৈব ফাঙ্গিসাইড ব্যবহার করে বিশেষ সুফল পাওয়া গেছে। এই দুটি হল হিনোসান (Hinosan = O—ethyl—S, S – diphenyl dithiophosphate) এবং কিটাজিন (Kitazin = O, O-di-isopropyl—S—benzyl-thiophosphate। হিনোসান এবং কিটাজিন ত্বকের ভিতর দিয়ে গাছের দেহে প্রবেশ করে ও বিভিন্ন অংশে কিছুটা পরিবাহিত হয়।

৬। নাইট্রোজেনঘটিত জৈব ফাঙ্গিসাইড (Heterocyclic nitrogenous compounds)

এই ধরণের বেশ কয়েকটি ফাঙ্গিসাইড রয়েছে যাদের মধ্যে সর্বাধিক ব্যবহৃত হল ক্যাপটান (Captan = N—trichloromethylthio—4—cyclohexene —1, 2—dicarboximide)। ফল ও সবজী গাছে পাতায় আক্রমণ হয়

$$\begin{array}{c} CH_2 \\ HC \quad\quad CH-CO \\ \| \quad\quad\quad | \quad\quad\quad > NSCCl_3 \\ HC \quad\quad CH-CO \\ CH_2 \end{array}$$
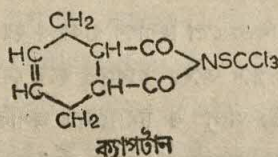
ক্যাপটান

এইরকম বহু রোগের নিয়ন্ত্রণে ক্যাপটান স্প্রে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এটি অনেক রোগের বিরুদ্ধে বীজশোধনে এবং

পিথিয়ামজনিত ড্যাম্পিং অফ রোগের নিয়ন্ত্রণে জমি ভিজিয়ে দেবার জন্যও ব্যবহৃত হয়। এই ধরণের আরও দুটি ফাঙ্গিসাইড হল ফলপেট (Folpet = N-(trichloromethylthio) phthalimide) ও ডাইফোলাটান (Difolatan = [N-(1, 1, 2, 2-tetrachloroethyl-sulfenyl)-cis-4-cyclohexene-1, 2-dicarboximide] । ফলপেটের ব্যবহার সীমিত হলেও এটি বিভিন্ন ফলের ব্রাউন রট ও গোলাপের ছাতা ধরা (c.o. *Sphaerotheca pannosa*) রোগের নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভাবে কার্যকরী। ডাইফোলাটান অনেক রোগের বিরুদ্ধে ব্যবহার হয়। এটি স্প্রে করে চীনাবাদামের টিক্কা, আলুর নাবি ধসা, চা গাছের ব্লিস্টার ব্লাইট (c. o. *Exobasidium vexans*), আঙ্গুরের ডাউনি মিলডিউ, ধানের বাদামী দাগ ইত্যাদি মারাত্মক রোগের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে। আবহাওয়ার প্রভাবে কম নষ্ট হওয়ায় ডাইফোলাটানের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়। এই কারণে অন্যান্য ফাঙ্গিসাইডের তুলনায় এটি কম বার স্প্রে করার প্রয়োজন হয়।

৭। কুইনোন জাতীয় যৌগ (Quinone compounds)

গাছে স্বাভাবিক অবস্থায় কিছু কুইনোন শ্রেণীর জৈব যৌগ পাওয়া যায় যাদের মধ্যে অনেকেরই ছত্রাকনাশক ক্ষমতা আছে। এগুলি ফেনল জারিত হওয়ার ফলে উৎপন্ন হয়। কিন্তু এ পর্যন্ত মাত্র দুটি এই ধরণের ফাঙ্গিসাইড পাওয়া গেছে যাদের রোগ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা হয়। একটি হল ক্লোরানিল (chloranil = 2, 3, 5, 6-tetrachloro-1, 4-benzoquinone) যার প্রচলিত নাম স্পার্গন (Spergon)। গমের দুর্গন্ধযুক্ত ভূষা, যবের আলগা ভূষা ও বিভিন্ন শস্যের চারা ধসা রোগ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বীজ শোধনের জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। অপর ফাঙ্গিসাইড ডাইক্লোন (dichlone = 2, 3-dichloro-1, 4-napthoquinone) ফাইগন (Phygon) নামে বাজারে পাওয়া যায়। এটি প্রধানতঃ বীজ শোধনের জন্য ব্যবহৃত হলেও, আপেলের স্ক্যাব, পীচের লীফ কার্ল প্রভৃতি রোগে স্প্রে হিসাবে ব্যবহার করেও সুফল পাওয়া গেছে।

O
Cl Cl
Cl Cl
O

ক্লোরানিল
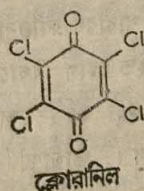
৮। সুগন্ধযুক্ত যৌগ (Aromatic compounds)

এই ধরণের কয়েকটি ফাঞ্জিসাইড আছে যাদের সীমিতভাবে বিশেষ বিশেষ রোগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সফল ভূমিকা রয়েছে। ডাইনোক্যাপ (dinocap) 2, 4-dinitro-6-octylphenyl crotonate ও 2, 6-dinitro-4-octylphenyl crotonate এর মিশ্রণ। প্রচলিত নাম ক্যারাথেন (Karathane)। এটি বিভিন্ন শস্যের ছাতাধরা রোগ নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত কার্যকরী। ব্র্যাসিকল (Brassicol = pentachloronitrobenzene) এই ধরণের একটি বিশেষ উপযোগী ফাঞ্জিসাইড। এটি প্রধানতঃ জমি ভিজিয়ে দেবার জন্য এবং বীজশোধনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রাইজোকটোনিয়া ও স্ক্লেরোশিয়ামজনিত জমিবাহিত রোগের ক্ষেত্রে ব্র্যাসিকল বিশেষ ভাবে কার্যকরী। এ ছাড়া আলুর ড্রাই রট (*Fusarium caeruleum*), এবং বট্রাইটিস ও স্ক্লেরোটিনিয়াজনিত রোগের নিয়ন্ত্রণেও ব্র্যাসিকলের ব্যবহার হয়। এই রকম আর দুটি উল্লেখযোগ্য ফাঞ্জিসাইড হল ডাইক্লোরান (Dichloran = 2, 6-dichloro-4-nitro-aniline) বা বট্রান (Botran) ও ডেক্সন (Dexon = p-dimethyl-amino-benzene-diazosodium sulphonate)। এগুলি সীমিতভাবে কয়েকটি রোগের নিয়ন্ত্রণে বিশেষভাবে কার্যকরী। পাটের ডাঁটা পচা, পেঁয়াজের হোয়াইট রট (c.o. *Sclerotium cepivorum*) এবং মনিলিনিয়া ও রাইজোপাসজনিত ফলের বিভিন্ন রোগে বট্রান ও ফাইকোমাইসিটিস শ্রেণীর ছত্রাকজনিত কিছু জমিবাহিত রোগে ডেক্সন ব্যবহার করে সফলভাবে রোগ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে।

খ। সিস্টেমিক ফাঞ্জিসাইড (Systemic fungicides)

এ পর্যন্ত যে সব ফাঞ্জিসাইডের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হল তারা নানাভাবে রোগের আক্রমণ কমায় ঠিকই কিন্তু রোগ নিরাময়ের মাধ্যমে আক্রান্ত গাছকে জীবাণুমুক্ত করে সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারে না। কিন্তু সিস্টেমিক ফাঞ্জি-সাইড প্রয়োগ করলে সেটি গাছের দেহের মধ্যে প্রবেশ করে ভিতরে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেখানে ছত্রাক থাকলে বা পরে কিছুদিনের মধ্যে প্রবেশ করলে তাকে নষ্ট করে গাছকে রোগমুক্ত করে। সাধারণ ফাঞ্জিসাইডে কাজ হয় না এরকম রোগের ক্ষেত্রে, যেমন উইল্ট বা বীজবাহিত রোগ যেখানে ছত্রাক বীজের ভিতরে থাকে সিস্টেমিক ফাঞ্জিসাইড ব্যবহার করা হয়। কার্যকারিতা বেশী হওয়ায় এইসব ফাঞ্জিসাইড পরিমাণেও অল্প লাগে। তাছাড়া একই ফসলে বেশীবার প্রয়োগ

করতে হয় না। এদের ব্যবহারের অসুবিধার দিক হল অধিকাংশ সিস্টেমিক ফাঞ্জিসাইড অল্প কয়েকটি বা বিশেষ এক শ্রেণীর ছত্রাকের বিরুদ্ধে সক্রিয় আর এদের বিরুদ্ধে বেশ তাড়াতাড়ি ছত্রাকের প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে। তাছাড়া সাধারণ ফাঞ্জিসাইডের তুলনায় দাম অনেক বেশী হওয়ায় এদের বিস্তৃতভাবে ব্যবহারের পথে কিছুটা বাধা রয়েছে। এখন বিভিন্ন শ্রেণীর সিস্টেমিক ফাঞ্জিসাইড পাওয়া যায় যাদের ব্যবহার করে অনেক মারাত্মক রোগের সফল নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে। সংক্ষেপে এগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে।

১। অক্সাথীন শ্রেণীর যৌগ (Oxathiin dompounds)

অক্সাথীন শ্রেণীর দুটি ফাঞ্জিসাইড হল ভাইটাভ্যাক্স (Vitavax = 2, 3-dihydro-5 carboxanilido-6-methyl-1, 4 oxathiin) ও প্ল্যান্টভ্যাক্স (Plantvax = 2, 3-dihydro-5-carboxanilido-6-methyl-1, 4-oxathiin-4, 4-dioxide)। দুটিই সাধারণতঃ বীজ শোধনের জন্য ব্যবহৃত হয়। গম, যব, ওট ও ভুট্টার ভূষা রোগ ভাইটাভ্যাক্স দিয়ে বীজ শোধন করে নিলে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। চীনাবাদাম, তুলা ও বীটের রাইজোকটোনিয়াজনিত রোগেও ভাইটাভ্যাক্স বিশেষভাবে কার্যকরী। প্ল্যান্টভ্যাক্স গম ও বীনের মরিচা, গমের ফ্ল্যাগ স্মাট *(c. o. Urocystis tritici)* ইত্যাদি কয়েকটি রোগের নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করা হয়।

২। বেঞ্জিমিডাজোল শ্রেণীর যৌগ (Benzimidazole compounds)

সিস্টেমিক ফাঞ্জিসাইডের মধ্যে বেশী ব্যবহৃত হয় বেঞ্জিমিডাজোল শ্রেণীর বেনোমিল [benomyl = methyl-N-(1-butylcarbamoyl)-2-benzimidazole carbamate] যার প্রচলিত নাম বেনলেট (Benlate) ও ব্যাভিস্টিন (Bavistin = Carbendazim = methyl-2-benzimidazole carbamate)। এই দুটি ফাঞ্জিসাইড অনেক অ্যাসকোমাইসিটিস, ব্যাসিডিওমাইসিটিস ও ফাঙ্গাই ইমপারফেকটি শ্রেণীর ছত্রাকজনিত রোগ অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণে সক্ষম। ফাইকোমাইসিটিস শ্রেণীর ছত্রাকের বিরুদ্ধে এরা সক্রিয় নয়। বীজশোধন, গাছের গোড়া ভিজিয়ে দেওয়া ও স্প্রে'র জন্য এদের বিস্তৃতভাবে ব্যবহার করা হয়। ছত্রাকজনিত উইল্ট ও কিছু ভূষা রোগ নিয়ন্ত্রণেও এদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া পচনের সম্ভাবনা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ফলকে ডুবিয়ে নেওয়ার জন্যও বেনলেট ব্যবহৃত হয়। জলীয় দ্রবণে বেনোমিল ভেঙ্গে গেলে যে methyl ester

of benzimidazol-1-yl carbamic acid (MBC) পাওয়া যায় সেটিই ছত্রাকনাশক হিসাবে কাজ করে এবং বাজারে ব্যাভিস্টিন নামে পাওয়া যায়। আর দুটি ফাঞ্জিসাইড সার্কোবিন [Cercobin = Topsin = 1, 2-bis (3-ethoxycarbonyl-2—thioureido) benzene] ও সার্কোবিন এম [Cercobin M = Topsin methyl = 1, 2-bis (3-methoxycarbonyl-2-thioureido) benzene] বেনোমিলের মতই বহু ছত্রাকের বিরুদ্ধে সক্রিয়, কিন্তু ফাইকোমাইসিটিস শ্রেণীর ছত্রাকের বিরুদ্ধে নয়। তবে এদের কার্যকারিতা বেনোমিল বা ব্যাভিস্টিনের থেকে কম। বেনোমিলের মত এদের থেকেও MBC পাওয়া যায় যা এদের ছত্রাকনাশক ক্ষমতার জন্য দায়ী। বিভিন্ন শস্যের ছাতাধরা, ধানের ঝলসা, আপেলের স্ক্যাব, বীটের পাতায় দাগ এবং ভার্টিসিলিয়াম ও সাইক্লোকটোনিয়াজনিত রোগে এই দুটি ফাঞ্জিসাইড ব্যবহৃত হয়। বেঞ্জিমিডাজোল শ্রেণীর আর একটি ফাঞ্জিসাইড হল থায়াবেণ্ডাজোল [thiabendazole = 2-(4-thiazolyl) benzimidazole]। এটি কিছু বীজবাহিত রোগের ক্ষেত্রে প্রধানতঃ বীজ শোধনের জন্য ব্যবহৃত হয়। গাছের দেহে প্রবেশের পর এটি কিন্তু বেনোমিলের মত ভেঙ্গে যায় না।

৩। পিরিমিডিন শ্রেণীর যৌগ (Pyrimidine compounds)

পিরিমিডিন শ্রেণীর দুটি ফাঞ্জিসাইড হল ডাইমেথিরিমল (dimethirimol = 5-n-butyl-2-dimethylamino 4-hydroxy-6-methyl pyrimidine) যা মিলকার্ব (Milcurb) নামে পরিচিত ও ইথিরিমল (ethirimol = 5-n-butyl-2-ethylamino-4-hydroxy-6-methyl pyrimidine) যার প্রচলিত নাম হল মিলস্টেম (Milstem)। দুটি ফাঞ্জিসাইডই বিভিন্ন শস্যের ছাতাধরা রোগ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়। গম, যব, ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইথিরিমল দিয়ে বীজ শোধন করে নিলে পাউডারি মিলডিউ রোগ নিয়ন্ত্রিত হয়। কুমড়ো, বীট ও কিছু ফুল গাছের ক্ষেত্রে ডাইমেথিরিমল দিয়ে বীজ শোধন করা হয়।

৪। অন্যান্য শ্রেণীর যৌগ (Other systemic compounds)

উপরে যে সব সিস্টেমিক ফাঞ্জিসাইডের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হল সেগুলি ছাড়া আরও কিছু ঐ ধরণের ফাঞ্জিসাইড আছে যাদের বিশেষ বিশেষ রোগের নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মর্ফোলিন (morpholines) শ্রেণীভুক্ত ট্রাইডেমর্ফ (tridemorph) ও অ্যানিলাইড

(anilides) শ্রেণীভুক্ত বেনোডানিল (benodanil) যাদের প্রচলিত নাম হল যথাক্রমে ক্যালিক্সিন (Calixin) ও ক্যালিরাস (Calirus)। বর্তমানে ক্যালিক্সিন ছাতাধরা রোগের নিয়ন্ত্রণে বিস্তৃতভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কলার সিগাটোকা ও চা গাছের ব্লিস্টার ব্লাইট রোগেও এটি বিশেষ কার্যকরী। ক্যালিরাস বিভিন্ন শস্যের মরিচা রোগের বিরুদ্ধে স্প্রে হিসাবে ও রাইজোকটোনিয়া-জনিত রোগে মাটি ভিজিয়ে দেবার জন্য ব্যবহার করা হয়। ক্লোরোনেব (chloroneb = 1, 4-dichloro-2, 5-dimethoxybenzene) এই ধরণের আর একটি সিস্টেমিক ফাঙ্গিসাইড যেটি কিছু রাইজোকটোনিয়া ও স্ক্লেরোশিয়ামজনিত রোগে এবং ফাইটফথোরাজনিত অ্যাভোকাডোর শিকড় পচা রোগে ব্যবহার করে সুফল পাওয়া গেছে। ইদানীংকালে সিস্টেমিক ফাঙ্গিসাইডের সঙ্গে সাধারণ ফাঙ্গিসাইড মিশিয়ে তৈরী কিছু ফাঙ্গিসাইডও পাওয়া যাচ্ছে।

বিভিন্ন সিস্টেমিক ফাঙ্গিসাইড গাছের দেহে প্রবেশের পর জাইলেমের মাধ্যমে উপরদিকে ছড়ায়, ফ্লোয়েমের মাধ্যমে নীচের দিকে ছড়ানোর বিশেষ কোন প্রমাণ নেই। এই ধরণের ফাঙ্গিসাইড নিয়মিতভাবে ব্যবহার হলে ছত্রাকে এদের প্রতি সহনশীলতা গড়ে ওঠে। এই সম্ভাবনা এড়াতে হলে কোন রোগের নিয়ন্ত্রণের জন্য মাত্র সেই রোগের বিরুদ্ধে কার্যকরী (specific) এরকম ফাঙ্গিসাইড ব্যবহার না করে অনেক রোগের বিরুদ্ধে কার্যকরী (broad spectrum) এমন ফাঙ্গিসাইড ব্যবহার করলে ভাল হয়। তাছাড়া মাঝে মাঝে ফাঙ্গিসাইড বদল করে বা একাধিক ফাঙ্গিসাইডের মিশ্রণ ব্যবহার করতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যেন প্রয়োজনের থেকে কম মাত্রায় (sublethal dose) ফাঙ্গিসাইড কখনও ব্যবহার না করা হয়।

ফাঙ্গিসাইডের ক্রিয়াপদ্ধতি (Nature of fungicidal action)

বিভিন্ন ফাঙ্গিসাইড কিভাবে ছত্রাককে নষ্ট বা নিষ্ক্রিয় করে ফেলে সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকলে নূতন নূতন ফাঙ্গিসাইডের উদ্ভাবন সহজ হয়। অধিকাংশ ফাঙ্গিসাইড জলে অল্প পরিমাণে দ্রবীভূত হয় মাত্র। গাছের ত্বকের উপর ফাঙ্গিসাইড জমলে সেখানে দেহকোষ থেকে যে নির্যাস বেরিয়ে আসে সেটাই ফাঙ্গিসাইডকে যথেষ্ট পরিমাণে দ্রবীভূত হতে সাহায্য করে বলে মনে করা হয়। দ্রবীভূত অবস্থায় ফাঙ্গিসাইড ছত্রাকের স্পোরের বা হাইফার কোষের মধ্যে প্রবেশ করে। ভিতরে প্রবেশের পর ফাঙ্গিসাইডের প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার ফলে কোষটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সব ফাঙ্গিসাইডের ক্রিয়াপদ্ধতি একরকম নয়। বিভিন্ন

ক্ষেত্রে ফাঙ্গিসাইড কোষের প্লাজমা আবরণী নষ্ট করে ভেদ্যতায় পরিবর্তন আনে, গুরুত্বপূর্ণ এনজাইমের ক্রিয়ায় বাধার সৃষ্টি করে, এনজাইমকে নষ্ট বা নিষ্ক্রিয় করে ফেলে, জারণ-বিজারণ সংক্রান্ত বিক্রিয়াগুলিতে বাধার সৃষ্টি করে বা প্রোটিন, DNA; RNA অথবা শারীরবৃত্তীয় বিক্রিয়ার পক্ষে অপরিহার্য কোন যৌগের সংশ্লেষে বাধা দেয়। আবার কোথাও কোথাও এমন প্রমাণ রয়েছে যে ফাঙ্গিসাইড কোষের উপাদান তৈরীতে বাধার সৃষ্টি করে নূতন কোষের বা হাইফার গঠনে ব্যাঘাত ঘটায়। সিস্টেমিক ফাঙ্গিসাইড দেহের ভিতরে ছত্রাকের সংস্পর্শে এলে একইভাবে ক্রিয়া করে সেখানে ছত্রাককে নষ্ট বা নিষ্ক্রিয় করে ফেলে রোগ নিরাময় সম্ভব করে তোলে।

অ্যান্টিবায়োটিক (Antibiotics)

মানুষের ও পশুর চিকিৎসায় অ্যান্টিবায়োটিকের বিরাট সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে গাছের রোগ নিয়ন্ত্রণে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে, কিন্তু অল্প দু-একটি ক্ষেত্রে ছাড়া সাফল্যের বিশেষ নজীর নেই।

স্ট্রেপ্টোমাইসিন (streptomycin) গ্রাম পজিটিভ ও গ্রাম নেগেটিভ উভয় ধরণের ব্যাকটিরিয়ার বিরুদ্ধেই সক্রিয়, তবে রোগ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে যে মাত্রায় ব্যবহার করতে হয় তাতে গাছের ক্ষতি হয় বলে ব্যবহার সাধারণতঃ হয় না। কিছু বীজবাহিত ব্যাকটিরিয়াজনিত রোগের ক্ষেত্রে বীজ শোধনের জন্য স্ট্রেপ্টোমাইসিনের ব্যবহার জানা আছে। অক্সিটেট্রাসাইক্লিন (oxytetracycline) ধরণের যৌগ টেরামাইসিন (Terramycin) স্প্রে হিসাবে ব্যবহার করে মাইকোপ্লাজমাজনিত রোগের ক্ষেত্রে আংশিকভাবে সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয়েছে। এর ব্যবহারে সাময়িকভাবে উপশম হলেও রোগ নিরাময় হয় না। দেখা গেছে যে স্ট্রেপ্টোমাইসিনের নিয়ত ব্যবহারের ফলে সহনশীল জাতির ব্যাকটিরিয়ার উদ্ভব হয়। কিন্তু স্ট্রেপ্টোমাইসিনের সঙ্গে অক্সিটেট্রাসাইক্লিনের মিশ্রণ ব্যবহার করলে তা হয় না। এই রকম একটি মিশ্রণ হল অ্যাগ্রিমাইসিন-১০০ (Agrimycin-100)। এতে ১৫% স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ও ১—৫% টেরামাইসিন থাকে। বিভিন্ন গাছের ক্রাউন গল, আপেল ও ন্যাসপাতির ফায়ার ব্লাইট, বীনের হ্যালো ব্লাইট, তুলার জ্যান্থোমোনাস *(X. malvacearum)* জনিত রোগ, আলুর সফ্ট রট (c.o. *Erwinia carotovora*) ইত্যাদি ব্যাকটিরিয়াজনিত রোগের নিয়ন্ত্রণে অ্যাগ্রিমাইসিন-১০০ ব্যবহার করা হয়।

কিছু অ্যান্টিবায়োটিক ছত্রাকজনিত রোগের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ব্লাস্টিসিডিন (Blasticidin-S) ও কাসুগামাইসিন (Kasugamycin) ধানের ঝলসা রোগ নিয়ন্ত্রণে অতি নির্ভরযোগ্য দুটি অ্যান্টিবায়োটিক। দুটিই গাছের দেহের ভিতরে প্রবেশ করে আক্রান্ত অংশে ছত্রাককে নষ্ট করে ও গাছে নূতন আক্রমণ প্রতিরোধ করে। কাসুগামাইসিনের কার্যকারিতা তুলনামূলকভাবে বেশী। জাপানে ঝলসা রোগ নিয়ন্ত্রণে এই দুটি অ্যান্টিবায়োটিক বিস্তৃতভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ভারতে আবিষ্কৃত অরিওফাঞ্জিন (Aureofungin) ছত্রাকজনিত কিছু রোগে ব্যবহার করা হয়। এটি গাছের দেহের ভিতরে প্রবেশের পর কিছুটা ছড়ায়। আপেলের ছাতাধরা, আঙ্গুরের ছাতাধরা ও ডাউনি মিলডিউ, পীচের ব্রাউন রট, লেবুর ফাইটফথোরাজনিত 'গামোসিস' (gummosis), যবের লীফ স্ট্রাইপ, ধানের বাদামী দাগ ইত্যাদি রোগে স্প্রে হিসাবে অরিও-ফাঞ্জিন ব্যবহার করে বেশ ভাল ফল পাওয়া গেছে। সাইক্লোহেক্সিমাইড (cycloheximide), যার প্রচলিত নাম অ্যাক্টিডায়োন (Actidione), পাইনের মরিচা (c. o. *Cronartuim commandrae*), পেঁয়াজের নেক রট (c. o. *Botrytis alii*), কুসুম গাছের মরিচা (c. o. *Puccinia carthami*) ইত্যাদি কয়েকটি রোগের নিয়ন্ত্রণে সফল, কিন্তু যেহেতু গাছের ক্ষতি করে সেজন্য এর বিশেষ ব্যবহার হয় না। আর একটি অ্যান্টিবায়োটিক গ্রিসিওফুলভিন (Griseofulvin) ব্যবহার করে পাউডারি মিলডিউ ও বট্রাইটিসজনিত রোগ ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু দাম খুব বেশী হওয়ায় সাধারণতঃ ব্যবহার হয় না।

রোগ প্রতিরোধী জাতির নির্বাচন ও সৃষ্টির মাধ্যমে রোগ নিয়ন্ত্রণ

অনেক সময় চাষের প্রয়োজনে এমন জাতির গাছ লাগাতে হয় যার ফলন ভাল ও অন্য অনেক গুণ আছে কিন্তু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উঁচু মানের নয়। সেক্ষেত্রে ভাল ফলন পাবার আশার সঙ্গে রোগজনিত ক্ষতির সম্ভাবনাও থেকে যায়। তাছাড়া যেসব জাতির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশ উঁচু মানের তারাও যে সব অবস্থাতেই নীরোগ থাকে তা নয়। প্রকৃতিতে পরিব্যক্তিজনিত যে নানা রকম পরিবর্তন জীনের স্তরে ঘটে চলেছে তার ফলে রোগ উৎপাদকের অনেক নূতন জাতির সৃষ্টি হয় যার মধ্যে কোনটি হয়ত গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিপর্যস্ত করে সেখানে রোগ সৃষ্টি করতে পারে। রোগের আক্রমণ হলে অবশ্য ফাঞ্জিসাইড ইত্যাদি প্রয়োগ করে রোগ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা যায় এবং অনেক ক্ষেত্রেই সেই প্রচেষ্টা সফল হয়। এ সত্ত্বেও যদি নির্বাচন বা সম্ভব হলে

সৃষ্টির মাধ্যমে উচ্চ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন কোন জাতি পাওয়া যায় তাহলে অনেক নিশ্চিন্তভাবে চাষ করা যায় এবং রাসায়নিক উপায়ে রোগ নিয়ন্ত্রণের যে বিরাট ঝুঁকি ও খরচ তাও এড়ানো সম্ভব হয়। ইদানীংকালে সঙ্করায়ণের মাধ্যমে শুধু ভাল ফলন দেয় এরকম নয় যথেষ্ট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও আছে এমন নূতন জাতি সৃষ্টির উপর কৃষিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে বহুমুখী প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে চাষ হয় বা আগে চাষ হত এরকম অনেক জাতির এমনকি বিদেশ থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন জাতির মধ্য থেকেও রোগ প্রতিরোধী জাতি বাছাই (selection) করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে, প্রয়োজন হলে, বাছাই করা জাতির সঙ্গে ভাল ফলন দেয় ও চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এরকম জাতির সঙ্করায়ণের মাধ্যমে এমন নূতন জাতি সৃষ্টির চেষ্টা করা হয় যাতে একসঙ্গে ভাল ফলন ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুটি গুণই বর্তমান। তবে কিছু সমস্যাও আছে। সঙ্করায়ণের মাধ্যমে কোন বিশেষ রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন যে নূতন জাতি সৃষ্টি হয় তার অন্য একটি রোগ উৎপাদকের আক্রমণে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। সেক্ষেত্রে সঙ্করায়ণের দ্বারা একই জাতিতে বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা আনার চেষ্টা করতে হয়। এইভাবে নূতন জাতি সৃষ্টির কাজ শুধু যে কঠিন ও সময়সাধ্য তাই নয় ব্যয়সাধ্যও বটে। তাছাড়া নূতন সৃষ্ট রোগ প্রতিরোধী জাতি বেশী দিন চাষের উপযোগী থাকে না কারণ সাধারণতঃ পরিবেশে কয়েক বছরের মধ্যেই এর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে অতিক্রম করে রোগ সৃষ্টি করতে পারে এরকম জীবাণুর আবির্ভাব ঘটে। বিশ্ববিখ্যাত কৃষি-বিজ্ঞানী ও সবুজ বিপ্লবের (green revolution) পুরোধা বোর্লগের (N. E. Borlaug, 1965) মতে সঙ্করায়ণের ফলে সৃষ্ট মরিচা রোগ প্রতিরোধী গমের জাতি ৫ বছরের বেশী চাষের উপযোগী থাকে না। সেজন্য এই ধরণের কাজ প্রায় একটানা চালিয়ে যেতে হয়।

বিফেন (R. H. Biffen, 1905) প্রথম দেখতে পান যে গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অন্যান্য গুণাবলীর মতই জীনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং মেণ্ডেলের সূত্রানুসারেই এক জনু থেকে পরবর্তী জনুতে যায়। জীনতত্ত্বের দিক থেকে দেখলে দেখলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একটি বা কয়েক জোড়া মুখ্য জীনের দ্বারা (mono- or oligogenic resistance) অথবা অনেক জোড়া গৌন জীনের দ্বারা (polygenic resistance) নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রথম ক্ষেত্রে গাছ রোগ উৎপাদকের অল্প কিছু জাতির বিরুদ্ধে উঁচু মানের অর্থাৎ খাড়া প্রতিরোধ ক্ষমতার

পরিচয় দেয় আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রায় সব জাতির বিরুদ্ধে কিছুটা অর্থাৎ সমান্তরাল প্রতিরোধ ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে। অর্টন (W. Orton, 1907) প্রথম সঙ্করায়ণের মাধ্যমে তরমুজের ফিউজেরিয়াম উইল্ট প্রতিরোধী নূতন জাতির সৃষ্টি করেন। সমান্তরাল প্রতিরোধ ক্ষমতার তুলনায় খাড়া প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সঙ্করায়ণ অনেক সহজ প্রধানতঃ দুটি কারণে। প্রথমতঃ অনেকগুলি জীনের তুলনায় একটি দুটি জীন নিয়ে কাজ করা অনেক সুবিধাজনক। দ্বিতীয়তঃ নূতন সৃষ্ট জাতিতে খাড়া রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে উচ্চতর ক্ষমতা যত সহজে চোখে পড়ে সমান্তরাল রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে তা হয় না। এইসব কারণে সঙ্করায়ণের কাজ প্রধানতঃ খাড়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর নির্ভর করেই হয়েছে। তবে সমস্যা হল এই যে খাড়া প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন নূতন সৃষ্ট জাতিটি তার পরিবেশে প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী জীনের অনুপূরক জীন সম্পন্ন রোগ জীবাণুর নূতন কোন জাতি এসে পড়লে ভীষণভাবে রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে কেননা তখন তার প্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারে কার্যকরী হয় না। সঙ্করায়ণের মাধ্যমে সমান্তরাল প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন নূতন জাতির সৃষ্টি হলে সেটি রোগ-উৎপাদকের কোন জাতির বিরুদ্ধে উঁচু মানের প্রতিরোধ ক্ষমতার পরিচয় দেবে না ঠিকই কিন্তু হঠাৎ রোগ উৎপাদকের নূতন জাতির আবির্ভাব হলে তার প্রতিরোধ ক্ষমতা ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার কোন সম্ভাবনাও নেই। ইদানীংকালে এমন ধারণা গড়ে উঠছে যে সঙ্করায়ণের মাধ্যমে একই গাছে খাড়া ও সমান্তরাল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অর্থাৎ ঐ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী একটি-দুটি মুখ্য জীনের সঙ্গে কিছু গৌন জীনের একত্র সমাবেশ করতে পারলে সব থেকে ভাল হয়। ইদানীংকালে অনেকে অবশ্য রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে কোন মুখ্য জীনের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন।

রোগ প্রতিরোধী জাতির নির্বাচন

গাছের নূতন রোগ প্রতিরোধী জাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সঙ্করায়ণের জন্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতির নির্বাচন প্রয়োজন অর্থাৎ নানা জাতির মধ্য থেকে ঐ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতিগুলিকে বেছে নিতে হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে এর জন্য অনুসন্ধান চালাতে হয়। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে চাষ হচ্ছে এমন সব জাতি সংগ্রহ করে একযোগে তাদের উপর পরীক্ষা চালিয়ে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দেখে বাছাই করতে হয়। আগে চাষ হত, নানা কারণে বর্তমানে চাষ হয় না এমন সব জাতিকেও অনেক সময় এই ধরণের বাছাই প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত

করা হয় যদি তাদের মধ্যে উচ্চ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার সন্ধান পাওয়া যায় এই আশায়। এইভাবে বাছাই এর মাধ্যমে ফিউজেরিয়াম উইল্ট প্রতিরোধী তুলা, তিসি ও বাঁধাকপির জাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রয়োজন হলে বিদেশ থেকেও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতি সংগ্রহ করা হয়। প্রথমে দেখে নিতে হয় এইসব জাতির চাষ স্থানীয় পরিবেশে সম্ভব কিনা এবং সেখানে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কতটা কার্যকরী। একে বলা হয় বিদেশী গাছের স্বদেশে উপস্থাপন (plant introduction)। এইভাবে ভারতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে ধান, গম, ভুট্টা, আখ, চীনাবাদাম ও আরও অনেক শস্যের নূতন জাতি সংগ্রহ করে আনা হয়েছে যাদের ব্যবহার করে সঙ্করায়ণের মাধ্যমে বিশেষ ফললাভ করা গেছে। ভারতে চাষ করা হয় এমন গাছের বিদেশী জাতির সংগ্রহ ও উপস্থাপনের কাজ তদারক করেন দিল্লীস্থিত ভারতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (Indian Agricultural Research Institute = IARI) Division of Plant Introduction। এখানে ২৫,০০০ এর মত বিভিন্ন শস্যের দেশ ও বিদেশ থেকে সংগ্রহ করা জাতি (germplasm) সংরক্ষিত আছে। শস্যভিত্তিক কেন্দ্রীয় গবেষণাগারগুলিতে, যেমন—কটকে কেন্দ্রীয় ধান্য গবেষণাগার, কোয়েম্বাটোরে কেন্দ্রীয় ইক্ষু গবেষণাগার ইত্যাদিতে, এই ধরণের বড় সংগ্রহশালা রয়েছে। প্রয়োজন হলে শস্যের উৎপত্তিস্থল পৃথিবীর যে অঞ্চলে সেখানেও খোঁজ করা হয়। সেখানে রোগ প্রতিরোধী জাতি বা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত ও ঐ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন অন্য কোন প্রজাতির গাছেরও সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। আলুর নাবি ধসা রোগের ক্ষেত্রে মেক্সিকোতে সোলেনাম ডেমিস্যাম (*Solanum demissum*) প্রজাতির গাছে এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী জীনের সন্ধান পাওয়া যায় যাকে ব্যবহার করে সঙ্করায়ণের মাধ্যমে আলুর রোগ প্রতিরোধী জাতির সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। একই ভাবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী জীনের উৎস হিসাবে টম্যাটোর রোগের ক্ষেত্রে লাইকোপার্সিকাম পিম্পিনেল্লীফোলিয়াম (*Lycopersicum pimpinellifolium*) ও আখের রোগের ক্ষেত্রে স্যাকারাম স্পনটেনিয়াম (*Saccharum spontaneum*) ব্যবহৃত হয়েছে। ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত হলেও বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে সঙ্করায়ণে সাফল্যের পথে অনেক বাধা থাকে। প্রথম হল বন্ধ্যাত্বের (sterility) সম্ভাবনা। দ্বিতীয়তঃ সময় লাগে অনেক বেশী। তাছাড়া সঙ্করায়ণের ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার সঙ্গে অন্য এমন কিছু বৈশিষ্ট্যও সংযুক্ত অবস্থায় উত্তরাধিকারসূত্রে (linked inheritance) নূতন জাতিটিতে এসে পড়তে পারে যা ঐ শস্যের চাষের দিক থেকে মোটেই

কাম্য নয়। তখন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থেকে এই বৈশিষ্ট্যটিকে বিযুক্ত করার প্রয়োজন হয়। এইভাবে বিভিন্ন প্রচেষ্টার ফলে সঙ্করায়ণের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন ও চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী একটি নূতন জাতির সৃষ্টি হলেও সেটি মাত্র একটি রোগের আক্রমণই প্রতিরোধ করতে পারে, অন্যান্য রোগ প্রতিরোধের কোন ক্ষমতা সাধারণতঃ তার থাকে না। যেহেতু সব শস্যই সাধারণতঃ বেশ কয়েকটি গুরুতর রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং নিবিড় চাষের ফলে এই ধরনের সম্ভাবনা অনেক বেড়েছে, সেজন্য ইদানীংকালে পর্যায়-ক্রমিক সঙ্করায়ণের মাধ্যমে একটি নূতন জাতিতে একাধিক মারাত্মক রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা একত্রিত করার প্রচেষ্টাও শুরু হয়েছে। তামাকের ক্ষেত্রে এইভাবে পাঁচটি বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে সক্ষম জাতির সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে বলে জানা যায়।

উপরে বর্ণিত বিভিন্ন উৎস থেকে যদি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী উপযুক্ত জীনের সন্ধান না পাওয়া যায় বা অত্যন্ত সীমিতভাবে পাওয়া যায়, তখন আলট্রাভায়োলেট (ultraviolet ray) বা গামা রশ্মি (gamma ray) অথবা বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগ প্রয়োগ করে কৃত্রিম উপায়ে পরিব্যক্তির (mutation) মাধ্যমে নূতন জাতি সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালানো হয়। অজস্র মিউট্যাণ্ট তৈরী করলে তার থেকে প্রাথমিক বাছাই এর পর কয়েক বছর নির্বাচনের কাজ চালালে হয়ত একটি দুটি যথেষ্ট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রজাতির সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। তবে এগুলি চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী না হতেও পারে।

সঙ্করায়ণের পদ্ধতি

স্ব-পরাগিত (self-pollinated) ও ইতর পরাগিত (cross-pollinated) শস্যের ক্ষেত্রে সঙ্করায়ণ ও সংশ্লিষ্ট পদ্ধতিগুলি মোটামুটি এক ধরণের হলেও কিছুটা পার্থক্য আছে। সঙ্করায়ণের আগে বেছে নেওয়া বিভিন্ন জাতি (variety) বা ধারার (line) মধ্যেও কিছুটা নির্বাচনের প্রয়োজন হয়। স্ব-পরাগিত শস্যের ক্ষেত্রে দুভাবে এটি করা হয়, যথা গণ বাছাই বা ম্যাস সিলেকশন (mass selection) ও বিশুদ্ধ ধারার জন্য বাছাই বা পিওর লাইন সিলেকশন (pure line selection)। গণ বাছাই এর ক্ষেত্রে চাষের জমি বা ছোট প্লট থেকে আপাতদৃষ্টিতে এক রকম কিছু গাছ বেছে নেওয়া হয় এবং তাদের বীজগুলি একত্রে সংগ্রহ করা হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে একটি গাছে স্ব-পরাগযোগের ফলে উৎপন্ন বীজ থেকে যেসব গাছ হয় তাদের মধ্যে থেকে

আবার বাছাই করা হয়। পরপর কয়েক বছর বাছাই করলে জীনগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বিশুদ্ধ জাতির গাছ পাওয়া যেতে পারে। ইতর পরাগিত শস্যের ক্ষেত্রে উপরোক্ত ব্যবস্থা ছাড়াও আরও কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বাছাই করা কয়েকটি গাছ থেকে সংগৃহীত বীজ মিশিয়ে নিয়ে ছোট প্লটে লাগানো হয় এবং সেখান থেকে বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তুলনামূলকভাবে উন্নততর কয়েকটি গাছ বেছে নেওয়া হয়। এই পদ্ধতিকে বলে 'প্রজেনি সিলেকশন (progeny selection)। ইতর পরাগিত শস্যের ক্ষেত্রে কদাচিৎ বেছে নেওয়া একটি গাছের উপর নির্ভর করে পরবর্তী স্তরে বাছাই করা হয় কারণ তাতে নিজেদের মধ্যে সঙ্করায়ণের (inbreeding) ফলে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে। বরঞ্চ পুনঃ পুনঃ বাছাই (recurrent selection) এর মাধ্যমে বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে উপযোগী জাতির গাছ বেছে নেওয়া সম্ভব বলে মনে হয়।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর নির্ভর করে বাছাই এর পর নির্বাচিত জাতি বা ধারাটির সঙ্গে ফলন ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী একটি জাতির সঙ্করায়ণ (intervarietal crossing) করা হয়। স্ব-পরাগিত শস্যের ক্ষেত্রে দুটি জাতির মধ্যে সঙ্করায়ণ হয়। ইতর পরাগিত শস্যের ক্ষেত্রে দুটি জাতির মধ্যে ছাড়াও নিকট সম্পর্কযুক্ত অন্য একটি প্রজাতির সঙ্গে সঙ্করায়ণ (interspecific crossing) হতে পারে।

সঙ্করায়ণের পর উৎপন্ন বীজ থেকে যে অনেক গাছ হয় তার মধ্য থেকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, ফলন ও অন্যান্য অনুমোদনযোগ্য বৈশিষ্ট্যের জন্য বাছাই করা হয়। প্রথম বাছাই হয় F_2 জনুতে। প্রতিটি বাছাই করা গাছের বীজ থেকে পাওয়া গাছের মধ্যে আবার বাছাই করা হয় পরবর্তী জনুতে এবং এইভাবে চলতে থাকে যতদিন না জীনগত বিশুদ্ধতার (genetic purity) লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়। একে বিশুদ্ধ বংশ ধারার জন্য নির্বাচন (pure line selection = pedigree selection) বলা হয়। অন্য পদ্ধতিতে (bulk population method) প্রাথমিক নির্বাচন আরও পরবর্তী পর্যায়ে—F_5 বা F_6 জনুতে করা হয়। সঙ্করায়ণের পর এমনও দেখা যায় যে নূতন সঙ্কর জাতির গাছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গেলেও অন্য প্রয়োজনীয় গুণের অভাব রয়েছে। তখন সঙ্কর জাতির গাছ ও গোড়াতে সঙ্করায়ণের জন্য ব্যবহৃত দুটি জাতির মধ্যে যেটিতে ঐ গুণগুলি রয়েছে তার মধ্যে আবার সঙ্করায়ণ করা হয়। একে বলা হয় 'ব্যাক ক্রস' (back cross)। প্রয়োজনে নির্বাচিত

গাছের সঙ্গে একাধিকবার back cross হতে পারে যতক্ষণ না রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার সঙ্গে অন্যান্য প্রয়োজনীয় গুণের একত্র সমাবেশ ঘটে।

নির্বাচন ও সঙ্করায়ণের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধী নূতন কোন জাতি পাওয়া গেলে চাষের জন্য সুপারিশ করার আগে তাকে নিয়ে বিস্তৃতভাবে পরীক্ষা -নিরীক্ষার প্রয়োজন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চাষ করে দেখতে হবে বিভিন্ন পরিবেশে ফলন কেমন হয় ও রোগ উৎপাদকের বিভিন্ন জাতির বিরুদ্ধে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কতটা কার্যকরী। যদি দেখা যায় যে রোগ উৎপাদকের কোন একটি মাত্র জাতির বিরুদ্ধেও এই রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কাজ করছে না অর্থাৎ গাছ তার আক্রমণের ফলে রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ছে তাহলে নূতন জাতিটিকে সাধারণ চাষের জন্য সুপারিশ করা যাবে না। রোগের প্রবল আক্রমণের বিরুদ্ধে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার কার্যকারিতা যাচাই করতে পারলেই সব থেকে ভাল হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশে সব সময় তা ঘটে না। এই উদ্দেশ্যে জমি-বাহিত রোগের বিরুদ্ধে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যাচাই এর জন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন কৃষি খামারে অনেক সময় উচ্চ মাত্রায় জীবাণু অধ্যুষিত অর্থাৎ অসুস্থ জমি বা 'সিক প্লট' (sick plot) তৈরী করা হয়। কৃত্রিম উপায়ে জমিতে বারবার জীবাণু বা রোগগ্রস্ত গাছের অংশগুলি মিশিয়ে দিয়ে এই অবস্থার সৃষ্টি করা হয়। অন্যান্য জাতির সঙ্গে নূতন জাতিটির বীজ সিক প্লটের জমিতে বুনে দেখতে হয় গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কতটা কার্যকরী। বাতাসবাহিত রোগের ক্ষেত্রে গাছে ছত্রাকের স্পোর বা ব্যাকটিরিয়ার সাসপেনসান স্প্রে করে ছড়িয়ে দিয়ে কৃত্রিম উপায়ে রোগের জোরালো আক্রমণ সৃষ্টি করা হয়। পরপর কয়েক বছর পরীক্ষা চালিয়ে যদি দেখা যায় যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিভিন্ন পরিবেশে যথেষ্ট সক্রিয় রয়েছে তখন নূতন জাতিটিকে চাষের জন্য সুপারিশ করা হয়। রোগ প্রতিরোধী যে নূতন জাতিরই সৃষ্টি হোক না কেন সেটি দীর্ঘকাল ধরে সব অবস্থায় রোগের আক্রমণ সফলভাবে প্রতিরোধ করতে থাকবে এটা আশা করা যায় না। সুতরাং নূতন রোগ প্রতিরোধী জাতি সৃষ্টির কাজ একাদিক্রমে চালিয়ে যেতে হবে যাতে প্রয়োজনের সময় উপযুক্ত রোগ প্রতিরোধী জাতির অভাবে চাষের বড় রকমের ক্ষতি না হয়। তাছাড়া প্রায় পৃথিবী জুড়ে চাষ হয় এরকম শস্যের মারাত্মক রোগগুলির ক্ষেত্রে অন্ততঃ বিভিন্ন দেশে নির্বাচন ও সঙ্করায়ণের মাধ্যমে রোগ-প্রতিরোধী জাতি সৃষ্টির কাজ চালানোর প্রয়োজন রয়েছে। এর ফলে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী জীনের সর্বোত্তম ব্যবহার সম্ভব হতে পারে।

সঙ্করায়ণের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধী জাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে যে সব শস্য নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হল।

গম ঃ মরিচা রোগ প্রতিরোধী গমের জাতি সৃষ্টির কাজ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ও ক্যানাডায় অনেকদিন থেকেই চলছিল। গমের উৎপত্তিস্থল মধ্য এশিয়ায়, ট্রান্সককেশিয়ার (Transcaucasia) পার্বত্য অঞ্চলে, রোগ প্রতিরোধী জীনের সন্ধান পাওয়া যায়। ঐ অঞ্চলে পাওয়া ট্রিটিকাম টিমোফীভিআই (*Triticum timopheevii*) গাছই মরিচা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী জীনের প্রধান উৎস। এই গাছের অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী জীনও রয়েছে। এ ছাড়াও ঐ অঞ্চলে পাওয়া ট্রিটিকামের অন্য কিছু প্রজাতি (*T. militinae, T. persicum, T. timonovum, T. fungicidum* ইত্যাদি) ও এজিলপস আম্বেল্লুলাটা (*Aegilops umbellulata*) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী জীনের উৎস হিসাবে বিভিন্ন প্রজাতির গমের (*T. vulgare, T. durum T. monococcum* ইত্যাদি) সঙ্গে সঙ্করায়ণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। ভারতে পাল (B. P. Pal), মেটার (K. C. Mehta) সহযোগিতায় ১৯৩০ সালে মরিচা রোগ প্রতিরোধী জাতি সৃষ্টির উদ্দেশে কাজ শুরু করেন। এর ফলে NP 770 ও NP 809 দুটি ভাল রোগ প্রতিরোধী জাতির উদ্ভব হয়। জাপান থেকে পাওয়া খর্বতা (dwarfness) নিয়ন্ত্রণকারী 'নোরীন' (Noreen) জীন ব্যবহার করে বোর্লগ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে মেক্সিকোতে খর্ব ও বিভিন্ন মরিচা রোগ প্রতিরোধী গমের নূতন জাতির সৃষ্টি করে পৃথিবীতে সবুজ বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন। মেক্সিকো থেকে পাওয়া সোনোরা—৬৪ (Sonora—64), লার্মা রোয়ো (Lerma Rojo 64A) ও আরও কিছু সঙ্কর গমের জাতি বা ধারাকে ব্যবহার করে ভারতে পরবর্তীকালে নির্বাচন ও সঙ্করায়ণের মাধ্যমে পরবর্তী সোনোরা, কল্যাণসোনা, সোনালিকা, অর্জুন ইত্যাদি রোগ প্রতিরোধী ও ভাল জাতির গমের সৃষ্টি করা হয়েছে। ভারতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ও উত্তর ভারতের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই ধরণের নূতন জাতি সৃষ্টির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

ধান ঃ ভারতে সঙ্করায়ণের মাধ্যমে ধানের নূতন জাতি সৃষ্টির কাজ আরম্ভ হয় বিশের দশকে। এর ফলে ১৯৪৮ সালে ঝলসা রোগ প্রতিরোধী Co 25 এবং কিছুকাল পরে অনুরূপ একটি জাতি Co 29 পাওয়া যায়। কটকে ১৯৪৬ সালে কেন্দ্রীয় ধান্য গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে এই ব্যাপারে উদ্যোগ আয়োজন অনেক বেড়েছে এবং সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টাও চালানো হচ্ছে।

ফিলিপাইনসের ম্যানিলায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান (International Rice Research Institute) বিশ্বে ধান সংক্রান্ত গবেষণার সর্বপ্রধান কেন্দ্র। লম্বা 'ইণ্ডিকা' (Indica) ও খর্বকায় 'জ্যাপোনিকা' (Japonica) শ্রেণীর ধানের মধ্যে সঙ্করায়ণের মাধ্যমে খর্বকায় ও উচ্চ ফলনশীল ধানের নূতন জাতি সৃষ্টির প্রচেষ্টার সঙ্গে বিভিন্ন মারাত্মক রোগের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রতিরোধী জাতি সৃষ্টির চেষ্টাও প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবেই চলেছে। এর ফলে ভারত ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে সংগ্রহ করা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী জীন ব্যবহার করে বেশ কিছু উঁচু মানের রোগ প্রতিরোধী ধানের জাতির সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। অনেক সময় একটি জাতির গাছে একাধিক রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাও দেখা গেছে। ঝলসা ও ব্যাকটিরিয়াজনিত পাতা ধসা রোগের আক্রমণ IR-শ্রেণীভুক্ত জাতির ধান মোটামুটিভাবে প্রতিরোধে সক্ষম। তিনটি জাতি, IR-28, IR-29 ও IR-30, একাধারে পাতা ধসা, ভাইরাসজনিত টুংরো ও গ্র্যাসি স্টাণ্ট রোগ প্রতিরোধী। এদের মধ্যে প্রথম দুটি আবার ঝলসা রোগ প্রতিরোধেও সক্ষম। আরও দুটি ঝলসা রোগ প্রতিরোধী জাতি হল IR-32 ও IR-34। এরা পোকার আক্রমণের বিরুদ্ধেও সক্রিয়। এর থেকে মনে হয় যে সঙ্করায়ণের মাধ্যমে কোন একটি জাতিতে একাধিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার একত্র সমাবেশ ঘটানো সম্ভব হতে পারে।

আখ ঃ ভারতে যে দুটি রোগের আক্রমণ থেকে আখ চাষের বিশেষ ক্ষতি হয়, যথা—লাল ধসা ও ভূষা, তাদের বিরুদ্ধে রোগ প্রতিরোধী জাতি সৃষ্টির প্রচেষ্টা এদেশে কোয়েম্বাটোরে অনেকদিন থেকে চলে আসছে। স্যাকারাম স্পনটেনিয়ামের (*Saccharum spontaneum*) লাল ধসা ও মোজেইক রোগের বিরুদ্ধে আর স্যাকারাম অফিসিনেরামের (*S. officinarum*) ভূষা রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে। উন্নত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতি সৃষ্টির প্রচেষ্টায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী জীনের উৎস হিসাবে সঙ্করায়ণের জন্য প্রয়োজনবোধে এদের ব্যবহার করা হয়েছে। এইভাবে কিছু উন্নত ধরনের রোগপ্রতিরোধী আখের জাতির সৃষ্টি হয়েছে, যেমন—লাল ধসার ক্ষেত্রে Co 1261, Co 1214 এবং Co 1053 ও ভূষা রোগের ক্ষেত্রে Co 449 এবং Co 527।

আলু ঃ নাবি ধসা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী R জীনের উৎস হল আলুর উৎপত্তিস্থল মেক্সিকো অঞ্চলের বুনো আলুর (*Solanum demissum*) গাছ। এর থেকে এ পর্যন্ত নয়টি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী জীনের

সন্ধান পাওয়া গেছে। সঙ্করায়ণের মাধ্যমে এই ধরণের এক বা একাধিক জীন নিয়ে নূতন রোগ প্রতিরোধী জাতি সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে এবং যথেষ্ট সাফল্য লাভ করা গেছে। ভারতে কেন্দ্রীয় আলু গবেষণাগারে (Central Potato Research Institute) নির্বাচন ও সঙ্করায়ণের মাধ্যমে 'কুফরি' শ্রেণীর কিছু নূতন জাতির সৃষ্টি হয়েছে যেগুলি ভাল ফলন দেয় ও বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা রাখে। এখান অন্যান্য রোগ, যথা ওয়ার্ট, ভাইরাস ও নিমাটোডজনিত রুট নট ইত্যাদির বিরুদ্ধেও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন জাতি সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলেছে।

তুলা: সঙ্করায়ণের মাধ্যমে তুলার নূতন জাতি সৃষ্টির কাজ প্রধানতঃ ফিউজেরিয়াম উইল্ট ও পাতায় কোণাচে দাগ বা 'ব্ল্যাক আর্ম (*Xanthomonas malvacearum*) রোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। ভারতে দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার ফলে গসিপিয়ামের (*Gossypium*) বিভিন্ন প্রজাতির বিশেষ বিশেষ জাতির (*G. herbaceum* var. *frutescens*, *G. arboreum* var. *neglectum* f. *bengalensis* ও *G. arboreum* var. *neglectum* f. *indica*) মধ্য থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে কয়েকটি উইল্ট রোগ প্রতিরোধী জাতির সৃষ্টি হয়েছে যাদের মধ্যে জয়ধর, বিজয়, প্রতাপ ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গসিপিয়ামের দুটি প্রজাতির (*G. herbaceum* ও *G. arboreum*) ব্ল্যাক আর্ম রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা আছে। এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী পাঁচটি মুখ্য জীনের সন্ধান পাওয়া গেছে যাদের ব্যবহার করে সঙ্করায়ণের মাধ্যমে নূতন রোগ প্রতিরোধী জাতি সৃষ্টির চেষ্টা চলছে।

প্রাসঙ্গিক পুস্তক ও গবেষণাপত্রাদি

Baker, K.F., and R. J. Cook. 1974. "Biological Control of Plant Pathogens." W. H. Freeman, San Fransisco.

Browning, J. A., and K B. Fry. 1969. Multiline cultivar as a means of disease control. *Ann. Rev. Phytopathol.* 7 : 355-382.

Chattopadhyay, S. B. 1980. "Principles and Procedures of Plant Protection". Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi. 480 pp.

Eckert. J.W., and N. F. Sommer. 1967. Control of diseases of fruits and vegetables by post-harvest treatment. *Ann. Rev. Phytopathol.* 5 : 391-432.

Erwin, D. C. 1973. Systemic fungicides : Disease control, translocation, and mode of acion. *Ann. Rev. Phytopathol.* **11** : 389-422.

Hollings, M. 1965. Disease control through virus-free stock. *Ann. Rev. Phytopathol.* **3** : 367-396.

Horsfall, J. G., and A. E. Dimond (eds.). 1960. "Plant Pathology. An Advanced Treatise". Vol. 3. Academic Press, New York.

Gram, E. Quarantines, 314-356.

Stevens, R. B., Cultural practices in disease control, 357-356.

Marsh, R. W. (ed.) 1972. "Systemic Fungicides". Longman, London.

Mattys, G., and A. E. Baker. 1980. An appraisal of the effectiveness of quarantines. *Ann. Rev. Phytopathol.* **18** : 147-165.

Nene, Y. L., and P. N. Thapliyal. 1979. "Fungicides in Plant Disease Control". Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi. 570 p.

Robinson, R. A. 1980. New concepts in breeding for disease resistance in plants. *Ann. Rev. Phytopathol.* **18** : 189-210.

Sharvelle, E. G. 1969. "Chemical Control of Plant Diseases." University Publishing, College Station, Texas.

Sadasivan, T. S. 1975. Breeding for disease resistance in plants. *Proc. Indian Acad. Sci.* (*Pl. Sci.*). **84** : 229-248.

Sinha, A. K. 1977. Induced resistance as a factor in plant disease control. *Ind. Biol.* **9** : 1-16.

১৬ রোগ অনুসন্ধান প্রণালী

বিভিন্ন গাছে নানা ধরণের রোগ উৎপাদকের আক্রমণে যে সব রোগের সৃষ্টি হয় তাদের মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্য রয়েছে। রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে রোগ ও রোগ উৎপাদক সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন কারণ অবস্থাভেদে বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। এর জন্য নির্দিষ্ট রোগ অনুসন্ধান প্রণালী অনুসরণের প্রয়োজন হয়। ভিন্ন ভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনানুসারে অনুসন্ধান প্রণালী কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে থাকে। সাধারণতঃ ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলি এখানে সংক্ষেপে দেওয়া হল।

সাধারণ পরীক্ষা (General examination)

কোন রোগের প্রসঙ্গে বিশদ অনুসন্ধান চালানোর আগে চাষের জমিতে রোগগ্রস্ত ফসল ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হয়। এর জন্য একবার মাঠে গেলে হয় না, কিছুদিন পর পর বেশ কয়েকবার যেতে হয়। তাহলে ফসলে রোগের প্রথম সূত্রপাত থেকে রোগ কিভাবে গাছ থেকে গাছে ছড়ায়, আক্রান্ত গাছে রোগের প্রকোপ কিভাবে বৃদ্ধি পায় এবং আবহাওয়ার কোন অবস্থায় কতটা ক্ষতি হয় এর একটা হদিশ পাওয়া যেতে পারে। গাছের রোগ সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের জন্য বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন ত আছেই। তাছাড়া রোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন আছে কি না সেই সিদ্ধান্তে আসার জন্যও রোগজনিত ক্ষতির পরিমাপ করতে হয়। বিভিন্ন পরিমাপ পদ্ধতির আলোচনা সপ্তদশ অধ্যায়ে করা হয়েছে। বিশদ অনুসন্ধানের জন্য অনেক সময় কোন জাতির গাছ লাগানো হয়েছে, কতদিন ধরে ঐ জমিতে একই শস্যের চাষ করা হচ্ছে, আগের বছরগুলিতে রোগের প্রকোপ কেমন ছিল এবং সেচ ও সারের প্রয়োগ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। জমিতে রোগের আক্রমণ হলে ফসলের কি ধরণের ক্ষতি হয় তাও খুব ভালভাবে জানা দরকার। গাছের শিকড়, গোড়া, কাণ্ড, পাতা বা ফল কোন কোন অংশ আক্রান্ত হয়েছে এবং কোথায় কি ধরণের রোগলক্ষণ দেখা যাচ্ছে তা খুঁটিয়ে দেখতে হয়। এর জন্য ছোট 'লেনস' (lens) ব্যবহার করলে পর্যবেক্ষণ আরও নিখুঁত হয়। যেখানে আরো ভাল করে পর্যবেক্ষণের দরকার মনে হয় সেখানে আক্রান্ত গাছ বা গাছের রোগগ্রস্ত অংশ সংগ্রহ করে পলিথিনের ব্যাগে পুরে ল্যাবরেটরীতে এনে সেখানে

লেনস বা অণুবীক্ষণের (microscope) সাহায্যে রোগগ্রস্ত অংশগুলিকে আরও খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হয়। অনেক সময় ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত অংশে ছত্রাকের স্পোর বা কনিডিয়াম অথবা যে সব বিশেষ অঙ্গে বিভিন্ন ধরণের স্পোর উৎপন্ন হয় যেমন পিকনিডিয়াম, ক্লিস্টোথীসিয়াম, পেরিথীসিয়াম ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়। রোগগ্রস্ত অংশ থেকে 'নীডল' (needle) এর সাহায্যে ঐগুলিকে কাঁচের স্লাইডে (slide) এক ফোঁটা জলে বা ল্যাকটোফেনলে (lactophenol) স্থানান্তরিত করে পাতলা কাঁচের 'কভার স্লিপ' (cover slip) দিয়ে ঢেকে অনুবীক্ষণে পরীক্ষা করে দেখা হয়। এইভাবে পরীক্ষার ফলে রোগ উৎপাদকের পরিচয় অনেক ক্ষেত্রে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং সঠিক সনাক্তকরণ সম্ভব হয়। অনেক সময় রোগগ্রস্ত অংশে ছত্রাকের স্পোর‍্যানজিয়াম, স্পোর ইত্যাদি এমন কিছু দেখা যায় না যার ভিত্তিতে রোগ নির্ণয় সম্ভব হতে পারে। এই রকম পরিস্থিতিতে সাধারতঃ দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে। প্রথম পদ্ধতিতে গাছের রোগগ্রস্ত অঙ্গের একটি ক্ষুদ্র অংশ, যেমন শিকড়, কাণ্ড, পাতা, বা ফলের টুকরো নিয়ে সেটিকে বিশেষভাবে সৃষ্ট আর্দ্র পরিবেশে রাখা হয়। সাধারণতঃ একটি 'পেট্রি' ডিশের (Petri dish) মধ্যে ভিজে ব্লটিং পেপারের উপরে রাখা কাঁচের স্লাইডে রোগগ্রস্ত ঐ টুকরোটিকে রেখে দেওয়া হয়। ভিজে ব্লটিং পেপার থেকে বাষ্পীভবনের ফলে পেট্রি ডিশের ভিতরে শীঘ্রই বিশেষ আর্দ্র পরিবেশের অর্থাৎ প্রায় ১০০ শতাংশ আপেক্ষিক আর্দ্রতার সৃষ্টি হয়। এই আর্দ্র কক্ষে (moist chamber) ২৪—৪৮ ঘণ্টা রাখলে গাছের রোগগ্রস্ত টুকরোটির উপর অনেক সময় ছত্রাকের স্পোর উৎপন্ন হতে থাকে। তখন স্পোরের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে রোগ উৎপাদক ছত্রাককে সনাক্ত করা গেলে রোগ নির্ণয় সম্ভব হয়।

রোগজীবাণুর পৃথকীকরণ ও চাষ (Isolation and culture of the pathogen):

যদি উপরোক্ত পদ্ধতিতে আর্দ্র পরিবেশে স্পোর উৎপন্ন না হয়, তখন আক্রান্ত গাছ থেকে রোগ উৎপাদকের পৃথকীকরণ ও বিশুদ্ধ চাষের ব্যবস্থা করতে হয়। এই পদ্ধতিতে ছত্রাক চাষের জন্য বিশেষ ধরণের পুষ্টিকর খাদ্য মাধ্যম (nutrient medium) প্রস্তুত করতে হয়। প্রধানতঃ যে সব উপাদান দিয়ে এই পুষ্টিকর মাধ্যম তৈরী করা হয় সেগুলি হল কার্বনের উৎস হিসাবে গ্লুকোজ (glucose) বা সুক্রোজ (sucrose) ; নাইট্রোজেনের উৎস হিসাবে সোডিয়াম নাইট্রেট (sodium nitrate), অ্যাসপারাজিন (asparagine) বা পেপটোন (peptone) ;

এবং পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস, সালফার, ইত্যাদি মৌল উপাদানের উৎস হিসাবে পটাশিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট (potassium hydrogen phosphate), ম্যাগনেশিয়াম সালফেট (magnesium sulphate) ইত্যাদি। এই সব বিভিন্ন উপাদান জলে একত্রে গুলে অটোক্লেভ (autoclave) যন্ত্রে (বড় ধরণের প্রেসার কুকার) ১৫ পাউণ্ড বাড়তি চাপে অর্থাৎ ১২১° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ১৫—২০ মিনিট রেখে মাধ্যমটি নির্বীজন (sterilization) করে নিলে সেটি ছত্রাক চাষের উপযোগী হয়। এই মাধ্যমে প্রতি লিটারে ১৫—২০ গ্রাম আগার (agar agar) মিশিয়ে উত্তপ্ত করলে সেটি প্রথমে গলে যায় কিন্তু পরে ঠাণ্ডা করলে জেলির মত জমে যায়। পরীক্ষাগারে সর্বাধিক ব্যবহৃত খাদ্য মাধ্যম হল 'পট্যাটো ডেক্সট্রোজ আগার' (potato-dextrose agar)। সাধারণতঃ ২০০ গ্রাম আলুর টুকরো জলে নিয়ে ১৫—২০ মিনিট ফুটিয়ে সেখান থেকে পাওয়া নির্যাসের সঙ্গে ২০ গ্রাম ডেক্সট্রোজ ও ১৫—২০ গ্রাম আগার ও প্রয়োজনমত জল মিশিয়ে এক লিটার খাদ্য মাধ্যম তৈরী করা হয়। অধিকাংশ ছত্রাক ও অনেক ব্যাকটিরিয়ার পক্ষে এই মাধ্যম খুব উপযোগী। তরল খাদ্য মাধ্যমের তুলনায় আগার সহযোগে তৈরী জমাট মাধ্যম (solid medium) নিয়ে কাজ করা অনেক সহজ। এই ধরণের মাধ্যম গলা অবস্থায় কাঁধাবিহীন কালচার টিউবে (rimless culture tube) ৬—৮ মি লি পরিমাণ বা 'কনিকাল ফ্লাস্কে' (conical flask) ১৫—২০ মি লি নিয়ে তুলার ছিপির (cotton plug) সাহায্যে তাদের মুখ বন্ধ করে অটোক্লেভে নির্বীজন করে নেওয়া হয়। মাধ্যমটি তরল থাকতে থাকতেই কালচার টিউবটিকে মাথার দিকটি একটু উচু করে টেবিলে শুইয়ে রেখে দিলে কিছুক্ষণের মধ্যেই এটি জমে যায়। ফ্লাস্কের তরল মাধ্যমটি ওখানেই জমিয়ে নেওয়া হয় বা নির্বীজন করা পেট্রি ডিশে ঢেলে জমতে দিলে সেখানে খাদ্য মাধ্যমের একটা পাতলা স্তর পাওয়া যায়।

ঐচ্ছিকভাবে পরজীবী ছত্রাকের পৃথকীকরণের পদ্ধতি হল এইরকম। আক্রান্ত শিকড়, পাতা, কাণ্ড বা ফলের ছোট টুকরো, যার মধ্যে রোগজীবাণু রয়েছে সেটিকে 'মারকিউরিক ক্লোরাইড' (mercuric chloride) এর দশমিক এক শতাংশ (০·১%) দ্রবণে ½ থেকে ১ মিনিট ডুবিয়ে রেখে তারপরে সেই টুকরোটিকে ৪—৫ বার নির্বীজন করা জলে ভালভাবে ধুয়ে নীডলের সাহায্যে কালচার টিউবে স্থানান্তর করা হয়। (রেখাচিত্র ২১ক)। এর পরে ঐ কালচার টিউবকে 'ইনকিউবেটরে' (incubator) নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় (২৫—৩০° সেঃ) রেখে দেওয়া হয়। এক-দু দিনের মধ্যেই ঐ টুকরোটি থেকে ছত্রাকের বৃদ্ধি লক্ষ্য

করা যায় এবং খুব শীঘ্রই ছত্রাকের হাইফা গাছের টুকরো ছেড়ে আগারের উপর ছড়াতে থাকে এবং কয়েকদিনের মধ্যেই মাধ্যমকে প্রায় ঢেকে দেয় এবং স্পোর বা প্রজনন সংক্রান্ত অন্যান্য অবয়ব গঠিত হতে দেখা যায়। যেহেতু মারকিউরিক ক্লোরাইড খুব বিষাক্ত সেই কারণে এর দ্রবণে গাছের টুকরোটিকে ডোবানোর পর খুব ভালভাবে ধুয়ে না নিলে ছত্রাকের বৃদ্ধি নাও হতে পারে। এই কারণে অনেক সময় অপেক্ষাকৃত কম বিষাক্ত ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইটের (calcium hypochlorite) দ্রবণে (যাতে শতকরা তিনভাগ সক্রিয় ক্লোরিন রয়েছে) টুকরোগুলিকে ২—৫ মিনিট ডুবিয়ে রেখে সেখান থেকে সোজাসুজি কালচার টিউবে স্থানান্তরিত করা হয়, জলে ধুয়ে নেবার কোন প্রয়োজন হয় না। মারকিউরিক ক্লোরাইড বা ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইটের দ্রবণে ডোবানোর উদ্দেশ্য হল গাছের ত্বকের উপর নানা ধরণের যেসব জীবাণু থাকে তাদের ধ্বংস করা যাতে রোগ উৎপাদকের বিশুদ্ধ কালচার পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। যদি গাছের রোগাক্রান্ত অংশে ছত্রাকের স্পোর যথেষ্ট পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়, তখন একটি নির্বীজন করা ইনোকুলেটিং নীডলের অগ্রভাগ দিয়ে কিছু স্পোর খাদ্য মাধ্যমে স্থানান্তর করেও ছত্রাক পৃথকীকরণের চেষ্টা করা যেতে পারে। অনেক সময় রোগ উৎপাদক ছত্রাক ছাড়াও অন্য ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়া কালচারে দেখতে পাওয়া যায়। যেহেতু ব্যাকটিরিয়া ছত্রাকের তুলনায় অনেক দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়, সেজন্য কালচারকে ব্যাকটিরিয়া থেকে মুক্ত রাখা বেশ কঠিন। এর জন্য খাদ্য মাধ্যমের সঙ্গে অ্যান্টিবায়োটিক বা জৈব অ্যাসিড (organic acid) যোগ করে ব্যাকটিরিয়ার পক্ষে অনুপযোগী করে নিতে হয়। সাধারণতঃ ক্লোরোমাই-সিটিন (chloromycetin) ৫০ পি পি এম (50 parts per million) অথবা ২৫ পি পি এম স্ট্রেপ্টোমাইসিন (streptomycin) ও ২৫ পি পি এম পেনিসিলিন (penicillin) একসঙ্গে মাধ্যমে মিশিয়ে দেওয়া হয়। ম্যালিক অ্যাসিড (malic acid) মিশিয়ে মাধ্যমের pH নামিয়ে আনলেও অতিরিক্ত অম্লতার জন্য ব্যাকটিরিয়া দমন সম্ভব হয়। ক্লোরোমাইসেটিন মাধ্যমে মিশিয়ে অটোক্লেভে নির্বীজন করা যায় কিন্তু স্ট্রেপ্টোমাইসিন ও পেনিসিলিন যেহেতু বেশী উত্তাপে ভেঙ্গে যায় সেজন্য এদের আলাদা করে নির্বীজিত জলে গুলে মাধ্যম নির্বীজন করার পরে ব্যবহারের আগে মিশিয়ে নিতে হয়।

ব্যাকটিরিয়াজনিত রোগের ক্ষেত্রেও একইভাবে রোগ উৎপাদকের পৃথকী-করণ সম্ভব। তাছাড়া আক্রান্ত অঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসা পুঁজের মত ব্যাকটিরিয়ার সামান্য অংশ নির্বীজিত জলে মিশিয়ে তার থেকেও পৃথকীকরণ সম্ভব হয়।
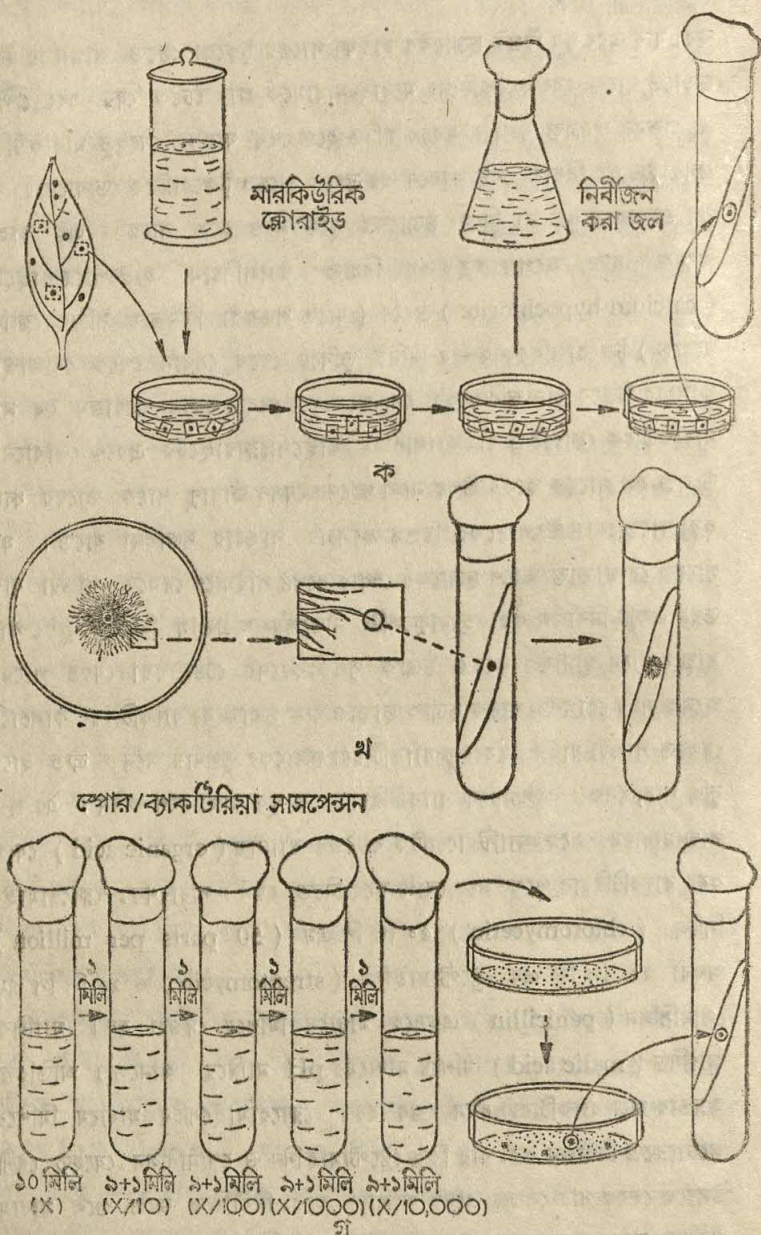
রেখাচিত্র ২১ : রোগজীবাণুর স্বতন্ত্রীকরণ ও বিশুদ্ধ চাষ
(ক) পাতার আক্রান্ত অংশ থেকে রোগজীবাণুর পৃথকীকরণ
(খ) 'হাইফাল টিপ' কালচার' প্রথায় ছত্রাকের বিশুদ্ধ চাষ
(গ) স্পোর বা ব্যাকটিরিয়া সাসপেনসনের লঘুকরণের মাধ্যমে ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়ার বিশুদ্ধ চাষ।

রোগগ্রস্ত গাছ থেকে যে ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়া পাওয়া গেল সেটি সত্যিই রোগ উৎপাদনের ক্ষমতা রাখে কি না তা প্রমাণের জন্যই ঐ ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণমুক্ত (uncontaminated) অর্থাৎ বিশুদ্ধ (pure) কালচারের প্রয়োজন হয়। তা ছাড়া রোগ উৎপাদককে নিয়ে যে ধরণের গবেষণাই করা হোক না কেন তার জন্যও বিশুদ্ধ কালচারই দরকার।

জীবাণুর বিশুদ্ধ চাষ (Pure culture of microorganisms)

রোগগ্রস্ত গাছ থেকে বিভিন্ন উপায়ে তৈরী ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়ার কালচার থেকেই বিশুদ্ধ চাষের চেষ্টা করা হয়। ছত্রাকের ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে। প্রথম পদ্ধতিতে হাইফার অগ্রভাগ থেকে কালচার (hyphal tip culture) ও দ্বিতীয় পদ্ধতিতে একটি স্পোর থেকে কালচার (monosporus culture) করা হয় যার ফলে এর বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না।

প্রথম পদ্ধতিতে ছত্রাকের কালচার থেকে অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ পেট্রি ডিশে রাখা খাদ্য মাধ্যমের উপর স্থানান্তরিত করে সেটিকে ইনকিউবেট করা হয়। ছত্রাকের কলোনী ক্রমশঃ চারিদিকে বাড়তে থাকে। পেট্রি ডিশটি উল্টে নিয়ে অনুবীক্ষণের তলায় রেখে দেখলে কলোনীর বাইরের দিকে কিছু কিছু বর্দ্ধনশীল হাইফাকে অন্যদের থেকে বেশ আলাদা অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে কালি দিয়ে চিহ্নিত করে নিতে হয়। পরে ডিশটি সোজা করে ঢাকা খুলে ঐ চিহ্নিত জায়গা থেকে ইনোকুলেটিং নীডলের সাহায্যে একটু আগার সহ হাইফার মাথার অংশ (tip) কেটে নিয়ে সেটিকে কালচার টিউবে স্থানান্তরিত করলে তার থেকে ছত্রাকের বিশুদ্ধ কালচার পাওয়া যায় (রেখাচিত্র ২১খ)। একে বলা হয় "হাইফাল টিপ কালচার"।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে ১০ মি লি নির্বীজিত জল একটি কালচার টিউবে নেওয়া হয়। পরে ছত্রাকের কালচার থেকে মাইসিলিয়াম সহ কিছু স্পোর ইনোকুলেটিং নীডলের সাহায্যে ঐ টিউবে স্থানান্তরিত করা হয়। টিউবটিকে দুই হাতের তালুর মধ্যে নিয়ে দ্রুত ঘোরালে স্পোরগুলি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। পাশাপাশি তিন-চারটি কালচার টিউবে ৯ মি লি করে নির্বীজিত জল থাকে। নির্বীজন করা পিপেট (pipette) দিয়ে প্রথম টিউব থেকে ১ মি লি স্পোর সাসপেনসন দ্বিতীয় টিউবে দেওয়া হয় এবং সেটিকে আগের মত নাড়াচাড়া করে স্পোর সাসপেনসন তৈরী করে নেওয়া হয়। একইভাবে দ্বিতীয় থেকে তৃতীয়, তৃতীয় থেকে চতুর্থ ও প্রয়োজনে চতুর্থ থেকে

পঞ্চম টিউবে ১ মি লি করে সাসপেনসান স্থানান্তরিত করা হয় (রেখাচিত্র ২১গ) এইভাবে প্রতিটি টিউবে স্থানান্তরকরণের সঙ্গে সঙ্গে স্পোরের সংখ্যা কমে দশভাগের একভাগে দাঁড়ায়, অর্থাৎ স্পোরের সংখ্যার লঘূকরণ (dilution) হয়। এর ফলে পঞ্চম টিউবে স্পোরের সংখ্যা খুবই কম থাকে। এর পরে দুটি পেট্রি ডিশের ঢাকনা একদিকে অল্প তুলে চতুর্থ ও পঞ্চম টিউবের স্পোর সাসপেনসন জমাট খাদ্য মাধ্যমের উপর ঢেলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ পরে স্পোরগুলি খাদ্য মাধ্যমের উপর থিতিয়ে গেলে উপরের ঢাকনা অল্প তুলে ডিশটি কাত করে ভিতরের জল ফেলে দেওয়া হয় এবং ডিশটি ইনকিউবেটরে রাখা হয়। এক-দুদিনের মধ্যেই বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো স্পোরগুলি অঙ্কুরিত হয়ে তার থেকে নূতন হাইফা হতে দেখা যায়। তখন পেট্রি ডিশটি উল্টো করে অনুবীক্ষণের তলায় রেখে দেখে নিতে হয় যে একই জায়গায় একাধিক স্পোর আছে কিনা। যদি নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে কেবলমাত্র একটি অঙ্কুরিত স্পোরই সেখানে রয়েছে তখন ইনোকুলেটিং নীডলের সাহায্যে একটু আগার সহ ঐ অঙ্কুরিত স্পোরটিকে কালচার টিউবে স্থানান্তর করলে একটি স্পোর থেকে উদ্ভূত ছত্রাকের বিশুদ্ধ কালচার পাওয়া যায় (রেখাচিত্র ২১গ)। অনেক সময় স্পোর সাসপেনসন পুরোটা পেট্রি ডিশে ঢালা হয় না। কয়েকটি কালচার টিউব গরম করে আগার মাধ্যমে গলিয়ে নেওয়া হয়। তারপর ঠাণ্ডা হয়ে আগার যখন প্রায় জমার মত অবস্থায় আসে তখন নির্বীজন করা পিপেটের সাহায্যে ১ মি লি স্পোর সাসপেনসান যোগ করে ভালভাবে ঝাঁকিয়ে নিয়ে খালি পেট্রি ডিশে ঢেলে দেওয়া হয়। তারপর স্পোর অঙ্কুরিত হয়ে ছত্রাকের বৃদ্ধি শুরু হলে আগের মত একই ভাবে কেটে নিয়ে কালচার টিউবে স্থানান্তরিত করা হয়।

ব্যাকটিরিয়া পৃথকীকরণের জন্য মোটামুটি একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। যেহেতু ছত্রাকের স্পোরের তুলনায় ব্যাকটিরিয়ার কোষের সংখ্যা অনেক বেশী হয় সেজন্য জলে তৈরী ব্যাকটিরিয়ার সাসপেনসনকে হয়ত চার-পাঁচ বারের জায়গায় ছয়-সাত বার লঘূকরণের প্রয়োজন হতে পারে। সাধারণতঃ চব্বিশ ঘণ্টা ইনকিউবেশনের পরই দেখতে পাওয়া যায় যে এক একটি ব্যাক-টিরিয়া কোষ থেকে আলাদা আলাদা ব্যাকটিরিয়ার কলোনী গড়ে উঠেছে। তখন কলোনীগুলিকে আলাদাভাবে কালচার টিউবে স্থানান্তরিত করা হয়।

যে সব ছত্রাক বাধ্যতামূলকভাবে পরজীবী তাদের এবং ভাইরাসের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ চাষের পদ্ধতি অন্যরকম। রোগে আক্রান্ত হয় এমন সংবেদনশীল জাতির গাছে কৃত্রিম উপায়ে আক্রমণের সৃষ্টি করে সেখানেই এইসব ছত্রাক বা ভাইরাসকে

বিশুদ্ধ অবস্থায় বজায় রাখা হয়। এছাড়া ইদানীংকালে টিস্যু কালচারের মাধ্যমেও এদের বিশুদ্ধ অবস্থায় রাখার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই এই সম্ভাবনা কাজে পরিণত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে প্রথমে নীরোগ পোষক গাছের ভাজক কলাকে বিচ্ছিন্ন করে উপযুক্ত আগার মাধ্যমে স্থানান্তরিত করে ২৭°সেঃ তাপমাত্রায় আলোকিত অবস্থায় ইনকিউবেট করা হয়। যখন স্থানান্তরিত কলায় কোষ বিভাজন ও আয়তন বৃদ্ধির ফলে কোষগুচ্ছ বেড়ে একটা নির্দিষ্ট আয়তনে পৌঁছায় তখন ছত্রাক বা ভাইরাসের দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে আক্রমণ করানো হয় এবং সেখানেই এদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটতে থাকে।

জীবাণুর রোগ উৎপাদন ক্ষমতার প্রমাণ (Establishment of pathogenicity)

কোন রোগগ্রস্ত গাছ থেকে পৃথকীকরণের পদ্ধতি অবলম্বন করে একটি ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়া পাওয়া গেলেই প্রমাণ হয় না যে সেটিই রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী। গাছ থেকে যে সব বিভিন্ন ধরণের জীবাণু পাওয়া যায় তাদের সব কটিকে নিয়েই পরীক্ষা করে দেখতে হয় তাদের রোগ উৎপাদন ক্ষমতা আছে কি না। পশু-রোগের ক্ষেত্রে জীবাণুর রোগ উৎপাদন ক্ষমতা নির্ণয়ের প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ জার্মান বিজ্ঞানী কখ (R. Koch. 1882) কয়েকটি প্রমাণের উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন যেগুলি বর্তমানে গাছের রোগের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য বলে মনে করা হয়। কখের শর্ত বা স্বীকার্যগুলি (Koch's postulates) হল :

১। জীবাণুটি সর্বক্ষেত্রে রোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবে।

২। রোগগ্রস্ত গাছ থেকে স্বতন্ত্রীকরণের পর জীবাণুটির বিশুদ্ধ চাষ করা হবে।

৩। সুস্থ পোষক গাছে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া ঐ জীবাণু প্রয়োগ করে কৃত্রিম উপায়ে আক্রমণের সৃষ্টি করলে সেখানে রোগের স্বাভাবিক লক্ষণগুলি ফুটে উঠবে ও

৪। কৃত্রিম উপায়ে আক্রান্ত গাছ থেকে পৃথকীকরণের পদ্ধতিতে পাওয়া জীবাণুর কালচার মূল কালচারের সঙ্গে সর্বাংশে এক রকম হবে।

কখের স্বীকার্যগুলি রোগগ্রস্ত গাছ থেকে পাওয়া জীবাণুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিনা তা জানার জন্য গাছে কৃত্রিম উপায়ে আক্রমণের (artificial inoculation) সৃষ্টি করে পরীক্ষা করে দেখতে হয়। এর জন্য পোষক গাছের রোগ সংবেদনশীল জাতির বা যে জাতির গাছে রোগ হতে দেখা গেছে তার বীজ শোধন

করে মাটির টবে লাগানো হয়। এইভাবে টবে কিছু নীরোগ চারার সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ চারাগুলিতে যখন চার-পাঁচটি পাতা দেখা যায় সেই সময় ছত্রাকের বিশুদ্ধ কালচার থেকে সংগৃহীত স্পোর নিয়ে জলে স্পোর সাসপেনশন তৈরী করে ছোট স্প্রেয়ারের সাহায্যে পাতায় ও চারার অন্যান্য অংশে ভালভাবে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। কয়েকটি টবের গাছে এইভাবে কৃত্রিম উপায়ে আক্রমণের সূচনা বা 'ইনোকুলেশন' (inoculation) করা হয়। অন্য কয়েকটি টবের গাছে শুধুমাত্র জল ছিটানো হয়। তারপর সব টবগুলিকে পলিথিন দিয়ে ঘেরা ঘরের আর্দ্র পরিবেশে (humid chamber) রাখা হয় যাতে জীবাণুর পক্ষে আক্রমণ সহজ হয়। পলিথিনের ঘর না থাকলে প্রতিটি টবের উপর পলিথিনের ব্যাগ দিয়ে গাছগুলি এমনভাবে ঢেকে রাখা হয় যাতে ভিতরে প্রয়োজনীয় আর্দ্র পরিবেশের সৃষ্টি হয় (রেখাচিত্র ২২)। সাধারণতঃ ২৪ ঘণ্টা, কখনও বা ৪৮ ঘণ্টা পরে টবগুলিকে আর্দ্র পরিবেশ থেকে স্বাভাবিক পরিবেশে এনে গ্রীন
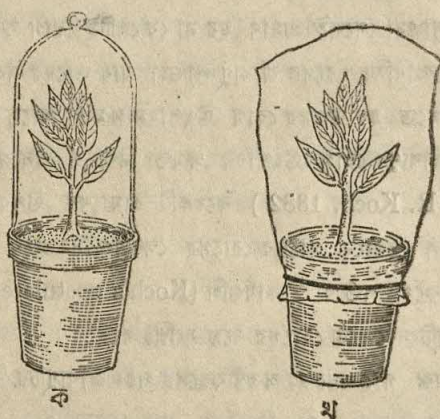
রেখাচিত্র ২২ : কৃত্রিম উপায়ে গাছে ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়া দ্বারা সংক্রমণের পদ্ধতি

হাউসে (green house) বেঞ্চের উপর রাখা হয়। তারপর নজর রাখতে হয় গাছে রোগের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কি না। যে সব রোগে পাতায় দাগ হয় সেখানে সাধারণতঃ ৪—৫ দিনের মধ্যেই রোগের লক্ষণ ফুটে ওঠে। যেখানে ব্যাকটিরিয়া নিয়ে কাজ সেখানে গাছে কৃত্রিম উপায়ে সফল আক্রমণের সৃষ্টি করতে গেলে অনেক সময় পাতায় ক্ষতের সৃষ্টি করতে হয়। যদি কৃত্রিম উপায়ে আক্রমণের সৃষ্টি করে দেখা যায় যে অধিকাংশ গাছেই রোগলক্ষণ দেখা যাচ্ছে তখন বোঝা যায় যে ব্যবহৃত জীবাণুটি রোগ সৃষ্টিতে সক্ষম।

যেখানে রোগটি জমিবাহিত সেখানে প্রথমে টবে নির্বীজন করা মাটি ভরে

নেওয়া হয়। তারপর কাঁচের কনিকাল ফ্লাস্কে বালির সঙ্গে ভুট্টার গুঁড়ো (maize meal) নির্দিষ্ট অনুপাতে (৭৫ : ২৫ বা ৯০ : ১০) মিশিয়ে তাতে জল দিয়ে অটোক্লেভে নির্বীজন করে নিয়ে সেই খাদ্য মাধ্যমে (sand-maize meal medium) ছত্রাকের চাষ করতে হয়। সাধারণতঃ ৮—১০ দিন পরে, ছত্রাকের কলোনী বড় হলে, ফ্লাস্ক থেকে সব কিছু বের করে এনে তার সঙ্গে সম পরিমাণ নির্বীজন করা মাটি খুব ভালভাবে মিশিয়ে ইনোকুলাম তৈরী করা হয়। দুভাবে এই ইনোকুলাম ব্যবহার করা যেতে পারে। টবের উপরিভাগে মাটির বদলে ইনোকুলাম দিয়ে ভরে সেখানে শোধন করা বীজ লাগানো হয়। এর পরে লক্ষ্য রাখতে হয় যে গাছের চারা কিছুদিনের মধ্যেই রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে কি না। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে টবে নির্বীজন করা মাটিতে বীজ লাগানো হয়। তারপর চারা কিছুটা বড় হলে উপরের দিকের মাটি ১ ইঞ্চি পরিমাণ ফেলে দিয়ে সেই জায়গায় ইনোকুলাম মাটির উপরের স্তরের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হয়। সাধারণতঃ এক সপ্তাহের মধ্যেই গাছের শিকড়ে বা গোড়ায় রোগলক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। অনেক উইল্ট রোগে লক্ষণ দেখা দিতে একটু বেশী সময় লাগে।

যেখানে ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়া বীজ থেকে পাওয়া গেছে এবং সন্দেহ করা হচ্ছে রোগটি বীজবাহিত সেখানে বিশুদ্ধ চাষের পর ছত্রাকের স্পোর বা ব্যাকটিরিয়ার সাসপেসন তৈরী করে তাতে মারকিউরিক ক্লোরাইডে শোধন করা বীজ কয়েক মিনিট ডুবিয়ে রাখা হয়। তারপরে একটু শুকিয়ে নিয়ে ছত্রাকের স্পোর বা ব্যাকটিরিয়া মাখানো বীজ মাটিতে বপন করা হয়। এর পরে লক্ষ্য রাখতে হয় বীজ রোগের আক্রমণে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বা চারা বেরোনর পর তাতে রোগের আক্রমণ হচ্ছে কি না।

কোন ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়ার রোগ উৎপাদন ক্ষমতা (pathogenicity) প্রমাণিত হবার পর তার সঠিক সনাক্তকরণের প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ ছত্রাকের ক্ষেত্রে অযৌন স্পোর, যৌনাঙ্গ, বা যৌন স্পোরের বৈশিষ্ট্যের এবং ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রে অন্য কিছু গুণাবলীর উপর ভিত্তি করেই এই সনাক্তকরণ হয়। সনাক্তকরণ সম্ভব না হলে ঐ উদ্দেশ্যে রোগ উৎপাদক জীবাণুর বিশুদ্ধ কালচার সাধারণতঃ ইংল্যাণ্ডের কিউ (Kew)তে কমনওয়েলথ মাইকোলজিকাল ইনস্টিটিউটে (Commonwealth Mycological Institute) পাঠানো হয়।

ভাইরাসজনিত রোগের পরীক্ষা পদ্ধতি

ভাইরাস আক্রান্ত গাছের পাতায় রঙের পরিবর্তন, বৃদ্ধিজনিত বিকৃতি, খর্বতা

ইত্যাদি নানা ধরণের রোগলক্ষণ ফুটে ওঠে যা দেখে ভাইরাসের আক্রমণ সম্বন্ধে সন্দেহ হলেও সব সময় নিশ্চিন্তভাবে কিছু বলা যায় না। অন্য কিছু রোগেও প্রায় একই ধরণের রোগলক্ষণ দেখা যায়। রোগগ্রস্ত গাছ থেকে নির্যাস সংগ্রহ করে নিকোটিয়ানা (*Nicotiana glutinosa*), চেনোপোডিয়াম (*Chenopodium* sp.) বা ধুতুরা (*Datura stramonium*) গাছের পাতায় সামান্য ক্ষত সৃষ্টি করে সেখানে প্রয়োগ করলে শীঘ্রই যদি ঐ অংশে সীমিত ধরণের ক্ষতের (local lesion) সৃষ্টি হয় তাহলে প্রাথমিকভাবে ভাইরাস আক্রমণ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। নির্যাস সংগ্রহের জন্য রোগলক্ষণযুক্ত পাতা প্রথমে মারকিউরিক ক্লোরাইড ও পরে নির্বীজিত জলের সাহায্যে জীবাণুমুক্ত করে নিয়ে প্রতি গ্রামের জন্য ১ মি লি পরিমাণ জল দিয়ে খল-নুড়ির (mortar and pestle) সাহায্যে পিষ্ট করে নেওয়া হয়। পরে এইভাবে সংগৃহীত নির্যাস তুলার পাতলা আস্তরণের মধ্য দিয়ে পরিশ্রুত করে নেওয়া হয়। তারপর একই প্রজাতির নীরোগ গাছের পাতার উপরিতল পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করে নিয়ে সেখানে প্রথমে কার্বোরাণ্ডামের (carborundun) মিহি গুড়ো ঘসে সামান্য ক্ষতের সৃষ্টি করে তার উপর ঐ পরিশ্রুত নির্যাস প্রয়োগ করা হয়। নির্যাস জলের বদলে ফসফেট বাফারে (phosphate buffer) (৭.৫ থেকে ৮.০ pH) সংগ্রহ করলে ভাইরাসের আক্রমণ ক্ষমতা পুরোপুরি বজায় থাকে। গ্রীণ হাউসে বা ছোট ছোট খাঁচায় (cage) কীটপতঙ্গহীন অবস্থায় রাখা গাছের উপর সংগৃহীত নির্যাস প্রয়োগ করা হয়। এইভাবে কৃত্রিম উপায়ে আক্রান্ত গাছগুলির উপর নজর রাখতে হয়। যদি দেখা যায় কিছুদিনের মধ্যে বৈশিষ্ট্য-সূচক রোগলক্ষণ দেখা যাচ্ছে তখন এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে রোগগ্রস্ত গাছটির নির্যাসে যে ভাইরাস রয়েছে সেটি এই রোগের কারণ। যদি সন্দেহ হয় যে রোগটির জন্য কীটপতঙ্গবাহিত ভাইরাস দায়ী তখন অন্য পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। প্রথমে জমির রোগগ্রস্ত গাছ থেকে কীটপতঙ্গ সংগ্রহ করে এনে তাদের পরীক্ষাগারে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পালন করা হয়। তারপরে কিছু কীটপতঙ্গকে খাঁচায় আলাদা করে রাখা রোগগ্রস্ত গাছের উপর ছেড়ে দেওয়া হয় যাতে তারা গাছ থেকে রস শোষণ করে সংক্রমণ ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। ভাইরাস ও বাহক পতঙ্গভেদে ২৪ ঘণ্টা বা আরও বেশী সময় এই ভাবে থাকে। তারপর এই খাঁচা থেকে কিছু পোকা গ্রীনহাউসে বা অন্য খাঁচায় রাখা নীরোগ গাছের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। এইভাবে কৃত্রিম উপায়ে আক্রমণের সৃষ্টি করে ১—২ দিন পরে গাছগুলিকে বাইরের মুক্ত পরিবেশে এনে

রাখা হয়। কিছুকালের মধ্যে আক্রান্ত গাছগুলিতে একই ধরণের রোগলক্ষণ দেখা দিলে প্রমাণিত হয় যে কীটপতঙ্গবাহিত ভাইরাস রোগসৃষ্টির জন্য দায়ী। পরবর্তীকালে প্রয়োজন হলে, সংগৃহীত নির্যাসটিকে বিশুদ্ধীকরণের পর ব্যবহার করে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে রোগ উৎপাদক ভাইরাসটিকে সনাক্ত করা হয়। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের ব্যবহার সম্ভব না হলে, সেরোলজি সংক্রান্ত পদ্ধতি (serological methods) ব্যবহার করে ঐ ধরণের রোগ সৃষ্টিকারী অন্যান্য ভাইরাসের সঙ্গে সম্পর্ক নিরূপণের মাধ্যমে কিছুটা বা অনেক সময় পুরোপুরি সনাক্তকরণও সম্ভব হতে পারে।

সহায়ক গ্রন্থের তালিকা

Agrios, G. N. 1978. "Plant Pathology". Academic Press, New York.

Baker, K. F., and W. C. Snyder (Eds.). 1965. "Ecology of Soil-borne Plant Pathogens." Murray, London.

Bruehl, G. W. (Ed.). 1975. "Biology and Control of Soil -borne Plant Pathogens''. The American Phytopathological Society, St. Paul, Minnesota.

Burgess, H. D. 1981. "Microbial Control of Pests and Plant Diseases". Academic Press, New York.

Carefoot, G. L., and E. R. Sprott. 1966. "Famine on the wind. Angus and Robertson, London.

Carter, W. 1973. "Insects in relation to Plant Disease''. J. Wiley & Sons, New York.

Commonwealth Mycological Institute. 1968. Plant Pathologists' Pocket Book''. Kew, London.

Daly, J. M., and I. Uritani (Eds.) 1979. "Recognition and specificity in Plant Host-Parasite Interactions". Japan. Sci. Soc. Press, Tokyo.

Day. P. R. 1974. ''Genetics of Host-Parasite Interaction". W.H. Freeman & Co., San Francisco.

Dickinson, C.H., and J.A. Lucas. 1977. "Plant Pathology and Plant Pathogens". Blackwell Sci. Publications, Oxford.

Fry, W.E. 1982. "Principles of Plant Disease Management". Academic Press, New York.

Garrett, S.D. 1970. "Pathogenic Root-infecting Fungi". Cambridge University Press, London.

Gaumann, E. 1950. "Principles of Plant Infection." Crossby Lockwood, London.

Goodman, R. N., Z. Kiraly, and M. Zaitlin. 1967. "The Biochemistry and Physiology of Infectious Plant Diseases". Van Nostrand-Reinhold, Princeton.

Heitefuss, R., and P.H. Williams (Eds.). 1976. "Physiological Plant Pathology". Springer-Verlag, Berlin.

Horsfall, J.G., and E.B.Cowling (Eds.) 1977-80. "Plant Disease : An Advanced Treatise". Academic Press, New York.

Vol. 1. How Disease is managed. (1977).

Vol. 2. How Disease develops in Populations. (1978).

Vol. 3. How Plants suffer from Disease. (1978).

Vol. 4. How Pathogens induce Disease. (1978).

Vol. 5. How Plants defend themselves. (1980).

Horsfall, J. G., and A. E. Dimond (Eds.) 1959-60. "Plant Pathology : An Advanced Treatise". Vols. 1, 2, and 3. Academic Press, New York.

Mace, M.E., A.A. Bell, and C.H.Beckman. (Eds.). 1981. "Fungal Wilt Diseases of Plants". Academic Press, New York.

Mahadevan, A. 1982. "Biochemical aspects of Plant Disease Resistance". I. Today & Tomorrow Printers and Publishers, New Delhi.

Manners, J.G. 1982. "Principles of Plant Pathology". Cambridge University Press, London.

Maramorosch, K. (Ed.). 1969. "Viruses, Vectors, and Vegetation". Interscience, New York.

Martin, H. 1964. "The Scientific Principles of Crop Protection". St. Martin's Press, New York.

Mehrotra, R.S. 1980. "Plant Pathology". Tata McGraw Hill Publishing Co. Ltd., New Delhi.

Mettlitskii, L., and O. Ozeretskovskaya. 1968. "Plant Immunity". Plenum Press, New York.

Roberts, D.A., and C.W.Boothroyd. 1972. "Fundamentals of Plant Pathology." W.H.Freeman & Co., San Francisco.

Scott, P.R., and A. Bainbridge (Eds.). 1978. "Plant Disease Epidemiology". Blackwell Scientific Publishers, London.

Singh, R.S. 1979. "Introduction to the Principles of Plant Pathology". 2nd Ed. Oxford & IBH Publishers, New Delhi.

Stakman, E.C., and J. G. Harrar. 1957. "Plant Pathology." The Ronald Press, New York.

Srivastava, S.K., and P.N. Patel. 1978. "Epidemiological reactions of Bacterial Plant Pathogens". Today & Tomorrow Printers and Publishers, New Delhi.

Strobel, G.A., and D.E. Mathre. 1970. "Outlines of Plant Pathology". Van Nostrand-Reinhold, New York.

Tarr, S.A.J. 1972. "The Principles of Plant Pathology". The Macmillan Press, London.

Torgeson, D.C. (Ed.) 1967, 1969. "Fungicides : An Advanced Treatise". Vols. 1 and 2. Academic Press, New York.

Tousson, T.A., R.V. Vega, and P. E. Nelson (eds.). 1970. "Root Disease and Soil-borne Pathogens". University of California Press, Berkeley.

Wood, R.K.S. 1967. "Physiological Plant Pathology". Blackwell Scientific Publications, Oxford.

Wood, R.K.S. (Ed.). 1982. "Active Defence Mechanisms in Plants". Plenum, New York.

Wood, R.K.S., A. Ballio, and A. Graniti (Eds.). 1971. "Phytotoxins in Plant Diseases". Academic Press, London.

Wood, R.K.S., and A. Graniti (Eds.). 1976. "Specificity in Plant Diseases". Plenum Press, New York.

প্রাসঙ্গিক গবেষণা পত্রিকার তালিকা

Acta Phytopathologica
Advances in Virus Research
Annals of Applied Biology
Annals of Phytopathological Society of Japan
Annual Review of Microbiology
Annual Review of Phytopathology
Annual Review of Plant Physiology
Biological Abstracts
Botanical Review
Canadian Plant Disease Survey
Indian Journal of Mycology & Plant Pathology
Indian Phytopathology
Journal of Bacteriology
Jurnal of Phytopathology
Journal of Virology
Mycologia
Nature
Nematologica
Netherlands Journal of Plant Pathology
Physiological Plant Pathology
Phytopathologia Mediterranea
Phytopathology
Plant Disease Reporter
Plant Pathology
Plant Protection Bulletin (FAO)
Review of Plant Pathology (formerly Review of Applied Mycology)
Transactions of the British Mycological Society
Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten Pflanzenschutz

পরিভাষা ও শব্দকোষ

Alternate host (অলটারনেট হোস্ট)—বিকল্প পোষক গাছ : কিছু রাস্ট জাতীয় ছত্রাকের যে দুটি পোষক গাছে ক্রমিক পর্যায়ে আক্রমণের মাধ্যমে জীবনচক্র সম্পূর্ণ হয় তার যে কোন একটি।

Antibody (অ্যান্টিবডি) : সম্বন্ধহীন কোন প্রোটিনের (অ্যান্টিজেন) প্রতিক্রিয়ায় প্রাণীদেহে উৎপন্ন বিরোধী ক্রিয়াসম্পন্ন প্রোটিনজাতীয় যৌগ।

Antigen (অ্যান্টিজেন) : প্রোটিন জাতীয় যৌগ যা প্রাণীদেহে ঢুকিয়ে দিলে সেখানে প্রতিক্রিয়ায় তার বিরোধী ক্রিয়াসম্পন্ন একটি যৌগের (অ্যান্টিবডি) সৃষ্টি হয়।

Appressorium (অ্যাপ্রেসোরিয়াম) : গাছের দেহত্বক ভেদ করে ভিতরে প্রবেশের পূর্বে ছত্রাকের হাইফা বা জার্ম টিউবের শীর্ষদেশের যে অংশ স্ফীত হয়ে ত্বকের উপর আটকে যায়।

Atrophy (অ্যাট্রফি) : নূতন সৃষ্ট কোষের আয়তনবৃদ্ধি না হওয়ায় বা সেগুলি নষ্ট হয়ে গেলে যে অবস্থায় গাছের বিশেষ কোন অঙ্গের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ও সেটি কার্যকারিতা হারায়।

Avirulence (অ্যাভিরুলেন্স) : রোগসৃষ্টির ক্ষমতার অভাব।

Avirulent (অ্যাভিরুলেণ্ট) : নিবীর্য প্রকৃতির রোগ উৎপাদক যার রোগসৃষ্টির ক্ষমতা নেই।

Bactericide (ব্যাকটিরিসাইড)—ব্যাকটিরিয়ানাশক : ব্যাকটিরিয়া নাশের ক্ষমতা আছে এমন যৌগ।

Bacteriophage (ব্যাকটিরিওফাজ) : যে ভাইরাস ব্যাকটিরিয়াকে আক্রমণ করে ধ্বংস করে।

Biotroph (বায়োট্রফ) : যে সব রোগজীবাণু কেবলমাত্র পোষক গাছের জীবিত কোষকেই আক্রমণ করে।

Biotype (বায়োটাইপ) : কোন জীবাণুর এমন একটি ধারা যার সকল সদস্যই জীনগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে অভিন্ন।

Blight (ব্লাইট) : রোগজীবাণুর দেহনিঃসৃত বিষাক্ত যৌগের ক্রিয়ায় গাছের দেহকোষের মৃত্যু ও আক্রান্ত অংশের দ্রুত শুকিয়ে যাওয়া।

Chemotherapy (কেমোথেরাপি) : রাসায়নিক যৌগের প্রয়োগে রোগ নিরাময়।

Circulative virus (সার্কুলেটিভ ভাইরাস) : রোগগ্রস্ত গাছ থেকে আহৃত হলে যে ভাইরাস বাহক পতঙ্গের মুখ থেকে দেহের বিভিন্ন অংশে সঞ্চালিত হবার পরে আবার মুখের লালাগ্রন্থিতে ফিরে আসে এবং লালার মাধ্যমে নূতন পোষক গাছে সঞ্চারিত হয়।

Collateral host (কোল্যাটারাল হোস্ট) : বিভিন্ন প্রজাতির পোষক গাছ যা একই রোগ উৎপাদক দ্বারা আক্রান্ত হয়।

Colonization (কলোনাইজেশন) : পোষক গাছের দেহের ভিতরে রোগ উৎপাদকের বিস্তার।

Cork (কর্ক) : জীবাণুর আক্রমণ বা আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় গাছের দেহে সৃষ্ট এক বিশেষ শ্রেণীর কলা যা জল, গ্যাস ও জীবাণু দ্বারা অভেদ্য।

Dikaryon (ডাইকেরিয়ন) : ছত্রাকের হাইফার কোষে বা স্পোরে দুটি বিপরীত যৌন প্রকৃতির নিউক্লিয়াসের যুগ্ম উপস্থিতি।

Diploid (ডিপ্লয়েড) : যে অবস্থায় কোন কোষে বা নিউক্লিয়াসে 2N সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে।

Disease cycle (ডিজিজ সাইকৃল)—রোগচক্র : রোগের আক্রমণের সূত্রপাত থেকে রোগলক্ষণের পূর্ণ প্রকাশ পর্যন্ত ঘটনাদির আবর্তনকাল।

Disease incidence (ডিজিজ ইনসিডেন্স)—রোগের আনুপাতিক হার : মোট গাছের তুলনায় রোগগ্রস্ত গাছের শতকরা হার।

Dynamic defence (ডাইন্যামিক ডিফেন্স)—সক্রিয় প্রতিরোধ : জীবাণু বা ভাইরাসের আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় দেহে উদ্ভূত প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

Endemic (এণ্ডেমিক) : যে রোগ কোন একটি দেশে বা একটি অঞ্চলে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত।

Epiphytotic (এপিফাইটোটিক) : কোন অঞ্চলে বিস্তৃতভাবে একটি সংক্রামক উদ্ভিদ রোগের বিশেষ প্রকোপ।

Eradicant (এরাডিক্যাণ্ট) : যা রোগে আক্রান্ত গাছ বা তার বিশেষ অঙ্গকে জীবাণুমুক্ত করে।

Facultative parasite (ফ্যাকালটেটিভ প্যারাসাইট)—ঐচ্ছিকভাবে পরজীবী : যে জীবাণু মূলতঃ মৃতজীবী কিন্তু অবস্থাবিশেষে সাময়িকভাবে পরজীবীর জীবন যাপন করে বাঁচতে পারে।

Forma specialis (ফর্মা স্পেসিয়ালিস) : কোন রোগ উৎপাদক ছত্রাক

প্রজাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির পোষক গাছে রোগসৃষ্টির ক্ষমতার বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত বিশেষ উপপ্রজাতি।

Fumigant (ফিউমিগ্যাণ্ট): উদ্বায়ী প্রকৃতির বিষাক্ত যৌগ যা কোন স্থান বা জমি কীট বা জীবাণুমুক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

Fungicide (ফাঙ্গিসাইড)—ছত্রাকনাশক/ছত্রাকবারক: ছত্রাকনাশের ক্ষমতা আছে এমন বিষাক্ত প্রকৃতির যৌগ।

Gall (গল)—অর্বুদ: রোগজীবাণুর বা কীটের আক্রমণের ফলে সৃষ্ট গাছের দেহের স্ফীত অংশ।

Haploid (হ্যাপ্লয়েড): যে অবস্থায় কোন কোষে বা নিউক্লিয়াসে N সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে।

Haustorium (হস্টোরিয়াম): বাধ্যতামূলকভাবে পরজীবী ছত্রাকের হাইফার বিশেষ শাখা যা পোষক গাছের দেহকোষের মধ্যে প্রবেশ করে ও সেখান থেকে পুষ্টির জন্য খাদ্যরস আহরণ করে।

Hemi-parasite (আধা-পরজীবী): যে পরজীবী পোষক গাছের মৃত্যু হলে সাময়িকভাবে মৃতজীবীর জীবন যাপন সক্ষম।

Herbicide (হার্বিসাইড)—আগাছানাশক: আগাছা ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে এমন বিষাক্ত প্রকৃতির যৌগ।

Heterokaryosis (হেটেরোক্যারিওসিস): যে অবস্থায় ছত্রাকের হাইফার কোষে বা স্পোরে একাধিক ভিন্ন বংশগত গুণাবলী সম্পন্ন নিউক্লিয়াস থাকে।

Horizontal resistance (হরাইজণ্টাল রেজিস্ট্যান্স)—সমান্তরাল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা: পোষক গাছের কোন জাতির রোগ উৎপাদকের বিভিন্ন জাতির আক্রমণ মোটামুটি ও প্রায় সমভাবে প্রতিরোধের ক্ষমতা।

Host (হোস্ট)—পোষক: পরজীবী যার দেহে আশ্রয়লাভ করে এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য, বিশেষ করে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য, সরবরাহের জন্য যার উপর নির্ভরশীল।

Hybridization (হাইব্রিডাইজেশন)—সঙ্করায়ণ: ভিন্ন বংশগত গুণাবলীর দ্বারা চিহ্নিত দুটি জীবের মধ্যে যৌনমিলনের মাধ্যমে মিশ্র গুণাবলী সম্পন্ন নূতন জীব সৃষ্টির পদ্ধতি।

Hydrolysis (হাইড্রোলিসিস)—আর্দ্র-বিশ্লেষ: যে পদ্ধতিতে কোন

এনজাইমের ক্রিয়ার ফলে জলের একটি অণুর সহযোগে একটি যৌগ বিশ্লিষ্ট হয়।

Hyperplasia (হাইপারপ্ল্যাসিয়া): কোষসমূহের অতিবিভাজনের ফলে গাছের অংশবিশেষের অতিবৃদ্ধি।

Hypoplasia (হাইপোপ্ল্যাসিয়া): কোষসমূহের সীমিত মাত্রায় বিভাজনের ফলে গাছের অংশবিশেষের সীমিতভাবে বৃদ্ধি।

Hypersensitivity (হাইপারসেনসিটিভিটি)—অতিসংবেদনশীলতা: কোন রোগজীবাণু বা ভাইরাসের বিশেষ বিশেষ জাতির প্রতি পোষক গাছের উচ্চ মাত্রায় সংবেদনশীলতা যার ফলে আক্রমণের তীব্র প্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত অংশে কিছু কোষের দ্রুত মৃত্যু ঘটে ও জীবাণু / ভাইরাস নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

Hypertrophy (হাইপারট্রফি): কোষসমূহের অস্বাভাবিক আয়তন বৃদ্ধির ফলে গাছের অংশবিশেষের অতিবৃদ্ধি।

Incubation period (ইনকিউবেশন পিরিয়ড)—অন্তবর্তী কাল: পোষক গাছের দেহে রোগ উৎপাদকের আক্রমণের সূচনা থেকে রোগের লক্ষণ প্রথম প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত সময়।

Immune (ইমিউন)—অনাক্রম্য: রোগের আক্রমণ সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধে সক্ষম।

Immunity (ইমিউনিটি)—অনাক্রম্যতা: রোগের আক্রমণ সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধের ক্ষমতা।

Inoculum (ইনোকুলাম): রোগ উৎপাদক বা তার দেহের বিশেষ কোন অংশ যা পোষকের দেহের সংস্পর্শে এলে সেখানে রোগসৃষ্টির ক্ষমতা রাখে।

Inoculum potential (ইনোকুলাম পোটেনশিয়াল): পোষক গাছের ত্বকে আক্রমণের জায়গায় রোগ উৎপাদকের আয়ত্তাধীন আক্রমণ ক্ষমতা যা তার সংখ্যা ও পুষ্টির উপর নির্ভরশীল।

Koch's postulates (কখ্‌স পস্টুলেটস)—কখের স্বীকার্য: কোন জীবাণুর রোগ উৎপাদন ক্ষমতার স্বীকৃতির জন্য প্রয়োজনীয় কখ্‌ নির্দেশিত শর্ত সমূহ।

Local lesion (লোকাল লেশন)—সীমিত ক্ষত: রোগজীবাণু বা ভাইরাসের আক্রমণের ফলে গাছের দেহে সৃষ্ট সীমিত আয়তনের ক্ষত।

Maceration (ম্যাসিরেশন): জীবাণুদেহনিঃসৃত এনজাইমের ক্রিয়ায় দুটি সংলগ্ন কোষের এজমালী দেওয়াল, মধ্যচ্ছদা, ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে কোষ দুটির বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া।

Microclimate (মাইক্রোক্লাইমেট): গাছের দেহসংলগ্ন অঞ্চলের স্থানীয় আবহাওয়া।

Micron (মাইক্রন): এক মিলিমিটারের হাজার ভাগের এক ভাগ।

Micronutrient (মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট): গাছের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য অথচ অতি অল্পমাত্রায় প্রয়োজনীয় মৌল উপাদান।

Middle lamella (মিডল ল্যামেলা)—মধ্যচ্ছদা: গাছের দেহে দুটি সংলগ্ন কোষের মাঝখানের এজমালী দেওয়াল।

Mycorrhiza (মাইকোরাইজা): গাছের শিকড় ও ছত্রাকের মধ্যে মিথোজীবিতার সম্পর্ক।

Ectotropic (এক্টোট্রফিক) *mycorrhiza*: যেখানে ছত্রাক শিকড়ে প্রধানতঃ ত্বকের উপরেই থাকে, ভিতরে সীমিতভাবে ছড়ায় এবং সাধারণতঃ কোষের ভিতরে প্রবেশ করে না।

Endrophic (এণ্ডোট্রফিক) *mycorrhiza*: যেখানে ছত্রাক শিকড়ের ভিতরে বেশ কিছুটা প্রবেশ করে, কোষের ভিতরেও প্রবেশ করে যদিও কোষের কোন ক্ষতি করে না, কিন্তু শিকড়ের গভীরে প্রবেশ করতে গেলে প্রতিহত হয় ও কোষের প্রতিক্রিয়ায় নষ্ট হয়ে যায়।

Necrosis (নেক্রোসিস): রোগজীবাণুর আক্রমণের ফলে গাছের দেহকোষের মৃত্যু।

Necrotroph (নেক্রোট্রফ) বা *Perthophyte* (পার্থোফাইট): যে রোগজীবাণু কেবলমাত্র পোষক গাছের মৃত কোষগুলিকে আক্রমণ করে।

Nematicide (নিমাটিসাইড)—নিমাটোডনাশক: নিমাটোডের মৃত্যু ঘটায় এমন বিষাক্ত যৌগ।

Obligate parasite (ওবলিগেট প্যারাসাইট)—বাধ্যতামূলকভাবে পরজীবী: যে পরজীবী একান্তভাবে পোষক নির্ভরশীল এবং পোষকের দেহের বাইরে যার কোন সক্রিয় অস্তিত্ব নেই।

Parasexual recombination (প্যারাসেক্সুয়াল রিকম্বিনেশন): হেটেরোক্যারিওটিক অবস্থায় দুটি ভিন্ন গুণাবলীর ধারক নিউক্লিয়াসের মিলনের

ফলে উৎপন্ন ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসের বিভাজনের ফলে মিশ্র গুণাবলী সম্পন্ন নূতন হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস সৃষ্টির পদ্ধতি।

Parasite (প্যারাসাইট)—পরজীবী : কোন জীবাণু বা ভাইরাস যা একটি গাছের দেহে আশ্রয় নেয় ও সেখান থেকে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, বিশেষতঃ শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য, সংগ্রহ করে।

Pesticide (পেস্টিসাইড)—জীবদেহের পক্ষে বিষাক্ত কোন যৌগ।

Pathogen (প্যাথোজেন)—রোগ উৎপাদক : পোষক গাছের দেহে রোগ-সৃষ্টিতে সক্ষম কোন জীব, জীবাণু বা ভাইরাস।

Pathogenesis (প্যাথোজেনোসিস)—রোগ সঙ্ঘটন প্রক্রিয়া : রোগ উৎপাদক যে সব প্রক্রিয়াসমূহের মাধ্যমে পোষকের দেহে রোগের সৃষ্টি করে।

Pathogenicity (প্যাথোজেনিসিটি)—রোগ সঙ্ঘটন ক্ষমতা : কোন জীব, জীবাণু বা ভাইরাসের পোষক গাছে রোগ সৃষ্টির ক্ষমতা।

Pathotoxin (প্যাথোটক্সিন) : রোগ জীবাণুর দেহনিঃসৃত বিষাক্ত যৌগ যা পোষকের রোগ সংবেদনশীল জাতির গাছে প্রয়োগ করলে রোগের স্বাভাবিক লক্ষণগুলি পুরোপুরি ফুটে ওঠে অথচ রোগ প্রতিরোধী জাতির উপর অনুরূপ কোন ক্রিয়া হয় না।

Pathovar (প্যাথোভার) : কোন রোগ উৎপাদক ব্যাকটিরিয়া প্রজাতির মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির পোষক গাছে রোগসৃষ্টির ক্ষমতার বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত বিশেষ উপপ্রজাতি।

Physiolgical race (ফিজিওলজিকাল রেস) : পোষকের বিভিন্ন জাতির গাছে রোগসৃষ্টির ক্ষমতার বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত রোগজীবাণুর বিশেষ জাতি।

Phytoalexin (ফাইটোঅ্যালেক্সিন) : রোগজীবাণু বিশেষতঃ ছত্রাকের আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় গাছের দেহে উৎপন্ন ছত্রাকবিরোধী যোগ।

Phytotoxin (ফাইটোটক্সিন) : জীবাণু দেহনিঃসৃত বিষাক্ত যৌগ যা পোষক গাছে প্রয়োগ করলে সেখানে রোগলক্ষণের সঙ্গে সাদৃশ্য নেই এমন ক্ষতের সৃষ্টি হয়।

Pit membrane (পিট মেমব্রেন)—কূপ পর্দা : গাছের দেহে ট্র্যাকীয়া ও ট্র্যাকাইড কোষের দেওয়ালের অপেক্ষাকৃত পাতলা অংশ যেখানে শুধুমাত্র মধ্যচ্ছদা আছে।

Plasma membrane (প্লাজমা মেমব্রেন)—প্লাজমা আবরণী : গাছের দেহ-কোষে প্রাচীরের ভিতরে সাইটোপ্লাজমের চতুঃপার্শ্বস্থ আবরণী।

Plasmodesma (প্লাজমোডেসমা) : গাছের দেহে এক্সমালী দেওয়ালের মধ্য দিয়ে সংলগ্ন ছুটি কোষের সাইটোপ্লাজমের যোগসূত্র।

Primary inoculum (প্রাইমারী ইনোকুলাম) : আগের বছরের রোগগ্রস্ত গাছ থেকে টিকে থাকা ইনোকুলাম যা থেকে নূতন বছরের গাছে রোগের আক্রমণের সূত্রপাত হয়।

Propagative virus (প্রোপাগেটিভ ভাইরাস) : রোগগ্রস্ত গাছ থেকে আহৃত হবার পর যে ভাইরাস বাহক পতঙ্গের দেহের ভিতরে সংখ্যাবৃদ্ধি করে।

Protectant (প্রোটেকট্যান্ট) : যা রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে গাছকে রক্ষা করে।

Quarantine (কোয়ার‍্যানটাইন) : পোষকের সঙ্গে রোগজীবাণুর সঙ্গরোধের আইনগত ব্যবস্থা।

Resistance (রেজিস্ট্যান্স)—রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : রোগের আক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষমতা।

Resistant (রেজিস্ট্যান্ট)—রোগ প্রতিরোধী : যে অল্প বা বিনা ক্ষতিতে রোগের আক্রমণ প্রতিরোধে সক্ষম।

Resting spore (রেস্টিং স্পোর)—বিশ্রাম স্পোর : যৌন বা অযৌন উপায়ে সৃষ্ট ছত্রাকের মোটা দেওয়ালযুক্ত ও বাড়তি খাদ্য সঞ্চিত আছে এমন স্পোর যা প্রতিকূল আবহাওয়ায় নষ্ট হয়ে যায় না এবং অনুকূল পরিবেশে অঙ্কুরিত হয়ে নূতন ছত্রাকের জন্ম দেয়।

Rhizomorph (রাইজোমর্ফ) : ছত্রাকের বহু হাইফার সমন্বয়ে গঠিত শিকড়ের আকৃতির বিশেষ অঙ্গ।

Rhizosphere (রাইজোস্ফিয়ার) : গাছের শিকড় সংলগ্ন জমির অংশ যেখানে শিকড়ের প্রভাব অনুভূত হয়।

Rot (রট)—পচন : জীবাণুদেহনিঃসৃত এনজাইমের ক্রিয়ায় গাছের আক্রান্ত অংশে কোষপ্রাচীরের ভাঙ্গন ও সংশ্লিষ্ট কোষের মৃত্যু।

Sclerotium (স্ক্লেরোশিয়াম) : অনেকগুলি ছত্রাকের হাইফা ঘনসন্নিবদ্ধ অবস্থায় থাকার ফলে গঠিত ছত্রাকের বিশেষ আকৃতির বিশ্রামকালীন অবয়ব যা তাকে প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে সাহায্য করে।

Secondary inoculum (সেকেণ্ডারী ইনোকুলাম) : রোগগ্রস্ত গাছের দেহে উৎপন্ন ইনোকুলাম যার মাধ্যমে রোগ একই মরশুমে গাছ থেকে গাছে ছড়িয়ে পড়ে।

Soil inhabiting fungus (সয়েল ইনহ্যাবিটিং ফাঙ্গাস)—জমিতে বসবাসকারী ছত্রাক : যে ছত্রাক জমিতে বসবাসকারী অন্যান্য মৃতজীবী জীবাণুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে খাদ্য আহরণের মাধ্যমে সেখানে স্থায়ীভাবে স্বাভাবিক জীবনধারণের ক্ষমতা রাখে।

Soil invading fungus (সয়েল ইনভেডিং ফাঙ্গাস)—জমিতে আশ্রয় গ্রহণকারী ছত্রাক : যে সব রোগ উৎপাদক ছত্রাক পোষক গাছের মৃত্যু হলে বা ফসল কেটে নেবার পরে জমিতে সাময়িকভাবে আশ্রয় গ্রহণ করে ও সেখানে কিছুদিন মাত্র টিকে থাকতে পারে কিন্তু কখনই জমিতে স্থায়ীভাবে বসবাসের ক্ষমতা রাখে না।

Static defence (স্ট্যাটিক ডিফেন্স)—নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা : আক্রান্ত গাছের গঠন ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

Strain (স্ট্রেন)—ধারা : পোষক গাছের বিভিন্ন জাতিতে বা বিভিন্ন প্রজাতির পোষক গাছে রোগসৃষ্টির ক্ষমতার বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত ভাইরাসের ভিন্ন ভিন্ন জাতি।

Susceptibility (সাসেপটিবিলিটি)—রোগ সংবেদনশীলতা : রোগের আক্রমণে অসুস্থ হয়ে পড়ার প্রবণতা।

Susceptible (সাসেপটিবল)—রোগ সংবেদনশীল : রোগের আক্রমণ হলে যে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

Symbiosis (সিম্বায়োসিস)—মিথোজীবিতা : দুটি জীবের যৌথ জীবনযাত্রা যেখানে তারা পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল।

Symptomless carrier (সিম্পটম্‌লেস ক্যারিয়ার)—রোগলক্ষণহীন বাহক : যে গাছ বা প্রাণী কোন রোগ উৎপাদক দ্বারা আক্রান্ত হলে নিজে রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে না কিন্তু রোগের উৎস হিসাবে কাজ করে ও রোগ ছড়াতে সাহায্য করে।

Systemic fungicide (সিস্টেমিক ফাঞ্জিসাইড) : যে ফাঞ্জিসাইড গাছের দেহে প্রবেশ করে ভিতরে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেখানে প্রতিষ্ঠিত ছত্রাককে বিনষ্ট করে ও পরবর্তী কালে ছত্রাকের আক্রমণ হলে তার থেকেও গাছকে রক্ষা করে।

Transduction (ট্রান্সডাকশন) : ফাজ দ্বারা বাহিত হয়ে কোন ব্যাকটিরিয়ার ডি এন এ'র অংশবিশেষের অন্য কোন প্রজাতি বা জাতির ব্যাকটি-

রিয়াতে স্থানান্তর ও সেখানে ডি এন এ'তে সংযুক্তির মাধ্যমে দ্বিতীয় ব্যাকটিরিয়ার জীনের গঠনে ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে স্থায়ী পরিবর্তনের পদ্ধতি।

Transformation (ট্রান্সফর্মেশন) : একসঙ্গে থাকা অন্য ব্যাকটিরিয়ার ডি এন এ'র কোন অংশ শোষণ ও নিজ ডি এন এ'তে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে কোন ব্যাকটিরিয়ার জীনের গঠনে ও চরিত্রিক বৈশিষ্ট্যে স্থায়ী পরিবর্তনের পদ্ধতি।

Tumour (টিউমার) : রোগজীবাণুর আক্রমণের ফলে গাছের দেহে উদ্ভূত স্বনিয়ন্ত্রণবিহীন, সততবর্দ্ধনশীল প্রকৃতির অর্বুদ।

Tylose (টাইলোজ) : জাইলেম প্যারেনকাইমা কোষের আয়তন বৃদ্ধির ফলে সংলগ্ন ট্র্যাকীয়ার গহ্বরে অনুপ্রবিষ্ট বেলুনের আকৃতির অবয়ব।

Vertical resistance (ভার্টিকাল রেজিস্ট্যান্স)—খাড়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : পোষক গাছের কোন জাতির রোগ উৎপাদকের কিছু জাতির আক্রমণ অতি উচ্চ মাত্রায় ও অন্য জাতিগুলির আক্রমণ অল্পমাত্রায় প্রতিরোধের ক্ষমতা।

Virulence (ভিরুলেন্স) : রোগ উৎপাদকের উগ্রতা বা পোষক গাছের ক্ষতি করার ক্ষমতা।

Vivotoxin (ভিভোটক্সিন) : পোষক গাছের দেহের ভিতরে রোগজীবাণু দ্বারা উৎপন্ন বিষাক্ত যৌগ যা কিছুটা পরিশ্রুত অবস্থায় ঐ প্রজাতির সুস্থ গাছে প্রয়োগ করলে সেখানে রোগের লক্ষণ পুরোপুরি বা আংশিকভাবে ফুটে ওঠে।

নির্দেশিকা

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১৫	উদ্ভিদ রোগ বিজ্ঞান	উদ্ভিদ-রোগবিজ্ঞান
২	২২	পরিস্কার	পরিষ্কার
	২৮	রোগউৎপাদকের	রোগ উৎপাদক
৩	১৪, ২০, ২৪	রোগউৎপাদক	রোগ উৎপাদক
	২৪	নিস্ক্রিয়	নিষ্ক্রিয়
৪	১১	ভুট্টা	ভুট্টা
৫	২৫	রমণীর	রমণীয়
১২	৬	তলত	তুলত
	১৭	উপাচারে	উপচারে
	২৬	খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ	খ্রীষ্টপূর্বাব্দ
১৩	১৪	উহল্ট	উইল্ট
১৪	১৮	butogaenic	autogenic
	২০	spontanecus	spontaneous
	২৯	স্বতঃস্ফূর্ত্ত	স্বতঃস্ফূর্ত
১৫	৫	Leeuwen hoek	Leeuwenhoek
১৬	১৫	*Berberis* sp	(*Berberis* sp.)
১৮	৯	দেহ নিঃসৃত	দেহনিঃসৃত
১৯	৩	বট্রাইটিস জনিত	বট্রাইটিসজনিত
	২১	নতুন	নূতন
	৩১	সঙ্করায়নের	সঙ্করায়ণের
২০	২৩	ব্যাকটিরিয়া জনিত	ব্যাকটিরিয়াজনিত
২১	১৯	Bowden	Bawden
২৮	২,১১	উদ্ভিদ রোগবিজ্ঞানী	উদ্ভিদ-রোগবিজ্ঞানী
২৯	১২	মিথোজীবীতা	মিথোজীবিতা
৩০	২৭	টিঁকে	টিকে
৩৩	১১	virent	virulent
৩৫	১২,১৫	রোগ লক্ষণের	রোগলক্ষণের
৩৭	২৮	অন্তবর্তী	অন্তর্বর্তী
৪৬	২১	হর	হয়

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৮	২৮	কোষেয়	কোষের
৪৯	৯	বেশি	বেশী
	১৪	জীবনযাপানর	জীবনযাপনের
৫১	২৫	বোরণ	বোরন
৬১	৮	অ্যাস্থেরাজইড	অ্যাস্থেরোজইড
৬২	২২	অ্যাসকোস্পোর	অ্যাসকোস্পোর
৬৫	২১	*Plasmodisphora*	*Plasmodiophora*
	২৪	*Phytopthora*	*Phyt ophthora*
৭৫	৩	জোগায়	যোগায়
৭৭	১২	উৎপাদনের	উৎপাদকের
	২৪	শ্রেণবিভাগ	শ্রেণীবিভাগ
৮১	১২	জীবজগতেয়	জীবজগতের
	২৩	সাধায়ণ	সাধারণ
৮২	৮	rods haped	rod-shaped
	১৬	কয়ে	করে
	২৭	সংযুক্তর	সংযুক্তির
৮৫	৩০-৩১	RNA-(polymerase-synthetase replicase)	(RNA-polymerase, -synthetase,-replicase)
৮৬	৪	messnger	messenger
	৮	নিউর্ক্লিয়িক	নিউক্লিয়িক
৮৭	৯	শারীরবৃত্তীর	শারীরবৃত্তীয়
	২৪	(S.C. Cicadellidae)	(Cicadellidae)
৮৮	২	'এফিড' (aphids)	'এফিড' (aphids) এর
৯০	২৪	অস্ততঃ	অন্ততঃ
৯১	১৭	সঙ্করায়নের	সঙ্করায়ণের
৯২	১৮	ফাইফথারা ইনফেসট্যানস	ফাইটফথোরা ইনফেস্ট্যানস
	১৯	স্টুয়ার্টআই	স্টুয়ার্টিআই
৯৫	৮	dikoryotic	dikaryotic
	১৭	সৃষ্টি	সৃষ্টি হয়
৯৭	১২	রাগ	রোগ
৯৮	২	যা	যার
১০৬	৯	দগের	দাগের
	২৬	পলিষ্টিক্টাস	পলিস্টিক্টাস
১১১	২৭	রোগলক্ষ্মণ	রোগলক্ষণ
১১৩	১৮-১৯	অলটারনোরিয়া	অলটারনেরিয়া

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১৪	২৪	টিঁকে	টিকে
	৩০	টিঁকিয়ে	টিকিয়ে
১২১	৪	শোষক	পোষক
১২২	২৮	সেপিভোরামে	সেপিভোরাম
১২৩	৫	*Phytisma*	*Rhytisma*
১২৫	১৮	৫০০০	৫০,০০০
১২৮	২	স্পোর	স্পোর যথাক্রমে
১৩০	১৭	এল্ম্	এল্ম
১৩৩	২৩	কার্শেনানের	কার্নেশনের
		ক্ষেত্রে	ক্ষেত্রে
১৩৫	১৫	*Apharomyces*	*Aphanomyces*
	২৮	স্পঙ্গোস্পেরা	স্পঙ্গোস্পোরা
১৩৬	৭	জ্রূণের	জ্রূণের
১৩৮	২৬	numericat	numerical
	৩০	উগ্রতা	উগ্রতা এবং
১৩৯	৭,১৪	মিলি	মি লি
১৪১	৩	*faboe*	*fabae*
১৪৩	৬	মধ্যে	মধ্য দিয়ে
	১২	এরউনিয়া	এরউইনিয়া
১৪৪	১	এরকম	একরকম
	৬	হষ্টোরিয়াম	হস্টোরিয়াম
	৮	ষ্টোমার	স্টোমার
১৪৫	১৭	চাপ	চাপ দেওয়া
	২১	*Chasterosporium*	*Clasterosporium*
১৪৯	৩১	পেকটিকল	পেকটিক
১৫২	২০	পঠে	ওঠে
১৫৬	১৮	কোষেয়	কোষের
১৫৯	৮	স্কোরোটিনিয়া	স্ক্লেরোটিনিয়া
	১৯	কটেক্সের	কর্টেক্সের
১৬০	২	পেরোনোস্পোরেলস	পেরোনোস্পোরেলস
১৬৩	১৬	প্রাজমোডিওফোরা	প্লাজমোডিওফোরা
	১৭	প্লাজমো	বাদ যাবে
	৩১	পাউভারি	পাউডারি
১৬৪	১২	মধোই	মধ্যেই

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৭৪	১৪,১৯,২২,২৫	ট্রানসএলিমিনেজ	ট্রান্সএলিমিনেজ
১৮০	৭	*kawachie*	*kawachii*
	৭০	পরিস্কার	পরিষ্কার
১৮২	২০	সফট	সফ্‌ট
১৮৩	৩	অ্যাট্রীম	এট্রীম
১৮৭	৫	রোগ	রোগে
১৮৮	৫	যা	বাদ যাবে
১৯০	২৭	গোলাকৃত	গোলাকৃতি
১৯৬	৯	পেরিকোনয়া	পেরিকোনিয়া
২০৫	২৫	সাইটোকাইলিন	সাইটোকাইনিন
২০৯	৭	৩২—৩৬	৩২—৩৬ ঘণ্টা
২১৭	৪	'kreb's	Kreb's
২২১	১৮	স্থানান্তরের ( ) এর মাধ্যমে	স্থানান্তরের ( ) মাধ্যমে
২২৬	৩	সৃষ্ট জলে	সৃষ্ট হলে
২৩২	৩১	sillicic	silicic
২৩৩	১৫	*Santhomonas*	*Xanthomonas*
২৩৬	২৬	উপর করে	উপর নির্ভর করে
২৩৯	২৫	ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে	ছড়িয়ে পড়ে
	২৯	রোগে ক্ষেত্রে	রোগের ক্ষেত্রে
২৬২	২১	ভূমকা	ভূমিকা
২৭৬	৯	ভৌগলিক	ভৌগোলিক
	৩১	ত্বেকর	ত্বকের
২৮৫	২০	নিয়ন্ত্রন	নিয়ন্ত্রণ
২৮৬	১২, ১৭	হুঁশিয়ারি	হুশিয়ারি
২৮৮	৭	ইনোকুলাবের	ইনোকুলামের
২৯৩	১১	নিভরযোগ্য	নির্ভরযোগ্য
৩০৬	১৪	রদলবদল	রদবদল
	৩১	টকা	টিকা
৩১৫	১০	বিরোধিতাকরী	বিরোধিতাকারী
৩১৭	২৩	প্রণয়ণ	প্রণয়ন
৩২০	৮	পেস্টসাইড	পেস্টিসাইড
৩২৭	২৭	জন্য	জন্য
৩৩২	১৩	হওবায়	হওয়ায়
৩৪৩	১৩	*Cronartuim*	*Cronartium*

খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের উদ্দেশ্যে বিশ্ব জুড়ে যে জোরালো প্রচেষ্টা চলেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক কৃষিতে উদ্ভিদ-রোগবিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম। রোগজনিত শস্যের ক্ষতি এড়াতে হলে উপযুক্ত রোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন। এর জন্য চাই রোগের সূত্রপাত কিভাবে হয়, রোগ কি অবস্থায় প্রসার লাভ করে, কি কারণে গাছের ক্ষতি হয় এবং গাছ কিভাবে রোগের আক্রমণ প্রতিরোধে সক্ষম হয় সে সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞান। উদ্ভিদ-রোগবিজ্ঞান শীর্ষক পুস্তকে অধ্যাপক অশোক সিংহ পোষক গাছ ও রোগ উৎপাদকের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে রোগবিজ্ঞানের উপরোক্ত মূল তত্ত্বগুলির আলোচনা করেছেন। এখানে গাছের রোগ সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা ছাড়াও প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞান চেতনার ক্রমবিকাশ, বিভিন্ন শ্রেণীর রোগ উৎপাদকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং রোগ নিয়ন্ত্রণের মূল পদ্ধতিগুলি নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে উদ্ভিদ-রোগ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটা সামগ্রিক ধারণা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা হয়েছে। এটিই বাঙলা ভাষায় উদ্ভিদ-রোগ-বিজ্ঞানের মূল নীতিগুলি নিয়ে রচিত প্রথম পুস্তক। কৃষি ও উদ্ভিদবিজ্ঞানের ছাত্ররা ছাড়াও অন্য যাঁরা গাছের রোগ সম্বন্ধে কিছুটা বিশদভাবে জানতে আগ্রহী তাঁরাও এই পুস্তক পাঠে উপকৃত হবেন।

চল্লিশ টাকা